স্মৃতিকণা

চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী

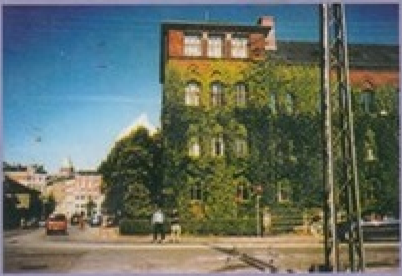

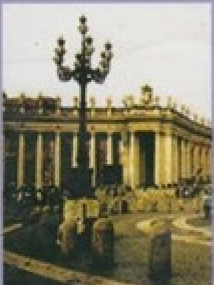

স্মৃতিকণা

চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী

Estd- 1949

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.pathagar.com

স্মৃতিকণা

চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী

প্রকাশক
এস এম রইসউদ্দিন
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১/৯৫৭১৩৬৪

গ্রন্থস্বত্বঃ লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশকাল ঃ জুন ২০০৮

মুদ্রাকর
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪/৯৫৬৯২০১

প্রচ্ছদঃ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ৪০০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম
১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
১৫০-১৫১ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা
৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

SMRITIKONA : By: Chowdhury Nurul Azim Quaderi, Published by: S.M. Raisuddin Director (Publication) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. Price :
Tk. 400.00, US$ 7 **ISBN.-984-70241-0000-9**

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় সর্বগুণসম্পন্ন জান্নাতবাসী দাদাজান চৌধুরী জিল্লুর রহমান দাদিজান সৈয়দা শাহেদা খাতুন প্রাণাধিক পূজনীয় জান্নাতবাসী জনক-জননী চৌধুরী বজলে রউফ কাদেরী ওরফে ফাইয়াজ ও সৈয়দা জারিয়াতুর রসুল প্রিয়তমা স্ত্রী সৈয়দা ফালাক আরা আজিম আমাদের স্নেহধন্য গুণমুগ্ধ সন্তান চতুষ্টয় ফারুক, শিল্পী, শাহীন, ফাহিম এবং সন্তানতুল্য বনী, রুমী, সীমা ও ঊর্মিকে আন্তরিক আশীর্বাদস্বরূপ।

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

একটি কথা প্রচলিত আছে, "পৃথিবী ভ্রমনের সামর্থ না থাকলে ভারতবর্ষ ভ্রমন করুন, সারা পৃথিবী দেখার স্বাদ পেয়ে যাবেন"। চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরীর আত্মজীবনী এবং ভ্রমনকাহিনী গ্রন্থ "স্মৃতিকণা"র পান্ডুলিপি পাঠ করে মনে হয়েছে, দেশ ভ্রমনের সাধ্য বা সুযোগ যদি কারো না হয়, এই বই পড়ে ভ্রমন পিপাসু মনের অনেকখানি তৃষ্ণা নিবারণ হয়ে যাবে। ভারত বর্ষের ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত দর্শনীয় স্থান, বিশেষ করে মুসলিম স্থাপত্য-শিল্পের নিদর্শনসমূহের মধ্যে আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর কুতুব মিনার, আজমীর শরীফসহ অনেক আউলিয়া ও বুজুর্গ ব্যক্তির মাযার শরীফ, ইতিহাস ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ভূ-স্বর্গখ্যাত কাশ্মীর, ইউরোপের সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি এবং আশিয়ান অন্তর্ভূক্ত সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া ইত্যাদি দেশ ভ্রমন করে লেখক যেভাবে স্থান কাল-পাত্রের সুনিপুন চিত্র তুলে ধরেছেন তা শুধু মনোমুগ্ধকরই নয়, পাঠকের সামনে জীবন্ত প্রতিচ্ছবি হিসাবে ধরা দেয়ার মত।

লেখক একজন প্রবীণ বিদগ্ধজন। দীর্ঘ ৩০ বছর শিক্ষকতার মহান পেশায় নিয়োজিত থেকে অত্যন্ত দায়িত্বশীলতার সঙ্গে নীরবে জ্ঞানের আলো বিলিয়েছেন। বাংলা, ইংরেজি, উর্দূ, আরবী এবং ফার্সি ভাষার উপর অসামান্য দখলের প্রভাব তাঁর গ্রন্থে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাঁর লেখায় গভীর জ্ঞান সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা এবং বিশাল আত্মপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে। পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলের প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ায় এই দুইটি আমলের সামাজিক রাজনৈতিক অনেক ঘটনা প্রবাহের তথ্যচিত্র ফুটে উঠেছে তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক বিশদ বিবরণে। অনেক দেশ-বরেণ্য ব্যক্তির সাহ্নিদ্ধলাভ ঘটায় তাঁদের কথাও গ্রন্থের নানাস্থানে উল্লেখ হয়েছে।

লেখকের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ, সহজ-সরল জীবনাচার, ধর্মের প্রতি গভীর মমত্ববোধ, আল্লাহ্'র প্রতি ঈমান ও আনুগত্য, সৃষ্টির প্রতি সাবলিল অনুরাগ "স্মৃতিকণা" গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ ও সমুজ্জ্বল করে তুলেছে।

একদিকে একজন সফল মানুষের অভিজ্ঞতা ও আত্মপলব্ধির স্মৃতিচারণ অন্যদিকে দেশ ভ্রমনের অনবদ্য কাহিনীর সমন্বয়ে সৃষ্ট এই গ্রন্থটি বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটির মাধ্যমে প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করে আমি তৃপ্তি বোধ করছি। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে বইটি সমাদৃত এবং প্রশংসিত হবে। আল্লাহ্ আমাদের প্রত্যাশা পূরণ করুন। আমিন॥

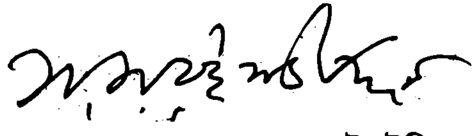

(এস এম রইসউদ্দিন)
পরিচালক (প্রকাশনা)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.pathagar.com

ভূমিকা

চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী-রচিত "স্মৃতিকণা" অংশত লেখকের আত্মকাহিনী এবং অংশত তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্ত। তিনি ভারত থেকে পাকিস্তানে আসেন, সে-পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেন। তিনি শিক্ষকতা করেছেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে, সেইসঙ্গে করেছেন আধ্যাত্মিক সাধনা। দেশভ্রমণের দুর্নিবার আকর্ষণ তিনি বোধ করেছেন বরাবর, পৃথিবীর নানা দেশে ভ্রমণ করতে সমর্থ হয়েছেন। সেসব দেশ সম্পর্কে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সংগ্রহ করেছেন অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য, খোলা চোখে সেসব দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য এবং আচার-আচরণ অনুধাবন করেছেন। যেসব স্থান তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার অনুকূল, সেসব স্থান সম্পর্কে তিনি ভক্তিভরে কথা বলেছেন। প্রসঙ্গক্রমে পরিচিত-অপরিচিত বহু মানুষের কথা এতে যেমন আছে, তেমনি আছে দেশ-বিদেশ সম্পর্কে জানা-অজানা অনেক তথ্য। এ-বই পাঠককে আকর্ষণ করবে বলে আমার বিশ্বাস।

১ মে ২০০৮

(ড. আনিসুজ্জামান)
প্রফেসর- এমেরিটাস
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

১ মে, ২০০৮

www.pathagar.com

প্রথম পর্ব

ভারত

সরকারী নাম	ঃ	ভারত
রাজধানীর নাম	ঃ	নতুন দিল্লী
জনসংখ্যা	ঃ	প্রায় ১২০ কোটি
আয়তন	ঃ	৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কিলোমিটার
মুদ্রার নাম	ঃ	ভারতীয় রূপী
ভাষা	ঃ	হিন্দী, ইংরেজী
মাথাপিছু গড় আয়	ঃ	৩৮০ ডলার
গড় আয়ু	ঃ	৬৩ বছর

সেদিনটি ছিল ১৯৩৩ সালের ১৭ মার্চ, মোতাবেক ১৩৪০ সন, ২ চৈত্র শুক্রবার বিকেল ৫-৩০ মিঃ। স্থান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় অবস্থিত বিখ্যাত গ্রাম-মাড়গ্রাম। রামপুরহাট রেল স্টেশন থেকে সোজা পূর্বে ছয় কিলোমিটার মাত্র। বর্তমানে চমৎকার পিচ্‌ঢালা পথ-ট্যাক্সি, বাস, রিক্সা, অটোরিক্সা, সাইকেল চলাচলের বেশ সুবিধা আছে। এই রাস্তাটির নাম ড. মহম্মদ কুদরত-ই- খুদা রোড।

আজ আমার শুভ জন্মদিন। অর্থাৎ সে দিনটিই ছিল আমার জন্মতারিখ। আমার নানাজান সৈয়দ শাহ আব্দুল ওলি আল কেরমানী আল-চিশ্‌তি আল-নিজামী আমাকে আমার জন্ম তারিখ (যা লিখে রেখেছিলেন) ছোটবেলাতেই জানিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে আমি ও আমার স্ত্রী তাঁর সেই সুন্দর হস্তাক্ষরে উর্দু ভাষায় লেখা দেখে চমৎকৃত হয়েছি। নানাজানের হাতের লেখা বাংলা, ইংরেজি এবং উর্দু তিনটি ভাষাতেই অত্যন্ত চমৎকার ছিল। বলাবাহুল্য আমার জন্ম তারিখটি যে পুরোপুরি নির্ভুল ছিল সেটা অবিশ্বাস্যভাবে প্রমাণ করেছে রাজশাহী থেকে একটি কম্পিউটার (Computer)। ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে আমি একবার রাজশাহী যাই। সেখানে আমার এক চাচাত ভাই রবিন একটা কম্পিউটার স্কুল চালাত। আমি হঠাৎ করে তার স্কুলটা দেখতে গেলাম ছুটি হয়েছে কিছুক্ষণ পূর্বে তাই শিক্ষার্থীরা কেউ ছিলনা। রবিনকে আমি বললাম, দেখ কম্পিউটার সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। তোমার কম্পিউটার আমার কি উপকার করতে পারে ? রবিন বলল, আপনার সম্বন্ধে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলতে পারে। তবে তার পূর্বে আপনার সঠিক বানানসহ আপনার নাম, আপনার মায়ের নাম, আপনার সঠিক জন্মতারিখ, আপনার সঠিক জন্মক্ষণ কম্পিউটারকে দিতে হবে। দিলাম তার কথামত আমার যা জানা ছিল।

www.pathagar.com

১৯৯৫ সালে এপ্রিল মাসে সপরিবারে পবিত্র হজ্বপর্ব সমাধার জন্য আমি যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম এবং পূর্ণ একমাস পবিত্র মক্কা ও মদিনা শরীফে অবস্থানের পর মহান আল্লাহপাকের অশেষ রহমতে দেশে প্রত্যাবর্তন করি- আলহাম দোলিল্লাহ্! কিন্তু ১৯৯৬ সালে কম্পিউটার আমাকে জানাচ্ছে আপনার যাওয়ার তারিখ ছিল ১৬ এপ্রিল অথচ আপনি গেছেন ১৯ এপ্রিল '৯৫। বাস্তবিকই তাই, কেননা, আমি সাউদিয়া এয়ারলাইন্সে বুকিং দিয়েছিলাম ১৬ এপ্রিল। সেখানে আমার এক ভাতিজা এনায়েত মওলা ছিল সাউদিয়া এয়ার লাইন্সের বুকিং অফিসার। সে পরে আমাকে টেলিফোনে জানায়, চাচা আপনাকে আরো ভাল ও বড় প্লেন দিচ্ছি। অতএব আপনি ১৬ তারিখ না গিয়ে ১৯ তারিখে যান। আমরা সত্যিই তাই করেছিলাম।

আবার কম্পিউটার আমাকে জানাচ্ছে, ১৯৯৬ সালের আগস্ট মাসে ১৬, ১৯, ২০, ২১, ২২ তারিখে আপনি এমন সমস্ত স্থানে ভ্রমণ করবেন যেগুলো আপনার জীবনে অতি স্মরণীয় পবিত্র স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ গণ্য হবে, এমনকি জীবনে এমন সুযোগ আর কখনও না-ও আসতে পারে। বাস্তবিকই তাই ঘটেছিল, যা যা কম্পিউটার বলেছিল। পরবর্তীতে, আমার লিখিত "মুসলিম বিশ্বে সফরনামা" বইতে পবিত্র জেরুজালেম থেকে ইরাক পর্যন্ত পুরো ৪০ দিনের ভ্রমণ কাহিনীতে বিস্তারিত উল্লেখ করেছি। পবিত্র উম্‌রাহ্‌সহ পাকিস্তান ভ্রমণও একই সঙ্গে সম্পন্ন করেছি।

রবিন আমাকে কম্পিউটার ডিস্কটা দিয়েছিল সংরক্ষণের জন্য। বেশ ক'বছর আমি সেটি সযত্নে রেখেছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে কয়েকবার বিভিন্ন এলাকায় বাসা বদলের ঝামেলায় সেটি খোয়া গেছে। ঢাকায় এবং চট্টগ্রামেও অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন কম্পিউটারের এমন ধরণের নির্ভুল ও নিখুঁত বিশ্লেষণে। আমি নিজেও কম বিস্মিত হইনি।

এই প্রতিবেদনের প্রথম দিকে উল্লেখ করেছি, "বিখ্যাত গ্রাম- মাড়গ্রাম" বলে। আমার সুপ্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে তার কিছুটা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন বোধকরি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্যপাল ডক্টর নূরুল হাসান কোন একসময় আমাদের মাড়গ্রামে সরকারী সফরে যান। সম্ভবত তিনি ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপক। কাজেই তিনি গ্রামবাসীকে উদ্দেশ্য করে তাঁর প্রদত্ত বিস্তৃত ভাষণের এক অংশে প্রশ্ন করেন, "আপনারা জানেন- আপনাদের এই গ্রামের গুরুত্ব ও মর্যাদা কতোখানি? বলে নিজেই নিজের প্রশ্নের উত্তর দেন এভাবে, "This is the biggest village in India, the second biggest village in Asia and the third biggest village in the World, both in area and population". পরবর্তীতে আমি গ্রামে গিয়ে এমনটিই শুনে এসেছি।

মূলত মাড়গ্রাম একটি মুসলিম প্রধান গ্রাম। আনুমানিক শতকরা ৮০ ভাগই মুসলিম। বেশীরভাগ লোকই ছিল এক সময় দরিদ্র এবং অশিক্ষিত। হাতে গোনা

www.pathagar.com

মাত্র কয়েকজন স্বনামধন্য ব্যক্তির জন্মস্থান এই গ্রাম। এঁদের মধ্যে ব্রিটিশভারতে ১৮৯৮ সালে Calcutta Presidency College থেকে First Class First হন আমার এক আত্মীয় সৈয়দ মহম্মদ আবদুল্লাহ, যিনি ছিলেন তৎকালে Executive Member of the Council of the Viceroy of India এবং Magistrate চৌধুরী জিল্লুর রহমান ছিলেন আমার নিজের দাদা, তিনি ছিলেন মাড়গ্রামের একচ্ছত্র জমিদার, মাড়গ্রাম A.O.M.E. School-এর হেড মাস্টার এবং ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। আমার দু'বছর বয়সে তিনি মাত্র ৫৪ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করে জান্নাতবাসী হন। সুবিচারক হিসেবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর ছোট চাচাত ভাই চৌধুরী হুজুরুল হক ছিলেন Honorary Magistrate এবং President, Birbhum Homeopathic Association। এরপর যাঁর নাম করা যায় তিনি ছিলেন সর্বজনগণ্যমান্য ড. মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা। তাঁর মেজভাই মহম্মদ বরকত-ই-খুদা, সেজ ভাই ডাঃ মহম্মদ নসরত-ই-খুদা- তিনি এমবি, বিএস (ক্যাল) এবং ছোট ভাই মহম্মদ নূরে খোদা- তিনি ছিলেন আমার পিতার সহপাঠী। প্রফেসর মহম্মদ রেজাউল করিম যিনি ছিলেন Principal, Girls College Berhampur, Murshidabad এরপর সৈয়দ মহম্মদ এজহার হোসেন, চৌধুরী আবি আহমদ, চৌধুরী আবুল হাসনাত, সৈয়দ মঞ্জুর কাদের প্রমুখ সকলেই ছিলেন ব্রিটিশভারতের পাস করা নামী-দামী Graduates এবং আমার নিকট আত্মীয়।

বর্তমানে অবশ্য অবস্থার রকমফের হয়েছে। প্রায় অর্ধ ডজনের উপর ডক্টরেট এবং অসংখ্য গ্র্যাজুয়েট ও মাস্টার্সের ছড়াছড়ি প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায়। বর্তমানে লোকসংখ্যা ৬২ হাজার এবং ৬৬টির মতো পাড়া। প্রতিটি পাড়া প্রায় এক একটি গ্রামের মতো। দু'টি ইউনিয়ন ও একটি থানা নিয়ে এই গ্রাম। দুঃখের বিষয় আজ পর্যন্তও ডিগ্রী কলেজ পর্যায়ে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। রাজনৈতিক কারণেই কিনা আমি জানিনা। বর্তমানে গ্রামে সরকারী উদ্যোগে একটি পাবলিক লাইব্রেরী গড়ে উঠেছে। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে পাকা ভবনে অবস্থিত লাইব্রেরীটি। বুড়াপীর হযরত জাফর খাঁ গাজীর মাজার একটি বৃহৎ টিলার উপর অবস্থিত। এরই সন্নিকটে লাইব্রেরী ভবন। বুড়াপীরতলা নামে স্থানটি সর্বজন পরিচিত। গ্রামের ভিতর একটি পিচঢালা পথ পুরো গ্রাম প্রদক্ষিণ করে বাসরুট হিসেবে বসুয়া, বিষ্ণুপুর হয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়েছে। গ্রামের প্রায় প্রতিটি বাড়ীতেই বিদ্যুৎবাতি ও পাখার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে অসংখ্য পাকা বাড়ী প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় বিদ্যমান। এককালে এই গ্রামে ছিল প্রচুর চাষী, কামার, কুমোর, তাঁতী, জোলা ও জেলের বাস। বর্তমানে এদেরই ছেলেমেয়েরা শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে নানা রকম ব্যবসা বাণিজ্যে জড়িয়ে পড়েছে। সরকারী চাকুরীর সুবিধা তাদের তেমন নেই বললেই চলে। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে বাজারপট্টি। বুড়াপীরতলা থেকে শুরু করে প্রায় ১ কিলোমিটার

www.pathagar.com

পর্যন্ত বিস্তৃত বাজার এলাকা। বর্তমানে সবকিছুই পাওয়া যায় নিত্য প্রয়োজনীয় যা কিছু দরকার। অনেকটা সেমিটাউনের মর্যাদায় উন্নীত এই গ্রাম। ৬৬টি পাড়ার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটি পাড়ার নাম এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- চৌধুরী পাড়া, মীরা পাড়া, গোদাম পাড়া, দারোগা পাড়া, রাহাত খাঁ পাড়া, সরকার পাড়া, খানসামা পাড়া, বাজার পাড়া, এঁটেল পাড়া, বাউরী পাড়া, হিন্দু পাড়া, সাঁওলা পাড়া, মোড়ল পাড়া, মোল্লা পাড়া, হঠাৎ পাড়া, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে গ্রামটি এতই বড় যে তার শুরু এবং শেষ নির্ধারণ করা সত্যিই মুশকিল। এই গ্রামের টোপোগ্রাফি বা ভৌগোলিক আকার আকৃতি বেশ খানিকটা উঁচু বলে প্রাকৃতিক বন্যার প্রকোপ কখনও পড়েছে বলে আমরা শুনিনি বা দেখিনি। গ্রামের আবহাওয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্যায়ের। অর্থাৎ শীতকালে যেমন প্রচন্ড শীত, গ্রীষ্মকালে তেমনই প্রচন্ড গরম। বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। গ্রামে প্রচুর পুকুর ও দীঘি আছে। প্রতিটি পাড়াতেই মসজিদ আছে। গ্রামের লোকজনের শরীর স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল। গড়পড়তা আয়ু একটু উচ্চমানের।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমাদের বংশ লতিকার একটা সূত্র যা আমি এ পর্যন্ত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি তা হল নিম্নরুপঃ

ভারতে বহু পূর্বেই পাঠান রাজ বংশের অবির্ভাব ঘটে মহম্মদ ঘোরির মাধ্যমে হিন্দু রাজা পৃথিরাজের পরাজয়ের পর। প্রায় ২০০ বছর পাঠান রাজ বংশের ভারত শাসনের পর মুঘল বীর সম্রাট বাবরের আগমন ঘটে পানি পথের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীর পরাজয়ের মাধ্যমে। এই বিশাল ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় এক সময় সম্রাট গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের (১৩২০-১৩২৫) খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর পর প্রথমপুত্র উলুঘ খান পরবর্তীকালে মহম্মদ-বিন-তুঘলক নাম ধারণ করে হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) আশীর্বাদপুষ্ঠ হয়ে ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১৩৫১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে প্রবল জ্বরে তাঁর মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা ফিরোজ শাহ তুঘলক ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে সুলতান হিসেবে রাজ্যশাসন করেন।

সম্রাট মহম্মদ বিন-তুঘলকের জামাই ছিলেন সিরাজখাঁ। তাঁরই ছেলে ছিলেন সুফি শাহ জাফর খাঁ গাজি। অর্থাৎ সম্রাট মহম্মদ-বিন-তুঘলকের নাতি ছিলেন শাহ জাফর খাঁ গাজী। পরিনত বয়সে তিনি ছিলেন মরদে মুমিন, মরদে মুজাহিদ। রিপলীজ 'বিলীভ ইট অর নট' বইতে বহু পূর্বে তাঁর সম্বন্ধে পড়েছিলাম, Headless Horseman এই নামের টাইটেল থেকে জানতে পেরেছি যে তিনি ত্রিবেনী নামক স্থানের নিকটস্থ বুহু যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু পক্ষের অস্ত্রাঘাতে আকস্মাৎ তাঁর পবিত্র মস্তক ছিন্ন হয়ে ভূমিতে পড়ে যায়, এবং তাঁর প্রশিক্ষিত ঘোড়া তাঁর অবস্থা জানতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর বাড়ীর পথে দীর্ঘ ২৬ মাইল পথ এক দৌড়ে এসে উপস্থিত হয় এবং অত্যন্ত

www.pathagar.com

অলৌকিকভাবে মস্তক বিহীন অবস্থায় তিনি তাঁর ঘোড়ার পীঠে বসে ছিলেন। জনশ্রুতি আছে যে, সুফিশাহ হজরত জাফর খাঁ গাজী (রহঃ) যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে একটি পাত্রে কিছু পানিতে দোয়াকালাম পড়ে রেখে বলে গেছিলেন যে, আমি যে অবস্থাতেই ফিরে আসি না কেন আমার উপর যেন ঐ পড়াপানি ছিটিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু তাকে ঐ অবস্থায় ফিরে আসতে দেখে বাড়ির লোকজন তাঁর সেই পূর্ব নির্দেশ ভুলে যায়। ফলে তাঁকে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ লুটিয়ে পড়ে। এই হজরত শাহ জাফর খাঁ গাজীর (রহঃ) মাযার মাড়গ্রামের বুড়াপীর তলায় উচু টিলার উপর সুদৃশ্যমান অবস্থায় আছে। কিন্তু তাঁর পবিত্র মস্তকটি রয়েছে ত্রিবেনীতেই। হজরত জাফর খাঁ গাজীর (রহঃ) বোনের মাযারও রয়েছ নিকটস্থ বড় মসজিদের মাযার সংলগ্ন স্থানে।

মাড়গ্রামের চৌধুরী বংশের আদি পুরুষ হিসেবে হজরত জাফর খাঁ গাজীকেই (রহঃ) উল্লেখ করা হয়। এই বংশধারার প্রথম যে ব্যক্তি চৌধুরী খেতাবে ভূষিত হন তাঁর নাম ছিল চৌধুরী মহম্মদ মুকিম। হাজী সৈয়দ নূরুন্নবী ওরফে শরফু মিয়া সাহেব ছিলেন বনেদী সৈয়দ পরিবারের প্রধান পুরুষ। তিনি শরফু মিয়া নামেই বিশেষ পরিচিত ছিলেন। চৌধুরী সাহেবদের ছিল জমিদারী এবং বংশ পরম্পরায় এই উভয় পরিবারেই ছিল বৈবাহিক সূত্রের বন্ধন। ক্রমান্বয়ে চৌধুরী মহম্মদ মুকিমের পুত্র ছিলেন চৌধুরী নিয়াজ আহম্মদ। তাঁর ছেলে ছিলেন চৌধুরী মতিয়ার রহমান তৎপুত্র ছিলেন চৌধুরী গোলাম ইমদাদুর রহমান এবং তৎপুত্র ছিলেন চৌধুরী লুতফুল হক এবং তৎপুত্র ছিলেন চৌধুরী আমিনুল হক। এই চৌধুরী আমিনুল হকের ছিলেন দুই পুত্র। প্রথম জন চৌধুরী একরামুল হক এবং দ্বিতীয় জন চৌধুরী এহ্সানুল হক। চৌধুরী একরামুল হকের ছিলেন তিনপুত্র সন্তান যেমন চৌধুরী জহুরুল হক, চৌধুরী মঞ্জুরুল হক, এবং চৌধুরী হুজুরুল হক। আর ছিলেন তিন কন্যাসন্তান। চৌধুরী এহসানুল হকের ছিলেন দুইপুত্র। যথা চৌধুরী জিল্লুর রহমান (লেখকের দাদা) এবং চৌধুরী আবুল মাতহার। আরও ছিলেন পাঁচটি কন্যাসন্তান। এঁদের মধ্যে একজনের সঙ্গে বিয়ে হয় সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া সহেবের। তিনি ছিলেন জেলা জজ সাহেব।

উল্লেখ্য যে, আমার (লেখকের) উপর পরিবারের পক্ষ থেকে একটা চাপ ছিল কুষ্টিনামা তৈরী করার। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রবীণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের অন্তর্ধানে এটা আর আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। তাছাড়া আমি সেই ১৯৫১ সাল থেকেই ভারত ছেড়ে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে অবস্থান করায় সে সুযোগটুকুও হারিয়েছি। বিধায় এই সংক্ষিপ্ত বংশ লতিকাটুকু উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম। যাতে ভবিষতে অধঃস্তন বংশধরেরা অন্ততঃ এই সূত্রটুকু থেকেই তাদের বংশধারার একটা যোগ সূত্র খুঁজে পায়। অবশ্য এর পরে অনেক দীর্ঘ বংশলতিকা রয়েছে যদিও, তবুও আমি তা উল্লেখ করে এই পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি করতে অপারগতা প্রকাশ করে সবিনয় অক্ষমতা জ্ঞাপন করছি।

www.pathagar.com

গওসুল আজম হজরত বড়পীর (রাঃ) সাহেবের অধঃস্তন বংশধারার যে বিকাশ সাধন হয়েছিল পশ্চিম বঙ্গের বহুস্থানে তাঁদেরই প্রতিষ্ঠিত কাদেরীয়া সিলসিলার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবনত ছিলেন মাড়গ্রামের এই চৌধুরী বংশের পূব পুরুষগণ এবং এখনও তা পূর্ববত বজায় আছে পূর্ণদমে আলহামদুলিল্লাহ। ফলে বর্তমানে মাড়গ্রামে বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছে খানকায়ে কাদেরীয়া। এই তরিকার বর্তমান সাজ্জাদা নশীন ও মোতওয়াল্লী সিদ্ধপুরুষ বড়হুজুর পাক কিবলা ও কাবা হজরত রশীদ আলী আল কাদেরী আল জিলী আল বাগদাদী আল হাসানী ওয়াল হোসায়নী সাহেব (মাঃ জিঃ আঃ)

মাড়গ্রামের প্রচুর মুরিদ, মোতাকেদ ও অসংখ্য ভক্ত অনুরক্তদের প্রতি বড় হুজুর পাক কিবলা অতিশয় সন্তুষ্ট হয়ে সম্প্রতি এক বিশাল জামে মসজিদ নির্মাণের মহতি পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে এক সুন্দর পরিবেশে অত্যন্ত মনোরম স্থানে এই জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হবে ইন্‌শাআল্লাহ। বলা বাহুল্য, ইতোমধ্যে বড় হুজুর পাক কিবলা পুর্ণিয়ায় রওশন গঞ্জে, বর্ধমানের মঙ্গল কোর্ট পাকে অতি সুদৃশ্য দুটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছেন। বাংলাদেশে রাজবাড়ীতে সুবৃহৎ মসজিদ এবং পাবনার মাসুমদিয়াতেও অতি চমৎকার জামে মসজিদ তাঁরই অনুমতি সাপেক্ষে নির্মিত হয়েছে।

এ পর্যন্ত ভারতের একটি বিখ্যাত গ্রামের ইতিবৃত্ত দিয়ে শুরু করলাম আমার "স্মৃতিকণা-রচনার সূচনা। ছোটবেলায় পড়েছিলাম বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা একটি কবিতা "সংকল্প"। কবি শিশু মনের উপর তাঁর এই ছোট্ট কবিতা দিয়ে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারেন তা আমি আমার নিজের জীবনে পরিণত বয়সে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। যতদূর মনে পড়ে কবি লিখেছিলেন,

থাকব না'ক বদ্ধ ঘরে; দেখব এবার জগৎটাকে
কেমন করে ঘুরছে মানুষ যুগান্তরের ঘুর্ণিপাকে।
দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
ছুটছে তারা কেমন করে,
কিসের নেশায় কেমন করে মরছে যে বীর লাখে লাখে।
কিসের আশায় করছে তারা বরণ মরণ-যন্ত্রণাকে॥

কেমন করে বীর ডুবরি সিন্ধু সেঁচে মুক্তা আনে
কেমন করে দুঃসাহসী চলছে উড়ে স্বর্গপানে।

হাউই চড়ে চায় যেতে কে চন্দ্রলোকের অচিন পুরে;
শুনব আমি, ইঙ্গিত কোন্ 'মঙ্গল' হতে আসছে উড়ে॥

পাতাল ফেড়ে নামব আমি উঠব আমি আকাশ ফুঁড়ে;
বিশ্ব-জগৎ দেখবো আমি আপন হাতের মুঠোয় পুরে॥

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পর্ব

<u>বীরভূম</u>

আয়তন	ঃ ৪৫৪৫ স্কয়ার কিঃ মিঃ;
জনসংখ্যা	ঃ ৩০,১২,৫৪৬ (২০০১ সেন্সস)
পুরুষ	ঃ ১৫,৪৫,৭৬৫,
মহিলা	ঃ ১৪,৬৬,৭৮১;
জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমান	ঃ ১৭.৮৮% (১৯৯১-২০০১);
লিঙ্গানুপাত	ঃ (২০০১)-৯৪৯ মহিলা প্রতি ১০০০ পুরুষে (পশ্চিম বাংলায় পঞ্চমস্থান);
শিক্ষাগত পরিমান	ঃ বছর
১৯৯১	- পুরুষ ৫৯.২৬ মহিলা ৩৭.২১,
২০০১	- পুরুষ ৭১.৫৭ মহিলা ৫২.২১।

আমার পিতার ইচ্ছা ছিল শিশুকালে স্কুলে ভর্তি না করে গৃহ-শিক্ষকের মাধ্যমে পড়িয়ে একেবারে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি করা। বছর বছর শ্রেণী পরীক্ষার প্রতি তাঁর কোন আগ্রহ ছিল না। ফলে, আমি একমাত্র ছেলে হিসেবে ৫/৬ বছর বয়সেই আমার হাতে রীতিমত 'তখ্‌তী' দেওয়া হয়। বিরাট ধুম্‌ধাম্‌ করে বাইরে দলিজে বহু লোককে মিলাদে দাওয়াত দেওয়া হয়। ইসলামী কায়দায় ছোট শিশুকে যখন প্রথম শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন একটা বড় তখ্‌তার উপর চক দিয়ে আরবী ভাষায় "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহিম" লিখে আরবী পরিভাষার সবগুলো অক্ষর বড় বড় করে শিশুর হাত ধরে কোন বুজুর্গ ব্যক্তি অথবা মৌলভী বা মাওলানা সাহেব লিখে দেন এবং কয়েকবার শিশুকে বিশুদ্ধ উচ্চারণ করতে শিখানো হয়। সমস্ত অনুষ্ঠানটি একটি মিলাদ মাহ্‌ফিলের মাধ্যমে ঐ শিশুর জন্য খাস দোয়া করা হয়। সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে শিশুর এই প্রথম পাঠভ্যাস এভাবে করাকেই আরবী ভাষায় 'তখ্‌তী' বলা হয়। আমার হাতে আমার পিতার বড়মামা জনাব সৈয়দ মহম্মদ বদরুদ্দোজা সাহেব যিনি ভারতের বিখ্যাত দেওবন্দের বড় আলেম এবং

www.pathagar.com

বীরভূম জেলা-স্কুলের প্রধান মাওলানা ছিলেন, তিনিই এই শুভ কাজটি করেছিলেন। তাঁর ছোটভাই সৈয়দ সাইদ আহমদ ছিলেন সেকেন্ড মাওলানা। বীরভূম জেলার প্রধান শহর সিউড়ী (Suri) জেলা স্কুলের মুসলিম ছাত্রাবাসের জন্য এরা দু'ভাই ছিলেন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট এবং একইসময়ে আমার পিতা তাঁর উপযুক্ত এই দু'মামার নিকট ছাত্রাবাসে থেকে লেখাপড়া করেছেন। আমার দাদা চৌধুরী জিল্লুর রহমান সাহেব আমার মাত্র দু'বছর বয়সেই আমাদের ত্যাগ করে জান্নাতবাসী হন।

আমার দাদাজানের প্রথম স্ত্রী ছিলেন আমাতুল কোবরা এবং তাঁদের প্রথম সন্তান ছিলেন বিবি মেহেরুন্নেসা চৌধুরাণী এবং দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন আলহাজ চৌধুরী খোরশেদ আলম। ঐ স্ত্রীর ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেন সৈয়দা শাহেদা খাতুনকে এবং তাঁদের প্রথম সন্তান ছিলেন আমার পিতা জনাব চৌধুরী বজলে রউফ কাদেরী।

আমার দাদজান ছিলেন সকল ভাইবোনদের বড় অর্থাৎ বংশের বড়। আমার পিতা জনাব চৌধুরী বজলে রউফ ওরফে ফাইয়াজ সাহেব ছিলেন তাঁর মাতার প্রথম সন্তান অর্থাৎ বংশের বড় এবং আমিও ছিলাম তাই। অর্থাৎ আমাকে দিয়েই চৌধুরী বংশের আর একটি জেনারেশন শুরু। গৃহ শিক্ষক হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমার জন্য আমার পিতা ভাল শিক্ষক নিয়োগ করতেন। কোন কোন শিক্ষকের সার্বক্ষণিক থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। বাইরে দলিজে বিশাল পাকা ভবনে তাঁদের সার্বক্ষণিক অবস্থানের সুব্যবস্থা ছিল। আমাদের পুরনারীরা সকলেই ছিলেন উঁচুস্তরের পর্দানশীন মহিলা। ফলে, জমিদার বাড়ীর বিরাট প্রাসাদে একমাত্র নিকট আত্মীয় ছাড়া অন্য কোন পুরুষ বা দূর-আত্মীয়ের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

ছোট বেলায় এক পাঠশালায় এক পন্ডিত মহাশয়ের নিকট আমরা পরিবারের ক'জন মাত্র লেখাপড়া করেছি। তাঁকে সকলে ফটিক মাস্টার নামেই চিন্‌ত। তাঁর নিজস্ব একটি মুদিখানার দোকান এবং একটি ছোট তাঁত ছিল। সেখানেই আমরা ৪/৫ জন ছাত্র প্রতিদিন মাত্র ২/৩ ঘন্টা করে শিক্ষালাভ করতাম। প্রধান বিষয় ছিল অংক, সাহিত্য ও হাতের লেখা। শ্রেণী হিসেবে এর তেমন কোন মান ছিল না। পন্ডিত মশায় শিক্ষক হিসেবে অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তাঁর ঐ ছোট্ট দোকানে আমাদের ছাড়া অন্য কোন ছাত্র নেওয়ারও অনুমতি ছিল না। আমাদের পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যখন তিনি মুদির সওদা বিক্রি করতেন, তখন বেশ মনে পড়ে মাত্র ২/

www.pathagar.com

৩ পয়সার বিনিময়ে তেল, ডাল, লবণ ইত্যাদি অনেকেই কিন্‌ত। তখন মাত্র ১ পয়সার ভগ্নাংশ ১ ছিদাম, ২ছিদাম, ৩ ছিদাম ইত্যাদি দিয়েই ঐ দিনের পরিমাণমত সওদা করা চলত। আমার বেশ মনে পড়ে, আমার নানাজান সৈয়দ শাহ আব্দুল ওলি সাহেবের নিয়ম ছিল, তাঁর মীরা পাড়ায় প্রায় ½ কি.মি. দূরে তাঁর বাড়ীতে গেলে তিনি আমাকে এক ন্যাড়া রাজার ছাপওয়ালা মাত্র ১টি তামার পয়সা দিতেন। যেটা আমি নিয়ে সোজা বাজারে গিয়ে কাসেম দোকানিকে দিলেই সে আমার হাফ প্যান্টের দু'পকেট এবং হাফহাতা জামার সাইড ও বুকপকেটে লজেন্স, চকলেট দিয়ে ভর্তি করে দিত। আর একটি কাগজের ঠোঙ্গায় দিত ছোট ছোট মার্বেলের মত পট্‌কা, বোম, ছুঁচো, হাউই এবং ফুলঝুরি যেগুলো আগুনের সাহায্যে রাতের বেলায় আতশবাজি খেলা যেত। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, বাজারে এগুলো এখন ক'শ টাকায় পাওয়া যাবে? আমি জানিনা। উপরন্তু যে উন্নতমানের লজেন্স চকলেটগুলো খেতাম, তাও বাজারে সচরাচর দেখা যায়না। মৌলভী ইজ্জত মোল্লা ছিলেন আমার আমপারা শিক্ষক। মৌলভী মনোয়ার ওস্তাদজী ছিলেন অংকের শিক্ষক, তিনি আমার পিতারও শিক্ষক ছিলেন।

ইংরেজি শিক্ষার জন্যে বিশেষভাবে আমার জন্যে একজন খৃস্টান শিক্ষক রাখা হয়েছিল। যিনি বিশুদ্ধ উচ্চারণে ইংরেজি শিখাতেন। বেশ মনে পড়ে লুঙ্গি বা পায়জামা পড়ে পড়তে গেলে তিনি ইংরেজি পড়াতেন না। বলতেন ঃ সর্টস্‌ এন্ড সার্টস্‌ এবং নটিবয় সু পরে আসতে হবে যদি সত্যিই তুমি ইংরেজি শিখতে চাও। পৃথিবীতে বোধকরি তাঁর আত্মীয় স্বজন কেউ ছিলেন না। অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। আমার পিতা আমার জন্যে ভাল ইংরেজি শিক্ষকের কথা রামপুরহাট শহরের এক হোটেলওয়ালাকে বলে রেখেছিলেন। তাই হঠাৎ একদিন আমার পিতাকে হোটেলে দেখে হোটেলওয়ালা পিতাকে বলেন, 'ঐ যে কোণায় বসা আপনার ছেলের জন্য শিক্ষক।' পিতা তাকে তখনই একবস্ত্রে আমাদের গ্রামে নিয়ে আসেন এবং তাঁকে দূরে একটা পুকুরে আমি নিয়ে যাই ও সাবান দিয়ে তিনি উত্তমরূপে গোসল করেন এবং নতুন জামা-কাপড় পরে সন্ধ্যার সময় তাকে আমাদের দলিজে নিয়ে আসি। তাঁর পুরনো জামা-কাপড় সেখানেই পুকুর পাড়ে পড়ে থাকে।

এই শিক্ষকের নাম ছিল সম্ভবত ডেভিড নির্মল ডি-কস্টা। পরবর্তীতে এই শিক্ষককে আমরা নিয়ে যাই বীরভূম জেলার এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে। সিউড়ী থেকে ১২

www.pathagar.com

মাইল দক্ষিণে খুষ্টিগিরিতে হযরত সৈয়দ শাহ আব্দুল্লাহ কেরমানী (রহঃ) (১৪৪০-১৫৪৮ খৃঃ) প্রতিষ্ঠা করেন এ গ্রাম। আমার মা ছিলেন এই বিখ্যাত পীর বংশেরই মাদারজাত ওলি হযরত আলহাজ্ব সৈয়দ শাহ মোঈন উদ্দিনের (রহঃ) নাতনী বিবি সৈয়দা জারিয়াতুর রসুল। এখানে প্রায় ৩০ একর জায়গার উপর রয়েছে বিশাল উঁচু দায়রা শরীফ। যেখানে আছে পীর সাহেবানদের বসত বাড়ী। বিরাট আকারের পুকুর গঙ্গাগড়ে যার চারিদিকেই রয়েছে বিশাল পাকা ঘাট। পূবদিকে রয়েছে অনেক বড় পাকা মসজিদ। পূর্ব-দক্ষিণ সংলগ্ন বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে রওজা মোবারক ও পারিবারিক গোরস্তান, লঙ্গরখানা ও সর্বদক্ষিণে ছিল মাদ্রাসা, বর্তমানে সেটা হাইস্কুল।

আমার ঐ ইংরেজি শিক্ষক ঐ মাদ্রাসাতেই একজন ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। হঠাৎ তিনি একদিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আব্দুর রহমান নাম ধারণ করেন। পরে মাদ্রাসার হেড মাস্টার হিসেবে নিয়োগ পান। তাঁর একটা অদ্ভূত অসুখ ছিল। যখনই তাঁর জ্বর হতো তখনই প্রচন্ডভাবে তাঁর সারা শরীর কাঁপতো এবং তাঁর দারুণ কষ্ট হতো; আর মুখে O God ! O God ! বলে চিৎকার করতেন। হঠাৎ একদিন খুব ভোরে, কাউকে কোন কিছু না জানিয়ে তাঁর নিজস্ব যেটুকু সম্বল ছিল কেবল তা নিয়েই তিনি নীরবে চলে যান। কেন চলে যান, কোথায় যান, এসব কিছু আমরা আর কোনদিন জানতে পারিনি।

আমার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী কেমনভাবে চলে গেছে আমি ঠিক জানতে পারিনি। আমার পিতার বদলীযোগ্য চাকুরীর বদৌলতে আমার মা, ছোট বোন- আমাতুর রসুল ও আমি সিউড়ী সদরে সোনাতোড় পাড়ায় খুষ্টিগিরির হযরত সৈয়দ শাহ আব্দুল হাফিজ সাহেবের প্রাসাদে বসবাস শুরু করি। যিনি ছিলেন আমার মায়ের এক মামা। সময়টা ছিল সম্ভবত ১৯৪৪ সাল। তখন তুমুল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে।

পুরো বাড়িটাতেই আমরা থাকতাম। অবশ্য বর্তমানে খুষ্টিগিরি ওয়াক্ফ স্টেটের মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদানেশীন হচ্ছেন আমার অতি নিকট আত্মীয় হযরত সৈয়দ শাহ মোহাম্মদ বজলে রহমান আল-কেরমানী, আল-নিযামী, আল-চিশতী। অতএব এই বাড়িটিও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। সম্প্রতি এই বাড়িটিকে বহুতল সুপার মার্কেট করার উদ্যোগ চলছে। রাস্তার পশ্চিমে একটি পুকুর। পুকুরের ঠিক উত্তরে বিশাল জামে মস্‌জিদ সংলগ্ন মক্তব এবং উপরতলায় মাদ্রাসা। আমার পিতা সাইকেলযোগে দৈনিক চাকুরীস্থল পুরন্দরপুর যাতায়াত করতেন। ঐ মক্তবটি চালাতেন

www.pathagar.com

মাত্র একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক। আমি জেলা স্কুলে ভর্তি হতে গিয়েও আমার তেমন ভাল না লাগায় এবং বাড়ি থেকে একটু দূরে হওয়ায় আমি বাড়ির কাছে ঐ মক্তবে ভর্তি হই তৃতীয় শ্রেণীতে। একটি বড় কামরায় দু'দিকে দু'টি শ্রেণী। নিচে সতরঞ্জিতে আমরা ছাত্ররা উপবেশন করতাম। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী মিলে মোট ছাত্র সংখ্যা বড় জোর ৪০ জন। শিক্ষক সাহেব বসতেন একটি কাঠের হাতলওয়ালা চেয়ারে, সম্মুখে একটি টেবিল। তাঁর পিছনে ছিল একটি ব্ল্যাকবোর্ড। এই দু'টি শ্রেণীকেই তিনি সুচারুরূপে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত করতেন। শ্রেণীর সমস্ত পাঠ্যপুস্তকই তিনি পড়াতেন ঐ সময়ের সিলেবাস অনুযায়ী। মাদ্রাসায় থেকে আমরা নামাজ শিক্ষা করে প্রথম নামাজ আদায় করতে অভ্যস্ত হই। বছরান্তে পরীক্ষায় যদিও আমি প্রথম হয়েই প্রমোশন পেয়েছিলাম, তবুও সিউড়ী শহর ছেড়ে দক্ষিণে ১২ মাইল দূরে খুষ্টিগিরি গ্রামে মাদ্রাসায় চতুর্থ শ্রেণীতে আমাকে ভর্তি করা হয়েছিল।

সিউড়ী শহর থেকে মাত্র কয়েক মাইল পশ্চিমে বিহার এলাকা শুরু। ফলে সিউড়ীর আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত প্রখর। পুরো শহরেই ছিল লাল সুরকীর পথ। প্রধান দু'টি হাইস্কুলের মধ্যে একটি ছিল জেলা স্কুল অপরটি বেনী মাধব হাইস্কুল। তাদের মধ্যে সব বিষয়েই ছিল দারুণ প্রতিযোগিতা। পরে বিদ্যাসাগর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কোর্ট-কাচারি, থানা, রেল-স্টেশন, বড় বড় বাজার মোটকথা একটি জেলা শহরে যা যা থাকা দরকার প্রায় সবই ছিল। বিশাল সরকারী হাসপাতাল ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য। শহরের মাঝখানে ছিল ভুতোবাবুর বিশাল বাসস্ট্যান্ড। তাঁর বহু মোটর-বাস ছিল, যেগুলো বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন শহরে চলতো, নিয়মিত যাতায়াত করতো এবং আজও করে। শহরে বেশ ক'জন বিখ্যাত ডাক্তার ছিলেন। যেমন ডাঃ কালীগতি বাবু, ডাঃ পাঁজা। এরা পশ্চিমবঙ্গে তৎকালীন খুবই বিখ্যাত ছিলেন। সিউড়ীতে রয়েছে একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, যাতে অনেকগুলো ফ্যাকাল্টি রয়েছে।

তখনকার সময় কোন সাইকেল রিক্সার প্রচলন ছিল না। প্রধান বাহন ছিল এক্কাগাড়ী বা পাল্কী গাড়ী যা দু'টি ঘোড়া দ্বারা টানা হতো। চালক বা কোচওয়ান গাড়ীর মাথার উপর বসে চাবুক হাতে ঘোড়া ছুটাতো। বেশ একটা আমেজ ছিল সে চলায়, ঘোড়ার পায়ের ছন্দময় একটানা কপ্-কপ, কপ-কপ্ শব্দ আমার খুবই ভাল লাগত। যা গরুর গাড়ীর মধ্যে মোটেই আশা করা যায় না। ফলে আমি

www.pathagar.com

ছোটবেলা থেকেই গরুর গাড়ী খুব অপছন্দ করতাম।

মাত্র তিনটি মহকুমা নিয়ে বীরভূম জেলা। একটি সিউড়ী (Suri) সদর, অন্যটি আমার হোম সাব-ডিভিশন রামপুরহাট (Rampurhat) এবং বোলপুর। শ্রী নিকেতন এবং শান্তি নিকেতনের বিখ্যাত 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' বোলপুর শহর সংলগ্ন বীরভূম জেলাতেই অবস্থিত। বিখ্যাত নোবেল বিজয়ী বঙ্গসন্তান অধ্যাপক ড. অমর্ত্য সেনও জন্মগ্রহণ করেন এই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে। অথচ আজ পর্যন্ত তাঁর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদকটি পর্যন্ত দেখার সুযোগ হয়নি। সম্প্রতি শান্তি নিকেতনে রবীন্দ্রনাথের নোবেল পদক ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী চুরি যাওয়ার পর তিনি নিজে তাঁর সম্পর্কে ঐ মন্তব্য করেন। মজার ব্যাপার হল, বীরভূম নামের কোথাও কোন গ্রাম বা শহর নেই। এই সিউড়ী শহর থেকে মাত্র কয়েক কি.মি. দূরে পাথর চাপড়ি। যেখানে রয়েছে দাতা মহবুব শাহের বিখ্যাত মাযার। আরো একটু দূরে রয়েছে বক্রেশ্বর গরম পানির ফোয়ারা। সেখানে অনেক রোগী তাঁদের রোগ নিরাময়ের জন্য স্নানের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করেন। এখানে রয়েছে জাপান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ উদ্যোগে নির্মিত ২১০ মেগাওয়াট সম্পন্ন ৪ ইউনিটের থার্মাল পাওয়ার স্টেশন। এই সিউড়ী থেকে মাত্র কয়েক কি.মি. দূরে অবস্থিত বিখ্যাত দামোদর ভ্যালী (D.V.C.) প্রজেক্ট (Damodar Vally Corporation Hydro-electric Project)। দামোদর নদের উপর অবস্থিত এই বাঁধের উপর নির্ভর করেই গড়ে উঠেছে বিশাল এলাকা জুড়ে চাষাবাদ এবং এখানে আরও রয়েছে Thermal Project. এই বীরভূম জেলায় মাত্র তিনটি মহকুমা শহর হলেও আরো রয়েছে ছোট-বড় বেশ কয়েকটি শহর, যেমনঃ সাঁইথিয়া (রেল জংশন), দুবরাজপুর, ইলামবাজার, আহমদপুর, মোল্লারপুর ইত্যাদি। মোল্লারপুরের নিকটেই তারাপীঠ গ্রাম, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান।

বীরভূম জেলার লাবপুরে জন্মগ্রহণ করেন বাংলার বিখ্যাত লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংযোজন হলো 'গণদেবতা'। এই গণদেবতার নামেই ভারতীয় রেল সরকার হাওড়া থেকে রামপুরহাট পর্যন্ত 'গণদেবতা এক্সপ্রেস ট্রেন' চালু করেছে। মৌরাক্ষী নদীর উপর মৌরেশ্বরে তৈরী করা হয়েছে বিশাল 'মাসানজোড় বাঁধ' এবং Hydro-electric Project. সারা বীরভূম জেলার কৃষিকাজের পরও এটা মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু

www.pathagar.com

অঞ্চল চাষাবাদের সুবিধা পেয়েছে। বর্ধমান জেলার কিছু অঞ্চল ও বিহারের বিশাল এলাকা ও ঝাড়খন্ড কৃষিকাজের সুবিধা পেয়েছে D.V.C. দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের প্রজেক্ট থেকে W.W. Hunter সাহেব ছিলেন একজন I.C.S. অফিসার। তাঁর বিখ্যাত রচনাবলী Statistical Accounts of Bengal-এর অনেকগুলো ভলিউম তিনি রচনা করেছেন। আমি তার কিছু পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম একসময়। প্রতিটি ভলিউমে তিনি কয়েকটি করে জেলার যাবতীয় হিসাব-নিকাশ প্রকাশ করেছেন। যেমন- চতুর্থ ভলিউমে তিনি বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন সুদীর্ঘ প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা জুড়ে। তিনি বীরভূম জেলা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, এই জেলার আয়তন অনেক বড় ছিল। এখানে প্রচুর লোহা, কয়লা এবং খনিজ দ্রব্যের প্রাধান্য ছিল। অধিবাসীরা ছিল কোল, ভীল, ডোম, হাঁড়ি, মুচি ও সাঁওতাল। বেশীরভাগই অশিক্ষিত ও দুর্বিনীত। ফলে এতবড় এলাকা শাসন করা ছিল একটা দুরূহ ব্যাপার। সে জন্যেই এই জেলার একটা বিরাট অংশ দেওয়া হয় বর্ধমানকে, কিছুটা দেওয়া হয় মুর্শিদাবাদকে এবং সামান্য কিছুটা ছেড়ে দেওয়া হয় বাঁকুড়া জেলাকে।

হান্টার সাহেব উল্লেখ করেছেন সমগ্র বাংলায় বারভুঁইয়াদের মধ্যে একজন ছিলেন বীরভূমের রাজা 'বীরসিংহ' এবং তাঁরই নামানুসারে এই জেলার নাম হয় বীরভূম। পরে একযুদ্ধে নবাব হায়দর জং বাহাদুর রাজা বীরসিংহকে পরাজিত করে বীরভূম দখল করেন। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা বীর সিংহের বাসভূমি ছিল লক্ষ্ণৌর বা রাজনগর। এখনও সেখানে রাজার অধঃস্তন বংশধরেরা বসবাস করেন।

বীরভূম জেলার পূর্বে মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণে বর্ধমান, উত্তরে বাঁকুড়া, পশ্চিমে বিহার অঞ্চল অবস্থিত। অপেক্ষাকৃত একটু উঁচু ভূমিতে এই এলাকার অবস্থান হওয়ায় বন্যার প্রাদুর্ভাব নেই বললেই চলে। বরং বীরভূমের বন্যার পানি প্লাবিত করেছে মুর্শিদাবাদের অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চল। বীরভূম জেলার আবহাওয়া তুলনামূলক ভাবে একটু বেশী প্রখর। মাটির উর্বরতার জন্যে এই এলাকা খাদ্যাভাবের প্রকোপে তেমন পড়েনি।

আমার চতুর্থ শ্রেণীর ইউ.পি. বৃত্তি পরীক্ষার সেন্টার পড়ে বোলপুরে। আমার সুযোগ্য শিক্ষক জনাব আব্দুল জলিলের কোচিং ও তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দেই এবং

www.pathagar.com

ভালভাবেই উত্তীর্ণ হই। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীপাঠ শুরু হয় পুনরায় মাড়গ্রামে। তখন আমাদের স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন বাবু মনোরঞ্জন কবিরাজ। তিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গে 'ভার্দুন ট্রেঞ্চ ফ্রান্সে' যোগদান করেন। মূলত তিনি আমাদের ইংরেজি বিষয়টা পড়াতেন বিশুদ্ধ উচ্চারণে। আমি তাঁকে অনেকটা অনুকরণ করতে পারায় তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। ক্লাসে কেবল আমাকেই ইংরেজি পড়ার জন্য আহ্বান জানাতেন। একদিন W. Wordsworth -এর লেখা Beautiful Things কবিতাটি আমি ক্লাসে পড়ার পর তিনি বলেন, I declare, you are the best boy in my school আমি অনুযোগের সুরে আমার প্রিয় বন্ধু রেজার অনুকূলে একটু আপত্তি করায় তা আর ধোপে টিকেনি বরং তিনি বলেন, Take your seat my verdict is correct.

www.pathagar.com

তৃতীয় পর্ব

এসময় আমার প্রধান খেলা ছিল দু'টি। একটি ফুটবল এবং অন্যটি কুস্তি। বড়দের সঙ্গে রীতিমত ফুটবল খেলতাম আমাদের নিজস্ব খেলার মাঠে। এ সময় কুস্তি বা মল্লযুদ্ধের প্রতি আমার প্রচন্ড আকর্ষণ ছিল। ফলে গ্রামে অনেকের সাথেই আমি কুস্তি লড়েছি। আমার একটা বিশেষ সুবিধা ছিল যে, এ খেলায় মার-প্যাঁচের টেকনিক আমার উত্তমরূপে জানা ছিল। বাংলার বিখ্যাত পাহ্‌লোয়ানদের যেখানে যেখানে খেলা হত আমি তা দেখতে যেতাম। যদিও আমার পিতা তা মোটেই পছন্দ করতেন না; এমনকি এরজন্য আমি তাঁর কাছে প্রচুর মারও খেয়েছি। শেষে তিনি তাঁর ছোট চাচা জনাব চৌধুরী আবুল মাতহারকে অনুরোধ করেন আমাকে বুঝানোর জন্যে। পরিশেষে আমার এই ছোট দাদাই অতি কৌশলে আমার মধ্যে এই খেলার প্রতি ভয়ভীতির সঞ্চার করেন।

কলকাতায় তখন চাকুরী করতেন আমার কয়েকজন চাচা। ছোটবেলায় আমি পিতামাতার সঙ্গে অনেকবার কলকাতা গিয়েছি বটে, কলকাতার কথা শুনতে শুনতে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু কিছু বর্ণনা তাঁদের কাছে জানার ফলে আমার কলকাতা যাত্রার প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মে। পিতামাতার জন্যেই আবার যাওয়ার সুযোগ পেলাম। পার্কসার্কাসে ঝাউতলা রোডে ছিল আমার এক নানী বিবি আমাতুল হাসানার বাড়ী। সেখানেই বরাবর উঠতাম। চাচারা সব থাকতেন বিভিন্ন মেসে। আমার কামাল চাচা, আজিজ চাচা ও মতলুব চাচাজানরা আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। ফলে প্রায়দিনই তাঁরা কেউ না কেউ আমাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় ঘুরে বেড়াতেন। তখন বৃটিশের রাজত্ব চলছে পুরোদমে। সারা কলকাতায় সাদা চামড়া লোকের বিচরণ চতুর্দিকে। দেখে বেশ মজা পেতাম। রাতের বেলা গোটা কলকাতা অন্ধকার অর্থাৎ Black-out সমস্ত গাড়ীর হেড লাইটের ৩/৪ অংশ কালো পেইন্ট দিয়ে ঢাকা থাকত। রাস্তায় অনেক সময় Manhole Cover না থাকায় চাচারা আমার হাত ধরে চলতেন আর বলতেন, দেখ বাবা Manhole-এর ভিতর পড়ে যেওনা, তাহলে একেবারে সোজা গঙ্গায় চলে যাবে। সারা কলকাতা থাকত অন্ধকারপুরী।

www.pathagar.com

একদিন দিনের বেলা হাওড়া ব্রিজ দেখতে গেলাম। দেখলাম পুরো ব্রিজের ট্রাসগুলো সব Ash Colour করা হয়েছে এবং অনেক বড় বড় বেলুন তার উপর বাঁধা অবস্থায় উড়ছে।

জাপানী যুদ্ধ উড়োজাহাজগুলো বোমা ফেলার জন্য প্রায়ই টার্গেট খুঁজে বেড়াত। হাওড়া ব্রিজও একটা টার্গেট ছিল। কিন্তু পারেনি। ডায়মন্ড 'হারবারে কিছু বোমা ফেলেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের তীব্রতা তেমন না থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল ভয়ঙ্কর। Curfew, Rationing, Black-out ইত্যাদি প্রচুর ইংরেজি শব্দের উৎপত্তি এ সময়েই। কেরোসিন তেল, চিনি, কাপড়, কাগজসহ সমস্ত খাদ্যদ্রব্যের চরম অভাব পরিলক্ষিত হয় সর্বত্র। বহুলোক অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। জনাব আবুল হাশিম ভাই তাঁর লিখিত As I see it বইতে উল্লেখ করেছেন, "During the great famine in Bengal men and women died of starvation in thousands parents sold their children and women bartered their honour for a morsel of food. There was a bumper crop of wheat in America and Russia. America dropped their surplus wheat in the depths of the Atlantic in order to screw up margin of profit of her wheat kings. Russia utilized their surplus wheat as fuel for the furnace depriving not only the sterving millinons of Bengal but also depriving other creatures of Allah like insects and birds of their natural right to draw their sustenance from the fruits of the fair earth. Why was this possible? The answer is equally obvious; this was the natural consequence of socialism. America and Russia thought that they had absolute right to deal with their resources in any manner they thought was conducive to their natural interest Islam like a double edged sword cuts both individualism and socialism and strickes a synthesis of the two opposites. Economic order of Islam is universalism.

মোট কথা, তখনকার দিনে একমাত্র কলকাতা ছাড়া আর কোথাও ট্রাম, মোটর-গাড়ী, মানুষ-টানারিক্সা ইত্যাদি দেখা যেত না। কোথাও কোন ধুলাবালির চিহ্ন পর্যন্ত দেখা যেত না। ভোর ৪ টার সময় থেকেই সারা কলকাতা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান চলত। সমস্ত রাস্তা পানির সাহায্যে ধোয়া মুছা চলত।

www.pathagar.com

মাড়গ্রামে আমাকে গৃহশিক্ষক হিসেবে পড়াতেন জনাব আব্দুল আলিম ভাই। খুবই দক্ষ শিক্ষক ছিলেন তিনি। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এম এ পাশ করেন এবং বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসাবে অবসর গ্রহণ করেন। জনাব ইজ্জত আলী মোল্লা সাহেব ছিলেন আমার আরবী শিক্ষক।

Anglo-Oriental Minor English School (AOMES) থেকে পাস করার পর আমি বর্ধমান জেলার গুসকরা শহরে বিখ্যাত পূর্ণানন্দ পাবলিক ইনস্টিটিউশন (পি.পি.আই)-এ ভর্তি হই সপ্তম শ্রেণীতে। ঐ শহরের মধ্যে একমাত্র মুসলিম পরিবার ছিলেন আমার মামা মহম্মদ মকসুদ ও মহম্মদ মেহবুব। মেহবুব মামা আমার চেয়ে ৩/৪ বছরের বড় ছিলেন এবং আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই মামাই আমাকে আরো ছোট বেলায় তাঁদের নিজস্ব পুকুরে সাঁতার কাটা শেখান এবং সেই সঙ্গে সাইকেল চালনা। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন; যার জন্য আমি তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার মামারা সকলেই এই স্কুলেই লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু কোন এক সাম্প্রদায়িক অপ্রীতিকর ঘটনার ফলে তাঁরা আর কেউ এমুখো হননি দীর্ঘকাল। ফলে যখন আমি ভর্তি হতে গেলাম, তখন সারা স্কুলে একটা চাপা গুঞ্জরণ শুরু হল এই বলে যে, আবার মকসুদ ফ্যামিলির সদস্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে। স্কুলের একমাত্র মুসলিম শিক্ষক মৌলভী আব্দুল আজিজ ছাড়া আর সকলেই ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত ও মার্জিত। লেখাপড়ায় আমি মোটেই পিছপা ছিলাম না, বরং স্কুলের পড়া আমার কাছে তেমন শক্ত বলে মোটেই মনে হয়নি কোনদিন। ক্লাসে শিক্ষকের সম্মুখে প্রথম বেঞ্চে বসা ছিল আমার বরাবরের অভ্যাস। সহপাঠির সঙ্গে প্রতিযোগিতার চেয়ে আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল শিক্ষকের প্রশ্নবাণের প্রতি বেশী আকর্ষণ। ফলে অচিরেই ভাল ছাত্র হিসেবে পরিচিতি পেতে আমার মোটেই বেগ পেতে হয়নি। হেড মাস্টার ছিলেন বাবু নিরদ বরণ মাহাতা এম এ বি টি, এসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার ছিলেন শিবনাথ বাবু এম এ বি টি, অতুলবাবু, সুরেশবাবু এঁরা সকলেই ছিলেন এম এ, বাবু জিতেন ব্যানার্জি ছিলেন ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর। এছাড়াও ছিলেন পানবাবু, অনিলবাবু প্রভৃতি বহু দক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক। আমি এতো কোয়ালিফাইড টিচার্স কোন একটা স্কুলে আর দেখিনি। সমস্ত বর্ধমান জেলার মধ্যে গুসকরার এই স্কুলটাই ছিল বেশ নামীদামী। ডাঃ অমূল্য বাবু ছিলেন সেক্রেটারী। হেড মাস্টার বাবুর এক মেয়ে এবং রেলস্টেশন মাস্টারের এক মেয়ে পড়ত বলে কোন মুসলমান ছেলেকে 'এ' সেকশনে পড়তে দেয়া হতনা। তাদের ফলাফল যতই ভাল হোক না কেন।

www.pathagar.com

তখন দেশ বিভাগ হয়ে গেছে। একটা পাকিস্তান অন্যটি হিন্দুস্তান। আমাদের একটা ক্লাস নিতেন পানবাবু। সাধারণত তিনি টিফিনের পরপরই ক্লাস নিতেন। সুকুমার বলে একটি ছাত্র সে ক্লাসে আসতো তিনি ক্লাসে আসার পর। সে ক্লাসে ঢুকার জন্যে অনুমতি চাইত একটা প্রচন্ড ঝাঁকি মেরে বলত আসব স্যার? পানবাবু তাকে কেন যেন সুনজরে দেখতেন না, বলতেন, কে হে? কুকুমার? তিনিও ঝাঁকি মেরে বলতেন, এসোহ্। সে এসে বসত প্রথম সারির একেবারে কোণায়। স্যার একটু পরে তাকে জিজ্ঞাসা করতেন, এটা কি হবে বলত দেখি কুকুমার? সুকুমার বলত, আমাকে কেন ধরটর জানোই তো আমি এসব পারিনা টারিনা। পানবাবু আমার কাছে এসে জিঞ্জাসা করতেন, কি বলে কিরে? হ্যাঁ কি বলে কি? আমি জবাব দিতাম, স্যার ও বলছে পারব না। প্রায়ই এরকম ঘটনা ক্লাসে ঘটত।

পানবাবুর একটা মস্ত দোষ ছিল যে, তিনি প্রতি ক্লাসে আমাদের মুসলমান ছেলেদের উদ্দেশ্যে বলতেন, তোরা এখানে কি করতে আছিস? পাকিস্তান যা না। আর সেখানে এখানকার কম্পাউন্ডারগুলো বড় বড় ডাক্তার বনে গেছে। সেখানে দুধ, ঘি, ডিম অত্যন্ত সস্তা মাত্র ২/৪ পয়সায় পাওয়া যায়। অতএব, এখানে থেকে কি করবি? যা পাকিস্তান যা। তাঁর এই মূল্যবান (!) উপদেশ আমার ভাল লাগত না। আমরা মুসলিম ছাত্ররা সর্বসাকুল্যে মাত্র গোটা পঞ্চাশেক ছিলাম সারা স্কুলে। আমি একটু নিচু ক্লাসে পড়লেও মূলে মুসলিম ছাত্রদের আমিই ছিলাম নেতা। যেহেতু আমি মুসলিম ছাত্রাবাসে থাকতাম না, অতএব মৌলভী আব্দুল আজিজ সাহেবকে আমার ভয় করার কোন কারণ ছিল না। কেননা, তিনি ছিলেন ঐ ছাত্রাবাসের সুপার। আমি বাড়িতে আমার বড় মামার কাছে পানবাবুর ব্যাপারটা আলাপ করি এবং এর একটা উপযুক্ত জবাব তাঁকে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হই। অনেক সলাপরামর্শের পর একটা চিঠি মুসাবিদা করেন আমার মামা এবং আমি সেটা লিখে মুসলিম ছাত্রাবাসের ক'জন ছাত্রকে সঙ্গে নিয়ে স্যারের বাসার নিকট গিয়ে তাঁকে চিঠিটা দেই। তিনি চিঠিটা বাসার ভিতর নিয়ে পড়ার পর তাঁর আক্কেল গুড়ুম। তিনি প্রায় কাঁদ কাঁদ গলায় আমাদের বলেন, আরে এতো আমার চাকুরী খেয়ে নিবি তোরা। আমার চাকরী থাকবে না। আমি তোদের মঙ্গলের জন্যেই বলি। বেশ তোরা পছন্দ না করিস তো বলব না, আর বলব না। সত্যিই তিনি তাঁর কথা রেখেছিলেন। অবশ্য পরে আমি পাকিস্তানে এসে কিন্তু তাঁর কথার বাস্তবতার মিল খুঁজে পেয়েছি, তিনি একেবারে মিথ্যা বলেননি।

www.pathagar.com

আমাদের সকল ছাত্রের স্কুলে যাওয়ার একটা ইউনিফর্ম ছিল। সাদা হাফসার্ট কাল সর্ট, সু ইত্যাদি। হঠাৎ একদিন আমি পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে স্কুলে গেছি। সেদিন দেখি একজন নতুন শিক্ষক এসেছেন ভূগোল ক্লাস নেয়ার জন্য। তিনি ভূগোল বিষয় পড়াতে পড়াতে বোর্ডে লিখলেন, FUCAULT একজন বিজ্ঞানীর নাম। উচ্চারণটা বার বার বললেন 'ফুকো' -ফুকলট নয। আমি তাঁর ঐ উচ্চারণটা মনে মনে রপ্ত করতে গিয়ে হঠাৎ 'ফু' শব্দটা শিস বাজার মত শব্দ বেরিয়ে আসে। অথচ কেউ কিছু বুঝতে পারার আগেই স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, কে? কে এমন শব্দ করল? আমরা ভয়ে কেউ কোন উত্তর দিতে সাহস পেলাম না। তিনি আমাদের পক্ষ থেকে উত্তর আসতে দেরী দেখে ক্রমশই অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। একসময় বলেই ফেললেন, এই সত্যটুকু বলার সাহস কারো নেই? তোমরা না বললে কিন্তু, আমি গণহারে তোমাদের শাস্তি দেব। শেষে প্রথম সারির এক কোণা থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম। কেননা, আমার বিবেক তখন আমাকেই ক্ষমা করছিল না। কেবল আমার জন্যেই এতোগুলো ছেলে শাস্তি পাবে তাতো হয় না। আমি উঠে দাঁড়ানোর পর স্যার বললেন, তুমি! কাছে এসো। একপা, দু'পা করে কাছে গেলাম। যতই কাছে যাই ততই তিনি ডাকেন আরো কাছে এসো। তিনি ছিলেন ডায়াসের উপর চেয়ারে বসা সম্মুখে টেবিল। আমি একেবারে তাঁর হাতের নাগালের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম, ভাবলাম আজ শেষ অবস্থা। তিনি আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এমন করলে? আমি বললাম স্যার ঐ 'ফুকো' উচ্চারণটা রপ্ত করতে গিয়ে হঠাৎ হয়ে গেছে। স্যার তখন সমস্ত ছেলেদের উদ্দেশ্যে বললেন, শোন ! এই ছেলে সত্যকথা বলেছে এবং ভাল ছেলে, তোমরা সকলেই এরমত সত্যকথা বলার চেষ্টা করবে। আর আমাকে বললেন, আর যেন এমন না হয় চেষ্টা করবে, যাও বসোগে। সেদিন বুঝেছিলাম সত্য কথা বলার কী পুরস্কার আর আনন্দ। পরে জেনেছিলাম তাঁর নাম বলরাম বাবু। তিনি একজন ব্যায়ামবীর ছিলেন।

গুসকরা ছোট শহর। রেল স্টেশন থেকে মামাদের বাড়িটা বড়জোর ২০০ গজ দূরে হবে। নামকরা ক'জন ডাক্তার ছিলেন এই শহরে। আমার বড় মামার বন্ধু ছিলেন ডাক্তার নন্দদুলাল রায়, যাঁকে আমিও মামা বলেই ডাকতাম। আর ছিলেন ডাক্তার এন, যশ। ডাক্তার অমূল্য বাবু অবশ্য এঁদের অনেক সিনিয়র ছিলেন। বেশ কয়েকটি রাইস মিল ছিল শহরে। বড়কা আর ছোট্কা নামে দুই কসাই ছিল, যারা আমাদের বাড়িতে খাসীর মাংস সরবরাহ করত নিয়মিতভাবে। অবশ্য গরুর গোস্তের কোন সরবরাহ কোথাও ছিলনা। যদি কখনও মুসলমান পাড়ায় তারা গরু জবাই

www.pathagar.com

করত, তবে খবর পেলে আনা যেত মাঝে মধ্যে। আমার স্কুলটা ছিল বাড়ি থেকে ২/৩ কি.মি. দূরে। মেঝ মামার সাইকেলটাই ছিল আমার একমাত্র বাহন। স্কুলটা ছিল সর্বাঙ্গীনভাবে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেক বড় এলাকা নিয়ে ২/৩টি খেলার মাঠ ছিল। প্রচুর ফুলের বাগান ছিল। একটি বাঁধানো ঘাটসহ পুকুর ছিল। হেড মাস্টার মশায় স্কুলটাকে এতই ভালবাসতেন যে, অনেক ভাল ভাল প্রস্তাব পাওয়া সত্ত্বেও তিনি স্কুল ত্যাগ করেননি। আমি হঠাৎ পাকিস্তান চলে আসার পর তিনি যখন জানতে পারেন, তখন অত্যন্ত মনক্ষুণ্ন হন। কেননা, আমি আসার পূর্বে কোন টি.সি. পর্যন্ত নিয়ে আসতে সাহস করিনি। ফেব্রুয়ারি মাসের বেতনের রশিদটাই আমার জন্য টি.সি'র কাজ করেছিল। পরে শুনেছি হেড মাষ্টার মশায়কে ভারত সরকার তাঁর কাজের জন্য পদ্মশ্রী খেতাবে ভূষিত করেছিল।

সপ্তম শ্রেণী থেকেই আমি দাবা খেলায় মেতে উঠি। কেননা, আমার বড় মামার সঙ্গে আমাকেই বেশী খেলতে হতো। এছাড়া ডাঃ দুলাল মামা, সাবরেজিস্ট্রার সাহেব এবং আমার বন্ধু সুজাউদ্দীনের দুলাভাই এক্সসাইজ দারোগা সাহেবের সঙ্গেও আমাকে প্রায়ই খেলতে হতো। একটা পরিত্যাক্ত গ্যারেজ ঘরে ছিল আমার পড়ার ঘর। স্কুলে মৌলভী সাহেব উর্দু পড়াতেন। সে তুলনায় আমার বাড়ীতেই আমি বেশ কিছু এগিয়ে ছিলাম। ফলে ঐ বিষয়ে আমার যথেষ্ট দক্ষতা ছিল বলে মৌলভী সাহেবও আমাকে বেশ একটু সুনজরেই দেখতেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন ছেলেরা কেউ হাতের লেখা আনেনি বলে মৌলভী সাহেব তাদের প্রত্যেককে অভিনব কায়দায় শাস্তি দিলেন। পকেট থেকে ছোট্ট নখকাটা ছুরি বের করে মাথার চুল ধরে টেবিলে চেপে ধরে ঘাড়ে এবং পিঠে ছুরির ফলা ঠেকিয়ে রক্ত বের হওয়ার পূর্বেই ছেড়ে দিতেন। ছেলেরা দারুণ যন্ত্রণায় কেঁদে কেটে অস্থির। শাস্তির এই প্রক্রিয়া আমার মোটেই সহ্য হলনা। আমি লেখা না আনলেও মৌলভী সাহেব আমাকে কিছুই বললেন না দেখে, আমি বললাম স্যার আমিও তো লেখা আনিনি। সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল এভাবেই আমাকে ডাকলেন আয়, কাছে আয়। আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমার মাথার চুল ধরে এক হেঁচকা টান মারার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাঁর উপর বুক চেপে পড়ে রইলাম হাত দুটিকে পিছনে রেখে। কেননা, ওস্তাদের গায়ে হাত লাগাতে হয়না আমার জানা ছিল। মৌলভী যে হাতলওয়ালা চেয়ারে বসেছিলেন সেটির পাশেই রাখা ছিল Volting Box তাই চেয়ারটি কাত হয়ে তার উপর পড়ে এবং তিনি দু'পা শূন্যে রেখে ঝুলতে থাকেন অথচ আমাকে মারার কোন সুবিধা পাননা। এভাবে বেশ কিছুক্ষণ তিনি ছট্‌ফট্‌ করার পর তাঁর

www.pathagar.com

প্রচুর দৈহিক শক্তির বলে উঠে দাঁড়ান এবং আমাকে প্রচন্ডভাবে মারপিট করেন এবং ক্লাসত্যাগ করে বেরিয়ে যান। ছেলেরা আমার জন্য অত্যন্ত মর্মবেদনা বোধ করে এবং বেশ বুঝেছে যে তাদের জন্যেই আমি এরূপ করেছি। কিন্তু কি আশ্চর্য ! মৌলভী সাহেবের এত প্রচন্ড মার খেয়েও আমার কেন যেন কষ্ট হয়নি এমনকি এক ফোঁটা পানিও পড়েনি চোখ থেকে। এভাবেই মৌলভী সাহেবের খড়্গহস্তের নিপীড়ন থেকে ছেলেরা বহুদিন নিস্তার পায়। আমার নিজের মনের মধ্যেও কেমন যেন একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করতাম।

আমার মামারা ছিলেন গুসকরা থেকে ১৩ কি.মি. দূরে কাশিয়াড়া গ্রামের অধিবাসী। তাঁদের পিতা ছিলেন খন্দকার আব্দুল হালিম এবং তাঁর পিতা ছিলেন নবাব আব্দুল জাব্বার সি.আই.ই। এই পরিবারেই আমার একমাত্র ছোট বোন আমাতুর রসুলের বিয়ে হয় নবাব সাহেবের এক পৌত্র মহম্মদ আব্দুল কবি'র সঙ্গে। নবাব সাহেব ছিলেন প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তি। প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ছিলেন বিশাল ওয়াক্ফ স্টেটের মালিক। এই পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন খন্দকার আব্দুল মোমিন সি.আই.ই; যিনি ছিলেন চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় সেখানকার কমিশনার। সেই আমলে ভারতে যে ক'জন প্রভাবশালী মুসলিম পরিবার ছিল, তাদের মধ্যে কাশিয়াড়া নিবাসী নবাব আব্দুল জাব্বারের পরিবার-পরিজনেরা ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায়, ধনে-জনে, অগ্রগণ্য। এই পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন স্বনামধন্য মহম্মদ আবুল কাসেম এবং তাঁর পুত্র আল্লামা আবুল হাশিম। আবুল কাসেমের নামানুসারেই তাঁর গ্রামের নাম হয় কাসেমনগর, কাসেমনগরে নবাব আব্দুল জাব্বার (এন.এ.জে) হাই স্কুল এবং একটি বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ও রয়েছে। বর্ধমান শহরেও তাঁদের পরিবারবর্গের বেশ কিছু জায়গা জমি ও বসতবাড়ী ছিল এবং এখনও আছে। বর্ধমানের ইসলাবাজারে রয়েছে তাঁদের বিশাল ওয়াক্ফ স্টেট এবং বাদশাহী আমলের এক প্রাচীন মসজিদ।

পশ্চিমবঙ্গের শহরগুলোর মধ্যে বর্ধমান একটি প্রধান ও প্রসিদ্ধ শহর। বর্ধমানের মহারাজার প্রচুর দান-দক্ষিণার বদৌলতে তৈরী হয়েছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এর মধ্যে রয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রয়েছে বিখ্যাত ফ্রেজার হাসপাতাল। বর্তমানে এই শহরের লোকসংখ্যা প্রচুর। ফলে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে করপোরেশনে উন্নীত করার উদ্যোগ চলছে। লর্ড কার্জন একবার বর্ধমানে আগমন করেছিলেন; ফলে তাঁর নামানুসারে তৈরী হয়েছে অতি বিশাল আকৃতির সুউচ্চ কার্জন গেট। সম্প্রতি বর্ধমান শহরে প্রচুর নামকরা ডাক্তার বহু ক্লিনিক তৈরী করেছেন যা কলকাতার

www.pathagar.com

উপর অনেক চাপ হালকা করেছে। সম্প্রতি গোলাঘাট এলাকায় আমার একমাত্র ভাগ্না নোমান জাহেদী একটি চমৎকার দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেছে। আমার বড়মামা মহম্মদ মকসুদ সাহেবের মেয়ে শবনমও বড় বাজারের নিকট একটি দ্বিতল ভবন সম্প্রতি বানিয়েছে।

বর্ধমান রাজ কলেজে লেখাপড়া করেছেন আমার ভগ্নিপতি মহম্মদ আব্দুল কবি তাঁর সহপাঠি ও একান্ত বন্ধু ছিলেন আমাদের বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পপতি ও ধনকুবের জহুরুল ইসলাম সাহেব। কলেজের সম্মুখে বিশাল রাণী মায়ের দীঘি। বর্ধমান মহারাজার রাজবাড়ীর একটা অংশে রয়েছে মহারাণী ওমেন কলেজ। বর্ধমান সদরঘাট এলাকায় রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ কলেজ। বর্ধমান গোলাপবাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে জি.টি. রোডের ধারে রয়েছে নার্সেস ট্রেনিং কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সমস্ত শহরের রাস্তাগুলো পাকা। সাইকেল, সাইকেল রিক্সা এবং মোটরবাইক হচ্ছে এখানকার প্রধান বাহন। বর্ধমান রেলওয়ে জংশন স্টেশন থেকে সারা ভারতের যে কোন স্থানে যাওয়া যায়। কলকাতা সিটি থেকে এর দূরত্ব মাত্র ৯০ কি.মি.। এক্সপ্রেস ট্রেন-এ সময় লাগে মাত্র ১ ঘন্টা ২০ মিনিট এবং লোকাল ট্রেনে প্রায় দু'ঘন্টা। কলকাতা থেকে যাবতীয় ট্রেন যেমন-রাজধানী এক্সপ্রেস, শতাব্দী এক্সপ্রেস, পাঞ্জাব মেইল, তুফান মেইল, কলকাতা মেইল ইত্যাদি সবগুলোই গ্র্যান্ড কর্ড বর্ধমান হয়ে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করে। বর্ধমান থেকে গুসকরা মাত্র ৩৩ কি.মি.। বর্ধমান থেকে রামপুরহাট ৬৫ কি.মি.। রেলওয়েতে কলকাতা থেকে দিল্লী ১৪০০ কি.মি. এবং কলকাতা থেকে মাদ্রাজ বা চেন্নাই ১৭০০ কি. মি.।

বর্ধমান জেলা বৃহৎ এলাকা নিয়ে গঠিত হওয়ায় প্রায় সবগুলো Coal Fields যেমন- রাণীগঞ্জ এ জেলাতেই অবস্থিত। দুর্গাপুর স্টিল ফ্যাক্টরী, চিত্তরঞ্জন লোকোমটিভ ওয়ার্কসপ এবং আরো বহু গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকারখানা গড়ে উঠেছে এই জেলাতেই। আসানসোল থেকে মাত্র ১০ কি.মি. দূরত্বেই রয়েছে বিখ্যাত বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মস্থান চুরুলিয়া গ্রাম। বর্তমানে সেখানে কবির স্মৃতির উদ্দেশে তৈরী হয়েছে বেশ কিছু ইমারত। যদিও আগের সেই পুরনো স্মৃতি বিজড়িত মাটির ঘর, মসজিদ ইত্যাদি আর তেমন দেখা যাবে না।

www.pathagar.com

চতুর্থ পর্ব

পাকিস্তান

সরকারী নাম	ঃ	ইসলামী জামহু রিয়াত-ই-পাকিস্তান
রাজধানীর নাম	ঃ	ইসলামাবাদ
জনসংখ্যা	ঃ	প্রায় ২৫ কোটি
আয়তন	ঃ	৭,৯৬,০৯৫ বর্গ কিলোমিটার
মুদ্রার নাম	ঃ	পাকিস্তানী রূপী
ভাষা	ঃ	উর্দু, পাঞ্জাবী, সিন্ধি, ইংরেজী
মাথাপিছু গড় আয় (জিডিপি)	ঃ	৪৮০ ডলার
গড় আয়ু	ঃ	৬৩ বছর

১৯৫১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকে হঠাৎ করে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা পাকিস্তান থেকে কলকাতায় আগমন করেন এবং আমাকে গুসকরায় খবর পাঠান তাঁর সঙ্গে ২/৩ দিনের মধ্যেই পাকিস্তান যাওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়ে কলকাতা যাওয়ার জন্যে। সে সময় বাড়ীতে আমার মামী বা মামারা কেউই উপস্থিত ছিলেন না। কেবল মাত্র কাজের কিছু লোকজন ছিল। অবশ্য আমি মনে মনে পাকিস্তান দেখার প্রবল আগ্রহ পোষণ করতাম। পাকিস্তান জন্মের পরপরই। সে সময় পাসপোর্ট বা ভিসার কোন প্রচলন ছিল না। কাজে কাজেই আমি পাকিস্তান চলে যাওয়ার এই প্রথম সুযোগটা আর হাতছাড়া করতে চাইলাম না। স্কুলে টি.সি. নিতে গেলে অবশ্যই পাব না ভেবে ফেব্রুয়ারী মাসের স্কুলের বেতন পরিশোধের যে রশিদ আমার নিকট ছিল, তা নবম শ্রেণীর এবং সেটাই সম্বল করে ও সামান্য কিছু বই পুস্তক সঙ্গে নিয়ে পাড়ি জমালাম কলকাতার উদ্দেশ্যে।

১১নং দিদার বক্স লেনের মেসে আমার আজিজ চাচার নিকট উঠেছিলেন আমার পিতা। তিনি অল্প সময়ের ছুটি নিয়ে এসেছিলেন বলে তার পরদিনই আমরা পিতাপুত্র

www.pathagar.com

একত্রে পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে শিয়ালদহ রেলস্টেশন ত্যাগ করে পরদিন অর্থাৎ ৩ মার্চ ভোরে ঈশ্বরদি জংশন স্টেশনে পৌছাই। পাবনা বিশ্বাস কোম্পানীর বাসে করে ১৮ মাইল পূর্বে পাবনা শহরে উপস্থিত হই সকাল ৮টায়। বাস থেকে নেমেই আমি খানিকটা বমি করি। বাণী সিনেমা হলের সম্মুখে দোতলা ভবনে ছিল বীরভূম মেস্। সেখানে বেশীরভাগ বোর্ডারই ছিলেন বীরভূম জেলা থেকেআগত বলেই ঐ মেসের নাম হয়েগিয়েছিল বীরভূম মেস্। এই মেসেই দোতালায় থাকতেন আমার মায়ের ফুলচাচা সৈয়দ শাহ্ আব্দুল মতি সাহেব। আমার নানাভাই, বয়সে আমার মায়ের অনেক ছোট ছিলেন বলে আমি মতিভাই বলেই ডাকতাম। তিনি জজ কোর্টের একজন কেরানী ছিলেন। ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে আমার পিতা ও মতি ভাই আমাকে পাবনা জিলা স্কুলে ভর্তি করার উদ্দেশ্যে হেডমাস্টারের সঙ্গে দেখা করেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়। সারারাত্রি রেল ভ্রমন উপরন্তু পথে বমি করার ফলে আমার শরীর এমনিতেই খারাপ হয়েছিল, তবুও পরীক্ষা দিতে হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশে ভিন্ন পরিবেশে। আমার পিতা সেদিনই তাঁর কার্যস্থলে চলে যাবেন বলে আমাকে তাড়াতাড়ি ভর্তির ব্যাপারে মতিভাইকে পীড়াপিড়ি করাতে জিলা স্কুলের হেড মাস্টার আমাকে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার জন্য উপদেশ দেন। আমার সঙ্গে টি.সি. না থাকার জন্যেই হোক বা যে কারণেই হোক, আমার অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তির ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহ প্রকাশ করেন। কেননা, আমাকে তাঁর যথেষ্ট পছন্দ হয়েছিল। কিন্তু আমার মুরুব্বীরা তাতে রাজি না হওযায় আমাকে স্থানীয় গোপালচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে ভর্তি করা হয় নবম শ্রেণীতে। অতএব, আমি গুসকরার পি.পি.আই.ছেড়ে এসে পাবনার জি.সি.আই. তে ভর্তি হলাম।

সম্পূর্ণ নতুন দেশ নূতন পরিবেশ, উপরন্তু জিনিষপত্র ভারতের তুলনায় দারুণ সস্তা হওয়ায় আমার বেশ ভালই লাগল। এ সময় পানবাবুর কথার যথার্থতা পদে পদে টের পাচ্ছিলাম। বাস্তবিকই তিনি সত্য বলেছিলেন। বীরভূম মেসে আমাদের থাকার কিছু অসুবিধা হওযায়, স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকদের পরিত্যক্ত বহুবাসা পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা নিকটেই হামিদ রোডের পাশেই একটি বিল্ডিং-এ উঠে পড়ি। যে বাসাটিতে ভিতরের দিকে বাস করতেন আমাদের বীরভূমের আব্দুর রহমান ভাই সপরিবারে। বাইরের অংশটাই আমরা অর্থাৎ আমি, মতিভাই এবং আমার একমামা সৈয়দ আবু হায়দার এই তিনজনের সংসার শুরু হয়। রান্না-বান্নার কাজটি আমি অতি

www.pathagar.com

অল্প সময়ের মধ্যেই রপ্ত করে ফেলি। পরে অবশ্য একটা বিহারী বাবুর্চি আমরা রাখতে পেরেছিলাম। ক'মাস পর সে কিছু চুরি করে পালিয়ে যায়। আমাদের G.C.I. স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন মথুর বাবু (Geography Trained Teacher)। কানে একটু কম শুনতে পেতেন বটে, তবে শিক্ষক হিসাবে খুবই ভাল ছিলেন। এই স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় একটা রচনা প্রতিযোগিতা হয়। বিষয় ছিল, 'আদর্শ নবী হিসাবে হজরত মুহাম্মদ (সাঃ)"। এতে আমি অংশ গ্রহণ করি এবং প্রথম স্থান লাভ করি। দ্বিতীয় স্থান লাভ করে আমার এক বন্ধু হারুণ-অর- রশিদ। কথা ছিল যে, আমাদের স্কুলের বার্ষিক মিলাদ মাহ্ফিলে যে রচনাটি প্রথমস্থান পাবে সেটিই কেবল সভার মধ্যে পাঠ করে সকলকে শুনানো হবে। অতএব, স্বাভাবিকভাবে সেদিন আমাকেই রচনাটি পড়ে শুনাতে হয়েছিল। নিমন্ত্রিত অতিথীদের মধ্যে সর্বজন গণ্যমান্য দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁরা ছিলেন একজন মাওলানা রইস উদ্দীন এম,এ, (ডবল) এবং আর একজন ছিলেন হাফেজ রইস উদ্দীন এম,এ,এল,এল, বি, মুন্সেফ পাবনা জজ কোর্ট। সে সময় আমাদের স্কুলে বেশ কিছু উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু শিক্ষক ছিলেন। দেশ বিভাগের পর থেকে তাঁরা প্রায় সকলের অলক্ষ্যেই এক এক করে দেশত্যাগ করে ভারতে চলে যান। আমার প্রাইভেট শিক্ষক ছিলেন বাবু রমেশ চন্দ্র সাহা। মূলতঃ তিনি অংকের শিক্ষক হলেও, প্রায় সব বিষয়ই তিনি পড়াতেন; আমাদের মাত্র ৭/৮ জন ছাত্রকে নিয়ে একটি ব্যাচের মধ্যে। আর কোন ব্যাচ পড়াতেন না। তিনি অবস্থাসম্পন্ন জমিদার ছিলেন। তাঁর ছেলে মিঠু আমাদের ক্লাসে প্রথম হত। যদিও সে প্রাইভেট পড়ত রাধানগর আর,এম, একাডেমির এক শিক্ষকের নিকট। শিক্ষক রমেশ বাবু তাঁর এই শিক্ষকতার পেশায় দারুণভাবে আন্তরিক ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সায়েন্স গ্রাজুয়েট শিক্ষক; কিন্তু তবু তিনি আমাদের ইংরেজি বিষয়টাও দেখতেন।

একদিনের ঘটনা, তিনি আমাদের সকলকে পিতার নিকট হোস্টেলে থাকা বাবদ টাকা চেয়ে ইংরেজীতে একটা চিঠি লিখে আনতে বলেছিলেন। তাঁর কথামত যথারীতি আমরা সকলেই ইংরেজিতে চিঠি লিখে নিয়ে আসি। আমার চিঠিতে আমি প্রথমেই Address করেছিলাম,

My Dear Father,

Thank you very much for your sweet note that I have duly recieved ইত্যাদি বলে। কিন্তু প্রথমেই তিনি পিতাকে 'My dear' Address

www.pathagar.com

করাতে আপত্তি করে তিনি কাটতে গেলে আমি বাধা দিই এবং অনুরোধ করে বলি, স্যার these are all correct English। আপনার পছন্দ না হয় তলায় Under line করুন কিন্তু দয়া করে কাটবেন না। Thank you লেখা দেখে বলেন, পিতাকে আবার Thank you কি হে? যা হোক ! এভাবেই আমার চিঠিখানা তাঁর পছন্দ হল না। কিন্তু আমি জানি আমি ঠিকই লিখেছি। পাবনা Inter Test পরীক্ষায় আমরা অংশগ্রহণ করেছিলাম। সেবার ইংরেজির প্রশ্ন বেশ কঠিন হয়েছিল। সম্ভবত সিরাজগঞ্জ থেকে কেউ প্রশ্ন করেছিলেন। পরীক্ষার ফল বের হবে এমন সময় হঠাৎ স্যার আমাদের বললেনঃ ইংরেজির ফল অত্যন্ত খারাপ। আমি বললাম, স্যার একজনও কি পাশ করেনি? স্যার বললেন, কেন তাতে কি হয়েছে? আমি বললাম একজন পাশ করলেও আমি আছি। এতক্ষণ স্যার অত্যন্ত গম্ভীরভাবে কথাবার্তা বলছিলেন; এবার হঠাৎ করে হেঁসে ফেলে বলেন সত্যিই তুমি আছ। মোট কথা, সর্বসাকুল্যে মাত্র ৬ জন সেবার ইংরেজিতে পাশ করেছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও স্যার কিন্তু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। আমার পিতার সঙ্গে আমার প্রসঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে বলতেন ঃ আপনার শ্রীমান বড় অদ্ভুত প্রকৃতির। সাধারণতঃ ছেলেরা ইংরেজি প্রথম পত্রে একটু বেশী নম্বর পায় আর আপনার শ্রীমান পায় দ্বিতীয় পত্রে বেশী নম্বর। আমার পিতার ইচ্ছা ছিল কলেজে আর্টর্স-এ ভর্তি করা, কিন্তু আমার ঐ শিক্ষকের চাপেই আমাকে সায়েন্সে ভর্তি করা হয়। দশম শ্রেণীতে উঠার পরপরই আমার মা ও বোন পাকিস্তানে বেড়াতে আসবেন জেনে গোপালপুর এলাকায় একটা বাসা ভাড়া নিই। এই বাসাতেই তাঁরা বেশ ক'মাস ছিলেন। আমার মেজমামা মেহবুব জাহেদীও বেশ কিছু দিন আমাদের কাছে থেকে গেছেন। তিনিও চলে যান ভারতে। আমার মা ও বোন ভারতে চলে যাওয়ার পরও বাসাটা আমরা ছাড়িনি। কেননা, আমার পিতা হোস্টেলে থাকা আমার জন্য পছন্দ করতেন না। ফলে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় আমার দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা হয় একটা পেশওয়ারী হোটেলে। তারা আমার ব্যাপারে যথেষ্ট ভাল খাওয়ার ব্যবস্থা করত এমন কি অন্য দোকান থেকে দই, বরফ, মিষ্টি ইত্যাদি এনেও খাওয়াত। অবশ্য তাই বলে তারা তেমন খুব বেশী চার্জ করেনি। আর রাতের বেলা আমার এক প্রতিবেশী খালা রুটি বানিয়ে দিতেন আমার জন্য, অবশ্য আটা আমি তাঁকে আগেই কিনে দিতাম এবং স্টোভ জ্বালিয়ে দুধ দিয়ে আমি একটা মিষ্টান্ন মত কিছু একটা বানিয়ে নিতাম। এ ভাবেই আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা আমি শেষ করি। তখন প্রতিটি

www.pathagar.com

জিনিষ বেশ সস্তায় যাওয়া যেত। যেমন খাঁটি গাওয়া ঘি সের প্রতি ৩ টাকা, দুধ দু'আনা, চাল প্রতি মন ১৩ টাকা থেকে ১৬ টাকা ইত্যাদি সব জিনিষই এই অনুপাতে বেশ সস্তা ছিল। বর্ষার সময় প্রচুর ইলিশ মাস ৫ টাকায় প্রায় ৭০/৮০ টা পর্যন্ত পাওয়া যেত নদীর ঘাটে। গরুর গোস্ত ১ টাকা সের। এভাবে অন্যান্য প্রচুর মাছ পাওয়া যেত বেশ সস্তায়। অভাব বলতে কোন জিনিষ তেমন চোখে পড়ত না। লোকের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা ছিল বেশ স্বচ্ছল। তখন পাবনায় আম, লিচু ইত্যাদি ১০০ কিনলে ২০০ পাওয়া যেত। পয়সা পয়সা ডিম। খাশীর গোস্ত ৩ থেকে ৪টাকা সের। সে সময় প্রচুর ঘোড়ার গাড়ী ছিল শহরে। মাত্র ২ টাকায় ৬ মাইল দূরে টেবুনিয়া হাটে যাওয়া যেত। কোচওয়ান ডাক দিত উচ্চস্বরে স্থানীয় ভাষায় বলত, "দুই টাহা, দুই টাহা।"

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আমি খুলনা শহর হয়ে যশোরের লোহাগড়া যাই, আমার এক চাচা সেখানে ছিলেন Civil Supply Inspector এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন আমার এক খালা। লোহাগড়ার কালিগঙ্গা নদীর ধারেই ছিল তাঁর একমাত্র দোতলা ভবন। পুরো বাড়ীটাতেই চাচা থাকতেন-চমৎকার আবহাওয়া। দক্ষিণেই নদী, প্রায় মাস খানিক ছিলাম। চাচার মেয়ে ও ছেলে বেবী ও বাবুকে নদীতে সাঁতার শিখাতাম। নদীর ওপারের দু'বন্ধু আব্দুর রহমান ও মোতালিবের সঙ্গে আমার বেশ সখ্যতা জমেছিল। তখনকার দিনে ঢাকায় ছিল Information Bureau তারা একটা বিজ্ঞাপন পত্রিকায় দিয়েছিল যে, যদি কেউ আট আনার একটি Revenue Stamp খামযোগে তাদের কাছে পাঠায় তবে তারা তার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফল জানিয়ে দেবে। এই সুযোগটা আমি সবার আগেই নিয়েছিলাম। ফলে, তারা আমার পরীক্ষার ফলাফল একটি Post Card এর মাধ্যমে সবার আগে জানিয়েছিল। অথচ সেখানকার High School গুলোতে ক'দিন পর ফল এসে পৌছায়। ফলাফল বের হওয়ার ক'দিন পরই আমি পাবনায় ফিরে আসি।

১৯৫৩ সালে আমি Edward College, Pabna তে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হই। প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে পেয়েছিলাম জনাব আজিমুদ্দীন আহমদ সাহেবকে, যিনি ছিলেন বর্তমান বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আবু সাঈদের পিতা। তিনি আমাদের ইংরেজি পড়াতেন খুব মজা করে। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই জনৈক হিন্দু হিসাব রক্ষকের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তিনি অত্যন্ত অন্যায়ভাবে চাকুরীচ্যুত হন এবং ঐ হিন্দু হিসাবরক্ষক ভারতে পালিয়ে যায়। এরপর Principal হন বাবু

www.pathagar.com

নলিনী রঞ্জন রায় First class First (C.U.) তিনি আমাদের পড়াতেন Mathematics- Physics department এর প্রধান ছিলেন বাবু মাখনলাল চক্রবর্তী; তিনিও First class first (C.U.), খুব ভাল পড়াতেন। Chemistry depertment এর প্রধান ছিলেন বাবু বসন্ত কুমার ঘোষ। সকলেই অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও প্রবীণ শিক্ষক। কিন্তু দেশ বিভাগের কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁরা এক এক করে সকলেই দেশ ত্যাগ করেন। ছাত্র শিক্ষক সকলের প্রবল অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও তাঁরা এ দেশে থাকতে চাননি। পরে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ এদেশে বেড়াতে এসে জানিয়েছিলেন, বহুকষ্টে কেউ কেউ কোন স্কুলে কোন প্রকারে ঢুকতে পেরেছিলেন, তাও সকলে না।

আমাদের বিজ্ঞান বিভাগের ক্লাসরুমগুলি ছিল গ্যালারীতে। আর বেশীর ভাগই বিজ্ঞানের শিক্ষকেরা Roll call করতেন না। বরং ছেলেরাই নিজেদের Roll নিজেরাই খুব দ্রুত বলে যেত। এতে সময় লাগত খুবই কম। হঠাৎ একদিন Chemistry-র শিক্ষক অধ্যাপক আব্দুল লতিফের ক্লাসে ঐভাবে Roll call করার সময় আমার Roll call ছিল 73। অসাবধানবসতঃ 73 উচ্চারণটা একটু শ্রুতিকটু শোনায়, শিক্ষক জিজ্ঞাসা করেন। কে? কে বলল? আমি দাঁড়িয়ে বললামঃ Sir I am sorry, I have some defective tongue, -the auterior part of my tongue is concected with the posterior part of my lower gum শিক্ষক কিছুক্ষণ নীরবে আমার দিকে চেয়ে থেকে মাথা নামিয়ে বলেন বস। আমাদের Biology department এর প্রধান ছিলেন প্রফেসর ডাঃ মনি মজুমদার BSc, MBBS (cal) খুবই সুন্দর ছিলেন দেখতে; একেবারে পুরো European পোষাকও পরতেন তাই। পাবনা শহর ছিল বর্দ্ধিষ্ণু হিন্দুদের বাস। রায় বাহাদুর থেকে আরম্ভ করে ছোট বড় অনেক জমিদার ছিলেন। তাঁদেরই দান-দক্ষিণা হিসেবে গড়ে উঠেছে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিল্পকলা একাডেমি, অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী' ইলিয়ট বনমালী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। বর্তমানে অন্নদাগোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী বিশাল চার তলা ভবনে রূপান্তরিত হয়েছে, রয়েছে প্রচুর মূল্যবান বই-পুস্তক।

১৯৫৫ সালে পাবনা শহরে আমরা ক'জন প্রতিষ্ঠা করি আঞ্জুমান-ই-ক্বাদেরীয়া। আমাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন জনাব মোয়াজ্জেম আহমদ সিদ্দিকী, মহম্মদ শরীফ। মহম্মদ আব্দুল হান্নান এবং আমি ছিলাম সর্বকনিষ্ঠ। পরবর্তী পর্যায়ে আরো অনেকে অবশ্য এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। মুলতঃ ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি যেমন, মিলাদ

www.pathagar.com

মাহফিল, প্রতি মাসেই ১১ই শরীফের মহফিল, ঈদে মিলাদুন্নবী, ফাতেহা-এ-ইয়াজ দহম শরীফ, মহররম শরীফ সবগুলি অনুষ্ঠান অর্থাৎ বছরে প্রায় ২৫-৩০টি অনুষ্ঠানমালা উদ্‌যাপন করতাম। আমার একটা প্রধান ভূমিকা ছিল দেওয়ান পাক পড়া ও সময় সময় ওয়াজ মহফিলে অংশ গ্রহনে ওয়াজ করা।

কলকাতায় ছিলেন আমার পীর ও মুর্শেদ। তিনি আমাকে টেকনিক্যাল পড়ার জন্য হুকুম করেন। ফলে, আমি ইলিয়ট বনমালী টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে, Sub overseer Course-এ ভর্তি হই। তখন ইনস্টিটিউটের প্রধান বা সুপারইনটেন্ডেন্ট ছিলেন মিস্টার B.B.Sen এবং আমার প্রিয়তম শিক্ষক ছিলেন মহম্মদ আব্দুল কুদ্দুস। Mr. Sen এর কোন ক্লাস আমাদের সঙ্গে ছিল না। কিন্তু হঠাৎ তিনি একদিন আমাদের ক্লাসে উপস্থিত হন। আমরা তো অবাক। তিনি সোজা ডায়াসে উঠে চেয়ারে বসেই প্রথম থেকে প্রতিটি ছাত্রের নাম ও তার অর্থ জিজ্ঞাসা করতে শুরু করেন। মুসলমান ছাত্ররা কেউই যখন তাদের নামের মানে বলতে পারেনা, তখন তিনি তাদের যথেষ্ট ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতে লাগলেন, বললেনঃ আরবী নাম রেখেছে অথচ মানে জানেনা কিছুনা ইত্যাদি। অথচ যখনই কোন হিন্দু ছেলের নাম জিজ্ঞাসা করেন, সে নাম বললেই বলেনঃ দেখ্ কত সুন্দর নাম-Self explanetory ইত্যাদি। ঘটনা চক্রে আমি বসার স্থান পেয়েছিলাম সেদিন দ্বিতীয় সারির মাঝা মাঝি। ফলে, যখন তিনি আমার নাম পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞাসা করেনঃ কি নাম? আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলি, চৌধুরী নূরুল আজিম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করেনঃ মানে কি-নুরুল আজিম মানে কি? আমি তাঁর উচ্চস্বরের তুলনায় আরো উচ্চস্বরে উত্তর দিই-The great Light of Knowledge কেননা, আমি পুরো জিনিষটা বুঝতে পেয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছিলাম, (I wanted to stop this nonsense) আমার পিছনে তখনও ৪/৫টি সারিতে মুসলিম ছাত্ররা ৯০% ভাগ বসে। ফলে দেখা গেল আমার ওষুধ কাজে লেগেছে। কেননা, আমার পর তিনি আর কারো নাম জিজ্ঞাসা করেন নি- আর আমি এটিই চেয়েছিলাম।

মিস্টার সেন পরে ঢাকায় এসে Mirpur Technical Training Cintre-এর Principal পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। আমি যখন ঢাকায় Diploma-in-Engg. করার পর একটা চাকুরীর সন্ধানে ছিলাম, তখন তিনিই আমাকে পছন্দ করে Senior Instructor পদে বহাল করেন। এটাই ছিল আমার জীবনের প্রথম শিক্ষকতা এবং তার কিছুদিন পরই তিনি Continental Tour-এ চলে যান সরকারীভাবে এবং

www.pathagar.com

আমার সম্বন্ধে Vice-Principal Mr. Mritha কে বলে যান আরো পদন্নোতির কথা। কিন্তু তাঁরা তাঁর কথা রাখতে পারেননি। Mirpur T.T.C. টা ছিল Contructed by the University of HAWAII, ফলে Mr. Aa Chang Jane ছিলেন Team leader আর তার সঙ্গে ছিলেন আরো দু'জন Mr. Hoopman, Mr. Gayal এরাই পুরো ইনস্টিটিউট দেখা শুনা করতেন। শিক্ষকদের শিক্ষকতার যোগ্যতানুযায়ী বেতন ছিল না বলে আমি প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য হই। ফলে তাঁদের সঙ্গে Assembly Hall-এ আমার বাদানুবাদ হয় প্রচন্ডভাবে।

এবং চাকুরী থেকে ইস্তফা দেওয়া আমি মনস্থ করি। যদিও ছাত্র পড়ানটা যে আমার কত প্রিয়কাজ তা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম ছাত্র শিক্ষক সকলের প্রচুর আবেদন নিবেদন সত্বেও আমি ইস্তফা দিলাম। যদিও ছেলেরা আমাকে প্রচুর সংবর্ধনা জানিয়েছিল। আমি ১১ মে ১৯৬৪ সালে চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েই ১৩ মে ১৯৬৪ সালে বিমান যোগে ঢাকা থেকে পাবনা এসে পাবনা পলিটেকনিকে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর হিসাবে শিক্ষকতায় যোগদান করি।

অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরীতে প্রচুর ভাল ভাল বই ছিল। এবং লাইব্রেরীয়ান ছিলেন মোনাদা আমাদের Edword College-এর Physical Instructor আবার Librarian অতএব তাঁর সঙ্গে অনেক পূর্ব থেকেই যথেষ্ট পরিচয় ছিল আমার। একদিন তাঁকে গিয়ে বললামঃ মোনাদা আমি কিছু ভাল বই পড়তে চাই, তবে লেখক ভিত্তিক এবং দেশ ভিত্তিক হতে হবে। মোনাদা বললেন ঃ অবশ্যই সম্ভাব্য সব বইই আপনাকে দেওয়া যাবে, তবে আপনাকে 'A' Grade Membership নিতে হবে। তাই করলাম এবং প্রথমেই শুরু করলাম American writer Howard fast -এর লেখা বই দিয়ে যাঁর প্রতিটি বইয়ের পিছনে লেখা আছে Not for sale in U.S.A. and Canada বইগুলি হল। 1. The freedom Road 2. The Unconquered 3. The Passion of the Saeco and Vanzetti 4. Second Generations ইত্যাদি। এর পর শুরু করি পড়তে রাশিয়ান লেখকদের বই যেমন ঃ লিও টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কী, আন্তন চেখভ, ডষ্টয় ভস্কি, পুশকিন ইত্যাদি লেখকের লিখিত বহু বই। এরপর শুরু করি চীনা লেখকদের লেখা বই। এমনি ভাবে দীর্ঘ ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত যত পড়া যায়। কোন দেশীয় লেখকের লেখা বই পড়ার আগ্রহ বা সময় কোনটাই ছিলনা আমার।

www.pathagar.com

পঞ্চমপর্ব

১৯৫৮ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন Field Marshal Mahammad Ayub Khan. তিনি ক্ষমতা গ্রহণের কিছু পরেই দেশে আইন শৃঙ্খলার পরিপ্রেক্ষিতে Marshal Law জারি করেন এবং এতে বেশ কিছু সুফলও পাওয়া গেছিল। ঐ সময় আমি Sub-Overseer পরীক্ষার শেষ দিন পরীক্ষা শেষে পাবনা জিলা কাউন্সিল বোর্ডে District Engineer সৈয়দ জয়নুল হক সাহেবের নিকট দেখা করি একটি চাকুরীর জন্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে তাঁর অফিসে গ্রহণ করেন এবং বলেন তুমি এক ঘন্টার মধ্যে তৈরী হয়ে নাও। কেননা, আমরা সাঁথিয়া ডাকবাংলোয় যাচ্ছি সেখানে তুমি Test relief work এর জন্যে Section officer হিসাবে কাজ দেখবে। অবশ্য ইতিপূর্বে আমার একচাচা চৌধুরী মহম্মদ বদরুদ্দোজা Advocate Pabna Court তাঁকে আমার সম্বন্ধে একটু বলে রেখেছিলেন।

যা'হোক, আমি বাসায় ফিরে আমার পিতা-মাতার নিকট বিদায় নিয়ে একটি সাইকেলসহ সাঁথিয়া ডাকবাংলো বাসযোগে হাজির হই। সেখানে আমাকে সাহায্য করার জন্যে একজন Pay-master Mr. Mohammad Ali যিনি ছিলেন Inspector, Civil Supply Deptt. ভদ্রলোক ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত এবং অত্যন্ত অমায়িক; বিশেষতঃ ইংরেজি ভাষার উপর তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। একজন কেরানী ছিলেন আব্দুল মতিন, তাঁর বাড়ির ছিল বেড়া। একজন চৌকিদার, একজন বাবুর্চি। আমাকে প্রথম দিকে কাজ কাম বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে এসেছিলেন Overseer সাইদুর রহমান সাহেব এবং সুপারইনটেন্ডেন্ট উমর আলী। প্রথম জীবনের প্রথম চাকুরী খারাপ লাগেনি। তাছাড়া সঙ্গী সাথীরা ছিলেন অত্যন্ত Co-operative পাবনা শহর থেকে ২৫/৩০ কিঃ মিঃ মত দূরে সাঁথিয়া ডাকবাংলো।

সময়টা ছিল গ্রীষ্মকাল। প্রতিদিন প্রায় ১০০-১৫০ লেবার দিয়ে মাটি কাটা কাজ Embankment তৈরী, উঁচু করে রাস্তা তৈরীর পর concrete Pavement করা হয়েছে পরে। এভাবেই আমি সেখানে ২/১ মাস কাজ করার পর আমার

www.pathagar.com

Camp নিয়ে যায় বেড়া ডাকবাংলোয় এবং সেখানে মাস খানেক কাজের পর নামে বর্ষা। বাধ্য হয়ে কাজ বন্ধ করে দিয়ে আমি একাই বেড়া ডাকবাংলো থেকে নদীপথে ভাঙ্গুড়া ডাকবাংলোয় পৌছে ইফতার করি। কেননা, তখন ছিল রোজার মাস। সেহ্রী খেয়ে নৌকাতে উঠেছিলাম বেড়া ডাকবাংলো থেকে, পুরোটা দিন নৌকায় অবস্থান করে ঠিক ইফতারের সময় ভাঙ্গুড়া ডাকবাংলোয় হাজির হই। ইতোমধ্যে সমস্ত সড়কপথ বর্ষার জন্যে বন্ধ হয়ে গেছিল।

এই সময়টা আমি অফিসেই বসে কিছু কাজ করার সুযোগ পাই। যেমন মালিগাছায় একটা ছোট ব্রিজ কনস্টাক্শনের প্রয়োজন ছিল। তাই আমি ঐ ব্রিজের জন্যে প্ল্যান তৈরী থেকে আরম্ভ করে তার যাবতীয় এস্টিমেট, ইত্যাদি করে টেন্ডার কল করে থাকি এবং কাজটা পান উপেন বাবু নামে পাবনা কালাচাঁন্দ পাড়ার এক ভদ্রলোক। পাবনা থেকে মাত্র ৬ কিঃ মিঃ দূরে মালিগাছা ব্রিজের নীচে দিয়ে যাতে ছোট নৌকা যেতে পারে তেমনটি Span রাখতে হয়েছিল। এ কাজটা করার সময়ও ছিল বর্ষাকাল। ফলে, বেচারা কন্ট্রাকটর বেশ একটু ঝামেলায় পড়েছিলেন। এই পুরো কাজটার সুপারভিশনেও ছিলাম আমি। যাক, শেষ মেশ একটু দেরী হলেও উপেন বাবু কাজটা সমাধা করেছিলেন সাহস করেই বলতে হবে। আমি তাঁর কাজের আন্তরিকতার জন্যে সন্তুষ্ট ছিলাম।

বর্ষার পর আবার শুরু হয় রাস্তার কাজ। এবার আমি যাই সুজানগর এবং সেখানে ডাকবাংলোয় অবস্থান করি! পাবনা থেকে সুজানগর ২০ কিঃ মিঃ মত হবে। সেখানে Paymaster ছিলেন সেখানকারই সাব রেজিষ্ট্রার সাহেব। দুঃখের বিষয়, তাঁর নামটি আমার এই মুহূর্তে আর মনে নেই। ভদ্রলোক বেশ সহযোগিতা করেছিলেন।

এ ডাকবাংলোয় থাকার সময় আমার মা মাঝে মধ্যে এলুমিনিয়ামের ডেকচি ভর্তি করে হাঁস, মুরগির গোস্ত, ডিম ইত্যাদি রান্না করে বাসের ড্রাইভারের মাধ্যমে আমার কাছে পাঠাতেন, যা আমরা কেরানী শওকত সাহেবসহ কজন মিলে বেশ মজা করে খেতাম। এই সময় হঠাৎ করে ভারত থেকে আমার বিয়ের একটা প্রস্তাব আসে পিতামাতার কাছে। তাঁদের নিকট আত্মীয়ের কাছ থেকেই প্রস্তাবটা আসে বলে তাঁরা এই প্রস্তাবের উত্তরটার দায়িত্বভার আমার উপর ছেড়ে দেন। আমি বাস্তবিকই এক কঠিন মুশকিলের মধ্যে পড়ি। কেননা, তখন বিয়ে করার মত আমার মন বা সামর্থ কোনটাই ছিলনা। আমার আগ্রহ ছিল আরো পড়াশুনা করা।

www.pathagar.com

যা'হোক অনেক ভেবে চিন্তে আমি কন্যাপক্ষকে উত্তর দিতে বাধ্য হই অনেকটা বিনয়ের আশ্রয় নিয়ে। নিঃসন্দেহে মহান আল্লাহ্ পাক আমার প্রতি সহায় ছিলেন বলেই বোধ করি সে যাত্রা আমি উদ্ধার পাই।

১৯৫৯ সালের দিকে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে Admission Test দেওয়ার জন্যে একটা ইন্টারভিউ কার্ড পাই। অতএব ক'দিনের ছুটি নিয়ে আমি এই প্রথম ঢাকার পথে পা বাড়ালাম। তখন ঈশ্বরদি রেল স্টেশন থেকে সোজা সিরাজগঞ্জ ঘাট পর্যন্ত এসে স্টিমারে যমুনা নদী পার হয়ে জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে আবার রেলে চাপতে হতো। এবং এটাই ছিল তখনকার দিনের একমাত্র পথ।

আমি যেহেতু একাই ছিলাম। তাই ফাঁকা দেখে একটা ছোট্ট Inter class compartment এ উঠে পড়ি। কিছু পরে আর এক ভদ্রলোক উঠেন, তিনি উর্দূভাষী ছিলেন বলে আমার সঙ্গে উর্দু ভাষাতেই বাক্যালাপ শুরু করেন। বেশ কিছু কথা-বার্তার এক ফাঁকে তাঁর ধারণা হয় যে আমি ভাল ফার্সি জানি। আমি তাঁকে অনেক বিনয়ের সঙ্গে বুঝাবার যতই চেষ্টা করি যে আমি মোটেই ফার্সি জানিনা, তাঁর কিন্তু মোটেই বিশ্বাস হয় না। ফলে, তিনি এক সময় বাঙ্কের উপর থেকে তাঁর ব্রিফকেসটা থেকে একটা উর্দু ম্যাগাজিন-'আস্তানা' বইটা বের করে একটা চমৎকার ফার্সি ভাষায় লিখা কবিতা আমাকে পড়তে দেন। রাত তখন ১২টা, তিনি আমাকে পড়তে দিয়েই তাঁর সিটে ঘুমিয়ে পড়েন। আমি পড়তে গিয়ে দেখি সেই বিখ্যাত কবিতাটির লেখক হচ্ছেন পাক-ভারত উপ-মহাদেশের সুলতানে হিন্দ ওলিয়ে কামেল হযরত খাজা গরীব নওয়াজ আজমিরী (রহঃ) অতএব, বেশ আগ্রহ নিয়েই পড়তে শুরু করলাম। মজার ব্যাপার হল, আমি যদিও কোনদিন ফার্সি পড়িনি তবে উর্দু ভাষায় আমার কিছুটা দখল ছিল বলে পড়তে কোন অসুবিধা হল না। উপরন্তু প্রতিটি লাইনের নীচে খুব ছোট্ট করে উর্দু ভাষায় তার তরজমা করা ছিল বলে পুরো কবিতাটা মাত্র এক ঘন্টার মধ্যেই আমার মুখস্ত হয়ে যায়। সঙ্গে কাগজ কলম থাকা সত্ত্বেও তা আর লিখার প্রয়োজন পড়েনি। আমি এই কবিতাটিই পরে ১৯৮৮ সালে যখন খাজাবাবার দরবার পাকে হাজির হই তখন সেখানে ভক্তিভরে তাঁর মাযার পাকে তাঁকে শুনানোর সৌভাগ্য লাভ করেছি।

ঢাকায় অবস্থান কালে আমার মেজ খালার বাসায় থেকে তিন দিনের তিন বিষয়ের উপর যেমন ইংরেজি, অংক এবং সাধারণ জ্ঞানের উপর উত্তমরূপে পরীক্ষা দিয়ে মৌখিক পরীক্ষার জন্যে অপেক্ষা করি। ইতোমধ্যে আমার মেজ খালুজান

www.pathagar.com

জনাব সৈয়দ শাহ্ ফজলুর রহমান সাহেব যিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন, তিনি ছিলেন Dhanmandi Boy's High School এর Senior Teacher. তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে আসেন। তখন সেখানে দেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার অফিস ও Laboratory ছিল অস্থায়ী ভাবে। খালুজান আমাকে সোজা তাঁর অফিসে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন। খালুজান তাঁকে মামা সম্বোধন করতেন আর আমি করতাম চাচা। আমার মৌখিক পরীক্ষা কবে হবে ইত্যাদি ২/৪টি কথা তিনি জিজ্ঞাসা করেন।

আমার লিখিত পরীক্ষা ভাল হওয়ায় আমার ধারণা ছিল মৌখিক পরীক্ষাতেও ভাল করব ইনশাআল্লাহ। কেননা, সে সময় সীমিত সংখ্যক বিভাগ যেমনঃ Civil, Mechanical, Electrical, power এবং Electronics এই মাত্র পাঁচটি বিভাগ চালু ছিল। প্রতিটি বিভাগেই মাত্র ৪০টি করে আসন ছিল একমাত্র civil বিভাগ ছাড়া। কেননা, সেখানে ছিল ৮০টি আসন এবং এটাই ছিল সর্ববৃহৎ বিভাগ।

যা'হোক পরীক্ষার দিনে আমার ডাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলাম। তখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ছিলেন Mr. M.A. Bari তাঁর আশে পাশে বেশ কজন শিক্ষকও উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই আমার বয়স নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। কেননা, নিয়ম ছিল ১ জুলাই পর্যন্ত বয়স হতে হবে ২০ বছর। কিন্তু আমার Matric certificate অনুযায়ী বয়স হয়েছিল ২১ বছর ৭ মাস ২০ দিন। আমি যদিও এটা Court of Majistrate First class থেকে Affidavit করেছিলাম এবং ২ বছর বয়স কমানোর আবেদন করে মঞ্জুর করিয়েছিলাম, তবুও তাঁরা তা মানতে নারাজ।

শেষে এক সময় Principal সাহেব আমাকে বলেন ঃ You see the students admitted here are much younger to you and you are much older to them; and it might so that after passing from this institute you may not have any government job. So what is the necessary to study over here, You may go আমাকে আর কোন কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই বিদায় করেন।

আমি সেখানে থেকে বেরিয়েই বারান্দা দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ দেখি ড. কুদরত-ই-খুদা তাঁর কক্ষ থেকে বেরিয়েছেন বোধ করি দুপুরের খাবারের জন্যে

www.pathagar.com

বাসায় যাবার উদ্দেশ্যে। সামনা সামনি দেখা হতেই চাচা জিজ্ঞাসা করলেন তোমার Interview কেমন হল? আমি তাঁকে Principal এর মতামতটা জানালাম। তিনি বললেন, তুমি বললে না কেন যে আমি পড়তে এসেছি; সরকারী চাকুরী করব কি করবনা সেটা পরের কথা। বলেই -বললেন আশা করি তোমার হয়ে যাবে। বলেই তিনি গাড়ীতে উঠে চলে গেলেন।

Result দিতে একটু বিলম্ব হওয়ায় আমি স্বাভাবিকভাবেই অস্থিরতা বোধ করছিলাম। কেননা, অল্প ক'দিনের ছুটি নিয়েছিলাম বলে। হঠাৎ করে একদিন আমি ড. কুদরত-ই-খুদা চাচার অফিসে প্রবেশ করে তাঁকে অনুরোধ করি আমার পরীক্ষার ফলটা একটু যদি আগে জানা যায় তবে আমি পাবনার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করতে পারি। কেননা, আমার ছুটি তখন শেষ তিনি আমাকে বলেন; দেখ আমি আমার ছেলেদের জন্যেও কোন দিন এসব করিনি, ইত্যাদি। শেষে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে কেবল জিজ্ঞাসা করলেন তোমার Roll No কত ? আমি বললাম 76 তিনি একটি কাগজে শুধু 76 লিখে পিয়নকে দিয়ে Principal এর নিকট পাঠালেন।

আমি বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই দেখি পিয়নটা সেই কাগজটাই ফেরত নিয়ে আসছে এবং তাতে অধ্যক্ষ সাহেব লিখেছেন, Sir, The result has not yet been published, we will be able to inform you as soon as the result is available- M.A. Bari, ঐ লিখাটুকু দেখার পর আমি আর অপেক্ষা না করে সোজা Notice Board এর নিকট গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকি এবং বেশ কিছু পরে এক সময় result টা দিয়ে দেওয়া হয়। আমার পরীক্ষার ফল কিছুটা ভাল হওয়ায় Stipend হিসাবে প্রতি মাসে ৬০ টাকা পাওয়া যায়। যা তখনকার দিনে প্রচুর। কেননা, আমাদের হোস্টেলে মেসের খরচা বাবদ লাগত ৪০ টাকা মাত্র। প্রতিদিনই মাছ, মুরগি ইত্যাদি পাওয়া যেত।

Admistion এর জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন ছিল তা আমার নিকট তখন ছিলনা। ফলে, আমার এক আত্মীয়ের নিকট ঋণ করে Admission নেওয়ার পর আমি পাবনা ফিরে যাই এবং পাবনা পৌছেই আমি তাঁর টাকাটা T.M.O করে ঢাকায় পাঠিয়ে দিই। পাবনায় ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার জনাব সৈয়দ জয়নুল হক সাহেব আমার কাজ কামে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি আমাকে স্থায়ীভাবে সেখানে নিয়োগের জন্য রাজশাহীতে Superintendent Engineer সাহেবকে বলে

www.pathagar.com

অনুমোদন নিয়েছিলেন। আমাকে যখন তিনি এটা জ্ঞাত করেন, তখন আমি তাঁকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলতে বাধ্য হই যে, স্যার আমি উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় যেতে চাই; অতএব দয়া করে আমাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রিলিজ করে দিবেন। তিনি উচ্চ শিক্ষার কথা শুনে যেমন খুশী হলেন, তেমনি চাকুরী ছেড়ে চলে যাব জেনেও বেশ কিছুটা দুঃখিত হলেন।

১৯৫৯ সালের প্রথম দিকে আমি যখন ঢাকায় এলাম পলিটেকনিকে ক্লাস করার জন্যে তখন প্রায় দু'সপ্তাহ ক্লাস হয়ে গেছে। তখন লতিফ ছাত্রাবাস চালু করা হয়নি। Electricity, water supply, সবই অসমাপ্ত ছিল। ফলে প্রথম দিন আমাকে একটা 'ডরমাটরিতে, অনেক ছাত্রের সঙ্গে থাকতে হয় বেশ কষ্ট করে। পরের দিন আমি হোস্টেল সুপার জনাব আলতাফ হোসেন সাহেবকে অনুরোধ করে একমাত্র ছাত্রাবাস East End Hostel এ ডাবলিং করার সুযোগ পেলাম। কিন্তু সেটাও আমার নিকট মোটেই ভাল লাগল না। কেননা, আমি এমনিতেই ছিলাম একটু আরামপ্রিয়, উপরন্তু শোয়ার কোন অসুবিধা আমার অসহ্য। অতএব, আমি তার পরদিন হোস্টেল সুপারের নিকট এক প্রকার জোর করেই অনুমতি আদায় করলাম নির্মীয়মান ছাত্রাবাসে অন্তত আমি একা হলেও থাকব। সিঁড়ি দিয়ে চেয়ার, টেবিল, কট ইত্যাদি উঠানোর কোন সুযোগ ছিলনা। কেননা, সমস্ত সিঁড়িতেই বাঁশের 'প্রপ' লাগান ছিল। কাজেই ঐ প্রপগুলির ফাঁকে ফাঁকে দেহটাকে কোন মতে গলিয়ে নিয়ে উপর নীচে উঠা নামার কাজটা সারতাম। মোটা রশির সাহায্যে টেবিল চেয়ার ইত্যাদি সব কিছুই উঠালাম তিন তলায় ৩০৫ নং রুমে। তখন এই ছাত্রাবাসের কোন নাম ছিল না। আমি মসজিদের ব্যাপারে একটু বেশী তৎপর ছিলাম বলে যারা সেখানে কাজ করছিল তাদের জানিয়ে দিলাম আগামী জুম্মার নামাজ ইনশাআল্লাহ এই মসজিদেই পড়ব; অতএব খুব দ্রুত তোমরা মোজায়িকের কাজ শেষ কর। নূতন ছাত্রবাসে আমার উঠার পর কিছু কিছু ছাত্র আমাকে অনুসরণ করে তারাও অবস্থান গ্রহণ করল। কেননা, East End Hostel এ মাত্র ২/৩ শত ছাত্রের ব্যবস্থা ছিল এবং এমতাবস্থায় অনেক ছাত্র ডাবলিং করতে বাধ্য ছিল। ফলে, অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক ছাত্র নূতন ছাত্রাবাসে উঠে আসে। নীচে ২/১টি মাত্র Tube well এর সাহায্যেই আমাদের যাবতীয় কাজ সারতে হত। অবশ্য কর্তৃপক্ষ আমাদের চাপাচাপিতে বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহের কাজ যত দ্রুত করা

www.pathagar.com

সম্ভব তা করেছিল। ইতোপূর্বে আমরা প্রত্যেকেই হারিকেন ও বদনা ব্যবহারের সুযোগ নিতে বাধ্য ছিলাম।

পলিটেকনিকের শিক্ষাপদ্ধতি সেমিস্টার সিস্টেমে হয়। ফলে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ক্লাস পরীক্ষা ইত্যাদি চলতে থাকে। যা আমার পূর্বে জানা ছিল না। কাজি ওবায়দুর রশীদ সাহেব আমাদের ফিজিক্স পড়াতেন। ২/৩ দিন ক্লাস করার পরই দেখি ক্লাস টেস্ট। আমি পরীক্ষা ভালই দিলাম বলে বিশ্বাস হল, কেনন, I.S.C. বেসিক জ্ঞানের ভিত্তিতে পরীক্ষা ছিল। ২/৪ দিনের মধ্যে ফল দেখে তো আমি অবাক। পরীক্ষা ছিল ৫০ নম্বরের আমি পেয়েছি মাত্র ২২ নম্বর। ২৫ নম্বর হল পাশ মার্ক। অতএব, দেখা যাচ্ছে আমি ফেল। স্যারের সঙ্গে দেখা করে আমি জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি? স্যার বললেন, তুমি কোন ছবি দাওনি। আমি বললাম, আপনি তো প্রশ্নে কোন ছবি চাননি। তিনি বললেন, তুমি তো প্রথম দিকে ছিলেনা। আমি প্রথম দিনই বলেছি, ছবি না চাইলেও তোমাদের প্রতিটি ছবি দিতে হবে। এর পরের পরীক্ষায় আমি তাঁর বিষয়ে ৫০ এর ভিতর পেলাম ৪৮ নম্বর। আবার স্যারের কাছে গেলাম তাঁর বোধ হয় ভুলে এত নম্বর পেয়েছি মনে করে। তিনি বললেন, তুমি পেলে ঐ ২ নম্বরও দিতাম। তোমার নম্বর আমার কাছে রেখে কি লাভ। এমনই ছিলেন সেই শ্রদ্ধেয় শিক্ষক।

পলিটেকনিকে পড়ার সময় দু'টি বিষয়ে আমার উপর কেউ বেশী মার্ক পেয়েছে বলে আমি জানিনা। একটা বিষয় হল ইংরেজি আর দ্বিতীয় বিষয়টা ছিল Drawing বা অংকন। Drawing এর জন্য যাবতীয় Drawing sheet, pencil ইত্যাদি সব কিছু কলকাতা থেকে কিনে এনেছিলাম যা ছিল বেশ উন্নত মানের। ফলে, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব আবু বকর সিদ্দিক সাহেব আমাকে বেশ খুশী মনে মার্ক দিতেন। ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন Mr. Ali Ahmed Mallick তিনি আমাকে প্রচন্ড পছন্দ করতেন।

হোস্টেলে বসবাসের সময় হঠাৎ একটা মিলাদ মাহফিলের প্রয়োজন দেখা দিল যেটা হবে মসজিদে। দিন তারিখ ঠিক হওয়ার পরও হঠাৎ করে আবার সেটা স্থগিত হয়ে যায়। কেননা, সামনে ছুটি ছিল ক'দিন, ছেলেরা সকলেই বাড়ী যাবে। অতএব, বাড়ী থেকে ফিরে এসে মিলাদ হবে, একথা শুনার পর আমি কথা বলতে বাধ্য হলাম যে, মিলাদের তারিখ একবার ঘোষণা হওয়ার পর সেটা স্থগিত বা

www.pathagar.com

পিছিয়ে দেওয়া বিধেয় নয়। আবার কথা উঠল প্রথম ছেলেদের হাতে তেমন টাকা পয়সা নেই, অতএব বাড়ী থেকে ফিরে এসেই মিলাদ হবে। আমি বলতে বাধ্য হলাম কত টাকা লাগবে মিলাদে? তাঁরা বললেন ৩০০/-টাকার মত বটে। আমি বললাম যে তারিখ ঘোষণা দেয়া হয়েছে সেই তারিখেই ইন্‌শাআল্লাহ মিলাদ হবে এবং টাকার দায়িত্ব আমি নিলাম। তখন সকলেই আমাকে সমর্থন করলেন।

আমি আমার ছাত্র বন্ধুদের কাছ থেকে অতি সহজেই প্রায় ৪৫০ টাকা মিলাদ মাহফিল বাবদ তুলে ফেললাম। ফলশ্রুতিতে আমাকে মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী করা হয় জোর করে অর্থাৎ আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। ইতোপূর্বে সেক্রেটারী ছিলেন জনাব আব্দুল আজিজ চৌধুরী। তিনি পাশ করে চলে যাওয়ার পর পদটি চালাচ্ছিলেন হোস্টেল সুপার জনাব আবু বকর সিদ্দিক সাহেব। এই সিদ্দিক সাহেবই আমাকে মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দিয়ে সোজা Principal Mr. M.A. Rashid সাহেবের Chamber-এ নিয়ে গিয়ে মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী পদে আমার অবস্থান ফয়সালা করে ফেলেন। আমি মসজিদ কমিটিতে প্রায় দু বছরের উপর বহাল ছিলাম। বাৎসরিক মিলাদ মাহফিল ছাড়াও প্রতি বছর বেশ কয়েকটি করে মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করতে আমি বেশ তৎপর ছিলাম। কেননা, আমি নিজেই মিলাদের শুধু ভক্ত নয় বরং একজন সক্রিয় কর্মী ছিলাম। যেমন হামদ ও নাত ইত্যাদিতে আমি নিজেই অংশ গ্রহণ করতাম এবং মাননীয় মেহমান হিসাবে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতাম শ্রদ্ধেয় ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, কবি গোলাম মোস্তফা, ড. মহম্মদ কুদরত-ই-খুদা, ড. ব্যারিস্টার মুহম্মদ সানাউল্লাহ, অধ্যাপক গোলাম আজম প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিদের, যাঁরা তাঁদের জ্ঞান গর্ভ আলোচনা করতেন ইসলাম ও মহানবী হজরত মহম্মদ (সাঃ) এর বিভিন্ন গুণাবলীর উপর।

পলিটেকনিকে আমার পূর্বে ভি,পি, অর্থাৎ ছাত্র ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব মহম্মদ তাজাম্মুল হক রাজী। যিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন এবং বেশ সমীহ করতেন। কোন কাজ তিনি আমাকে ছাড়া করতেন না। এমন কি একদিন বলেই ফেললেন যে, You are our next V.P. So please ready for your self তাঁর কথাটার প্রতি আমি ততটা গুরুত্ব দিতে পারিনি। কেননা, মূলতঃ আমি পড়াশুনার জন্যেই ঢাকায় এসেছিলাম অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তাছাড়া তখনকার দিনের রাজনীতি বিশেষতঃ ছাত্র রাজনীতি বর্তমান কালের মত এত

www.pathagar.com

নোংরা ছিলনা কোন দিনই। কোন দলমত নির্বিশেষে ছাত্র সমাজ নিজেদের দাবী দাওয়ার উপর আন্দোলন করতে অভ্যস্ত ছিল একান্তভাবে আঞ্চলিকতার ভিত্তিতেই। অতএব কোন রাজনৈতিক দলের লেজুর বৃত্তি করা তাঁদের অভিরুচির বাইরে ছিল। ফলে রাজনীতি করার জন্যে আর্থিকভাবে কোন অবস্থাতেই কোন রাজনৈতিক দলের নিকট থেকে সাহায্য সহযোগিতা পাওয়ার কথা আমরা চিন্তা পর্যন্ত করিনি।

অবশেষে একদিন পলিটেকনিক ছাত্র ইউনিয়নের নির্বাচনের দিন এগিয়ে এল। আমি এ ব্যাপারে বরাবরই নির্লিপ্ত ছিলাম। কেননা, একমাত্র লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আমি ঢাকা আসিনি। কিন্তু বিধিবাম। আমার ছাত্রবন্ধুরা উপযুক্ত প্রার্থী হিসাবে আমাকেই চূড়ান্তভাবে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত নিল, আমার প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও।

প্রতিটি বিভাগ থেকেই যেমন, Civil, Electrical, Mechanical, Power & Electronics সব বিভাগ থেকেই তারা তাদের ছাত্র বন্ধুদের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিল। মজার ব্যাপার হল, আমার স্থাপত্য বিভাগ যেহেতু সর্ব বৃহৎ, তাই আমার বিভাগ থেকেই কামাল উদ্দীন বলে আমার এক সহপাঠী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতার জন্য চূড়ান্তভাবে মনস্থির করে ফেলল। আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন জনাব এম, এ কদ্দুস। তিনিও চান যে তাঁর বিভাগ থেকেই যেন ভি,পি, পদের উপযুক্ত প্রার্থী দেওয়া হয়। ফলে, তিনি আমাকে এবং কামালকে একত্রে ডেকে বললেনঃ দেখ আমি চাই, তোমাদের দু'জনের মধ্যে মাত্র একজন দাঁড়াও এবং একজন বসে পড়। তিনি কামালকে বললেন তুমি এবার প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাক আগামীবারে দেখা যাবে। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, স্যার গতবারেও আমি আপনার কথায় দাঁড়াইনি, অতএব এবার আমি অবশ্যই দাঁড়াব। স্যার তখন আমাকে বললেন তোমার কি অভিমত? আমিও সঙ্গে সঙ্গে বললাম, আমি মোটেই ইচ্ছুক নই, কিন্তু আমার বন্ধুরা নাছোড়বান্দা। স্যার বললেন ঠিক আছে তাহলে লটারীতে যার নাম আসবে, সেই দাঁড়াবে। আমি তা মানতে চাইলেও আমার বন্ধুরা তা মানতে নারাজ। অবশেষে দু'জনই একই বিভাগ থেকে দাঁড়ালাম। তুমুল প্রতিযোগিতা হল সব বিভাগ থেকেই নির্বাচন শেষে ফল দাঁড়াল, আমার নিকটতম প্রার্থী কামাল ১৪১ ভোটে পরাজিত হয়েছে আমার কাছে। অন্যদের ব্যাপারে মন্তব্য নিঃস্প্রয়োজন।

এভাবেই এক কঠিন বাস্তবতার স্বীকার হয়ে আমি নির্বাচিত হলাম। আমার সহযোগী হল আরও ১৪ জন সেক্রেটারী। তাঁদের মধ্যে বর্তমান ইনস্টিটিউট অব

www.pathagar.com

ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশের সভাপতি জনাব রফিকুল ইসলাম ভূঞা ছিলেন শিক্ষা সংক্রান্ত সম্পাদক, জনাব নূরুন্নবী ছিলেন লাইব্রেরী সম্পাদক, জনাব আতিকুর রহমান ছিলেন ক্রীড়া সম্পাদক, জনাব কামালউদ্দীন ছিলেন প্রকাশনা সম্পাদক, জনাব মহম্মদ জাকারিয়া ছিলেন সংস্কৃতি ও বিনোদনমূলক সম্পাদক ইত্যাদি। এভাবেই মোট সাতটি বিভাগে দু'জন করে সম্পাদক ও সহসম্পাদক হিসাবে আমার সহকর্মী হিসাবে প্রচুর সুনামের সঙ্গে কাজ করেছিলেন, -আমি তাঁদের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

তখনকার দিনে ঢাকা পলিটেকনিকের সামনে দিয়ে কোন বাস চলাচল করত না। হোস্টেল বিল্ডিং -এ সমস্ত ছাত্রের থাকার সংকুলান না হওয়ায় অনেক ছাত্রকেই বাইরে থেকে আসতে হত ক্লাস করার জন্যে। তাই হঠাৎ একদিন প্রিন্সিপাল মিঃ রশিদ সাহেব আমাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে বললেন ঃ তোমার ছাত্রবন্ধুদের যারা বাইরে থাকে তাদের এখানে ঠিক সময় মত ক্লাস করার একটা ব্যবস্থা কর। আমি বললামঃ স্যার আমি কি করতে পারি বলেন। তিনি আমাকে পরামর্শ দেন, বি আর টি সির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করতে। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে আমার এক বন্ধু ছিলেন জনাব হাবিবুর রহমান তাঁর একটা Vespa ছিল এবং তিনিও বাইরে থেকে এসেই ক্লাস করতেন। আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সোজা বি আর টি সির চেয়ারমানের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হই। কিন্তু তাঁর পিয়ন আমাদের ভিতরে যেতে দিলনা। বরং বলল, তিনি মিটিং এ ব্যস্ত আছেন এখন যেতে পারবেন না। এভাবে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করতেই হঠাৎ করে চেয়ারম্যান Col K.W. Za cob রুম থেকে বেরিয়ে এসেই বললেনঃ What happens? আমি বললাম Good morning Sir, my name is chowdhury Nurul Azim, newly elected vice- President of the students Union of Dhaka Polytechnie Institute. Many of our fellow friends leave in the out side of our hostel campus. But as there is no bus rout, they are in great trouble to attend the class in due time. So, please allow your BRTC bus in Tejgaon Industrial Area as regular service. তিনি বললেনঃ No, I am sorry I can not do it now. Then He asked me, do you know how many times the Rail gate of kawran Bazar is opened and closed per day? I said no. He told me forty five times a day and do you think that my bus will remain stand

www.pathagar.com

over there for such a long period of time? So, I can't do it তখন আমি বলতে বাধ্য হলাম যেঃ If you don't do it, then I will be compelled to send my fellow frinds to you and then you will face them. He very quickly requested me not to send the students. Then he told me well next month from 12th May the Bus will move. I shook his hands with thanks and told my friend Mr. Habibur Rehman please note it down, that Col. Za cob giving me words with shaking my hands that his bus will move from next month on 12th may and he noted down in his note book পরে বন্ধু হাবিবুর রহমান আমেরিকার উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেন।

আমি একদিন ক্লাস রুমে বসে ক্লাস করছিলাম। হঠাৎ করে প্রিন্সিপ্যাল মিঃ রশীদ আমাকে ডেকে পাঠান। আমি তাঁর চেম্বারে ঢুকলে বলেনঃ দেখেছ বাস চলছে। তোমাকে সাহেব যেমন কথা দিয়েছিল, ঠিক তার কথা রেখেছে। তাঁকে একটা ধন্যবাদ জানিয়েছ? আমি বললাম, না, আমি আর কি জানাব, আপনিই ধন্যবাদটা জানিয়ে দেন। তিনি বললেন; কেন আমি কেন জানাব কাজ করেছে সে তোমার কথায় আর আমি জানাব ধন্যবাদ? কর তুমি, আমার এখান থেকে ফোনে তাঁকে একটা ধন্যবাদ জানিয়ে দাও। স্যারের কথামত তাঁকে ধন্যবাদ জানালে তিনি বেশ খুশী হন।

প্রথম বর্ষে পড়ার সময় প্রফেসর এম,এ, বারী সাহেব ছিলেন আমাদের ভাইস-প্রিন্সিপাল। তিনি ঠিক করেছিলেন যে, একটা সেমিস্টারের ক্লাস তিনি আমাদের নিবেন। আমাদের মোট আটটি গ্রুপ ছিল। যেমন A,B,C,D,E,F,G,H। তিনি ঠিক করেছিলেন, ২টি করে গ্রুপ একসঙ্গে সপ্তাহে একদিন নিবেন। যে ক্লাসটা নিবেন তার নাম হবে ক্রেডিট ক্লাস। অর্থাৎ কিভাবে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিতে হয়। কেমন ভাবে দাঁড়াতে হয় এবং বক্তৃতা দেওয়ার সময় সাধারণতঃ বক্তারা তাদের হাত দুটি ও পা দুটি নিয়ে বড়ই বিব্রতবোধ করে অথবা খেলা করে যা দর্শকদের নিকট অত্যন্ত দৃষ্টিকটু দেখায়; ইত্যাদি বিষয়ের উপর একটা ট্রেনিং ক্লাস তিনি নিতেন। যার মান ছিল ৫০ নম্বর। আমাদের ঐ ধরনের ক্লাসের পর সম্ভবতঃ আর কেউ ঐ ধরনের ক্লাস নিয়েছেন বলে আমি জানিনা।

যা হোক প্রথম দিন তিনি আমাদের AB গ্রুপকে সবকথা বলেন এবং আরো বলেনঃ Remember, each and every one of you must speak in English

on any topic you like, so, get prepare youself for the next class. আমরা স্যারের কথামত প্রস্তুতি নিতে শুরু করলাম। আমার Roll No ছিল ২৬ কিন্তু আমার রুমমেট ছিল আরও তিনজন। তাদের মধ্যে মহম্মদ আব্দুল মান্নানের Roll No ছিল 8 । অতএব, দেখা যাচ্ছে প্রথম ক্লাসেই তাকে কিছু না কিছু অবশ্যই ইংরেজিতে বলতে হবে। অতএব, সে এখন আমার নিকট আবদার করল আপনি চৌধুরী সাহেব আমার ইংরেজি বক্তৃতাটা লিখে ঠিক করে দেন। আমি বললাম, আপনি কোন বিষয়ের উপর বলতে চান বলেন, আমি সেটাই লিখে দিচ্ছি। তিনি বলেন, না আপনিই ঠিক করে দেন।

আমি ভেবেচিন্তে বললাম News paper reading এর উপর বলবেন কি? তাহলে ওটাই লিখে দিই। তিনি রাজী হলেন। প্রস্তুতিও নিলেন। আমি জানি যেহেতু আমার Roll No-26 অতএব, আমার অনেক পরে অর্থাৎ ২/৪ ক্লাস পরে পালা আসবে। অতএব, আমি নিজের জন্য কোন প্রস্তুতি নিলাম না।

Next class -এ স্যার যখন আমাদের বলার জন্য বার বার আহ্বান জানাতে লাগলেন, তখন একজনও সাহস করে উঠে গেলনা। দীর্ঘ সময় এভাবে ডাকাডাকির মাধ্যমে সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, আমার নিজের কাছেই অত্যন্ত খারাপ লাগল যে, এটা স্যারের প্রতি একটা অসম্মান। অতএব, আমি আর নিজেকে আটকে রাখতে পারলাম না। আমি উঠে গিয়ে News paper reading এর উপরই বক্তৃতা করতে শুরু করলাম। এরপর এক এক করে দু'চার জন বক্তৃতা করল। ক'জনের বক্তৃতা শেষ হলে স্যার মন্তব্য করলেন : The first lecturer must get the credit for today. Though he has omintted may important points, still he has shown his courage to speak before the audience in the beginning.

রুমে এসে আমার বন্ধুবরটির মন খারাপ হয়ে যায় আমার উপর কেননা, যে Topic এর উপর আমি তার বক্তৃতা ঠিক করে দিয়েছিলাম। সেটাই বলেছি বলে। আমার উত্তর হল স্যার বারবার আপনাদের ডাকা সত্ত্বেও আপনারা কেউ না বলাতেই তো আমি বলতে বাধ্য হলাম। দরকার হয় আপনাকে আবার অন্য কোন Topic এর উপর আমি আপনার বক্তৃতা লিখে দিব। আসলে বেশীর ভাগ ছেলেই গ্রাম গঞ্জ থেকে আসা বলেই তাদের ইংরেজিতে বেশ কিছুটা অসুবিধা ছিল।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পর্ব

তৃতীয় বর্ষে পড়ার সময় আমি ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি (V.P.) নির্বাচিত হই। সভাপতি ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল নিজেই (As an ex-officio)। কিন্তু করাচি পলিটেকনিকের ১০০ জন ছাত্র আমাদের এখানে যখন বেড়াতে বা শিক্ষা-ভ্রমনে এসেছিল, তখন দেখেছিলাম তাদের ছাত্র-সংসদের সভাপতি ছিলেন একজন ছাত্র জনাব আনোয়ার চৌধুরী, দেখতে অত্যন্ত সুদর্শন এবং খুব চমৎকার ইংরেজিতে বক্তৃতা করতে অভ্যস্ত। আমরাও ছাত্র-সংসদ থেকে শিক্ষা ভ্রমণে ভারত পাকিস্তান যাওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েছিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আমলাদের অনুমতি না পাওয়ায় তা আর কোন দিনই সম্ভব হয়নি।

১৯৬২ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান সারাদেশে ডিগ্রী শিক্ষা কোর্সকে ২ বছরের পরিবর্তে ৩ বছর করার জন্য জোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু আমরা ছাত্র সমাজ ছিলাম তার প্রচন্ড প্রতিকূলে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের প্রতিও গণ অসন্তোষ থেকে দুর্বার ছাত্র আন্দোলন তো ছিলই। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন লেঃ জেঃ আজম খান। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে এদেশে প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের আমন্ত্রণে পাকিস্তান ভ্রমনে এলে ঢাকাকে নূতনভাবে সাজানো হয় গভর্নরের তত্ত্বাবধানে। বহু রাস্তা এবং রাস্তার পার্শবর্তী এলাকাকে চকচকে ঝকঝকে করে তোলার জন্যে বিশেষতঃ যেসব এলাকা দিয়ে রাণীর শোভাযাত্রার ব্যবস্থা ছিল সেগুলিকে এবং মাঝে-মাঝে বিশাল তোরণের সমারোহ যাতে বিরাট আকারে লেখাছিল LONG LIVE THE QUEEN ইত্যাদি বহু তোরণ তৈরী করা হয়েছিল।

রাণীর দেশ ভ্রমনের পরও steel made gates সেই সমস্ত লোহার তোরণগুলি দীর্ঘদিন ছিল। ছাত্র আন্দোলনের সময় ঢাকা পলিটেকনিকের ছাত্ররা

www.pathagar.com

অনেকটা অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে গিয়ে সেই সমস্ত গেটের অনেক ক্ষতি সাধন করে এমন কি কোন কোনটিতে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমি মূলতঃ তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন ঢাকা পলিটেকনিক, টেক্সটাইল কলেজ এবং গ্লাস এন্ড সিরামিক্স পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ায় এই তিন প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের সঙ্গে নিয়েই আন্দোলনে যোগ দিতাম। যার ফলে পূরো নেতৃত্ব অনেকটা আমার ঘাড়েই পড়ত। পলিটেকনিকের ছাত্রসংখ্যা বেশী হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই আমার দায়িত্বটাও ছিল অনেক বেশী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভাইদের সঙ্গে আন্দোলন সমাবেশে যোগ দেওয়ার জন্য আমি একদিন বিশাল ছাত্র সমাবেশ সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার পথে ঐ তোরণগুলির কিছু কিছু ধ্বংস সাধন করতে করতে অগ্রসর হই। এমন সময় হঠাৎ দেখি Holy Family Hospital এর নিকট আমাদের যাত্রাপথে বাধা দেয় আর্মি। পিছন ফিরে যাওয়ার পথও দেখি বন্ধ অর্থাৎ আর্মি, সম্মুখে ও পিছনে উভয় দিকে সেনাবাহিনী কর্তৃক পথ আটকানো দেখে আমি হত-বিহবল হয়ে পড়ি। পরে হাসপাতালের ভিতর আমি একা ঢুকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ শুরু করি। কিন্তু তারাও বিপদে পড়েছে। এমন সময় হঠাৎ এক ডাক্তার আমাকে বলেনঃ আপনি এখানে টেলিফোনে ব্যস্ত, অথচ আপনার ছাত্রদের আর্মি-গাড়ীতে অনেককে তুলে নিয়ে গেল দেখলাম। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দেখি কথা সত্য,- কোথাও কেউ নেই।

বহুকষ্টে আমি এপথ সেপথ করে অনেক ঘুরে ফিরে যখন হোস্টেলে পৌছলাম, তখন দেখি অনেক ছাত্রকে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে এবং প্রত্যেক ছাত্রের নিকট আমার খোঁজ নিয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে তোমাদের নেতা কে? ছাত্রবন্ধুরা বুদ্ধি করে উত্তর দিয়েছে আমরাই নেতা। কেউ আমার নাম বলেনি। তবুও আমার পাঁচ জন বন্ধুকে কারাগারে নিক্ষেপ করে এবং বাকী সকলকে ছেড়ে দেয়। একমাস পর আমার ঐ বন্ধুরা কারাগার থেকে ছাড়া পায়। কিছু দিনের জন্য ইনস্টিটিউট এবং হোস্টেলগুলি সরকারীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

থাইল্যান্ডের রাজা ভূমিবল এবং রাণী সিরিকীত সরকারী সফরে ঢাকা আসেন। এই উপলক্ষে গভর্ণর লেঃ জেঃ আজম খান আমাদের শিক্ষা বিভাগের

www.pathagar.com

অনেককেই দাওয়াত করেছিলেন গভর্নর হাউসে Royal dinner party-তে। আমিও ছাত্রনেতাহিসাবে দু'টি নিমন্ত্রণ পত্র পেয়েছিলাম; একটি V.P. হিসাবে অপরটি ছিল G.S. বা সাধারণ সম্পাদকের জন্য। কিন্তু আমাদের ছাত্র-সংসদে সাধারণ সম্পাদকের কোন পদ ছিলনা। বিধায় দু'টি কার্ডই আমার কাছে আসে। Head of the Institute হিসাবে প্রিন্সিপ্যাল সাহেব মিঃ রশীদ এবং তাঁর স্ত্রীও আমন্ত্রিতদের মধ্যে ছিলেন। প্রতিটি কার্ডের পিছন দিকে Dress Code এর উল্লেখ ছিল। হয় Dinner suit অথবা National dress অর্থাৎ পায়জামা ও শেরওয়ানী পরিধান করতে হবে। কিন্তু এই পোষাকের অভাবে অনেকেই সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি মনে হয়। আমি আমার প্রধান হোস্টেল সুপার জনাব মহম্মদ হোসেন সাহেবের পরামর্শে আমার বন্ধু মহীউদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নিই G.S. এর স্থলে। আমরা Black suit পরি প্রিন্সিপ্যাল সাহেব একটা খয়েরী রং-এর সুট পরিধান করেন। গভর্নর হাউসের প্রধান গেট থেকে বেশ কয়েকবার কার্ড check করা হয়। বিশাল টেন্টের মাধ্যমে অতিথীদের আপ্যায়নের আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত অতিথীদের মধ্যে পরিচিত যাঁদের পেলাম তাঁদের মধ্যে ড. মহম্মদ কুদরত-ই-খোদা, ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ, ড. এম,এ, রশীদ, ড. ওসমান গনি প্রমুখ প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে।

সেখানে গিয়ে আমি ও মহীউদ্দীন জায়গা দখল করে বসে ছিলাম পাছে বসার জায়গা না পাই মনে করে। পরে আমাদের অধ্যক্ষ মিঃ রশীদ আমাদের কাছে এসে বলেন, আরে তোমরা বসে আছ কেন? এখানে সকলের সঙ্গে পরিচিত হও। এটা বসে সময় কাটানোর স্থান নয়। আমরা বললাম কিভাবে পরিচিত হবো? স্যার বললেন, এস আমার সঙ্গে বলেই এক ভদ্রলোকের নিকট গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন। এমনি করে ২/১ জনের সঙ্গে পরিচয় করার পর, আমি তাঁকে বললাম আসেন স্যার আমার সঙ্গে বলেই ড. কুদরত-ই-খুদার নিকট নিয়ে গিয়ে পরিচয় করালাম এবং আমার ব্যাপারেও তাঁরা উভয়ে কিছু মত বিনিময় করলেন। ডি,আই,টির চেয়ারম্যান ছিলেন মিঃ আবুল এহ্সান, তিনি এক সময় পাবনার ডি,সি, ছিলেন। তিনি ছিলেন chain smoker অতএব এক সময় দেখলাম সিগারেট এন্ড'টাকে নিজের জুতোর হিলে চাপ দিয়ে নিভিয়ে

www.pathagar.com

একটা show tree এর গামলায় ফেললেন। তাঁর সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল, তাই গিয়ে কিছু আলাপ করলাম।

আমরা মাত্র চারজন ছাত্র নেতা সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আমি, বন্ধু মহীউদ্দীন, বুয়েটের সাধারণ সম্পাদক ফজলে হোসেন এবং সম্ভবত মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রনেতা। আমি ইতিমধ্যে দু'জন থাইল্যান্ডের ছাত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম সেখানে, যারা ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ছিল। পরিচিতি পর্ব সমাধানের শেষের দিকে আমরা একস্থানে একত্র বসেছিলাম রাজার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার অপেক্ষায়। এমন সময় হঠাৎ দেখি একজন Army officer আমাদের নিকট এসে বলেনঃ You are here ! come on, the king is waiting for you. আমরা চারজনই একসঙ্গে উঠলাম, গিয়ে দেখি প্রথমেই আমাদের অধ্যক্ষ মিঃ রশীদ, তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন গভর্নর আজম খান এবং তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে মহামান্য রাজা ভূমিবল। প্রথম তিন জনের পরিচিতির পর আমার পালা। মিঃ রশীদ যখন আমার পরিচয় দিয়ে গভর্নরকে বলেনঃ Mr. Chowdhury Nurul Azim, Vice-President of Dhaka Polytechnic Institute তখন গভর্নর বাহাদুর আমার সঙ্গে hand shake করার সময় লক্ষ্য করলাম তাঁর চেহারার রং বদলে গেল এবং তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে আমাকে রাজার নিকট পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাজা আমার সঙ্গে hand shake করতে করতে এক সময় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন Well, do you know any Thai student here ? I replied yes your Excellancy two Thai students have come here from medical college. Then he said, would you please call them to me. রাজা প্রথমে তাদের সঙ্গে ২/৪টি ইংরেজিতে কথা বলার পর Thai Language এ কথা বলতে শুরু করেন। আর ওদিকে দেখি, মহিলাদের সঙ্গে রাণী সিরিকীত একের পর এক পরিচিতি পর্ব সমাধা করে চলেছেন। রাণীর প্রায় পুরো পিঠটা উন্মুক্ত দেখলাম। হয়ত ওটাই তাঁদের রীতি।

এরপর শুরু হল খাওয়া দাওয়ার পালা। আমাদের সমস্ত নিমন্ত্রিত অতিথীবর্গের জন্য 'বুফে' খাওয়ার ব্যবস্থা। বিশাল বিশাল বহু টেবিলে প্রচুর পরিমাণ খাবারের নানা প্রকার উপাদেয় মুখরোচক খাদ্য সম্ভার সাজানো। আর

www.pathagar.com

এক দিকের টেবিলে অনেক রকম soft drinks রয়েছে যার যা পছন্দ-Vimto, CocaCola ইত্যাদি। ওদিকে দেখি মহামান্য রাজা-রাণী, গভর্নর ও তাঁর স্ত্রীসহ প্রায় এক ডজন সেক্রেটারী যাঁরা সকলেই ছিলেন Dinner Suit পরিহিত অর্থাৎ সাদা কোট, কাল ট্রাউজার এবং বো (Bow) সজ্জিত। এক সময় দেখি আমাকে উদ্দেশ্য করে ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ বললেনঃ দেখ নুরুল আজিম তোমার গভর্নর বাহাদুররা Health Drink করছেন। আমরা বিভিন্ন টেবিলে ঘুরে ঘুরে প্রায় দু ঘন্টা ধরে গল্প করে করে খেলাম। যখন সবকিছু শেষ করে আমরা হোস্টেলে ফিরে এলাম তখন রাত ১১টা পার। আমাদের দু'বন্ধুর রাজকীয় খানা-পিনার ব্যাপার নিয়ে আমাদের বন্ধুরা অনেকেই ঠাট্টা-মস্করা করতেও বাকী রাখল না।

আন্দোলনের সময় আমি বেশ কিছু সময় আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। ফলে, সরকারের উপর মহল থেকে সকলেই আমার অনুসন্ধান কাজে ব্যর্থ হন। এ জন্যেই গভর্নর আজম খান আমার পরিচয় পাওয়ার পর তাঁর চেহারা লাল বর্ণ হয়ে উঠে লক্ষ্য করেছিলাম।

১৯৬২ সালের মহান শিক্ষা- আন্দোলনে সারা দেশব্যাপী ছাত্রসমাজ একযোগে সরকারের তিন বছর ডিগ্রী শিক্ষাক্রমের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান গভর্নর লেঃ জেঃ আজম খানের জনপ্রিয়তায় বিতশ্রদ্ধ হয়ে তাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানে সরিয়ে নেন এবং তাঁর স্থলে মোনায়েম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। উল্লেখ্য যে, মোনায়েম খান ছিলেন আইয়ুব খানের চরম এক অন্ধ ভক্ত এবং অকুতোভয় ব্যক্তি। তাঁর অনমনীয় মনোভাব তরুণ ছাত্র সমাজকে যেন আরও উস্‌কে দেয়, আন্দোলন চলবে কি চলবে না এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার দিন ছিল সেটা। বিধায়, আমি ছাত্র নেতা হিসাবে তেজগাঁ এলাকার সব ছাত্র সমাজ তথা পলিটেকনিক, টেক্সটাইল এবং গ্লাস এন্ড সিরামিক্সের ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমতলায় একটা চেয়ারের উপর দাঁড়িয়ে মাইক ছাড়া খালি গলায় সমস্ত ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিতে বাধ্য হই। উল্লেখ্য যে, আমার পূর্বে বহু ছাত্রনেতা বক্তৃতা করেছেন এবং তাঁদের বেশীর ভাগ বক্তৃতামালার ভিতর যে শ্লোগান ছিল, তা'হল- 'আইয়ুব খানের কল্লা চাই, 'আইয়ুব-মোনায়েম দুই ভাই এক

www.pathagar.com

দড়িয়ে ফাঁসি চাই, 'মোনায়েম খানের রক্ত চাই, ইত্যাদি। এ ধরনের বক্তৃতা আমার যেমন রুচি বিরুদ্ধ, তেমনই ছিল নীতি বহির্ভূত। অতএব, আমি পূরো ব্যাপারটা আঁচ করে নিয়ে কি বলতে হবে না হবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দেখি আমার নাম ঘোষণা করা হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমি দাঁড়িয়ে বলতে শুরু করলামঃ

ভার্সিটিতে শিক্ষারত বড় ভাইরা আমার সালাম গ্রহণ করুন! ভোকেশনাল এডুকেশনে শিক্ষারত আমরা দেশ গড়ার কারিগর। সারাদেশ আমাদের জন্য প্রতিক্ষায় আছে। কেননা, দেশের উন্নতি আমাদের ছাড়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। আমরা যারা এখন শেষ বর্ষের ছাত্র তারা মোটামুটি প্রায় সকলেই জানি কে কোথায় কোন কাজে যোগদান করব। অতএব, আমাদের কখনই উচিৎ হবে না আপনাদের Rigional Movement এ যখন তখন ডাকে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ মিছিলে দাঁড়িয়ে শ্লোগান ও হাততালিতে সামিল হওয়া। আপনারা দেশের শাসন পর্যায়ে উচ্চপদের অধিকারী হবেন, দেশ চালাবেন, আমাদের সে সুযোগ নেই। বিধায়, আপনাদের নিকট অনুরোধ, কারণে অকারণে আমাদের যখন তখন দয়া করে ডাক দিবেন না। আমি বুঝেছি, আজকের এই মহান শিক্ষাক্রমের আন্দোলনে আমাদের যোগ দেওয়া উচিৎ এটা National Issue বলেই আমি এই বিশাল ছাত্র সমাজকে ডাক দিয়ে সঙ্গে নিয়ে এসেছি। আজকের এই আন্দোলনের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। সরকারের বিশাল বাহিনী আছে। আমাদের প্রতিরোধ করার নানান কৌশল তাদের জানা আছে, শক্তি আছে। তবুও আমি বলব, আমরা কমবেশী সকলেই দরিদ্র ভদ্র লোকের সন্তান। আমাদের শক্তি হল, আমাদের অদম্য মনোবল। এই মুহূর্তে আমার যা মনে পড়ছে তা হল Battle of Waterloo এর যুদ্ধ। আপনারা অনেকেই জানেন এই যুদ্ধে বিখ্যাত ফরাসী বীর নেপোলিয়নের মত যোদ্ধা, হেরে গিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অখ্যাত সেনাপতি নেল্‌সনের কাছে। এ ঘটনা ইতিহাস সাক্ষী।

নেপোলিয়নের মত বিখ্যাত বীরের বিরুদ্ধে লড়বার কথা সাব্যস্ত হওয়ায় নেলসন ছিলেন অত্যান্ত বিচলিত। এমন সময় একজন কর্নেল হঠাৎ বলে উঠলেন If we win in this battle really it would be a great victory! নেলসন ঘরের মধ্যে দ্রুত পায়চারি করছিলেন, তিনি কর্নেলের কথা শুনার পরপরই টেবিলে একটা প্রচন্ড থাপ্পর মেরে বলে উঠলেন What if no if, We must,

www.pathagar.com

We must, We must ভাইসব! আমার মনে হয় নেলসনের এই মনোবলই তাঁকে শক্তি যুগিয়েছিল এবং তিনি যুদ্ধে জিতেছিলেন।

এই যুদ্ধে বীর নেলসনের জীবন ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, একদিন প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল অথচ স্কুল ছিল খোলা। নেলসনের পিতা ছিলেন খুব সজ্জন ব্যক্তি। তিনি নেলসন ও তার বড় ভাই ডেভিডকে ডেকে বললেনঃ দেখ বাবারা বাইরে প্রচন্ড ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে অথচ তোমাদের স্কুল কিন্তু খোলা, আমি মনে করি তোমদের স্কুলে যাওয়া উচিৎ। বলেই, বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'টি টাট্টুঘোড়া যোগাড় করে আনলেন আর বলেন, দেখ রাস্তার যা অবস্থা তাতে হয়ত ঘোড়ার পাও ভেঙ্গে যেতে পারে। তবুও আমি মনে করি পারলে তোমদের স্কুলে চলে যাওয়া উচিৎ। পিতার নির্দেশ ও তাঁর মনোবাঞ্ছা পুরণের জন্যে দু'ভাই যাত্রা করলেন ভয়ানক প্রতিকূল ঐ আবহাওয়ার মধ্যেই। বহু কষ্টে মধ্যপথ যাওয়ার পর ক্লাস এইটের ছাত্র বড়ভাই ডেভিড বলল ঃ Oh Nelson! It is intolerable. Let us go back to home. ছোট ভাই নেলসন ষষ্ঠ শ্রেণীরছাত্র বলে, বড়দা যে কষ্ট করে এই মধ্যপথ পর্যন্ত এসেছি, সেই একই কষ্ট করেই তো আবার ফিরতে হবে তার চেয়ে বরং স্কুলে গেলে আমাদের দুটো উদ্দেশ্য সাধন হবে। এক কষ্টটা কাজে লাগবে, আর দ্বিতীয়টি হলো বাবাও খুশি হবেন।

অতএব, বন্ধুরা আমি মনে করি, আমরা আন্দোলনের এখন আর মধ্যপথে নেই। বরং তিন চতুর্থাংশ পার হয়ে এসেছি, এই সিকি পথটুকু ইনশাআল্লাহ আমরা পার হতে পারব। আপনাদের সকলকে আমি সালাম জানিয়ে এখানেই শেষ করছি, খোদা হাফেজ।

আমার বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি ৮/১০ জন ভার্সিটির সিনিয়র বড়ভাই তাঁদের দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে চেয়ার থেকে নামিয়ে এক রকম পাঁজাকোলা করে যেন আমাকে নিয়ে একেবারে সোজা বিখ্যাত মধুর ক্যান্টিনে এককোনে গিয়ে টেবিলের চারপাশ ঘিরে বসলেন। আমার পরিচয়, বাড়ীর ঠিকানা ইত্যাদি জানার পর আমাকে বললেনঃ আপনি খুবভাল বলেছেন, এখন আন্দোলন চলবে। তবে আপনার চালাকী ধরা পড়ে গেছে। কেননা, আপনি যখন বক্তৃতা করছিলেন তখন আই,বি এর লোক আপনার পুরা বক্তৃতা টেপ

www.pathagar.com

করে নিয়েছে যা আপনি মোটেই লক্ষ্য করেননি। সে জন্যেই আমরা আপনাকে এভাবে এখানে তুলে এনেছি কারো সঙ্গে মিশতে দিইনি আপনার বিপদের কথা মনে রেখে। আজই আপনার নামে ওয়ারেন্ট বের হবে। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলাম, কিন্তু আমি আপনাদের পরিচয় তো জানতে পারলাম না? তাঁরা বললেন আমরা সব আইন বিভাগের ছাত্র, ৮/১০ বছর ধরে আছি। কেবল পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিয়ে যাই। এখন আপনি বলেন, কোথায় যাবেন? আমি বল্লাম হোস্টেলে। তাঁরা বললেন, না। কখনই না। আপনি কোন আত্মীয়ের বাসায় থাকবেন কিছুদিন। এখন বলেন এখান থেকে কিসে যাবেন? আমি বল্লাম রিক্সায়। তাঁরা বল্লেন অবশ্যই না। আপনি যাবেন বেবী-ট্যাক্সিতে নতুবা ধরা পড়ার আশঙ্কা আছে।

আমি তাঁদের কথামত কাজ করেছি এবং পরে বুঝেছি তাঁদের কথা সত্য। সেই দিনই আমার নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল। তিন দিন পর আমি বিকেলের দিকে অধ্যক্ষের বাসায় যাই। দেখি তিনি লনে বসে চা খাচ্ছিলেন, আমাকে দেখেই বললেনঃ কি, তুমি নাকি খুব বড় বক্তা হয়ে গেছ। এতবড় বক্তা সারা পাকিস্তানে নেই। আমি বললাম স্যার আমি? হ্যাঁ হ্যাঁ তুমি। সেদিন তুমি ভার্সিটির আমতলায় বক্তৃতা করনি? আমি বললামঃ স্যার ছেলেদের অনুরোধে আমি কিছু বলতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু আইয়ুব খান বা মোনায়েম খান সম্পর্কে তো কিছুই বলিনি। তিনি বললেন কেন বলনি? অন্য সব ছেলে যা বলেছে তুমিও তাই বলতে। আমি বললাম, আমি কি বলেছি না বলেছি আপনি শুনবেন তো। তিনি বললেনঃ আমি সব শুনেছি, তোমার পুরো বক্তৃতা আই, বি, অফিসার এখানে এসে টেপ বাজিয়ে শুনিয়েছে। অতএব, তুমি এখনই আমার সামনে থেকে চলে যাও।

আমি চাইনা যে আমার সামনে থেকে তোমাকে Arrest করে নিয়ে যাক। আমি বললাম, তাহলে পাবনা যাই। বললেন, না গতকালই তোমার পাবনার ঠিকানা পুলিশ নিয়ে গেছে। আমি বললাম, তাহলে কোথায় যাব? বললেন, যে জাহান্নামে খুশি যাওগে, আমাকে বলে যেওনা নতুবা ধরা পড়ে যাবে। বুঝলাম তাঁর আপত্য স্নেহ আমার প্রতি বিদ্যমান। আমি তাঁকে সালাম জানিয়ে বিদায় নিলাম।

www.pathagar.com

ঢাকায় ২/৪ দিন এ বাসা সে বাসা করে থেকে হঠাৎ দেখি আমার বড় মামা সৈয়দ শাহ আব্দুল খবীর বগুড়া থেকে ঢাকায় এসেছেন কোন কাজে। তিনি সবশুনে বললেন, তাহলে চল আমার সঙ্গে বগুড়া। তাঁর সঙ্গেই বগুড়া গিয়ে দীর্ঘ দু'মাস কাটালাম। বগুড়ায় রাজা বাজারের রাজা লজে ছিলেন আরিফ মামা। একদিন আমি ও আরিফ মামা একটা ছবি দেখার জন্য স্থানীয় এক হলে গেলাম। কিছুক্ষণ পরই দেখি হলের মধ্যে অনেক পুলিশ। আমরা সেখানে থাকা আর নিরাপদ মনে করলাম না, বাসায় ফিরে এলাম। আরিফ মামার পিতা ছিলেন বগুড়ার এক সময়ের জমিদার। তাঁর নিজেরও বেশ কিছু প্রভাব প্রতিপত্তি বগুড়া শহরে লক্ষ্য করেছি। তাঁর সঙ্গে তৎকালীন জামিল সোপ ফ্যাক্টরীর যাবতীয় কাজ এবং বিখ্যাত 'জানে সাবা' সোপ তৈরীর পুরো কাজটা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। অন্য একদিন মামা আমাকে সঙ্গে নিয়ে মজিবুর রহমান ভান্ডারীর স্পিনিং ফ্যাক্টরীর সতরঞ্জি তৈরীর কারখানা দেখার সুযোগে দেখলাম তাঁরা মামাকে ও আমাকে যথেষ্ট খাতির করলেন যেমনটা করেছিলেন জামিল সোপ ফ্যাক্টরীর মালিকরা।

দীর্ঘদিন আত্মগোপনের পর যখন ঢাকায় ফিরে এলাম তখন অধ্যক্ষ সাহেবের অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর আমি উঠতেই বললেন, বস। আমি আবার বসতেই দেখি এক বিশালকায় ব্যক্তি আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। অধ্যক্ষ সাহেব তাঁকে হাঁসতে হাঁসতে বললেনঃ এই যে আমাদের ভি,পি, চৌধুরী নূরুল আজিম। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম তাঁর পরিচয়। তিনি বললেন, অফিসার-ইনচার্জ। আমি বললাম; কিসের অফিসার -ইনচার্জ? তিনি বললেনঃ ডি,আই,বি। আমিও সঙ্গে সঙ্গে অফিসারকে বলে উঠলাম। Thank you, glad to meet you অফিসার বললেনঃ বসেন, আপনার সঙ্গে আলাপ করি। ভয়ের কিছু নাই। ছেলেমেয়ে আমাদেরও আছে। কোথায় ছিলেন, কেমন ছিলেন বলেন। আমি বললাম। কিছুক্ষণ পর আমি বললাম, আমার তো ক্লাসের সময় হল, আমি কি যেতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ যান আপনি ক্লাস করুণ।

ইতোমধ্যে আমি আমার দু'জন সেক্রেটারী জনাব আতিক ও জনাব কামালের কাজের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে পদত্যাগ করি। আমার পদত্যাগের পর ২/১ জন

www.pathagar.com

উপদেষ্টাও পদত্যাগ করেন। অধ্যক্ষ এই পদত্যাগের কারণ অনুসন্ধানের জন্য ভাইস প্রিন্সিপ্যাল জনাব এম, এ, বারী সাহেবকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করেন। কমিটি দীর্ঘদিন ধরে নানা জিজ্ঞাসাবাদের পর আমাদের পদত্যাগ গ্রহণ করেন। ফলে আমার ওয়ারেন্ট নিয়ে যখন আমাকে এ্যারেস্ট করার প্রশ্ন আসে তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার পদত্যাগ পত্রের উল্লেখ করে বলেনঃ He is no more V.P. now. এভাবেই আমি সে যাত্রা রক্ষা পাই। আমি আত্মগোপনের পর ফিরে এসে হঠাৎ একদিন অধ্যক্ষ সাহেবের বাসার দিকে যাই। সেখানে অধ্যক্ষ সাহেবের মাতা আমাকে চিনতেন বলে, তিনি আমাকে দেখেই উচ্চস্বরে বলে উঠেন, হ্যাঁগো। তুমি কেমন ছেলে? তুমি কোথায় ছিলে? তোমার জন্যে আমরা সারারাত ঘুমুতে পারিনি। সারা পাকিস্তানে তোমাকে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। প্রতি রাতেই আমাদের বাসায় তোমার জন্যে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের টেলিফোন, এমনকি চীফ সেক্রেটারী পর্যন্ত তোমার অনুসন্ধান করেছেন। আমার এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কাজী ওবায়দুর রশীদ সাহেব যিনি সম্পর্কে অধ্যক্ষ সাহেবের ভাগনা হতেন আমাকে পরে জানান যে, তোমার ব্যাপারে সরকারের ধারণা যে নিশ্চয়ই তুমি অধ্যক্ষ সাহেবের নিকট আত্মীয়। নতুবা তোমাকে ধরা সম্ভব হচ্ছে না কেন?

এভাবেই কেটেছে আমার বিচিত্র ছাত্রজীবন। তৃতীয় বর্ষের শেষের দিকে যখন আমার ফাইনাল পরীক্ষা আসন্ন, তখন আমরা হঠাৎ করে বিশেষতঃ আমি জানতে পারলাম যে পলিটেকনিকের পড়াশুনার পর আমাদের জন্য আর কোন উচ্চ শিক্ষার সুযোগ নেই। অধ্যক্ষ সাহেব হঠাৎ একদিন আমাকে বলেই বসলেনঃ This is the terminal education for you. You are polytechnic graduates and no scope for further education.

এতটুকু জানার পরই আমাদের কাছে পুরো জিনিষটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আমাদেরকে Diploma Engineers হিসাবেই সারা জীবন কাটাতে হবে। অথচ আমাদের মধ্যে উচচ শিক্ষা গ্রহণ করার মত প্রচুর মেধাবী ছাত্র ছিল। কাজে কাজেই আমরা কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রবলভাবে আন্দোলনের পটভূমি সৃষ্টি করে সমগ্র ছাত্র সমাজকে যখন বুঝালাম যে আমাদের ভবিষ্যত কত অন্ধকারময়, তখন প্রথম বর্ষ এবং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা সকলেই আমাদের

www.pathagar.com

ফাইনাল পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করতে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল। অথচ আন্দোলনের প্রথম দিকে কথা ছিল যে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হবে না। আমাদের স্থাপত্য বিভাগে পড়ত দু'জন নেপালী ছাত্র-দিলীপকুমার থাপা ও প্রদীপ কুমার। ফোর্ড ফাউন্ডেশনের স্কলারশীপে তারা পড়াশুনা করছিল। আমরা কেবল তাদের দু'জন ছাত্র ছাড়া তৃতীয় বর্ষের সমস্ত বিভাগের সমস্ত ছাত্র ১৯৬২ সালের ডিপ্লোমা ফাইনাল পরীক্ষা বর্জন করলাম। অবশ্য আমাদের শিক্ষকরা বহু চেষ্টা করেছিলেন যাতে আমরা পরীক্ষা বর্জন না করি। কিন্তু কোন ফল হয়নি, আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে অটল ছিলাম। আমাদের দাবী ছিল মাত্র তিনটি (১) উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে, (২) সরকারী চাকুরীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর পদ মর্যাদা দিতে হবে।, (৩) গ্র্যাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারদের বেতনের এক ধাপ নীচেই আমাদের বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে।

আমাদের এ দাবী ছিল অত্যন্ত যৌক্তিক এবং ন্যায় ভিত্তিক। কেননা, আমরা বিশ্বের বহুদেশ থেকে তাদের শিক্ষাকার্যক্রম ও বেতন ভিত্তিক চাকুরী কাঠামোর সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম। আমাদের দেশের গুটি কয়েক দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন ডিগ্রী ইঞ্জিনিয়ারদের কারসাজিতেই গঠন করা হয়েছিল ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের শিক্ষা কার্যক্রম এবং সরকারী বেতন কাঠামো। ফলে, আমরা দেশবাসীকে বুঝানোর জন্যে সর্ব প্রথম একটা পুস্তিকা বের করেছিলাম বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় একত্রে- "আমাদের কথা"। হলুদ রং এর কভার পেজে ছিল একটি মুষ্টিবদ্ধ হাত, সে হাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে একটা বিরাট মিছিল, বহু প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন সহ শোভাযাত্রা।

হোস্টেল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অতএব মেসও চালু ছিলনা। কাজে কাজেই, আমরা গুটি কয়েক নেতৃস্থানীয় ছাত্র ছাড়া আর কেউ হোস্টেল বিল্ডিং-এ থাকত না। হোটেলেই আমাদের পানাহার করতে হত। ইতোমধ্যে আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে সভা সমিতি করে আমাদের কথা,-তথা আমাদের দাবী দাওয়া জনসাধারণকে বুঝানোর চেষ্টা করেছি। ভিক্টোরিয়া ক্লাবে এক সন্ধ্যায় আমাদের কথা বলার জন্য আমাকে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এভাবে আমরা দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছি।

www.pathagar.com

পূর্ব পরিকল্পনামত একদিন গভীররাতে আমরা কজনমাত্র তৎকালীন বিশাল ব্যক্তিত্ব জাস্টিস ইব্রাহীম সাহেবের বাসায় উপস্থিত হই। তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে আমাদের কথা শোনেন। শুনতে শুনতে এক সময় মন্তব্য করেনঃ "যারা ইট-পাথর দিয়ে বিশাল বিশাল আট্টালিকা তৈরী করে তারা তো সেখানে থাকার সুযোগ পায় না। এমন কি বৃষ্টি বাদলেও তারা ঐ স্যাঁত সেঁতে মাটিতেই শয্যা গ্রহণ করে। কেন, তাদের কষ্ট হয় না। ঠান্ডা লাগেনা Have they got animal sperm on their body? কথাটা শুনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথাটা হেঁট হয়ে গেল, আর আমার বন্ধুরা সমস্বরে বলে উঠল জি স্যার জি স্যার। তিনি আমাদের কথা দিলেন আগামী কালই আমি তোমাদের কথা পত্রিকায় দিব। আমরা তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে মহা খুশীতে বিদায় নিলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! পরের দিন পত্রিকায় দেখলাম, আমাদের ছাত্রদের ব্যাপারে দেশের কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি কোনরূপ মন্তব্য কোথাও প্রকাশ করতে পারবেন না। এটা সরকারী নির্দেশ।

প্রতিমাসে হোস্টেলে মাত্র ৪০ টাকার মেসিং ফি বাবদে খরচা হত এবং মোটামুটি ভাল খাওয়া যেত তৎকালে। মেস ম্যানেজার হিসাবে প্রতি মাসেই একজন নূতন বোর্ডারকে ম্যানেজার বানানো হত এবং প্রত্যহ মার্কেটিং অফিসার হিসাবে পূর্ব তালিকাভূক্ত একজন বোর্ডারের সঙ্গে মেসের বয় আবুল অথবা কালাম এদের মধ্যে যে কেউ একজনকে হেলপার হিসাবে দেওয়া হত। মেস কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন আমার এক বন্ধু জনাব আলতাফ হোসেন। আমি একটু ভোজন রসিক হিসাবে প্রায়ই আমার ঐ বন্ধুর পাশে বসে বলতাম। কৈ হে কি খাবার আছে আন, আজকে আমি সেক্রেটারী সাহেবের পাশে বসেছি, এভাবে প্রায়ই আমি মন্তব্য করতাম। ইতোমধ্যে, মেসের খাবার দারুণভাবে নিম্ন পর্যায়ে নেমে আসে। একদিন তো কিছু ছেলে, শাকরান্না করা সামান্য অংশ অধ্যক্ষের বাসায় গিয়ে তাঁকে দেখিয়ে অভিযোগ করে যে, কেমন করে এভাবে খাওয়া যাবে? তখন মেসের ম্যানেজার ছিল বদরুল আলম বলে একটি বিহারী ছেলে। আমরা কমিটি থেকে বুঝতে পারলাম যে এটা তার অসততার কারণেই হচ্ছে। ফলে, ঠিক হল যে, বদরুলকে অবশ্যই ম্যানেজার পদ থেকে সরাতে হবে। কিন্তু লেখাপড়ার চাপের কারণে অনেকেই ম্যানেজার হতে রাজি

www.pathagar.com

হতো না। এ রকম এক পরিস্থিতিতে আমার বন্ধু সেক্রেটারী আলতাফ হোসেন আমাকে ধরল যে, এবার আপনাকেই ম্যানেজার হতে হবে। কেননা, আপনি খাবার নিয়ে সমালোচনা করেন বেশী। আমি অনেক ওজর আপত্তি পেশ করা সত্ত্বেও সে নাছোড়বান্দা। শেষে এক পর্যায়ে সে বলেই বসলঃ দেখেন চৌধুরী সাহেব! মেসে খেতে গেলে আপনাকে অবশ্যই ম্যানেজার হতে হবে। কথাটা আমাকে বেশ একটু লাগল। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি হব ম্যানেজার তবে শর্ত হচ্ছে আমার রুমমেট জনাব আব্দুল মান্নানকে আমার সহযোগী একাউন্টেন্ট হিসাবে কাজ করতে হবে তবেই আমি রাজি। আমি জানতাম, মান্নান সাহেব কোনমতেই রাজি হবে না।

যাহোক ! পরিশেষে কমিটি বহু কষ্টে মান্নান সাহেবকে রাজি করিয়েছিলেন। আমরা চারজন রুমমেট ছিলাম, এদের মধ্যে আর দুজন হলেন জনাব তাজুল ইসলাম ও মফিজুর রহমান মফিজ। আমি এদের সকলকে নিয়ে একদিন বসলাম কি প্রকারে প্রত্যহ খাবারের মান ভাল করা যায় সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর ঠিক হল, সারা মাসের জন্য চাল, ডাল, তেল, লবন, পিয়াজ ইত্যাদি এককালীন বাজার থেকে কিনে মজুদ রাখা এবং দৈনিক বাজারের জন্যে বরাদ্দ টাকা থেকে মাছ, মুরগি, শাক-সবজি ইত্যাদি কিনতে হবে কোন কার্পন্য না করেই। অতএব, মার্কেটিং অফিসার যিনি সেদিন যাবেন তাঁর হাতে ১০৫/- টাকা দিয়ে বলতাম সবটাই খরচা করবেন, লাগলে ২/৫ টাকা দিয়ে নিয়ে আসবেন পরে আমি দেব, কিন্তু কোন মতেই টাকা ফেরত আনবার চেষ্টা করবেন না। তখনকার দিনে মল্লিক বাজার থেকে সওদা নিয়ে আসা হত ঘোড়াগাড়ী করে। জ্বালানীর জন্য কাট কেনা হত গাড়ী ধরে সারা মাসের জন্যে। এভাবেই আমি ডিসেম্বর ও জানুয়ারী দু'মাস বেশ ভাল ভাবেই মেস চালানোর কৃতিত্ব দেখিয়ে তার থেকে বহুকষ্টে মেস কমিটির হাত থেকে উদ্ধার পাই। আসল কথা হল, সততার কোন বিকল্প নেই। মেসের টাকা মারার মত কোন দুর্মতি থাকলে, অবস্থার কোন উন্নতি হতে পারে না।

আগের কথায় ফিরে আসি, -আন্দোলনের সময় মেস বন্ধ থাকার কারণে বেশী পয়সা দিয়ে আমাদের হোটেলের খাওয়াটা আমার পছন্দ হলনা। কেননা, চাঁদার টাকার উপর নির্ভর করে আন্দোলন চালানোর পক্ষপাতি আমি ছিলাম

www.pathagar.com

না, উপরন্তু এটা দৃষ্টিকটু দেখায়। আন্দোলন কতদিন চলবে তাও অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। আমি নিজেই তখন উদ্যোগ নিয়ে প্রস্তাব রাখি, এবার আন্দোলন ঢাকার বাহিরে বৃহত্তর দেশের নিজ নিজ জেলা শহরে গিয়ে আন্দোলন জোরদার করার সময় এসেছে। কেননা, আমরা ন্যায় ভিত্তিক ও খুবই যৌক্তিক মাত্র যে তিনটি দাবী নিয়ে আমাদের কর্তৃপক্ষ তথা সরকারের নিকট জোরালো দাবী রেখেছি তা থেকে কোন অবস্থাতেই আমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারিনা। যে ফাইনাল পরীক্ষা ছিল আমাদের মূললক্ষ্য, সেই পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে মাত্র এক জন। প্রদীপ কুমার নেপাল-ভারত সীমান্তে রাজনৈতিক কারণে আটকা পড়ে পরীক্ষা দিতে পারেনি।

সুতরাং, আমাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমি চলে গেলাম পাবনা শহরে এবং অন্যান্য বন্ধুরা তাদের নিজ নিজ শহরে চলে গেল। মাত্র কয়েক জন ছাত্র পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের জন্য থাকল ঢাকায়। তারা প্রয়োজন বোধে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। **"আমাদের কথা"** বইগুলি কিছু আমরা সঙ্গে নিলাম প্রচার ও গণমুখী আন্দোলন জোরদার করার জন্য। দীর্ঘ প্রায় একবছর ধরে আমাদের এই মহান আন্দোলনকে তীব্র থেকে তীব্রতর করার মানষে আমরা ছাত্র সমাজ ঝাঁপিয়ে পড়লাম মহা আন্দোলনে। রাতের অন্ধকারে গোপনে আমাদের অনেক ঝুঁকি নিয়েও কাজ করতে হয়েছে।

www.pathagar.com

সপ্তম পর্ব

১৯৬০ সালে পলিটেকনিক ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের জনাব কিবরিয়া ভাই। ১৯৬১ সালে ছাত্র সংসদের সহসভাপতি ছিলেন স্থাপত্য বিভাগের জনাব তাজাম্মুল হক রাজী। তিনি আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন এবং প্রায় কাজই তিনি আমার সঙ্গে পরামর্শ করে সম্পাদন করতেন। প্রতিটি কাজেই আমি তাঁর সহযোগী হিসাবে থাকার ফলে একদিন তিনি আমাকে বলেই ফেললেনঃ Please get ready, you will be our next V.P. তাঁর ঐ ইচ্ছাটাই হয়ত আমাকে সহ-সভাপতি হওয়ার মত গুরু দায়িত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। যদিও আমার তেমন কোন বিশেষ আগ্রহ ছিলনা। পরবর্তী পর্যায়ে আমার সহ-পাঠীদের মধ্যে অনেক শুভার্থী ও সমর্থকদের পীড়াপীড়িতে আমি সম্মত হতে বাধ্য হই। ইতোপূর্বে এ ব্যাপারে আমি সামান্য কিছু আলোচনা করেছি।

ঢাকা পলিটেকনিক ছাত্র সংসদের ১৯৬২ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভের পর যখন আমাদের সংসদীয় কমিটিতে বরণ করে নেওয়ার সময় সভাপতি হিসেবে অধ্যক্ষ আবদুর রশিদ সাহেব প্রধান অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তৎকালীন ডাইরেক্টর (ডিটিই) এবং সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত ভাইস-চ্যানসেলর (বুয়েট) ডক্টর এম,এ, রশিদ সাহেবকে। অতএব, ছাত্র সংসদের নব-নির্বাচিত সহ-সভাপতি হিসেবে আমার উদ্বোধনী ভাষণে আমি কী বলব তা 'লিখিতভাবে আমাদের অধ্যক্ষ রশিদ সাহেব আমার নিকট দেখতে চান। আমি বলি স্যার আমি লিখিত কোন ভাষণ তো দেব না। তখন তিনি বলেন, ড. রশিদের সামনে তুমি কি বলবে না বলবে তা আমি আগেই জানতে চাই। আমি বলি, স্যার আমি নিজে Extempore Speach হিসাবে যা পারি বলব অতএব এটা আগে থেকে আপনাকে আমি কী জানাব? তাছাড়া আমি তো বাংলায় কিছুই বলব না, বলব ইংরেজিতে। তখন তিনি খানিকটা আশ্বস্ত হন।

সম্মেলনের দিনে আমি স্টেজে উপস্থিত হওয়ার একটু আগে আমার গায়ের কোন কোট ছিলনা। অথচ শীতের দিন। আমার এক ভক্ত বন্ধু চট করে তার

www.pathagar.com

গায়ের কোটটা খুলে আমার গায়ে জোর করে চাপিয়ে দিল। সম্ভবতঃ তার বাড়ী বগুড়া, এ মুহূর্তে তার নাম আমার মনে না পড়ায় আমি অত্যন্ত লজ্জিত ও দুঃখিত। স্টেজে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি অধ্যক্ষ আব্দুর রশিদ এবং প্রধান অতিথি হিসাবে ছিলেন ড. এম, এ, রশিদ। স্টেজের উপর আরো ১৫টি চেয়ার রাখা হয়েছিল। আমার নব নির্বাচিত সম্পাদকদের আমি এক এক করে পরিচিতি পর্ব সমাধানের পর তাঁদের বসার জন্যে বলি। আমি লেকচার স্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বলার সময় আমার হঠাৎ মনে পড়ে গেল ইনিই সেই ড. রশিদ, ডিপ্লোমাদের প্রতি রয়েছে যাঁর প্রচুর অনিহা। তাদের মঙ্গলের জন্যে তাঁর প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে দায়ী। তাই তাঁকে ক'টাক্ষ করে আমি বেশ সাবলিল ভাবেই কিছু কথা বলে ফেলি। তিনি আমার Extempore English Lecture এর ব্যাপারে অধ্যক্ষ রশিদ সাহেবকে বার বার প্রশ্ন করেন আমার পরিচয় জানার জন্যে। এটা পরে আমার দুজন সুপ্রিয় বন্ধু আনিসুর রহমান ও হামিদুর রহমান আমার কাছে গল্প করে শুনিয়েছেন। সভাশেষে আমি যখন ড. রশিদকে বিদায় দেওয়ার সময় তাঁর সঙ্গে কিছু দূর এগিয়ে তাঁকে গাড়ীতে তুলে দিতে যাই তখন তিনি আমাকে প্রশ্ন করেন Where do you come from? you speaks very nice english. I don't find such a boy like you even in my Engineering University আমি বলি Sir I have come from Edward College Pabna. তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেনঃ I know Edward College Pabna, it is a mofassil College. How it's possible for you to speak such a nice english? তখন তিনি গাড়ীর ভিতর বসে পড়েছেন। হঠাৎ করে আমি বলে ফেলি Sir originally I am coming from Calcutta. যেই বলা অমনি তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন Calcutta! I see that is why you are showing your excell বলেই গাড়ীর দরজাটা সজোরে বন্ধ করলেন তিনি নিজেই। আমার মনে হল, তাঁর কাছে আমার গুরুত্ব যেন অনেকটা ফাঁস হয়ে গেল।

পরের দিন অনেকেই আমার বক্তৃতার জন্যে আমাকে অনেক মোবারকবাদ জানান। আমার বন্ধুরা তো দারুণ খুশি। বিশেষতঃ ড. রশিদের সম্মুখেই তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করার সৎসাহস দেখে।

আমাদের সময় তখন পলিটেকনিকে অনেক বিদেশী এক্সপার্ট থাকতেন যেমন Dr. Sam O Webster, Dr. Ham, Dr. Albert-E- French Mr. Garie

www.pathagar.com

ছিলেন একজন মেকানিক্যাল এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার। তিনি দেখতে ছিলেন অনেকটা দৈত্যের মত বিশালাকৃতির মানুষ। পিয়নরা অনেকেই তাঁকে দেও সাহেব বলে পরিচয় দিত। তাঁর বিদায় কালীন সভায় আমরা তাঁকে উপহার স্বরূপ একটা চমৎকার লুঙ্গী, একটা পাঞ্জাবী ও একটা জিন্নাহ্‌ক্যাপ প্রদান করি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পরে একটু ঘুরেফিরে আমাদের হেসে হেসে দেখালেন আমরাও সকলে প্রচুর হাসলাম।

১৯৬২ সালে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ওপেন করা হয় তখন অনেককেই দাওয়াত করা হয়েছিল। আমিও ঐ দাওয়াতে ছাত্রনেতা হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। এবং সৌভাগ্যক্রমে প্রথম সারির দিকেই বসার সুযোগ পেয়েছিলাম। গভর্নর আজম খান এসেছিলেন প্রধান অতিথি হিসাবে আর সভাপতি হিসাবে ছিলেন উপাচার্য ড. এম,এ, রশিদ। প্রচুর লোক হয়েছিল হলের ভিতর এবং বাহিরে। স্টেজের উপর মাইকের সামনে গভর্নর আজম খান সাহেব বক্তৃতা করছিলেন। তাঁর সামনে কোন লেকচার স্ট্যান্ড ছিলনা। মাইকের অনেক লম্বা তার ওখানেই জমা ছিল। আজম খান সাহেব বক্তৃতার মধ্যে এক সময় যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং বার বার বলতে থাকেনঃ I don't like the Dhaka and Rajshahi University. Kick out these Universities. I like to see the each home of the country is humming in Engineering and Technincal, Scientific and Agriculture বার বার এইভাবে কথা বলেন। পিছনে বসে ছিলেন ড. রশিদ, তাঁকে দেখিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে বলেনঃ Look the atom of Pakistan is sitting over here, kick out all those Universities এই কথা বলার সময় তিনি পিছনের দিকে ২/৩ পা পিছিয়ে আবার দ্রুত সামনে এসে তার ডান পা উপরের দিকে ছুড়তে থাকেন বার বার। এমন সময় হঠাৎ তাঁর ডান পায়ের সঙ্গে মাইক্রোফোনের তার জড়িয়ে যায় এবং তিনি সম্মুখের দিকে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নেন।

ড. রশিদকে যখন তিনি উদ্দেশ্য করে কথা বলছিলেন তখন ড. রশিদের মুখে তৃপ্তির অপূর্ব হাসি সেই সঙ্গে তাঁর দাড়িতে নিজ হাত বুলিয়ে বুলিয়ে খুশিতে ডগমগ অবস্থা। গভর্নর আজম খানের দীর্ঘ বক্তৃতার এক ফাঁকে হঠাৎ তিনি বলে উঠেনঃ I think it is rather suffocating ! বাস্তবিকই তাই, তাঁর এই কথা বলার পরপরই

www.pathagar.com

কারো কারো বমিভাব দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে হলের বড় বড় জানালা ও দরজাগুলো থেকে লোক সরিয়ে ফেলা হয়। আমি নিজে সেখানে উপস্থিত না থাকলে হয়ত এমনভাবে লেখা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।

১৯৬২ সালে The First East Pakistan Forum Speech on Science এই টপিক এর উপর একটি অভিনব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়, যা ইতোপূর্বে কখনও হয়নি। ফলে ঢাকায় অবস্থিত অধিকাংশ নাম করা স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির ছাত্র-ছাত্রীদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্যে। আমাদের ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকেও আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় মোট দশটি টপিক এর মধ্যে মাত্র কয়েকটি যা এখন আমার মনে পড়ছে তা হল যেমনঃ

1. Technological Evolution
2. The Power Plant and Power Sources of Pakistan
3. The Space
4. The Industrical Development of Pakistan
5. The Atomic Energy of Pakistan ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই Forum Speceh এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার ভার ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. এস, জেড, হায়দার সাহেবের উপর। তিনি আমাদের যে ব্রিফিং দিয়েছিলেন তাহল মূলতঃ তাঁরা আমাদের নিকট থেকে কেবলমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে একটি বিশেষ বিষয়ের উপর দক্ষতা দেখতে চেয়েছিলেন। কোন জ্ঞানগর্ভ পন্ডিতের তত্ত্ব বা তথ্যপূর্ণ আলোচনা নয়। ফলে, আমরা সেই মতই প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। আমরা ঢাকা পলিটেকনিক থেকে মোট আট জন প্রতিযোগী এতে অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পাই। প্রথম বর্ষ থেকে তৃতীয় বর্ষ পর্যন্ত ছাত্র আমাদের মধ্যে ছিল। এরমধ্যে একমাত্র আমিই ছিলাম তৃতীয় বর্ষের ছাত্র। আমার পছন্দ ছিল Technological Evolution এবং এই বিষয়ের উপর প্রস্তুতি নিতে গিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব কাজি ওবায়দুর রশীদ আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এমন কি তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে British Council Library, USIS Library, Dhaka Polytechnic Library ইত্যাদিতে বিভিন্ন বই পুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করে আমাকে সাহায্য করেন বক্তৃতা তৈরী করার জন্যে। মোটামুটিভাবে আমরা

www.pathagar.com

সকল প্রতিযোগী যখন প্রস্তুত, তখন আমাদের পলিটেকনিক Auditorium এ এর একটা রিহার্সাল বা Shadow of the final এর একটা অনুষ্ঠান করা হয়। সেখানে সকল ছাত্রবৃন্দ শিক্ষকমন্ডলী এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞগণও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের উপস্থাপনায় তাঁরা সকলেই চমৎকৃত। আমাদের Literary Department এর তখন Advisor ছিলেন অধ্যাপক ইমদাদুল হক চৌধুরী সাহেব। অতএব তাঁকেই আমাদের সঙ্গে ঢাকা কলেজ অডিটোরিয়ামে উপস্থিত থাকতে হয়।

সেখানে গিয়ে আমরা দেখি এলাহী কান্ড। প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশ। স্কুল ও ইন্টার কলেজ গ্রুপকে জুনিয়র দলে এবং ডিগ্রী ও ভার্সিটি দলকে সিনিয়র গ্রুপে ফেলা হয়েছে। প্রথম দিন আমরা জুনিয়র গ্রুপের বক্তৃতা যে হলে চলছিল সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের ইংরেজিতে বক্তৃতা শুনে খুবই ভাল লাগল। তারা এসেছে বেশীর ভাগই Holy Cross, Bottomly Home থেকে হঠাৎ করে আমি বুঝতে পারলাম, আমি নিশ্চয়ই জুনিয়র গ্রুপে পড়তে পারিনা। কেননা আমি তৃতীয় বর্ষের ছাত্র হিসাবে অবশ্যই আমার সিনিয়র গ্রুপে থাকা উচিৎ। এই ভেবে দ্বিতীয় দিনের এক সময়ে আমি সিনিয়র গ্রুপে গিয়ে বসি। সেখানে গিয়ে দেখি বিচারক হিসাবে উপস্থিতি আছেন ড. জি.সি. দেব, ড. ইন্নাস আলী, ড. এস,জেড, হায়দার (মাঝে মাঝে বসেন আবার চলে যান) এবং প্রধান বিচারক হিসাবে রয়েছেন নটরডাম কলেজের Father Tim আমি Father Tim - এর নিকট আমার সিরিয়াল নম্বরটা জানতে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে বলেনঃ You will be informed later on, take your seat অবশ্য তখন বক্তৃতা চলছিল কিন্তু তিনি আমাকে যেভাবে কথা বলেন তাতে আমি বুঝলাম, আমাকে এখন তিনি জানাতে চাননা। অথচ এটা জানা আমার জন্য খুবই জরুরী। বিধায় আমি তখনই ড. হায়দরকে গিয়ে বলিঃ স্যার আমি যেহেতু পলিটেকনিক তৃতীয় বর্ষে পড়ি, অতএব আমি কোন গ্রুপে থাকব? তিনি বলেন অবশ্যই সিনিয়র গ্রুপে। তখন আমি বলি আমার সিরিয়াল নম্বরটা Father Tim আমাকে এখন জানাতে চাননা। তিনি তখনই বলেনঃ You must know it now বলেই তিনি উঠে আসেন আমার সঙ্গে সোজা Father Tim -এর নিকট গিয়ে আমার কথা বলে আমাকে জানান যে আমার সিরিয়াল নম্বর-৪১।

ইতোমধ্যে বুয়েটের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) জনাব ফজলে হোসেন আমাকে সেখানে দেখেই খানিকটা চমকে উঠলেন। বললেনঃ বড়ভাই

www.pathagar.com

আপনি এখানে তাহলে তো আমার প্রথম পুরস্কারটা হাতছাড়া হয়ে গেল। এভাবে কথা বলার অর্থ তিনি আমাকে আগে থেকেই জানতেন একজন বাগ্মী হিসাবে। উপরন্তু তাঁর বড় ভাই জনাব ফকরুল ইসলাম যিনি আমাদের সঙ্গে পলিটেকনিকে আমাদের সহপাঠি ছিলেন। জনাব ফজলে হোসেনের হাতে দেখলাম একমুঠো কাগজের রোল, যা তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু। তিনি বলেন আমার তো ঘন্টা দেড়েক লাগবে এগুলো শুনাতে। আমি বললাম। আপনি তো মাত্র ১০ মিনিট সময় পাবেন শুধু বলার জন্য। তিনি বল্লেন, আমি অনেক ডাটা যোগাড় করেছি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কোন বিষয়ের উপর বলবেন? তিনি উত্তর দেন। The Power Plant and Power Sources of Pakistan এরপর তিনি তাঁর প্রাক্তন শিক্ষক Father Tim এর নিকট গিয়ে কানে কানে কিছু একটা বলেন এবং তার কিছুক্ষণ পরেই দেখি তিনি স্টেজের উপরে একপাশে একটা Black Board রাখা ছিল তার উপর তাঁর ঐ বিষয়ের উপর ২০০ শত বছরের একটা গ্রাফ এঁকে রাখেন। এরপর যখন তাঁর নাম Father Tim ঘোষণা করেন তখন তিনি গিয়ে লেকচার স্টান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে বিনা মাইকে বক্তৃতা দিতে শুরু করেন। নির্ধারিত ১০ মিনিটের মধ্যেই প্রথম ওয়ার্নিং দেওয়া হল তিনি শেষ করতে পারলেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ার্নিং দেওয়া সত্ত্বেও তিনি শেষ করতে পারলেন না। পরিশেষে বক্তৃতা অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে বসে পড়তে হল। উল্লেখ্য যে, এদিনে কারো কোন বক্তৃতায় এ পর্যন্ত কোন হাততালি শ্রোতাদের মধ্য থেকে পড়তে শুনলাম না। অথচ এই শ্রোতাদের হাততালির জন্য কিন্তু একটা ভাল নম্বর ছিল। যাহা হউক, সবার শেষে Father Tim উঠে দাঁড়িয়ে বলেনঃ Now the last speaker no 41 Mr. Choudhury Nurul Azim from Dhaka Polytechnic Institute will speak before you.

আমি লেকচার স্ট্যান্ডের সম্মুখে গিয়ে মাইক ছাড়াই (কেননা, মাইক ব্যবহারের অনুমতি কারো জন্যেই ছিলনা) মাননীয় বিচারকবৃন্দকে এবং উপস্থিত দর্শক মন্ডলীকে উদ্দেশ্য করে আমার বক্তব্যের বিষয় Technological Evolution জানিয়ে শুরু করলাম ঃ When fire came out from the friction of the stones and men and women were used to wear the buckle of the trees and skins of the animals--- ইত্যাদি কথা বলার মাঝে একবার সকলের হাততালি

www.pathagar.com

লক্ষ্য করলাম প্রথম বারের মত। যেহেতু আমার সময় ছিল খুবই সিমিত মাত্র দশ মিনিট, অতএব আমার দীর্ঘ বক্তৃতার বেশ কিছু অংশ বলা বাদ দিলাম পরিকল্পনা থেকে। কেননা, দেখে দেখে বলার কোন সুযোগ ছিলনা, তাই আমার Set Speech কে সংক্ষিপ্ত করে যখন বর্তমান যুগের Rocket, Rudder পর্যন্ত বক্তৃতার মাঝা মাঝি এসে পড়েছি তখন আমার জ্ঞানী শ্রোতাদের ভিতর থেকে আবার তীব্র হাততালি শুনলাম। আমার বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে যখন মাত্র ২/১ মিনিট বাকী আছে তখন আমার Closing Sentence ছিল এ রকম ঃ To day the inter planetory travel of man may quench the thirst of knowledge so that the mankind would either have the power to destrory the world or possibley the whole Universe at will, or the key to a new era of undreamed of power and speed, comfort and happiness of a world of plenty. বক্তৃতা শেষ হতে না হতে প্রধান বিচারক Father Tim থেকে শুরু করে সকল বিচারক এবং সমস্ত জ্ঞানী শ্রোতা মন্ডলী একযোগে প্রচন্ড দীর্ঘ হাততালির মাধ্যমে আমাকে তৃতীয় ও শেষ বারের মত উষ্ণ অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বক্তৃতা শেষে আমি নিজ আসনে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আমার সঙ্গে করমর্দন করে তাঁদের আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এঁদের মধ্যে জনাব ফজলে হোসেন ও তাঁর বন্ধু আমার বক্তৃতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেনঃ বড় ভাই আপনি তো প্রথম পুরস্কারটা পেয়েই গেলেন। অথচ এটা আমি পাব এ আশাতেই এসেছিলাম। ফলাফল বের হবার কিছু পূর্বে একটা বিরতি দেওয়া হয় সকলের জন্যে।

বিরতির একটু পূর্বে হঠাৎ করে ড. ইন্নাস আলী স্টেজের উপর উঠে বলেনঃ The graph regarding the power plant and power Sourses of Pakistan which has been drawn on the black board, is very important and you may note it down for your future reference. এই কথা কটি বলেই তিনি নেমে আসেন।

আমিও আমার বন্ধুরা যখন সকলেই বেশ পুলকিত অবস্থায় হলের বাইরে লবিং করছিলাম তখন হঠাৎ আমাদের মাঝে উপস্থিত হন জ্ঞানের সাগর ড. জি.সি. দেব। আমাদের বন্ধুরা যখন তাঁর নিকট ফলাফল সম্বন্ধে কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ করল, তিনি বলেন, একটু পরেই তো ফল প্রকাশ হবে তখন জানতে পারবে।

www.pathagar.com

হঠাৎ আমার দিকে তাঁর চোখ পড়ায় আমার গায়ে হাত দিয়ে বলেনঃ 'তুমি খুব ভাল বলেছ। দেখ, বিচারকের চেয়ারে বহুবার বসেছি। কিন্তু কখনও কোন হাততালি দিইনি। বিচারকের পদে বসে হাততালি দিতে হয় তাও কখনও জানতাম না। কিন্তু তুমি আমাদের বাধ্য করেছ হাততালি দিতে "And it was father Tim the chief Judge, who started clappig and we all followed him". তারপর বলেন; তবে আমি বলব ঐ ছেলেটিকে কেন ব্ল্যাক বোর্ড ব্যবহার করতে দেওয়া হল? যা আর কাউকেই দেওয়া হয়নি। তাছাড়া এটা তো Forum speech এখানে কেবল মাত্র বক্তৃতা ছাড়া অন্যকোন মিডিয়া বাবহার করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া ড. ইন্নাস আলীই বা কেন Result out হবার পূর্বেই বোর্ডে আঁকা ঐ graph এর উপর এত প্রশংসা করতে গেলেন, তাও আমি বুঝতে পারলাম না। সে তাঁদের ছাত্র বলে কিনা তাও জানিনা।' আবার আমার গায়ে হাত দিয়ে বলেন, তবে তুমি বেশ ভাল বলেছ যদিও তোমার অতটা উত্তেজিত না হলেও চলত।

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ছিলেন ড. মহম্মদ হোসেন। তিনি প্রধান অতিথি হিসাবে এসেছিলেন সভায় পুরস্কার বিতরণের জন্যে। যখন বিজয়ীদের নাম এক এক করে ঘোষণা করা হয়, তখন প্রথম বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয় ফজলে হোসেন বুয়েট থেকে দ্বিতীয় বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং তৃতীয় বিজয়ীর নাম ঘোষণা করা হয় বুয়েট থেকে যে আমার ঐ একই বিষয়ের উপর বক্তৃতা করেছিল দুর্বল এক বক্তা হিসাবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁদের সবার নাম এখন আর মনে নেই। প্রথম পুরস্কারের মূল্য ছিল ২৫০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কারের মূল্য ছিল ২০০ টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কারের মূল্য ছিল ১৫০ টাকা মাত্র। বাকী আমাদের সকলকে Consolation Prize হিসাবে প্রত্যেককে একটি করে বই পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিজ্ঞ বিচারকদের বিচারের এই অন্যায় বিধানের বিরুদ্ধে আমার বন্ধুরা সকলেই প্রতিবাদ করার জন্য যখন প্রস্তুত তখন আমি তাদের প্রতিহত করি এই বলে যে, এখানে আমরা কোন Scene Create করতে চাইনা। আমরা যেহেতু পলিটেকনিক থেকে এসেছি তাই তথাকথিত শিক্ষিতের দল আমাদের মূল্যায়ন করল না। অতএব, ভবিষ্যতে এ ধরনের আর কোন অনুষ্ঠানেই আমরা অংশগ্রহণ করব না। আমাদের

www.pathagar.com

উপদেষ্টা জনাব ইমদাদুল হক চৌধুরী সাহেবও অত্যন্ত মনক্ষুন্ন অবস্থায় আমাদের সকলকে চলে আসার জন্য তাগিদ দিলেন।

ঢাকা কলেজের গাড়ী বারান্দার নীচে আমি যখন চলে আসার জন্য একা দাঁড়িয়ে আছি তখন হঠাৎ ফজলে হোসেন আমাকে এসে বলেনঃ বড় ভাই আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এ বিচার ঠিক হয়নি। আসলে আপনিই প্রথম হওয়ার উপযুক্ত। আমি তাঁকে বলিঃ Thank you for your consolation, We are to obey the decision of the learned Judges and nothing more of it.

আমার পুরো বক্তৃতাটা তখনকার প্রচলিত ইংরেজি সাপ্তাহিক The Record পত্রিকা ছেপেছিল খুব সুন্দর করে। এক সময় প্রেস ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর জেনারেল ছিলেন জনাব আব্দুল ওহাব। ইতোপূর্বে তিনি New York Times, The Statesman, London Times প্রভৃতি নাম করা ইংরেজি দৈনিক পত্রিকাগুলির রিপোর্টার ছিলেন। তিনিই বের করেছিলেন তাঁর নিজস্ব প্রেস থেকে ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকা The Record. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি Part time Teacher হিসাবে জার্নালিজম বিষয়ের উপর দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করেছেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. আনিসুজ্জামান তাঁর বড় জামাতা এবং সম্পর্কে আমার খালু। আমি লক্ষ্য করেছি ইংরেজি, ফার্সি ও উর্দূ ভাষায় খালুর ছিল সমান দক্ষতা। '৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তাঁর ছোট ভাই এটার্নি আব্দুল আহাদকে পাক সেনাবাহিনী তুলে নিয়ে যায় এবং তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। এতে তিনি দারুণভাবে মর্মাহত হন। ৬৫ নং স্বামীবাগের বাড়ীতে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি এবং আমার খালা ছাড়া আর কেউ ঐ বাসায় থাকতেন না। সে সময় আমি হঠাৎ পাবনা থেকে ঢাকায় আসলে তাঁরা আমাকে তাঁদের বাসায় থাকার জন্যে আহ্বান জানান এবং আমি বেশ কিছুদিন তাঁদের সঙ্গ দিয়েছি। প্রতি রাত্রে খালু তাঁর আইডেনটিটি কার্ডটি টেবিলের সামনে নিয়ে বসতেন আর বলতেন আর্মি আসলে তো আর পালানো যাবে না অতএব পরিচয় পত্রটি সামনে রাখাই ভাল। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর খালা, খালু ও আমি গভীর রাত্রি পর্যন্ত গল্প করতাম, হাসাহাসি করতাম। খালা বলতেন তোমার খালু খাওয়া-দাওয়া একরূপ প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন তাঁর ছোট ভায়ের চলে যাওয়ার পর। তুমি আসার পর এখন একটু একটু করে খেতে শুরু করেছেন। আমি লক্ষ্য করতাম খালু আমার সঙ্গে অকেটা

www.pathagar.com

বন্ধুর মত মেলামেশা করতেন। আমি একটি বা দু'টি ফার্সি কবিতা যদি তাঁকে শুনাই তবে তিনি আমাকে ততোধিক ফার্সি শের শুনাতেন। ঠিক তেমনিভাবে উর্দূ ভাষায় আমি কিছু কবিতা বললে, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত সাবলিলভাবে বিখ্যাত উর্দূ কবিদের যেমন মির্জা গালিব, আকবর এলাহাবাদী, জামী, আল্লামা ইকবালের উর্দু ও ফার্সি ভাষায় রচিত প্রচুর ফাসিদা শুনাতে বেশ পারদর্শী ছিলেন এবং লিখতেও পারতেন অতি দ্রুত।

১৯৭৮ সালে আমি পি,জি, হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম চেক-আপের জন্যে। প্রফেসর এ,কে, আজাদের তত্ত্বাবধানে ছিলাম দীর্ঘ ৪৫ দিন। তখন খালু আমাকে প্রায়ই মাঝে মধ্যে দেখতে আসতেন। আমি আশ্চর্য্য হতাম যখন শুনতাম, যে খালু স্বামীবাগ থেকে সোজা পায়ে হেঁটে পি,জি, হাসপাতালে আসতেন আবার আমার সঙ্গে কিছু গল্পগুজব করে পুনরায় পায়ে হেঁটে স্বামী বাগের বাড়ীতে ফিরে যেতেন। বিশেষতঃ তাঁর ঐ বয়সে অমন হাঁটার দৃষ্টান্ত আমার কাছে খুবই অবাক লাগত। ১৯৮২ সালে আমি পুনরায় পাবনা সিভিল সার্জন সাহেবের পরামর্শে পি,জি, হাসপাতালে ভর্তি হই এবং আমাকে Academic Interest এর উপর জরুরী ভিত্তিতে চিকিৎসা বিজ্ঞানী এমিরিটাস প্রফেসর ডাঃ নূরুল ইসলাম সাহেবের তত্ত্বাবধানে রাখা হয় পুরো দেড় মাস। অবশ্য প্রতি বারেই আমি Paying Bed এ থেকেছি এবং Class I officer হিসাবে তাঁরা আমার প্রতি যথেষ্ট যত্ন নিয়েছেন। এসময় খালু আমাকে বলেন, তুমি আমার নাম করে প্রফেসর নূরুল ইসলামকে বলবে যে আমি তাঁকে অনুরোধ করছি তোমাকে ভাল করে দেখার জন্যে। এসময়েও খালু আমাকে কয়েকবার পি,জি, হাসপাতালে দেখতে এসেছেন। ডাঃ নূরুল ইসলামকে খালুর কথা বলার পর তিনি আমাকে বলেনঃ Yes, I am also interested about you. দুঃখের বিষয় পি,জি, হাসপাতাল বহু চেষ্টার পরও আমার রোগের ঠিকানা বের করতে ব্যর্থ হয়। পরিশেষে আমি কলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করাতে বাধ্য হই। এক সময় খালু আমাকে দুটি বিখ্যাত বই পড়তে দেন কিছু দিনের জন্যে। তার মধ্যে Dr. Paul Brant এর লিখা The Secret of Egypt পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছি, কেননা একটা কঠিন বিষয় বস্তুকে সহজ সরল ইংরেজি ভাষায় কত অনুপমভাবে পরিবেশন করা যেতে পারে তা লেখক দেখিয়েছেন। আর দ্বিতীয় বইটি হল স্যার আল্লামা ইকবাল রচিত The

www.pathagar.com

Reconstruction of Religious Thoughts in Islam আর একটি বিখ্যাত পুস্তক তিনি আমাকে দান করেন; সেটি হল ইমাম গাযযালী (রহঃ) রচিত 'তহফাতুল ফালাসিফা' গ্রন্থটি তৎকালীন দার্শনিক চিন্তাধারা ও তার প্রতিক্রিয়ার একটি প্রামান্য দলিল বিশেষ।

মূলতঃ ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি খালুর প্রবল আকর্ষণ ছিল কিন্তু ইসলাম ধর্মের প্রথম ও প্রধান কিতাব অর্থাৎ আল-কোরআন তাঁর পাঠ্যসূচীর বহির্ভূত ছিল। এটা আমি জানতে পেরে তাঁকে একদিন অনুযোগের সুরে বলি, খালু! আপনি এতবড় পন্ডিত হয়ে বিশেষতঃ ফার্সি ও উর্দূ ভাষায় এতটা দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও আপনি আল-কোরআন সম্পর্কে যখন মহান আল্লাহ্ পাক আপনাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন কী বলবেন? তিনি বলেনঃ দেখ বাবা আমি অর্থ ছাড়া কোন জিনিষ পড়তে রাজি না। তাছাড়া এ বয়সে এখন এটা কিভাবে সম্ভব? আমি বলি বর্তমানে বাজারে প্রচুর অর্থ সম্বলিত কোরাণ মজিদ বিভিন্ন ভাষায় প্রচলিত আছে। আপনার পছন্দমত হাদিয়া করুন। কী আশ্চর্য্য! তখনই উঠে পড়লেন, বললেন, চল কোথায় পাওয়া যায় দেখি। স্টেডিয়ামের এক বিরাট লাইব্রেরী থেকে Allama Abdullah Yusuf Ali সংকলিত The Holy Quran হাদিয়া করলেন। বাসায় ফিরে এসে আমি বললাম একজন হাফেজ সাহেব অথবা মওলানা রাখুন তাহলে আপনার কাজ খুব সুবিধা হবে। খালু ঠিক তাই করেছিলেন এবং পুরো এক বছর লেগেছিল তাঁর এই মহাগ্রন্থ পবিত্র আল-কোরআন শেষ করতে। পরে তিনি আমাকে জানান, বাবা আমি তোমার কথা রেখেছি এবং এই খতমের পর আমি মিসকিনদের মধ্যে কিছু দান খয়রাত করেছি। মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর এই কাজ কবুল করুন। আমিন। খালুর একটা মস্তবড় গুণ ছিল অযথা কোন বিষয় নিয়ে তর্ক করতেন না। যেটা জানতেন না সেটা অকপটে স্বীকার করতেন। সত্যানিষ্টা ছিল তাঁর সব কাজের মূলমন্ত্র। এক সময় তিনি ছিলেন Water and power development Authority (WAPDA) এর একজন উপদেষ্টা, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তাঁর মতের অমিল হওয়ায় হঠাৎ করেই চাকুরীতে ইস্তফা দেন। তাঁর ভায়ের শোকে বিহ্বল হয়ে তিনি একটি বই লেখেন One man`s agony নামে।

১৯৬৩ সালে হঠাৎ আমি একদিন তাঁর বাসায় যাই। তাঁর মেজ মেয়ে নাজু তখন ক্লাস এইটের ছাত্রী। তাকে আমি বলি একটা বই আনত দেখি বুবু। সে

www.pathagar.com

ভিতর থেকে একটা বই আমাকে এনে দিল। বইটার নাম হল Bertrand Russel speaks his mind. বইটা একটু উল্টেপাল্টে আমি বুঝতে পারলাম এটা আমার পড়া দরকার। আমি তাকে বলি দেখ বইটা আমি নিয়ে যেতে পারি কি? পড়ে পরে আমি ফেরত দেব। নাজু বলে ভাই আব্বাকে তাহলে জিজ্ঞাসা করি। খালু তখন বিশ্রাম করছিলেন বিকেল বেলা। তিনি বলেন অন্য যে কোন বই নিতে এ বইটি ছাড়া। আমি বলি, না থাক আজকে আমি চলি। আমি যখন রাস্তায় নেমে পড়েছি, হঠাৎ দেখি খালু আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তিনি আমাকে বলেন দেখ বাবা এ বইটা British Council Library থেকে এনেছি। তারা আমাকে বইটা ফেরত দেওয়ার জন্যে তিন তিনবার Reminder দিয়েছে। ঠিক আছে চল, বলেই সবাইকে তৈরী হতে বলে গ্যারেজ থেকে গাড়ী বের করে আমাকেসহ সোজা British Council library, সেখানে গিয়ে প্রথমেই বইটি ফেরত দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করেন বইটি তাঁর নামে পুনরায় ইস্যু করার জন্যে। আমি দাঁড়িয়ে নীরবে তাঁর কান্ড দেখে অবাক। পরে বাইরে এসে আমাকে বইটা দিয়ে বলেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফেরত দিও। আমিও ঠিক দুদিন পরই বইটা তাঁকে ফেরত দিই- তিনি অবাক; এত তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে গেল বলে। আমি বলি, ভাল বই পড়তে আমার বেশী সময় লাগেনা। ১৯১৬ সালে খালুর জন্ম হয় এবং আমি ১৯৩৩ অর্থাৎ ১৭ বছরের বিরাট ব্যবধান কিন্তু তিনি আমাকে কখনও বুঝতে দেননি। ১৯৯৪ সালে ১৫ জুলাই শুক্রবার ৭৮ বছর বয়সে তিনি দীর্ঘ বার্ধক্য রোগের পর আমাদের শোক সাগরে ভাসিয়ে জান্নাতবাসী হন। আমি তাঁর দাফন কার্যে যারপর নেই মুষড়ে পড়ি।

www.pathagar.com

অষ্টম পর্ব

আমার সুপ্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের ধারণা হতে পারে যে, আমি স্মৃতিকণা নামের আড়ালে যেন অনেকটা আমার আত্মকাহিনী লিখতে বসেছি। বিলক্ষণ, আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি অনেকটা তাই। কেননা এরও প্রয়োজন আছে। যেহেতু আমার তথা লেখকের জীবন প্রণালী ব্যাতীত তার ভ্রমণ কাহিনী তো সার্থক হতে পারে না। সুতরাং এখানে আত্মকাহিনী ও ভ্রমণকাহিনী ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বিশেষতঃ আজকের দিনে সমাজে যারা পদাধিকার বলে Chief Engineers পর্যন্ত পদ অলঙ্কৃত করেছেন; বহু পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউটের Vice Principal, Principal পদে উন্নীত হয়ে জীবন ধন্য করেছেন। শুধু তাই নয় কারিগরী শিক্ষা বোর্ড, ডাইরেক্টরেট-অব টেকনিক্যাল এডুকেশন (DTE) এর বড় বড় পদগুলি অলঙ্কৃত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, তাঁদের অনেকেই কিন্তু এই ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে আমাদের আন্দোলনের সুফল ভোগ করে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করে বা না করে বর্তমান সমাজে তাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। হতে পারে এঁদের অনেকই আমাদের মহান আন্দোলনের পটভূমি সম্পর্কে হয়ত অনেক কিছুই জানেন না। বর্তমান তরুণ প্রজন্মের তো জানার প্রশ্নই উঠেনা। অথচ আমরা যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলাম, তারা অনেকেই এই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। যে বীজ বুনে, চারা বড় করে সযতনে পালন করে কিন্তু ফলভোগ করে পরবর্তী প্রজন্ম। অতএব, এটা আমার কোন ক্ষোভ নয় বরং বলব এটাও একটা সাফল্য।

আমাদের আন্দোলনের এক পর্যায়ে যখন আমরা সকলেই ক্লাস বর্জন করেছি, কর্তৃপক্ষের কোন মতেই আমাদের শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে আনতে পারছেন না; তখন আমাদের ডাইরেক্টর ছিলেন Dr. Waquar Ahmed (DTE)। তিনি অল্প কিছুদিন পূর্বে এইপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যেহেতু Dr. M.A. Rashid সাহেব

www.pathagar.com

পদন্নোতিতে Vice-Chancellor (BUET) হিসাবে যোগদান করার পর হঠাৎ একদিন Dr. Waquar Ahmed সাহেব আমাদের ছাত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ দান করার বাসনা প্রকাশ করেন তাঁর নিজ দপ্তরে রমনা এলাকায় Engineers Institute সংলগ্ন ভবনে। ছাত্র প্রতিনিধি দলের প্রধান হিসাবে আমি, কেননা আমি তখন ভি,পি, ছিলাম এবং আমার সঙ্গে আর পাঁচ জন এই মোট ছয়জন আমরা যথাসময়ে Dr. Waquar Ahmed. সাহেবের সঙ্গে তাঁর টেবিলের সম্মুখে বসি। তাঁর পাশে বসেছিলেন Dr. French Technical Advisor in Pakistan from Oklahoma (U.S.A.) Dr. Waquar আমাদের সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন তখন তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে আমাদের কথোপকথন শুনছিলেন। আলোচনার শেষের দিকে হঠাৎ তিনি Dr. Waquar সাহেবের অনুমতি চাইলেন আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য। Dr. Waquar তাঁকে অনুমতি দিয়েই অন্য কক্ষে চলে যান এবং তিনি তখন আমাদের বলতে লাগলেন আমাদের ছাত্রদের উন্নতির জন্য তিনি এবং তাঁর সরকার। অর্থাৎ আমেরিকা কি কি সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক সুবিধা দিবেন ইত্যাদি ইত্যাদি এবং এক পর্যায়ে তিনি তাঁর বৃহৎ ব্যাগ থেকে মোটা মোটা খান কয়েক বই পুস্তক বের করে দেখাতে লাগলেন। Dr. Albert E-French ছিলেন দীর্ঘাকায় সুবিশাল দেহের অধিকারী মানুষ। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত গুর-গম্ভীর যা আমাদের অনেকেরই পক্ষে ছিল বোধগম্যের বাহিরে। এমতাবস্থায় হঠাৎ আমার কি মনে হল, আমি তাঁকে তাঁর শিক্ষা জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন রাখলাম। তিনি বলেনঃ Yes, I was a diploma in 1932. In 1934 I got my degree in B.Sc Engineering and in 1937 Igot my Ph.D. Degree in Electrical Engineering in USA এ পর্যন্ত শুনার পরপরই আমি বললামঃ স্যার, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এখন আপনার কাছে আমাদের প্রশ্ন, যখন আপনি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ডিগ্রী পড়ার সুযোগ পেয়েছেন, তখন আমরা কেন এ সুযোগ পাবনা? অথচ আপনিই হচ্ছেন একমাত্র Technical Advisor in between Pakistan and Oklahoma State University, Oklahoma, Why not it is possible in our case ? তিনি বললেন This is your Government concerned policy. I can not say anything about it. বলেই তিনি তাঁর বই পুস্তকগুলি

www.pathagar.com

গুটিয়ে নিয়ে ব্যাগে ভরে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেন।

১৯৬৭ সালে যখন আমরা Diploma in Technical Education করার জন্য Technical Teacher's Training College (TTTC) এ পড়তে আসি, তখন দেখি Dr. Albert আমাদের The Philosophy of Polytechnic Education বিষয়ের উপর শিক্ষকতার ভার পেয়েছেন। প্রথম দিন ক্লাসেই আমি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিই যে প্রশ্ন আমি তাঁকে করেছিলাম ১৯৬২ সালে। তিনি উত্তরে বলেনঃ হ্যাঁ, মিস্টার চৌধুরী আমার মনে পড়ছে। আমি সেদিন তোমার উত্তর দিতে পারিনি, তবে আজকে আশাকারি উত্তর দিতে পারব। শোন, আমাদের দেশে আমরা ম্যাট্রিক (এস,এস,সি) পাশ করি ১২ বছর স্কুলে পড়ার পর। অথচ তোমরা সেখানে ১০ বছর স্কুলে পড়ার পর ম্যাট্রিক পাশ কর। আসলে আমাদের নিয়ম হল ১৬ বছর শিক্ষাক্রমের নীচে আমরা কাউকে ডিগ্রী দিইনা। সেক্ষেত্রে তোমরা ১০+৩=১৩ বছর শিক্ষা পাঠান্তে ডিপ্লোমা কর। Diploma Course করাই হয়েছে supervisor job পালন করে পুরো Project work সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে। আমেরিকতেও অনেক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আছে উচ্চ বেতনে। অবশ্য আমি মনে করি তোমাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ থাকা উচিৎ। বিশেষতঃ ইঞ্জিনিয়ারিং Concept টা তৈরী করা হয়েছে ১ঃ৫ঃ২৫ এই অনুপাতে। অর্থাৎ যেখানে ১ জন ইঞ্জিনিয়ার, ৫ জন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং ২৫ জন দক্ষ শ্রমিক প্রয়োজন।

বস্তুতঃ আমাদের সময় যারা পলিটেকনিকে পড়তে এসেছিল তারা অনেকেই I.Sc পাশ এমন কি B,Sc পড়তে পড়তে হঠাৎ এই নূতন ধরনের পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি অতি আকৃষ্ট হয়েই পড়তে আসে। সেমিস্টার সিস্টেমে শিক্ষাক্রম সাজানো হয় মোট ৬টিতে। বছর প্রতি ২টি করে সেমিস্টার। প্রতি সেমিস্টারেই প্রচুর পরীক্ষা দিতে হয় বলে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত ফাঁকি দেওয়ার কোনরূপ সুযোগ ছিল না। বিধায় অনেক মেধাবী ছাত্র আসত সরকারী ও বেসরকারী উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার সন্তান হিসাবে। ১৯৫৫ সালে প্রথম শুরু হয় এই শিক্ষাক্রম ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে। ১৯৫৮ সালে বের হয় প্রথম ব্যাচ। সেই হিসাবে পঞ্চম ব্যাচ হিসাবে ১৯৬২ সালে আমার বেরিয়ে আসার কথা। কিন্তু বিধি বাম। পলিটেকনিকের এই বৃহত্তম মহান ছাত্র

www.pathagar.com

আন্দোলনের নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ১৯৬৩ সালে আমাদের জুনিয়র গ্রুপের প্রশ্ন পত্রের উত্তরদানে আমরা বিশেষতঃ স্থাপত্য বিভাগের ছাত্ররা বাধ্য হই। কেননা, আগেই বলেছি, একমাত্র নেপালী ছাত্র দিলীপ কুমার থাপা ১৯৬২ সালে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করায় আমাদের জন্য প্রস্তুত প্রশ্ন পত্রগুলি Out হয়ে যায়। অতএব কর্তৃপক্ষ আমাদের জন্য নূতন করে পৃথক কোন প্রশ্ন-পত্র তৈরী না করে ১৯৬৩ সালের ব্যাচের পরীক্ষার্থীদের জন্য সে প্রশ্নপত্র তৈরী করা হয়েছিল তাতেই আমাদের পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও কথা পরে বলব।

ইতোপূর্বে আমি বলেছি, আমরা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত যে বিশেষ ক'জন ছাত্র ঢাকায় থাকতাম তাঁদের সকলের নাম ঐ মুহূর্তে আমার মনে না আসায় আমি দুঃখিত। তারা নিজ নিজ অঞ্চলে গিয়ে আন্দোলনের ধারা বেগবান করার জন্যে জনমত সমর্থনের আশায় সারাদেশব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিলেন। আমি গেলাম পাবনা শহরে যেখানে আমার পিতামাতা অবস্থান করতেন। ঢাকা থেকে সঙ্গে নিয়েছিলাম 'আমাদের কথা' পুস্তিকার কিছু কপি। পাবনা শহরে এক সময় পাশাপাশি বাসায় থাকতেন ডি,আই,বি ইন্সপেক্টর জনাব আখতারুজ্জামান সাহেব। আমি তাঁকে অনেক শ্রদ্ধা করতাম বলেই খালুজান বলে সম্বোধন করতাম। তিনি যথেষ্ট পরহেজগার লোক ছিলেন। রাতের বেলা বেশকিছু Under ground work করার সময় আমার কিছু বিপদের আভাস পেয়ে একদিন আমি সাহস করে ঐ খালুজান তথা ইন্সপেক্টর সাহেবের পকেটে 'আমাদের কথা'র একটি কপি ঢুকিয়ে দিয়ে বলিঃ খালুজান বইটা না পড়ে আমাকে ধরার চেষ্টা করবেন না। দয়া করে পড়বেন এবং বুঝবেন তারপরও যদি আপনি মনে করেন আমাকে ধরা দরকার তখন আমাকে জানাবেন। আমার এই সাহসী ভূমিকার কথা তিনি আমার পিতাকে জানান এবং বলেন আপনার ছেলে তো এখন খোদ আমাকেই বিপদে ফেলেছে।

বাবু রমানন্দ মল্লিক তখন পাবনা পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে এতই স্নেহ করতেন যে প্রায়ই আমাকে আন্দোলনের ব্যাপারে টিপস দিয়ে সাহায্য করতেন। একদিন তিনি আমাকে বলেই বসলেনঃ তুমি গভীর রাত্রি ছাড়া আমার কাছে এসোনা। আমি তাঁর কথামত কালো শেরওয়ানী পরে তাঁর বাসায় যেতাম।

www.pathagar.com

আমি পিতার একমাত্র সন্তান হওয়ায়, পিতামাতা আমাকে এতই স্নেহ করতেন যে আমার তেমন কোন বিপদ হলে তাঁরা মোটেই সহ্য করতে পারবেন না; এটা আমি বিলক্ষণ জানতাম। কেন না আমার কঠিন কোন অসুখ হলেই আমার পিতা নীরবে রোজা পালন করতেন অথচ আমাদের কাউকে তা জানতে দিতেন না। এমতাবস্থায় আমি ডিষ্ট্রিক কাউন্সিলে একটা চাকরী নিই। কিছু দিন যেতে না যেতেই হঠাৎ করে আমার পিতামাতা আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেন ভারতীয় আমার এক আত্মীয়ার সঙ্গে। এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের সঙ্গে আমাকে কলকাতায় নিয়ে যান। কিন্তু পথেই আমি সাংঘাতিক এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। কলকাতায় নেমেই আমার চিকিৎসা শুরু হয় বটে কিন্তু রোগের কোন উপসম হয়না। সব সময় জ্বর ও পিঠে ব্যাথা তৎসহ কাশি। ঐ অবস্থাতেই কলকাতা খানকা শরীফ লেনে অবস্থিত মসজিদ পাকে তিন তলায় হুজুরপাকের হুকুম মত বিয়ে পড়ান সমাধা হয়। কেননা, আমার পিতা পূর্বেই হুজুরপাকের অনুমতি নিয়ে রেখেছিলেন এবং সেই মোতাবেক মেয়ের ভাই সৈয়দ ফজলে হায়দার সাহেব এবং তাঁর ছোট মামু তথা আমার ছোট চাচা জনাব চৌধুরী ফজলুর রহমান সাহেব মুর্শিদাবাদের ইন্দ্রানী গ্রামের সৈয়দ আলী হায়দার সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা সৈয়দা ফালাক আরার 'এজেন' তথা সম্মতি নিয়ে আমাদের পূর্বেই কলকাতায় উপস্থিত ছিলেন। অতএব, কালবিলম্ব না করে শুভকাজ সমাধা হয়ে যায়। তারিখটা ছিল ১৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৩ সাল। আমার পীর ও মুর্শেদ হযরত সৈয়দ শাহ মুসতারশিদ আলী আলকাদেরী আল জিলী আল বাপদাদী আল্ হাসানী ওয়াল হোসায়নীর (রহঃ) নির্দেশ মোতাবেক 'রসুমত' তথা কনের সঙ্গে সাক্ষাতের দিন নির্ধারণ করেন ১১ শরীফ রাত্রে অর্থাৎ ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার ১৯৬৩ সাল।

অতএব, আমার চিকিৎসা ও যুগপৎ বিবাহের পরবর্তী কার্যাদি সমানতালে চলতে থাকল। বর্ধমানের গুসকরা শহরে বিখাত ডাক্তার নন্দ দুলাল রায় যাঁকে আমি মামা সম্বোধন করতাম আমার বড় মামা মহম্মদ মকসুদের অকৃত্রিম বন্ধু সুবাদে, তিনিই আমার চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য্য ! আমার রোগের তেমন কোন উপসম হল না। এই অবস্থাতেই আমরা মাড়গ্রাম নিজ বাড়ীতে থেকে আমার এক ফুপা ডাঃ সৈয়দ মাহ্‌মুদুন্নবী সাহেব অনেক চেষ্টা

www.pathagar.com

করলেন। অনেক ইনজেকশন ওষুধ ইত্যাদি প্রয়োগ করে তাঁর চেষ্টার কোন ত্রুটি করলেন না। আমাদের ভিসা নিয়ে যেহেতু ভারত যেতে হয়েছিল। অতএব ৬ মার্চ রাত্রে হযরত জাফর শাহ গাজীর (রহঃ) মাযার যিয়ারত করে রাত্রি ১২টার পর আমরা আত্মীয় স্বজন মিলে মোট আশিজন বরযাত্রী সহ মুর্শিদাবাদের ইন্দ্রনী গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দিই। পরদিন সকাল ৮টার মধ্যেই রৌদ্রজ্বল ঝল্মলে আলোতে আমাদের স্বাদর সম্ভাষন জানিয়ে মাইকে বাদ্যবাজনার মধ্যেই আতিথেয়তার চরম মেহমান নেওয়াজীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন গ্রামের সর্বোচ্চ নামী দামী এই সৈয়দ পরিবার। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের বরযাত্রীদের প্রচুর খাদ্য সম্ভারে তৃপ্ত করা হয়। আমি যেহেতু অসুস্থ বিধায় আমাকে বিশ্রামের জন্য দহলিজের একটি বিশেষ কামরায় আরাম করতে দেওয়া হয়। দুপুরের নামাজের পরপরই আমাদের জন্য বিয়ের বিশেষ খানা পরিবেশন করা হয় এবং বিকেলে পুনরায় নাস্তার পরিপাটি দেখে আমার এক সময় মনে হল, যেন আমরা সব খাওয়ার জন্যেই জন্মেছি। বাড়ীর সম্মুখে জামে মসজিদ, মাগরিবের নামাজের পরপরই শুরু হয় ১১ শরীফের মিলাদ মাহফিল, এশার নামাজান্তে সকলেই এক এক করে মসজিদ ত্যাগ করেন বটে কিন্তু আমি একাই মসজিদে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করি এমন কি আমরা কি কাজের জন্য এখানে এসেছি তারও খেয়াল হারিয়ে ফেলি। হয়ত এটা আমার শারিরীক অসুস্থতার জন্যেও হতে পারে। শেষে আমাকে কনের ছোট ভাই সৈয়দ ফজলে মুর্শেদ একফাঁকে মসজিদ থেকে উঠিয়ে সোজা বাড়ীর ভিতর নিয়ে যান। কেননা, সকল আত্মীয়স্বজন আমার অপেক্ষায় বসে আছেন। উপরন্তু আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাতের খাবার পরিবশেন করা হবে এবং তারপরই কনেসহ আমাদের সকলের বিদায় পর্বের যবনিকাপাত।

পরের দিন শুক্রবার সুপ্রভাত রবি করের ঝকঝকে আলোয় আমাদের স্বাগতম জানান আমার ল'চাচা জনাব চৌধুরী কামাল উদ্দীন। তিনিই কনেকে তথা তাঁর ভাগ্নিকে স্বাদরে গ্রহণ করে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে যান। দুঃখের বিষয় বছর ২/৩ হল, তিনি প্রায় ৮৮ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে জান্নাতবাসী হয়েছেন। তখন আমি ও আমার স্ত্রী সুইডেনে ছিলাম। সারাদিন চলল কনে দেখার ধুম। বিকেলে মীরা পাড়ায় ছিল ১১ শরীফের মিলাদ মাহফিল মসজিদ পাকে। ওখানে আমি মিলাদ শেষে আমার মেজ ফুপুর বাসায় ঘুমিয়ে পড়ি। একেবারে এশার নামাজ

www.pathagar.com

মসজিদে পড়ে হজরত মীর সাহেবের মাযার যিয়ারত শেষে অনেক রাতে আমার মেজ ফুপা সৈয়দ শাহনওয়াজ সাহের তাঁর এক ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে আমাদের চৌধুরী পাড়ায় আমাকে যেতে সাহায্য করেন। কেননা, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে কোন বিদ্যুৎ ছিলনা।

দু'দিন পর অর্থাৎ রবিবার বৌভাতের আয়োজন করা হয় বেশ স্বাড়ম্বরে। কনের ছোটভাই এসেছিলেন আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমি মাত্র ৬ দিন পরই কনেকে তাঁর পিত্রালয়ে রেখে আমার পিতামাতা সমভিব্যাহারে আমরা পাকিস্তান চলে আসি। কেননা, আমরা এমনিতেই হিসাবের বাহিরে অনেক সময় ব্যয় করে ফেলেছি। পাবনায় ফিরে এসে দেখি আমার চাকরীটি নট হয়ে গেছে। উপরন্তু যে বেতন আমার পাওনা ছিল তাও পেলাম না। যাহা হউক, সব বাদদিয়ে আমার এখন পূর্ণ চিকিৎসা শুরু করলেন প্রখ্যাত ডাঃ মহম্মদ ইসহাক তিনি যথেষ্ট যত্ন ও আন্তরিকতার সঙ্গে চিকিৎসা করলেন দীর্ঘদিন কেননা, আমি তাঁর বাড়ীর সম্মুখের বাসাতেই অবস্থান করতাম।

ইতোমধ্যে আমার পিতার এক বন্ধুর চাকরীর পদন্নোতির ব্যাপারে আমাকে ঢাকা আসতে হল এবং সেখানে বেশ কিছু দিন থেকে আমি হঠাৎ করে মিরপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে অধ্যক্ষ মিঃ বি,বি, সেনের অধিনে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করতে বাধ্য হই। ফলে, আমি ও আমার বন্ধু জনাব সানাউল্লাহ মিয়া এক সঙ্গে কাজে যোগদান করে আমাদের ঈপ্সিত পরীক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখতে লাগলাম।

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মিরপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের একটা চুক্তি থাকায় তাদের প্রেরীত Expert Mr. Aa chong Zane টিম লিডার হিসাবে এবং Mr. Hoopman , Mr. Gayale এ তিন জন প্রায় সর্বক্ষণ ট্রেনিং সেন্টারের দেখা-শুনা করতেন বলে ট্রেনিং সেন্টারের কোন কিছুর প্রয়োজনের অভাব ছিল না। আমাদের Working Period ছিল সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত। মাঝে ১ ঘন্টার বিরতি ছিল দুপুরের খাবার ও নামাজের জন্যে। খুবই সুন্দর ছিল কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা। ক্যাফেটেরিয়াতে মাত্র ১২ থেকে ১৪ আনার মধ্যেই চমৎকার প্রাতঃরাশ করা যেত। দু'টি পরোটা, দুটি ডিম পোচ, ভাজি বা হালুয়া এবং এক কাপ চা বেশ তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া যেত। চতুর্দিক ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার

www.pathagar.com

পরিচ্ছন্ন চকচকে ঝকঝকে। শিক্ষকদের বেতন শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্বিশেষে ২০০ টাকা থেকে ২১০ টাকা পর্যন্ত ছিল। শিক্ষকদের থাকার জন্যেও হোস্টেল ছিল, যেখানে আমিও অবস্থান করতাম।

এখানে ক্লাসরুমের একটা ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। আমি ইংরেজি এবং টেকনিক্যাল ড্রইং বিষয় দুটির উপর শিক্ষকতা করতাম। একদিন আমি নীচে তলায় ছেলেদের সামনে একটা অনুপ্রাশ বা Alliteration Black Board এর উপর লিখে তালিম দিচ্ছিলাম। যেমনঃ

AN AUSTRIAN ARMY AWFULLY ARRAID
BOLDLY BY BATTERIES BESIEGED BELGRADE
COSEC COMMANDERS CANNONADING COME
DEALING DESTRUCTION DEVASTATINNG DOOM.

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনার পর এই Alliteration টি তৈরী হয় অথচ কোন বই পুস্তকে ABCD দিয়ে একত্র কোথাও এটি পাওয়া যায় না। ১৯৫৩ সালে Edward College এ যখন আমি পড়তাম তখন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক আকরাম সাহেব আমাদের এটি লিখে নিতে বলেছিলেন, কেননা, তিনিও তাঁর শিক্ষকের কাছ থেকেই এটি শিখেছিলেন। শিক্ষকতার এই প্রথম জীবন থেকেই আমি চেয়ারে বসে পাঠদান করা অভ্যাস থেকে মুক্ত ছিলাম। ফলে, সমস্ত ক্লাস রুমে কখনও কখনও প্রয়োজন বোধে ঘুরে ফিরে পাঠদান করা আমার অভ্যাস ছিল। সেদিনও আমি Black Board এর লিখা সব ছেলে ঠিকমত উচ্চারণসহ লিখতে পারছে কিনা তা দেখার জন্যে হঠাৎ করে সর্বশেষ বেঞ্চের পিছনে দাঁড়িয়ে দেখি একজন ছাত্র সে হাই বেঞ্চের নীচে একটি নভেল লুকিয়ে নিয়ে নীরবে গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। এই একটি মাত্র ছাত্রের এই কর্মকান্ডে আমার মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ার অবস্থা। আমি তার কাছ থেকে বইটি নিয়ে কেবল বললামঃ Novel reading is not a bad thing, I do study novel but never in the class room. How you dare to read novel while your tacher is giving lecture in the class; am I a failure teacher to you? এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে আমি লেকচার টেবিলের এককোনায় শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লাম, হঠাৎ করে আমার প্রচন্ডভাবে কাঁদতে ইচ্ছা করছে যে,

www.pathagar.com

কেন আমি এই ছেলেটির মন আকর্ষণ করতে পারলাম না? আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বের হল না, আমি যেন হঠাৎ বোবা হয়ে গেলাম। আমি হাতের ইশারায় সব ছেলেদের চলে যেতে নির্দেশ দিলাম। ছেলেরা আমার এই অবস্থা দেখে তারাও কেউ কোন কথা না বলে নীরবে ক্লাস রুম ত্যাগ করল। আমি অনেকক্ষণ একাকী ঐ ভাবেই বসে থাকলাম এবং ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়লাম। সেদিন ঐটিই ছিল শেষ ক্লাস। অতএব, আমি এক সময় খুব ধীরে ধীরে অসুস্থ রুগীর মত আমার হোস্টেল বেডে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

তৃতীয় দিনে এই গ্রুপের ছেলেদের সঙ্গে তিন তলার উপর ড্রইং-হলে (Drawing Hall) আমার ক্লাস ছিল। আমি যথারীতি ক্লাসে গিয়ে রোলকল করার সময় লক্ষ্য করলাম সেই ছেলেটি, যার নাম এখন আর আমার মনে নেই তবে ফর্সা লম্বাটে চেহারা, মুখে লম্বা কাল দাড়ি আর তার মাথায় ছিল চমৎকার কোঁকড়ানো কাল চুল। সে বসেছে সবার শেষে মাথা নীচু করে তবে সম্পূর্ণ মাথাটি মুড়িয়ে ফেলেছে। আমি পড়ানোর শেষে, চলে যাবার পূর্বে ছেলেটিকে উদ্দেশ্য করে বললামঃ তোমার বইটি আমার কাছ থেকে নিয়ে যেও এবং কাল থেকে মাথায় একটা টুপি পরে এস।

ছেলেটিকে আমি কোন গালমন্দ করিনি, কেবলমাত্র ঐ দুটি কথা এবং আমার পুরো শরীরের অভিব্যক্তিই তাকে বুঝতে সাহায্য করেছে যে শিক্ষক কতখানি মর্মাহত। যার ফলশ্রুতিতে সে নিজেই নিজেকে শাস্তি দিয়েছে অত্যন্ত কঠিনভাবে। এই ঘটনার কথা আমি ১৯৭৩ সালে বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যখন আমি টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে BSC. Tech করার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। তখন আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের হেড ছিলেন অধ্যাপক আখতার সাহেব তিনি নিজে যথেষ্ট ভাল ছাত্র ছিলেন বলে শুনেছি, অথচ ক্লাস টিচার হিসাবে একেবারেই অপদার্থ, দীর্ঘ দিন তাঁর ক্লাসে তিনি কেবল গাল-গল্প Gossips কেচ্ছা কাহিনীর মধ্যে অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করেন যা' আমাদের মত বয়স্ক শিক্ষিত শিক্ষকদের নিকট রীতিমত পীড়া দায়ক হয়ে দাঁড়ায়। বয়সে তিনি আমার চেয়ে অনেক জুনিয়র ছিলেন এবং আমার সহপাঠিদের মধ্যেও আমি ছিলাম অনেক সিনিয়র। ফলে তাঁকে কিছুটা জ্ঞান দেওয়ার জন্যেই হয়ত আমাকে উপরের ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লেকচার স্টান্ডের সম্মুখে দাঁড়িয়ে

www.pathagar.com

বলতে হয়েছিল। আমার বন্ধুরা আমার এই অপূর্ব বক্তৃতা দারুন উপভোগ করেছিলেন বটে, তবে অধ্যাপক আখতার সাহেবের চেহারা এমন রক্তাভ আকার ধারণ করেছিল যে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন এবং বলেনঃ ঠিক আছে, এবার থেকে তাই হবে আপনারা যেনমটা চান। এর পরই তিনি দ্রুত ক্লাস ত্যাগ করেন। অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমি তাঁর অপ্রিয়ভাজন হয়ে পড়ি। আমার পরীক্ষার খাতায় তিনি যে নম্বর দিতেন তা দেখে আমার কোন কোন সুহৃদ বিস্ময় প্রকাশ করে বলতেন, আপনি তাঁকে দেখান তাঁদের পীড়াপীড়িতে আমি তাঁর কাছে গেছি কোন লাভ হয়নি। তখন প্রিন্সিপ্যাল-ইন-চার্জ ছিলেন প্রফেসর নাজমূল হক সাহেব, তিনিও ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার তাঁর কাছেও আমার খাতা দেখান হয়েছে পর তিনি মন্তব্য করেনঃ দেখ হে কিছু কিছু Crazy Teacher সব খানেই আছে। এর বেশী তিনি কিছুই করতে পারেন নি।

যাহা হউক, মিরপুর টেকনিক্যাল থেকে একটা ছুটি পেলাম কিছু দিনের জন্যে; সেই ছুটিতে আমি ভারতে গেলাম আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। সেখানে গিয়ে ঠিক করলাম আমাদের একটা মধুচন্দ্রিমা Honey moon হওয়া দরকার। প্রথমে আমার ইচ্ছা ছিল দার্জিলিং যাওয়া। কিন্তু সে সময় ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক খুব ভাল না থাকায় টিকটিকির ভয়ে ঐ কল্পনা বাদ দিয়ে কলকাতায় যাওয়া স্থির হয়। যদিও আমার শশুর সাহেবের প্রবল আপত্তি ছিল তাঁর মেয়েকে কলকাতা নিয়ে বেড়াতে যাওয়ায়। কেননা, তিনি ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারের পুরুষ প্রধান। যদিও তিনি নিজে কলকাতায় থেকে লেখাপড়া করেছিলেন তবুও তাঁর সংশয় এই ছোট্ট মেয়েটিকে আমার সঙ্গে কলকাতায় পাঠাতে। শেষে আমি বলতে বাধ্য হলাম যে ফুপা, আপনার মেয়ে কোনদিন কলকাতা যায়নি এটা ঠিক। কিন্তু কলকাতা তো আমার কাছে আমার গ্রামের মতই পরিচিত, অতএব অসুবিধা কোথায়? বস্তুতঃ আমার স্ত্রীর মা অর্থাৎ আমার বড় ফুপু যখন মারা যান তখন আমার স্ত্রীর বয়স মাত্র ৪/৫ বছর হবে। সেই থেকেই স্নেহময় পিতার সান্নিধ্য ছাড়া আর কোথাও তার যাওয়া সম্ভব হয়নি। মোট কথা বাড়ীর চার দেওয়ালের বাইরে গিয়ে কিছুই দেখা সম্ভব হয়নি। কবি গুরুর ভাষায়ঃ

www.pathagar.com

"দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীর্ষের উপর
একটি শিশিরবিন্দু।"

অতএব অবস্থা যখন এই, তখন আমি তাঁকে নিয়ে প্রথমে সাঁইথিয়া রেল জংশন স্টেশন থেকে প্রথম শ্রেণীতে একটা ছোট কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লাম এবং নামলাম বর্ধমানের ছোট্ট শহর গুসকরায়। সেখানে আমার বোন, মেজ মামা মেহবুব জাহেদী ও তাঁর স্ত্রী হামিদা খালা থাকতেন। সেখানে মাত্র ২/৩ দিন ছিলাম। আমার স্ত্রী জীবনে সেই প্রথম সিনেমা দেখেন সকলে মিলে অভিযান বইটি, যা তখন চলছিল স্থানীয় একটি সিনেমা হলে। এরপরই আমাদের কলকাতা যাত্রাশুরু। আমরা সেখানে গিয়ে উঠলাম পার্ক সার্কাসে আমার নানীর বাসায় ঝাউতলা রোডে, ট্রাম ডিপো থেকে বেশ কাছেই। নানী আমাদের দেখে খুবই খুশী হলেন।

কলকাতা শহর ভারতের চারটি বিখ্যাত শহরের মধ্যে একটি। যেমন দিল্লী, বোমবাই বর্তমানে মুম্বাই কলকাতা এবং বর্তমানে চেন্নাই মাদ্রাজ। বর্তমানে একমাত্র কলকাতাতেই এখনও ট্রাম চালু আছে। আমরা প্রথম দিন সন্ধ্যায় ৩৩ নং আলীমুদ্দিন স্ট্রীটে আমার হুজুরপাকের বাসায় হাজির হলাম ট্যাক্সিতে। নীচ তলায় থাকতেন কিছু খাদেম এবং উপর তলায় হুজুর পাক সপরিবারে অবস্থান করতেন। বর্তমান বড় হুজুর পাক আমার স্ত্রীকে উপর তলায় যাওয়ার পথ বাতলে দেন। আমরা বেশ কিছুক্ষণ সেখানে হাজির থাকার পর হুজুরপাকের কদমুসী করে তাঁর অশেষ দোয়া এবং হুজুর পাকের দেওয়া তাবাররুক হিসাবে কিছু মিষ্টি নিয়ে আমার স্ত্রী নীচে নেমে আসেন। সেখান থেকে আমরা চলে যাই আমার স্ত্রীর বড় বোনের বাসায় যা নিকটেই ছিল, সেখানে আমাদের রাতে খাওয়ার দাওয়াত ছিল।

পরের দিন সকালেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম কলকাতায় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্যে। প্রথমেই গেলাম বিখ্যাত জাদুঘর দেখতে কিন্তু সেদিন সেটা বন্ধ থাকায় আমরা গেলাম ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে। আসলে ভারতে মোঘল সম্রাটদের নানা রকম স্থাপত্য কৌশলের প্রতি বৃটিশদের নজর পড়ে, যা বেশীর

www.pathagar.com

ভাগই দিল্লী, আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রিতে অবস্থিত। সুদীর্ঘ ৭০০ বছরের শাসনামলে মোঘল বাদশাদের ঐ সমস্ত মনোরম স্থাপত্য কৌশল এখনও তাঁদের রুচিবোধ ও সৌন্দয্য প্রিয়তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সব কিছুর মধ্যে আগ্রায় তৈরী সম্রাট শাহজাহানের অমর সৃষ্টি মমতাজ মহলের স্মৃতিসৌধ তাজমহল। সে তাজমহলকে প্রাণভরে দেখার পর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেনঃ কা'লের কপোল তলে শুভ্রসমুজ্বল এ তাহজমহল।' তখন হয়তো তাই ছিল, তবে এখন নেই। এখন যেটা আছে সেটাও কবির ভাষায়ঃ

'তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখেছ কি তার প্রাণ
অন্তরে তার মমতাজ নারী, বাহিরেতে শাহজাহান।'

বাস্তবিকই তাই, সাদা মার্ব্বেল পাথরে যে এ স্থাপত্য কৌশলের অপূর্ব সৃষ্টি তা আজও সারা বিশ্বে কেউ কোথাও তৈরী করতে পারেন নি। যেমনটা চেষ্টা করেছিলেন বৃটিশ রাজ মহারানী ভিক্টোরিয়ার স্মরণে কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল তৈরীর মানষে, সে খায়েশ কিন্তু মোটেই পূরণ হয়নি। তবুও আমি আমার প্রিয়তমা স্ত্রীকে সেটা দেখাতে গিয়ে প্রায় ৪ ঘন্টা সময় ব্যয় করে ভারতের ইতিহাসসহ ইংল্যান্ডের অনেকখানি বর্ণনা করতে হয়েছে যা আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে জানাছিল। অল্পবয়সী মহিলা শ্রান্ত -ক্লান্ত অবস্থায় আমরা দিনের শেষে বাসায় ফিরলাম।

পরের দিন আবার এই চৌরঙ্গীতেই এলাম জাদুঘর দেখার জন্য। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে কলকাতা যাদুঘর অন্যতম বিখ্যাত জাদুঘর। আমি নিজে বেশ কয়েকবার সেখানে গেছি। তখন কোন পয়সা লাগত না। এখন রীতিমত টিকিট কেটেই প্রবেশ করতে হয়। প্রথমে ঢুঁকেই দেখা যাবে হাতির বিশাল দু'টি দাঁত যা দেখে মনে হবে হাতিটি না জানি কত বড় ছিল। তার নীচেই লিখা আছে। এরাও একদিন জিবিত ছিল। জাদু ঘরের প্রতিটি হল ঘর বিশাল আকৃতির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সবই প্রমান সাইজ কেননা অতিকায় ডাইনোসর থেকে আরম্ভ করে উঠ, তিমি, অজগর প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ জন্তু জানোয়ারের বিরাট স্কেলিটন সাজানো রয়েছে। যা দেখলে বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই। প্রবেশ পথের দিক নির্দেশনা দিয়ে একেবারে পঞ্চম তলা পর্যন্ত দেখতে দেখতে যাওয়া যাবে। প্রতিটি তলায় রয়েছে অনেক বিশালাকৃতির হলঘর। থরে থরে সাজানো রয়েছে

www.pathagar.com

সারা বিশ্ব থেকে নিয়ে আসা অতি দুর্লভ অপূর্ব সব দেখার বস্তু। ফলে শিক্ষার ব্যাপারে এটা একটা বিরাট জ্ঞান ভান্ডার স্বরূপ। স্কুল, কলেজের ছেলে মেয়েরা তাদের ছুটির দিনে দলে দলে ভিড় করে দেখে যুগপৎ আনন্দ ও জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। সবার শেষে দেখা যাবে ৪,৫০০ বছরের রক্ষিত মমি যা মিশর থেকে আনা হয়েছে। আমার স্ত্রীকে নিয়ে পুরো জাদুঘর দেখতে প্রায় ৫ ঘন্টা দীর্ঘ সময় কখন পার হয়ে গেছে অন্ততঃ আমি বুঝতে পারিনি। কেননা, আমি ছিলাম যেন এক অত্যন্ত পরিশ্রমী শিক্ষক আর আমার স্ত্রী ছিলেন যেমন গুণমূগ্ধ শিক্ষকের এক অনুগতপ্রাণ ছাত্রী। বাস্তবিকই কলকাতা জাদুঘর দেখতে গেলে তাড়াহুড়া কন্নার কোন মানে হয় না।

চতুর্থ দিন আমরা বেরুলাম চিড়িয়া খানা দেখার জন্য। সেদিন ছিল রবিবার আমার ল' চাচার ছুটির দিন। অতএব, তিনিও আমাদের সঙ্গে চললেন আলীপুর চিড়িয়াখানা দেখার জন্যে। দুপুরে খাওয়ার কিছুপর আমরা রওনা হলাম। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে এটিও একটি অন্যতম বিশালাকৃতির চিড়িয়াখানা (Zoo)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিরল প্রজাতির প্রাণী যেমন গরিলা এখান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছিল জাপানীদের বোমার ভয়ে বহু প্রজাতির প্রাণীর সমাবেশ ঘটেছে আলীপুর চিড়িয়াখানায়। আমি ছোট বেলায় বেশ কয়েকবার দেখেছি এবং প্রচুর আনন্দ পেয়েছি। জলহস্তি, বাঘ, সিংহ, হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, উঠপাখি থেকে আরম্ভ করে ভুচর, জলচর ও নানা প্রজাতির হাঁস বর্তমান রয়েছে এখানে যা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বানর, বন মানুষ এবং ওরাং উটাং এর নানা রকমের খেলা দেখার মাঝেও প্রচুর আনন্দ পাওয়া যায়। ভারতে আর কোন চিড়িয়াখায় এত প্রচুর প্রজাতির জন্তু জানোয়ার আমার চোখে পড়েনি। শেষে দেখি বিশাল এক হাতির পীঠে উভয় দিকে ৪ জন ৪জন করে মোট আট জন বেঞ্চের উপর চমৎকারভাবে বসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে আমারও বাসনা জাগল আমার স্ত্রীকে নিয়ে হাতির পীঠে উঠে ঘুরব কিছুক্ষণ। কিন্তু বাধ সাধলেন আমার চাচা, তাঁর কথা নতুন বৌকে নিয়ে হাতিতে উঠা যাবেনা। যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন কি হবে? তাঁর প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও যখন আমি নাছোড় বান্দা, তখন বললেনঃ যাও, আমি এটা নিজ চোখে দেখতে পারব না; বলে তিনি একটা বিল্ডিং-এর আড়ালে চলে গেলেন। আমরা দুজনে মজাসে হাতির পীঠে

www.pathagar.com

ঘুরে ঘুরে দারুণ রোমাঞ্চ অনুভব করলাম। কেননা, এই হাতির পীঠেই বহু রাজা-বাদশা এমন কি রানীরাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছেন, ইতিহাস সাক্ষী। পরে যখন আমরা অক্ষত অবস্থায় নেমে এলাম তখনও আমার চাচাজানের অভিমান যায় না। অবশ্য অনেক পরে আমরা জেনেছি হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে ঐ হাতি কিছুলোকের দুর্ভাগ্যের কারণ হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে বহুদিন হাতির পীঠে উঠা চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ বন্ধ রেখেছিল। এত পশু-পাখির খাবার ও লালন পালন বিরাট একটা খরচার ব্যাপার। উপরন্তু বহু কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি ঐ সামান্য টিকিট বিক্রির পয়সায় মোটেই সম্ভব নয়। বর্তমানে অনেক বাঘ ও সিংহকে সর্বক্ষণ খাঁচায় বন্দী না রেখে তাদেরকে বড় বড় আই ল্যান্ডের ভিতর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যার চতুর্দিকে বিশাল গর্ত করে পানি ছেড়ে দেওয়া আছে। অতএব, খোলা চোখে বেশ কাছে থেকেই তাদের ভালমত দেখা যায়। ইউরোপের অনেক চিড়িয়াখানায় আমি এই ব্যবস্থা দেখে এসেছি।

পঞ্চম দিন অর্থাৎ শেষ দিন আমরা কলকাতার বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান যা কেবল বাইরে থেকেই দেখা যায় যেমন চৌরঙ্গীতে যে কোন স্থানে দাঁড়ালে দেখা যাবে দিল্লীর সম্রাট কুতুবুদ্দীন আইবেকের তৈরী বিখ্যাত কুতুব মিনারের আদলে তৈরী ব্রিটিশ রাজের নির্মাণ করা মনুমেন্ট। বহুসিঁড়ি ভেঙ্গে সর্বোচ্চ শিখরে উঠার ব্যবস্থা আছে বটে, তবে আমরা উঠিনি। বিশাল গড়ের মাঠের এক প্রান্তে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে অতন্দ্র প্রহরীর মত। ডান দিকে ট্রাম লাইমের পর রাস্তার ও পাশেই প্রকান্ড লাল রং এর রাইটার্স বিল্ডিং। এ পাশে রয়েছে বিখ্যাত গ্র্যান্ড হোটেল, যার ভিতরটা আমি অন্য একসময় ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এখান থেকেই দেখা যাবে বাম দিকে দূরে বিড়লার তৈরী প্ল্যানে টোরিয়াম যা অনেক পরে তৈরী হয়েছে। আমি ২/১ বার ওখানে প্রবেশ করে মহাকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারার নানাবিধ অবস্থান লক্ষ্য করেছি। এখান থেকেই একটু দূরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল। এরই কাছাকাছি রয়েছে বিখ্যাত রেসকোর্স ময়দান বা ঘোড়দৌড়ের মাঠ। ও পাশে রয়েছে বিখ্যাত ইডেন গার্ডেন ময়দান, তার ডানেই রয়েছে লাট ভবন। খোলা মেলা জায়গা হওয়ায় এতোগুলো দর্শনীয় বস্তু দেখার সুযোগ আছে একমাত্র চৌরঙ্গী থেকেই।

আমার চাচাজান একদিন রাত্রে আমাদের দাওয়াত করে হোটেল আমিনীয়ায় খাওয়ালেন। পরে আমরা জোড়া ঘোড়ার ফিটন গাড়ীতে পার্কসার্কাস বাসায়

www.pathagar.com

ফিরলাম ঘোড়ার পায়ের কপ-কপ কপ-কপ ছন্দময় শব্দ শুনতে শুনতে।

ইতোমধ্যে শিয়ালদহ্ রেল স্টেশনের নিকট প্রাচী হলে তখন চলছিল পাবনার মেয়ে সুচিত্রা সেন ও সৌমিত্র চট্টপ্যাধ্যায়ের বিখ্যাত বই 'সাত পাকে বাঁধা'। যা দেখার লোভ আমরা সংবরণ করতে পারলাম না। উপরন্তু আমার স্ত্রীর দেখা প্রথম জীবনের এটি দ্বিতীয় বই। প্রচুর আনন্দ পেলাম আমরা দুজনে বইটি দেখে। এত ভাল বই আমরা জীবনে এক সঙ্গে খুবকমই দেখেছি। কলকাতা ছেড়ে আসার পথে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্য সৃষ্টি হাওড়ার ব্রিজ দেখালাম আমার স্ত্রীকে। গঙ্গা নদীর উপর এই অত্যাশ্চর্য ব্রিজটি তৈরী করা হয় কলকাতা এবং হাওয়ার মধ্যে একমাত্র সংযোগ পথ হিসাবে। বৃটিশ সরকারের আমলে বৃটিশ ইঞ্জিনিয়ারগণ তাঁদের অপূর্ব স্থাপত্য কৌশলের জন্য এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা নদীর দুই পাড়ে কেবল মাত্র দুটি এবাটমেন্টের উপর সমস্ত ব্রিজটি ধনুকাকৃতির ন্যায় অবস্থিত। প্রায় এক মাইল মত দীর্ঘ এই ব্রিজের নীচে কোথাও কোন পায়ার বা পিলার নেই, অথচ তার উপর দিয়ে অসংখ্য ট্রাম, বাস, ট্রাক, মোটর যান ইত্যাদি বহু টন ওজনের যান বাহনসহ তার নিজের ওজন নিয়ে আজ বহু বছর ধরেই অক্ষত অবস্থায় দঁড়িয়ে আছে। 4 Lane Way ছাড়াও ব্রিজের উভয় দিকে রয়েছে চমৎকার Foot path যা রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখা রয়েছে। আসলে এই নির্মান কৌশলের কারসাজি হল ট্রাস (Truss)। নেকলেসের মত লাগে দূর থেকে দেখতে এই ট্রাস। এই ট্রাসের মাধ্যমে পুরো ব্রিজের Load বা ওজনটা বহু উপরে উঠিয়ে নিয়ে দুই তীরে অবস্থিত দুটি বিশাল মজবুত এবার্টমেন্টের (Abutment) উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয় ৫০-৫০ ভাগে।

ঢাকা পলিটেকনিকে অধ্যাপনা করার সময় Roads and Highways বিষয়টা ছিল আমার অন্যতম প্রিয় Subject সেই সঙ্গে ড্রইং বিষয়টাও আমার খুবই প্রিয় ছিল। ছাত্রদের অনুরোধে এই হাওড়া ব্রিজের পুরো ড্রইং সারা Black Board জুড়ে এঁকে তাদের বুঝাতে হয়েছিল এই স্থাপত্য কৌশলের টেকনিক। ছেলেরা এতে এতই চমৎকৃত হয়েছিল যে, তারা আমার ডিপার্টমেন্টাল হেড জনাব মিজানুর রহমান সাহেবকে গল্প করে শুনিয়েছিল, যে আমি কেমন করে কেবল স্মৃতির পাখায় ভর করে সারা ব্ল্যাকবোর্ড জুড়ে এত সুবৃহৎ ব্রিজের ছবি আঁকতে সক্ষম হয়েছি। এটা হয়ত সম্ভব হয়েছিল এজন্যে যে আমি ছাত্রাবস্থায় সবসময়

www.pathagar.com

ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং-এ সর্ব্বোচ্চ নম্বর অর্জন করতাম বলে। বর্তমানে কলকাতায় অনেক কিছু নূতন প্রকল্প হয়েছে যা দেখার মত। যেমন মাটির নীচে মেট্রো ট্রেন, প্রচুর ফ্লাই ওভার, পার্ক সার্কাসে বিড়লার টেকনিক্যাল মিউজিয়াম, সল্ট লেকের দিকে রয়েছে Science city, Aquativa, Heritace Plaza ইত্যাদি ইত্যাদি। কবির ভাষায়ঃ

হাওড়ার ব্রিজ যেন মস্ত এক বিছে
হ্যারিসন রোড চলে তার পিছে পিছে।

যাহা হউক, আমার স্ত্রীর যেহেতু কোন পাসপোর্ট ছিলনা, বিধায় তাঁকে তাঁর পিত্রালয়ে রেখেই আমি পুনরায় ফিরে এসে মিরপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে কাজে যোগদান করি।

www.pathagar.com

নবম পর্ব

১৯৬২ সালের ডিপ্লোমা ফাইনাল পরীক্ষা ১৯৬৩ সালের হিসাবে ১৯৬৪ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয়। যদিও তখন আমাদের হাতের কাছে পর্যাপ্ত বই পুস্তক ইত্যাদি তেমন ছিলনা। তবুও যেহেতু পরীক্ষা দিতেই হবে বলে আমাদের ঢাকায় থাকা। তাই পরীক্ষার জন্য সাধ্যমত আমরা চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার বন্ধু সানাউল্লাহ্ মিয়া ও আমি উভয়েই কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে ঢাকা পলিটেকনিক হোস্টেল বিল্ডিং এ এসে উঠি। পরীক্ষার সময় আমার রুমমেট ছিলেন আমার প্রাক্তন রুমমেট আব্দুল মান্নান।

প্রতিদিন পরীক্ষার পর আমি আসরের নামাজের শেষে হোস্টেল গেটে এসে দাঁড়াই এবং দেখি আমার কিছু কিছু বন্ধু তাদের পরীক্ষা খারাপ হওয়ার দরুন তারা হোস্টেল ত্যাগ করে মালপত্রসহ চলে যেতে উদ্দত হয়েছে। আমি শক্ত প্রহরীর মত তাদের পথরোধ করেছি এবং বুঝিয়েছি এই বলে যে পরীক্ষার পাশের দায়িত্ব আমি নিলাম। আমাদের পুরোন ব্যাচের অনেকেরই পরীক্ষা ভাল হচ্ছে না। তা আমি বিলক্ষণ জানি। কেননা, আমাদের স্থাপত্য কৌশল বিভাগের ছেলেদের বিশেষতঃ খারাপ হওয়ার কথা আমি ইতোপূর্বে ব্যক্ত করেছি। আমার দায়িত্বের কথা মনে রেখেই প্রতিটি পরীক্ষা শেষে আমি সোজা অধ্যক্ষ জনাব রশিদ সাহেবের চেম্বারে গিয়ে তাঁকে জানাই আমাদের অবস্থা তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে যথেষ্ঠ স্নেহ করতেন বলেই বোধ করি আমাকে যথেষ্ট শান্তভাবে আশ্বাস দিয়ে বলতেন, তোমাদের ফলাফলের ব্যাপারটা আমি দেখব, আমার উপর তুমি ভরসা রাখ। কিন্তু তুমি লক্ষ্য রাখবে যেন তোমার কোন বন্ধু পরীক্ষা ত্যাগ না করে। এভাবেই আমাদের পুরো পরীক্ষাটা পার করতে হয়েছে। ড্রইং পরীক্ষা ছিল সম্ভবত শেষ দিন। সেদিনই ভারত থেকে আমার স্ত্রীর পত্র পেয়েছি অথচ সেটা পড়ার পর্যন্ত অবকাশ পাইনি। পরীক্ষা শুরু হওয়ার একটু পূর্বে জানালার ধারে এক ফাঁকে চোখ বুলিয়েছি মাত্র।

১৯৬৪ সালে ঢাকায় সামান্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয় ঠিক ঐ সময়ে। গভর্নর

www.pathagar.com

মোনায়েম খানের তখন জয় জয়কার অবস্থা। এ হেন অবস্থার মধ্যেই পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঢাকায় থাকতে বাধ্য হলাম। অধ্যক্ষ রশিদ সাহেব আমাকে একদিন বলেই বসলেন তোমার বন্ধুর চাকুরী ক্ষেত্রে একদিনের সিনিয়রিটি যে তোমার জন্যে কত মারাত্মক হতে পারে তা পরে টের পাবে। যা হোক, এভাবেই আমাদের পরীক্ষা শেষে আমরা পুনরায় আমাদের কার্যস্থলে যোগদান করি।

মিরপুর টেকনিক্যাল টেনিং সেন্টারে থাকাকালীন আমাদের পরীক্ষার ফলাফল বের হয়। এতে স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের পুরানো ব্যাচের চেয়ে নূতন ব্যাচের ফল অপেক্ষাকৃত ভাল হয়। কিন্তু তবুও আমার বন্ধুরা যথেষ্ট পরিশ্রমের মাধ্যমে এবং অধ্যক্ষ রশিদ সাহেবের আমাকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির ফলে আমার বন্ধুদের ফলাফল মোটামুটি ভালই ছিল।

অধ্যক্ষ মিঃ বিবি সেন হঠাৎ করে একটা Continental Tour এর সুযোগ পান এবং তিনি চলে যাবার পূর্বে উপাধ্যক্ষ জনাব মৃধাকে আমার সম্মুখেই বলে যান যেন আমাকে একটা প্রমোশন দেয়া হয়। কিন্তু উপাধ্যক্ষ সাহেব সেটা করতে পারেন নি বা করেন নি। মিরপুর টেকনিক্যালে থাকতে থাকতেই হঠাৎ করে আমেরিকা থেকে ঢাকায় একটা টিম আসে 'SIRCARAMA' নামে একটা বিশেষ ধরনের চলচ্চিত্র দেখাতে। যেটা ঢাকার আউটার স্টেডিয়ামে দেখানোর পূর্বে বিশাল DOME আকৃতির অডিটোরিয়াম তৈরী করতে তাদের দীর্ঘদিন সময় লেগেছিল। মাত্র সাতশত (৭০০) লোককে একসঙ্গে এটা দেখান সম্ভব। কেননা ভিতরটা সম্পুর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল এবং বসার জন্য কোন সিট ছিল না। সকল দর্শককেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ১১টি স্ক্রীনের উপর 4-Dimension ছবি দেখার সুযোগ ছিল। ৪,৫০০ মাইল পথ প্রসান্ত মহাসাগরের তীরবর্তী পোর্ট সানফ্রান্সিসকো থেকে আমেরিকার পশ্চিমপ্রান্তে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরবর্তী অবস্থিত নিউইয়র্ক পোর্ট সিটি পর্যন্ত দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে যা যা দেখা সম্ভব প্রায় সমস্তই দেখানো হয়েছে অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে মাত্র ২২ মিনিটে। এবং যখন যে ধরনের যানবাহন দরকার তখন সে ধরনেরই যানবাহন ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন কখনও জল জাহাজ, কখনও হেলিকপ্টার, কখনও উড়োজাহাজ কখনও বা জীপ, আবার কখনও বা পদব্রজে অর্থাৎ যখন যে অবস্থায় ১১টি অত্যন্ত দামী মুভি ক্যামেরা ও ১১ জন ক্যামেরাম্যান একসঙ্গে ঐ ক্যামেরা গুলি চালু রেখে ছবি তুলতে তুলতে

www.pathagar.com

অগ্রসর হয়েছেন একই সময়ে ফলে, চর্তুদিকের কোন দৃশ্যই বাদ পড়েনি। অর্থাৎ একজন লোকের পক্ষে রাস্তায় চলতে চলতে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে যেমন ইচ্ছামত দেখা সম্ভব তা সবই সারকারামার মাধ্যমে দেখানো সম্ভব হয়েছে একই সময়ে। আর এজন্যেই এই ভ্রমন দৃশ্যের নাম দেওয়া হয়েছে Sircarama-A Tour of America."

ফটোগ্রাফিক সাম্রাজ্যে এটা যে তখনকার দিনে একটা অতি বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর এ কারণেই আমেরিকা তার প্রবল প্রতিদ্বন্দি রাশিয়াকে এটা চমক দেওয়ার মানষে প্রথমেই রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে এটার প্রদর্শনী সম্পন্ন করে সম্ভবত ১৯৫৬ সালে। এরপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বড় বড় শহরগুলিতে এই প্রদর্শনী চলতে থাকে। সৌভাগ্যক্রমে আমি ১৯৫৮ সালে কলকাতায় প্রথম এটা দেখি। সে সময় এটা সেখানে দীর্ঘদিন প্রদর্শিত হয়। ফলে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু দর্শক এটা দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ঢাকায় ১৯৬৪ সালে যখন এটা দেখানো শুরু হয়, তখন আমরা মিরপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারের বিদেশী বিশেষজ্ঞের সৌজন্যে আমরা প্রথম দিকেই এটা দেখার সুযোগ পাই। অত্যন্ত দূর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ আমিরিকার তৎকালীন স্বনামধন্য প্রেসিডেন্ট মিঃ জন, এফ, কেনেডিকে ডালাসে হত্যার পর-পরই এটা বন্ধ করে দিয়ে প্রদর্শনকারীবৃন্দ এদেশ ত্যাগ করেন। ফলে এদেশের লক্ষকোটি মানুষ এই অভূতপূর্ব দৃশ্য যা 'সারকারামার' মাধ্যমে আমেরিকা ভ্রমণ করা থেকে বঞ্চিত হন। এটা নিঃসন্দেহে একটা বিরাট সুযোগ হাতছাড়া হওয়া ব্যাতীত আর কী বলা যায়?

মাত্র কয়েক মাস আমি মিরপুর টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে শিক্ষকতা করেছি। আকর্ষণ ছিল যে আমাদের শিক্ষকদের এক একটা ব্যাচ সময় মত হাউয়াই দ্বীপপুঞ্জে যাবে এবং শিক্ষামূলক ও বিনোদনের মত আনন্দের কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে কয়েক মাস পর দেশে ফিরবে। অবশ্য ইতোপুর্বে এ ধরনের হাউয়াই ফেরত বেশ কিছু শিক্ষক আমাদের মাঝে কাজ করছিলেন যেমন গোলাম রসুল সাহেব, আফতাব সাহেব, সালমান সাহেব ইত্যাদি প্রায় ডজন খানেক শিক্ষক ছিলেন কর্মরত। তাঁদের বাচনিক তাঁদের অভিজ্ঞতা শুনেও বেশ ভাল লাগত। উপরন্তু আমার দেশ ভ্রমনের আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত প্রবল ছিল।

বিদেশী বিশেষজ্ঞের টিমলীডার মিঃ আ, চংজেন, যার পিতা ছিলেন আমেরিকান

www.pathagar.com

এবং মাতা ছিলেন চীনা মহিলা, উপরন্তু জেন সাহেব সুদীর্ঘ ১৬ বছর আমেরিকান আর্মিতে ছিলেন। বেশ শক্ত সামর্থ মানুষ তখন তাঁর বয়স ছিল ৫৫ বছর। সব সময় অত্যন্ত দ্রুত চলাচল করতে অভ্যস্ত। এ হেন মানুষটির কাছে আমি ও বন্ধুবর সানাউল্লাহ মিয়া হঠাৎ একদিন তাঁর চেম্বারে উপস্থিত হয়ে বললাম স্যার আমরা দুজনই কোয়ালিফায়েড ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার অথচ এখানে আমাদের বেতন যা দেওয়া হয় তা আমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়; বরং অন্যান্য নন-ডিপ্লোমা শিক্ষককেও ঐ একই বেতন দেওয়া হয়। অতএব, আমাদেরকে এখানে রাখতে চাইলে অবশ্যই সকল শিক্ষকদের জন্যেই একটা মানসম্মত পে-স্কেল দিতে হবে। তিনি শুনে বলেন আপনাদের বেতন স্কেলের ব্যাপারে আমাদের করার কিছুই নেই। বরং এটা আপনাদের সরকারের ব্যাপার। এ পর্যন্ত কথা হওয়ার পর আমরা উঠে আসি। সকল শিক্ষককেই পোষাক পরিচ্ছদে বেশ ছিমছাম থাকতে হতো। আমি সাধারণতঃ সুটিং পরতে পছন্দ করতাম। সেটা ইংরেজি অথবা ইসলামী যাই হোক না কেন। শীতের সময় বিধায় ঐ দুই ধরনের সুটিং ছাড়া আমি অন্য কোন পোষক পরতাম না। কিন্তু জেন সাহেবকে লক্ষ্য করতাম তিনি যেন আমার চুড়িদার পায়জামা, কাল শেরওয়ানী, পায়ে নাগরা বা সেলিম শাহী জুতা এবং মাথায় কালো রামপুরী ক্যাপ অবস্থায় যখন দেখতেন যে আমি কোন মেশিন শপে কাজ করছি তখন বেশ বিরক্ত বোধ করতেন। অথচ সুট-টাই পরা অবস্থায় দেখলে সে রকম করতেন না।

প্রতি মাসে একদিন সকল শিক্ষকদের নিয়ে বসতেন জেন সাহেব টিচার্স কাউন্সিল। সুবিধা অসুবিধার কথা, সার্বিক শিক্ষা প্রণালীর অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোচনা চলত। এ রকম এক দিনের আলোচনায় হঠাৎ করে আমাকে জেন সাহেব প্রশ্ন করেনঃ How much you are getting Mr. Chowdhury? আমি বলি। Rupees 200 per month. তিনি তখন আমাকে বলেন ঃ Well Mr. Chowdhury I will pay Rs 400, but I will ask you to dig earth from the field infront of this institute Biulding, will you do it? আমি বলি। No, never তিনি আমাকে আবার প্রশ্ন করেন Mr. Chowdhury who clean your room ? আমি বলিঃ Sweeper, he comes in time to clean it, তিনি বলেনঃ So, you don't clean it, But do you know I perform my each & every job every day. I have billt my own

www.pathagar.com

house in America with my son. I know how to plough the land, how tc rowing, sowing and harrowing the soil etc, etc, আমি উত্তরে বলি Sir, definitely you have been trained in certain field of technology and I think that is your specific job: as I have been trained in the subject of Diploma in Civil Engineering and that is my specific job. আমি কথাগুলি বেশ উত্তেজিত অবস্থায় বলতে থাকি এবং আমার সহকর্মী শিক্ষকবৃন্দ প্রায় সকলেই আমাকে সমর্থন করেন আমার যুক্তিভিত্তিক কথার পক্ষে। জেন সাহেব তখন বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়েছেন শিক্ষকদের সমর্থন না পেয়ে। এমন সময় হঠাৎ করে মিঃ হুপম্যান ঐ সময় বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে মিঃ জেন দ্রুত গিয়ে ডেকে নিয়ে আসেন তাঁকে এবং বলেন আমাদের কথপকথনের সারাংশ। মিঃ হুপম্যান শুনার পর আমাকে লক্ষ্য করে বলেনঃ Yes, he is correct, Come on let us go now বলেই জেন সাহেবকে টেনে নিয়ে চলে গেলেন।

আমি বুঝতে পারলাম, এইখানে আর আমার থাকার কোন প্রয়োজন নেই। অতএব, আমি কর্তপক্ষকে জানিয়ে দিলাম। মিরপুর মেডিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারটি ছিল শ্রম বিভাগের অধিনে Labour Directorate, অতএব, Man power থেকে ইনটারভিউয়ের পরই আমাকে সরকারীভাবে নিয়োগ পত্র প্রদান করা হয়। সুতরাং চাকরী থেকে ইস্তফা দেওয়ার পূর্বেই তাঁদের জানিয়ে দেওয়া উচিৎ বলে মনে করি। ছাত্র-শিক্ষক সকলেই পৃথক পৃথকভাবে আমাকে বিদায় সম্ভাষণ বা fare-well মিটিং এ অনেক ভাল ভাল কথা আমাকে শুনালেন। ছেলেরা বাংলা ও উর্দূতে মান পত্র প্রদান করে তাঁদের প্রাণের আকুতি জানাতে কোন ক্রটি করলনা। তারা নিজেরা কাঁদলো আমাকেও কাঁদালো এবং আমি তখনই বুঝলাম পেশা হিসাবে একমাত্র শিক্ষকতাই আমার বাকী জীবনের সীমারেখা। অতএব, কাল বিলম্ব না করে আমি সোজা ডাইরেক্টোরেট অফ টেকনিক্যাল এডুকেশনে (ডি,টি,ই) গিয়ে এসিসটেন্ট ডিরেক্টর জনাব এম, এ, কুদ্দুস সাহেবের নিকট দেখা করি। তিনি ছিলেন একসময় আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষক এবং বিভাগীয় প্রধান। আমি তাঁকে কিছু বলতেই, সঙ্গে সঙ্গে বলেন কোথায় যেতে চাও? আমি বলি, স্যার পাবনায় আমার পিতা মাতা আছেন সুতরাং সেখানে হলেই ভাল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একটা নিয়োগ পত্র বের

www.pathagar.com

করেন যাতে অন্য কোন একজন শিক্ষকের নাম লিখা ছিল। আমি স্যারকে বলি, স্যার আমি তাহলে Proper channel-এ আসি। তিনি আমাকে এতই স্নেহ করতেন যে, বললেন কোন প্রয়োজন নেই। বলেই ঐ শিক্ষকের নামটি একটান দিয়ে কেটে দিয়ে সেখানে আমার নামটি নিজের হাতে লিখে দেন এবং আমাকে বলেনঃ পরশু দিন পাবনায় কাজে যোগদান কর। আমি তাঁকে সালাম করে নিয়োগ পত্রটি সঙ্গে নিয়ে সোজা মিরপুর ট্রেনিং সেন্টারে ছাত্র শিক্ষকদের প্রবল বাধার মুখেও পদত্যাগ পত্র জমা দিই। তখন ঢাকা ঈশ্বরদী এয়ার বাস সম্প্রতি চালু হয়েছিল। আমি পরদিনই এয়ারবাসে ঈশ্বরদী হয়ে পাবনা। অর্থাৎ ১১ মে ১৯৬৪ সালে পদত্যাগপত্র পেশ এবং ১৩ মে ১৯৬৪ সালে পাবনা পলিটেকনিকে জুনিয়র ইনষ্টাক্টর (সিভিল) হিসাবে যোগদান করি। বন্ধু সানাউল্লাহ মিয়াও অন্যত্র যোগদান করেন।

ইতোমধ্যে এক ফাঁকে ভারতে গিয়ে আমার স্ত্রীকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আসার ব্যাপারে কন্যাপক্ষ কী ব্যবস্থা নিয়েছেন জানতে গিয়ে জানলাম কোন ব্যবস্থায়ই নেওয়া হয়নি। বরং তাঁরা সকলে নিশ্চিন্তে আমার উপর ভরসা করে হাল ছেড়ে দিয়েছেন। অথচ বছর ঘুরে নূতন বছর শুরু হয়েছে। নিদেন পক্ষে তাঁরা একটা ভারতীয় পাসপোর্ট অন্ততঃ করে রাখতে পারতেন, তাও করেন নি। আমার পিতৃপ্রতীম শ্রদ্ধেয় শশুর সাহেব তথা আমার বড় ফুপা অসুস্থ এবং যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ। অতএব তাঁর কথা বাদ দিলেও তাঁর দুই পুত্র সন্তানদের দ্বারাও সে কাজ সম্ভব হয়নি বা তাঁরা এটি আদৌ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে হয়ত মনে করেন নি। যা হোক, আমি সেখানে অল্প সময়ের জন্য গিয়ে আর পাসপোর্টের ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে আমার স্ত্রীকে সোজা কলকাতায় নিয়ে আসি। কলকাতায় পাকিস্তান এমব্যাসিতে তখন কর্মরত ছিলেন আমার ২/১ জন নিকট আত্মীয়। তাঁদের সুযোগ্য পরামর্শে Repatriation Certificate এর মাধ্যমে আমার স্ত্রীকে পাকিস্তানে আনা যেতে পারে বলে আমাকে জানান। তবে, এ কাজটিও খুব সোজা নয়। কেননা, কলকাতায় অবস্থিত অন্য কোন উর্দ্ধতন পাকিস্তানী কর্মকর্তা যদি দয়া করে আমাকে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে একটা Certificate দেন তবেই এটা সম্ভব হতে পারে। সৌভাগ্যক্রমে সে সময় কলকাতায় সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার তথা প্রধান ব্যক্তি ছিলেন আমারই এক দাদাজান জনাব সৈয়দ মঞ্জুর কাদের সাহেব। তিনি প্রথম দিকে ঢাকায় থাকা কালীন অবস্থায় আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন এমনকি তাঁর পুরো পরিবারের নিকট

www.pathagar.com

আমি ছিলাম বিশেষ আদরনীয় ব্যক্তি। অতি সম্প্রতি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী জনাবা আমেনা খাতুন ছিলেন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষামন্ত্রী খানবাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেনের জ্যেষ্ঠা কন্যা আমাদের সকলকে শোক সাগরে ভাসিয়ে জান্নাতবাসী হয়েছেন। দোয়া করি, মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর পবিত্র রুহের প্রতি রাজি থাকুন! আমীন!!

প্রকৃতপক্ষে এই দাদাজানের Certificate এর জোরেই পাকিস্তান এমব্যাসী থেকে Repatriation Certificate যোগাড় করা এই অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব হয়। আমার এই দাদাজানের বর্তমান বয়স আশি উর্ধ্ব। মহান আল্লাহ্ পাক তাঁকে আরো দীর্ঘ ও সুস্থ্ জীবন দান করুন! আমিন!!

পাবনা পলিটেকনিকে তখন টিচিং স্টাফদের জন্য নূতন কোয়ার্টার তৈরী হচ্ছিল। আমার পিতা মাতা পাবনা দিলালপুরে যে বাসায় থাকতেন, সেটা ছিল আমাদের জন্য বড়ই অপ্রতুল। অতএব, আমি ঢাকা থেকে ফিরেই কাজে জয়েন করে মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই সবার আগে একটি অসমাপ্ত বাসায় উঠতে বাধ্য হই। তখন সেখানে অধ্যক্ষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় বাবু রমানন্দ মল্লিক। যিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র, অসাম্প্রদায়িক যার ফলশ্রুতিতে তিনি টেকনিক্যাল ডাইরেকটোরেটের সর্বোচ্চ পদের অর্থাৎ ডাইরেক্টর জেনারেল (ডিজি) হিসাবে সুনামের সঙ্গে দীর্ঘদিন কর্মরত থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি আমার প্রাক্তন শিক্ষক এবং কর্মকর্তা হিসাবে সব সময় আমার কাজের প্রতি সুপ্রশংসনীয় দৃষ্টি রাখতেন। পাবনা পলিটেকনিকে প্রথম দিন প্রথম ক্লাসে তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে ছাত্রদের সম্মুখে পরিচয় পর্বে আমার সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতায় যে ভূয়সী প্রশংসা করেন, তাতে আমি নিজেই নিজের নিকট কিছুটা ছোট হয়ে যাই।

ডিপ্লোমা-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশন করার বহু পূর্বেই আমি শিক্ষা প্রণালী, শিক্ষা পদ্ধতি, Teaching Technic ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রখ্যাত লেখকদের বই পড়ার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। যেমন হয়েছিল প্রফেসর ডেল কার্নেগীর লিখিত বিশ্ববিখ্যাত বইগুলি পড়ার সুযোগ। যথা How to win friends and Influence people, How to stop Worring and start Living, Personality, How to Influence people by public speaking ইত্যাদি। ঢাকা পলিটেকনিকে ছাত্র অবস্থায় পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল একটি বিখ্যাত বৃহৎ

www.pathagar.com

বই How to carry on conversation by Dr. Stuart Nutley বলা বাহুল্য, এই লেখকের লেখা অন্য কোন বই আমি ঢাকায় কোথাও খুঁজে পাইনি বহু চেষ্টা সত্বেও। মোট কথা শিক্ষক, শিক্ষকতা ও প্রশিক্ষণের উপর যতখানি সম্ভব আমি পড়ার কোন কসুর করিনি অর্থাৎ যাকে বলে অনেকটা Untiring efforts of study'র ব্যাপারে হয়ত আমি ছিলাম একটু অক্লান্ত। কোন ভাল বই তা যত বৃহৎ-ই হোক না কেন তা পড়তে আমি কখনও কোন অসুবিধা বোধ করিনি। আমার পরিবারের অনেক সদস্যই আমাকে পড়ার ব্যাপারে নানা রকম সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, ফলে আমি তাঁদের নিকট চির কৃতজ্ঞ।

পাবনা পলিটেকনিকে ১৯৬৪ সাল থেকে ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি ছিলাম জুনিয়র ইনস্ট্রাকটর হিসাবে। এ সময় নূতন ক্লাসে পাঠ শুরু করার পূর্বে ২/৪ দিন নূতন ছাত্রদের সঙ্গে আমাদের পরিচিতি পর্ব শেষ করতেই সময় চলে যেত। ছাত্রদের কেবল সিলেবাস শেষ করার মধ্যেই আমার শিক্ষকতাকে মোটেই সীমাবদ্ধ রাখিনি। বরং তাদের সঙ্গে মিশে তাদের প্রত্যেকের মন মানসিকতার উপর পুরো জরিপ চালিয়ে কাকে কিভাবে কোনদিকে গড়ে তুলতে হবে, এব্যাপারে আমি অত্যন্ত সচেতন ছিলাম। তাদের সঙ্গে যেমন পিকনিক পাটিতে গেছি, রান্না করেছি আবার শিক্ষামূলক Study tour ও করেছি প্রচুর। আমার পরম শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন শিক্ষক প্রিন্সিপ্যাল মহম্মদ শাহ জাহান সাহেবের ইচ্ছায় তৃতীয় বর্ষের মাত্র ২০ জন বাছা বাছা সিনিয়র ছাত্র দলকে সঙ্গে নিয়ে আমি এবং বন্ধু শামসুদ্দিন শেখ সাহেব ১৯৬৬ সালে পুরো পূর্ব বাংলা শিক্ষামুলক ভ্রমন করেছি প্রায় মাস খানেক। শামসুদ্দিন সাহেব ছিলেন শক্তি বিভাগের প্রধান ও আমি স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক হিসাবে ঐ দুই বিভাগেরই ছাত্র নিয়ে একটা ছোট দল গঠন করা হয়েছিল দীর্ঘ ভ্রমনের সুবিধার্থে। সিরাজগঞ্জে যমুনা নদী পার হয়ে ট্রেনে সোজা চট্টগ্রাম রেল স্টেশনের নিকটে দুপুরের খাওয়া হোটেলে সেরে নাসিরাবাদে চট্টগ্রাম পলিটেকনিকে উপস্থিত হই। তখন সেখানে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ড. নজরুল ইসলাম। তিনি আমাদের দল দেখে বেশ খুশী হয়েছেন বুঝা গেল। অবশ্য পূর্বেই তাঁকে জানান হয়েছিল আমাদের দলের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। তিনি দয়া করে তাঁর পলিটেকনিকের ছোট্ট Pick-up গাড়ীটা দেন কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি ইত্যাদি পরি ভ্রমনের জন্য। পিছনে খোলা স্থানে ছেলেরা বেঞ্চের উপর আরাম করে বসে আমরা দুই শিক্ষক চালকের পাশে বসি।

www.pathagar.com

চালক সামসু অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দুর্গম পাহাড়ী পথে আমাদের বিভিন্ন স্থানে নিয়ে যায়। প্রথমেই আমরা চলে যাই কাপ্তাই-এর HydroElectric project দেখার জন্যে। সেখানে মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের নিকট ছিল যথেষ্ট আকর্ষণীয় বিষয়। কাঠের কাজ শিক্ষার জন্য সেখানে তখন ছিল পাক-সুইডিস টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট, সেটি অনেক পরে পলিটেকনিকে রূপান্তরিত হয়েছে। সেখানে থেকে সোজা চলে যাই রাঙ্গামাটি রাতে আমরা রাঙ্গামাটির রেস্ট হাউসে অবস্থান করি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদনক্রমে, তখন কিন্তু অনেক রাত। পরের দিন ভোরে হোটেলে প্রাতঃরাশ সেরে সোজা চট্টগ্রাম পার হয়ে একেবারে কক্সবাজার সাগর সৈকতে। পাহাড়ের প্রতি মানুষের একটা আকর্ষণ আছে জানতাম, যার জন্যে অনেক মানুষ বার বার পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একেবারে চূড়া পর্যন্ত না উঠে থামতে চায় না। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! যখন দেখলাম সাগরে নেমে আমাদের ছেলেরা ও আমরা সব একাকার হয়ে গেলাম অনতিবিলম্বে। নিমাই চন্দ্র দে ছিল অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের, তৃতীয় বর্ষের শক্তি বিভাগের ছাত্র। কিন্তু সাগরে নেমে সে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বদলে গেল যা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। বুঝলাম, সাগরের আবেদন, সাগরের ডাক আরো অনেক প্রবল। যার ফলে পৃথিবীর সমস্ত সৈকতগুলি মানুষের ভীড়ে যেন হারিয়ে গেছে। কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত বিশ্বের দীর্ঘতম নিরাপদ সৈকত হিসাবে সুপরিচিত। ভারতের একমাত্র গোয়া ছাড়া আর সমস্ত সৈকতগুলি আমি ঘুরে এসেছি কিন্তু কেন জানিনা কক্সবাজার সাগর সৈকত আমার কাছে অনেক বেশী আকর্ষণীয় মনে হয়েছে; ফলে ৮০ দশকে আমি সপরিবারে পুনরায় সেখানে গেছি ২/৩ দিনের জন্যে।

যাহোক, ফেরার পথে কক্সবাজার থেকে মাত্র ১২ মাইল ভিতরে রামুতে বৌদ্ধ প্যাগোডা ও অনেক মূল্যবান পিতল-কাঁসার বৌদ্ধমূর্তি ও তৈজস পত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছি পর্যটকের দৃষ্টিতে। এভাবে প্রায় পুরো দু'দিন ভ্রমনের পর যখন চট্টগ্রাম শহরে একটা লেবেল ক্রসিং এর সম্মুখে এসে ড্রাইভার সামসু গাড়ী থামাতে বাধ্য হল, তখন দেখলাম পিছন থেকে একজন ট্রাক ড্রাইভার এসে তাকে চট্টগ্রামের দুর্বোধ্য ভাষায় বেশ কিছুক্ষণ কথা শুনাল। কিন্তু সামসু একটা কথাও বলল না বা তার দিকে ঘুরে তাকালোও না। আমি বড় বিস্ময় বোধ করছিলাম ব্যাপারটা দেখে। পরে যখন গাড়ী ছাড়ল তখন আমি সামসুর কাছে জানতে চাইলাম কী ব্যাপার?

www.pathagar.com

সামসু বলল স্যার, আমি তাকে যেহেতু একটু আগে এক মোড়ে ওভারটেক করে এসেছি, তাই সে বললঃ তুমি কাজটা ভাল করনি। আমি যদি আমার ট্রাকটা একটু বাঁকিয়ে নিতাম তাহলে তোমার পিছনে বসা অতগুলি মানুষের কী হত বল? কেউ বাঁচত না। ইত্যাদি কথা অত্যন্ত ধীর ধীরে উপদেশের সুরে তাকে শুনিয়ে ছিল ঐ ড্রাইভার। সামসু তার নিজের ভুল বুঝতে পেরে একটা কথাও বলেনি। চট্টগ্রামের ভাষা যে আমাদের জন্যে কত দুর্বোধ্য হতে পারে তা সেই প্রথম দেখলাম। এদিকে আমরা এসে পালিটেকনিকে পৌঁছালাম প্রায় সন্ধ্যার একটু পরে।

পরের দিন সকালে আফিসে গিয়ে আমরা অর্থাৎ আমি ও শামসুদ্দীন শেখ সাহেব একটু বেশ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়লাম সেখানকার শিক্ষক সমাজের নিকট। কেননা, তাঁরা আমাদের কোন খোঁজ খবর না পেয়ে অতিমাত্রায় দুশ্চিন্তায় ছিলেন। আমাদের উচিৎ ছিল একটা সংবাদ অন্ততঃ তাঁদেরকে দেওয়া। যাহোক, প্রিন্সিপ্যাল ড. নজরুল ইসলাম সাহেব তাঁর ধীর স্থির ও বিনয়ী স্বভাবের বদৌলতে বিশেষতঃ শামসুদ্দীন শেখ সাহেব কোন মতে রক্ষা পেলেন। চট্টগ্রামের দর্শনীয় স্থান বলতে নিকটেই ছিল হযরত শাহ বায়জীদ বোস্তামীর মাযার ও তৎসংলগ্ন বিশাল পুস্করিনী ও মসজিদ। মাযারটি অনেক উচু একটি টিলার উপর অবস্থিত। মসজিদের নিকট পুকুরে ছিল প্রচুর বড় বড় কাছিম। তাদেরকে অনেকে খাবার খেতে দিলে তারা নিকটে এসে নানান রকমের খাবার খায়, যা দেখতে অনেকটা দৃষ্টি নন্দন যোগ্য বটে। তাদের বয়স নাকি শুনা যায় বহু বছর যা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য এতই বেশী ছিল যে, গভর্নর লেঃ জেঃ আজম খান সাহেব তাকে কুইন-অব-ইস্টপাকিস্তান নামে অভিহিত করতেন। বিশেষতঃ চট্টগ্রামের পুরো এলাকা বা টোপোগ্রাফি ছিল পাহাড়ী অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত, ফলে অনেক রাস্তা উচু-নীচু হয়ে এঁকে বেঁকে অগ্রসর হয়েছে। চট্টগ্রামের ফয়েজ লেক পলিটেকনিক থেকে একটু দূরে। বিখ্যাত বাটালী হিল ও অন্যান্য ছোট খাট পাহাড় সব মিলিয়ে একটা নৈসর্গিক দৃশ্য বিরাজমান। পলিটেকনিকের অবস্থানও বেশ কটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে। ইদানিং শুনা যায় ইটভাটা ওয়ালাদের অত্যাচারে অনেক পাহাড় নাকি বিলুপ্ত হতে বসেছে। চট্টগ্রামের ডকইয়ার্ড ছিল আমাদের জন্য একটা প্রধান আকর্ষণ। অনেক বিদেশী বড় বড় জাহাজ একেবারে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে সেই প্রথম। সবচেয়ে বড় কথা, চট্টগ্রামের মনোরম আবহাওয়ায় আমাদের

www.pathagar.com

মন-মগজের অবস্থা ছিল অত্যন্ত পুলকিত। ২/৪ দিন অবস্থানের পর সদলবলে চট্টগ্রাম ত্যাগ করি ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা দেখার উদ্দেশ্যে। অবশ্য আমাদের যাত্রার পূর্বে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক থেকে আমাদের বিদায় ভোজের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

নব নির্মিত সার কারখানা ঘুরে ঘুরে দেখালেন আমাদের সেখানকার কর্তৃপক্ষ। তাঁদের সদয় ব্যবহারে আমরা বেশ মুগ্ধ হয়েছি।

এরপর আমাদের যাত্রা সোজা সিলেট শহরে তথা শ্রীহট্ট। পূর্বেই আমাদের Tour programme তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী সাহেবকে জানান হয়েছিল। চমৎকার চেহারার অধিকারী ব্যক্তিই শুধু নন, তিনি অত্যন্ত ভদ্র ও দারুণ আমুদে প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বলে আমাদের যথেষ্ট আনন্দ দান করেছেন। সিলেটে সুরমা নদীর এপারে পলিটেকনিক ওপারে হযরত শাহ জালাল (রহঃ) বাবার বিখ্যাত মাযার ও মসজিদ। আমরা পবিত্র এক জুম্মার নামাজ সেখানে আদায় করার সৌভাগ্য লাভ করি। মাযার ও মসজিদ সংলগ্ন বিশাল এলাকা জুড়ে বংশপরম্পরায় খাদেম সাহেবদের বসবাস। শাহ জালাল বাবার সুপ্রিয় জালালী কবুতরের প্রাদুর্ভাব প্রচুর। সিলেটে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে সেখানকার বাড়ীঘরের ছাদের পরিবর্তে ট্রাস ফ্রেমের উপর C.I. Sheet এর ছাউনি, যার উপর Red Oxide Paint করা আছে। চা-বাগানের জন্য বিখ্যাত সিলেটে আছে বেশ কয়েকটি দৃষ্টি নন্দন Tea gerden যেমনঃ লাক্কাতুরা, মালনিছড়া ইত্যাদি আরোও অনেক চা-বাগান আছে শ্রীমঙ্গলে। শহরটিকে আমাদের খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে মনে হয়নি। সিলেটের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনতা, ব্যবসা ও বাণিজ্য উপলক্ষে লন্ডনের প্রবাসী হিসাবে যুগ যুগ ধরে সেখানে বসবাস করেন বলেও হয়ত সিলেটের প্রতি তাঁদের আগ্রহ কম থাকায় শহরের অবস্থার এই রূপ, লোকসংখ্যা প্রচুর।

এরপর আমরা ছাতকের সিমেন্ট ফ্যাক্টরী দেখার জন্য যেদিন সকালে ছাতক পৌছালাম। সেদিনই সেখানে দীর্ঘ ৭ দিন পর সূর্যদ্বয়ের আবির্ভাব। তাই আমাদের এক ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু সেখানে রেসিডেন্ট ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে ছিলেন। যিনি ইতোপূর্বে পাবনা ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলে ডিষ্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে বেশ কিছুদিন কাজ করেছিলেন এবং প্রতিদিন বিকেলে পাবনা পলিটেকনিকে টেনিস গ্রাসকোর্টে আমাদের সঙ্গে টেনিস খেলতে আসতেন। এ মুহূর্তে ভদ্রলোকের নাম মনে না পড়ায় আমি দুঃখিত।

www.pathagar.com

তিনি আমাদের দেখে যারপর নেই আনন্দিত আমাদের সেই দিনের রৌদ্দ উজ্জ্বল সোনালী প্রভাতে সুস্বাগতম জানালেন প্রাণ ভরে। আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পেরে সব ব্যবস্থাই করলেন এবং বললেন নদীর ওপারে স্পীড বোটে করে আপনারা ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরী দেখে আমার এখানে আপনারা দুজন শিক্ষক দুপুরে লাঞ্চ সেরে তারপর যাবেন। ছাত্রদের জন্য ওপারেই প্রচুর ভাল ও সস্তা হোটেল রয়েছে। ওদের ওখানে বসিয়ে দিয়েই আপনারা চলে আসবেন। আমরা তাঁর কথামত কাজ করলাম। ছেলেরা মাত্র ১ টাকার মধ্যেই একটা আস্ত মুরগিসহ টেনে প্রাণ ভরে খাবার খেয়ে দারুণ খুশী। এদিকে আমরা তাঁর বাসায় যখন খেতে শুরু করেছি তখন হঠাৎ করে একট শাটল ট্রেন ছাতক রেল স্টেশনে হাজির, আর ঐ ট্রেনেই আমাদের সিলেট যাওয়ার কথা। যেটা আমাদেরকে সিলেটে সুরমা মেল ধরাবে। আমাদের ব্যস্ততা লক্ষ্য করে ইঞ্জিনিয়ার দম্পতি জানালেন আপনাদের তাড়হুড়া করার কোন প্রয়োজন নেই। ধীরে সুস্থে আরাম করে খান। অনেক ভাল ভাল খাবার ছিল, ইলিশ মাছ থেকে মুরগী পর্যন্ত কোন কিছুই বাদ ছিলনা। তাঁদের উষ্ণ আন্তরিকতার এতটুকু অভাব ছিলনা। ওদিকে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব রেল স্টেশনে লোক পাঠিয়ে স্টেশন মাস্টারকে বলে পাঠালেনঃ সাহেবের বাসায় মেহমান, অতএব তাঁরা না আসা পর্যন্ত ট্রেনটিকে আটকে রাখতে। আমাদের বিস্ময়ের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মত অবস্থা। কেননা, হাইওয়েতে চলাচলকারী মোটর, বাস ইত্যাদি কিছুক্ষণের জন্য প্রভাবশালী ব্যক্তির ইংঙ্গিতে আটকে রাখা সম্ভব জানতাম। কিন্তু তাই বলে এখানে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আটকে রেখে সিলেটে ঢাকা গামী সুরমা মেলকে আটকে রাখা কি একই কথা? বন্ধুবর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেনঃ দ্যাখেন, এই বিদেশ বিভূয়ে সহজে কেউ আসতে চায়না। তদুপরি এটা একটা টারমিনাল স্টেশন অর্থাৎ লাস্ট স্টপ। অতএব, এতটুকু সুবিধা বা ক্ষমতা যদি আমার নাই থাকবে তবে আমি কেন এখানে থাকব? কথা তাঁর অত্যন্ত যথার্থ বলে আমরাও খানিকটা নিশ্চিন্ত হলাম। ছেলেরা সব পূর্বেই ট্রেনের কামরায় বসে ছিল। আমরা বেশ কিছু পরে এসে বসেছি এবং এটা স্টেশন মাস্টার নিশ্চিত হওয়ার পরই ট্রেন ছাড়ার অনুমতি দিলেন।

বাস্তবিকই সিলেটে সুরমা মেল আমাদের অপেক্ষায় ছিল এবং আমরা গাড়ী বদল করার পরপরই সুরমা মেল ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পথে গভীর রাত্রে

www.pathagar.com

বন্ধুবর শামসুদ্দীন শেখ সাহেব আমাকে বলেনঃ ভাই চৌধুরী সাহেব, যদি আপনি কিছু মনে না করেন তবে আমি সামনে কুমিল্লা স্টেশনে নেমে আমার দেশের বাড়ী হয়ে একটু ঘুরে পাবনা যেতে পারি। আপনি ছেলেদের ঢাকা এবং নারায়নগঞ্জ ভ্রমনটা দয়া করে দায়িত্ব নিয়ে সমাধা করতে চাইলে আমার কিছু উপকার হয়। তাঁর মনের এ আকুতির প্রতি সাড়া না দিয়েই বা উপায় কী? আমি বলিঃ ঠিক আছে, আমাদের জন্য দোয়া করেন।

প্রত্যূষে আমরা ঢাকা ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনে পৌঁছে সোজা ঢাকা পলিটেকনিক হোস্টেলে ছেলেদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে, আমি প্রথমেই তাদের ঢাকা ও নারায়নগঞ্জের জন্য একটা ভ্রমনসূচী ঠিক করে ফেলি। বন্ধুবর এলমুর রহমান সাহেব তাঁর বাসায় আমাকে থাকার জন্য অনুরোধ করেন। কেননা, তিনি ও তাঁর স্ত্রী আমার পরিবারের সঙ্গে পূর্ব পরিচিত। এখন প্রধান সমস্যা দাঁড়াল ছেলেদের নিয়ে ভ্রমনের জন্য আপাততঃ একটা বাস দরকার। এটার উদ্দেশ্য আমি টি,টি,টিসির কলেজের প্রফেসর এ,কে, আজাদ সাহেবের শরণাপন্ন হই। কিন্তু আজাদ সাহেব প্রথমেই আমাকে নিরাশ করেন। আমি হতাশ না হয়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব এম,এ, হালিম সাহেবকে অনুরোধ করি এবং তিনি দয়া করে জনাব আজাদ সাহেবকে বলেনঃ দেন ওকে গাড়ীটা। ওতো আমাদেরই ছাত্রছিল, এখন সে নিজে এতগুলি ছাত্র নিয়ে এসেছে Study tour এ। যাহোক, শেষমেশ আজাদ সাহেব গাড়ী ব্যবহারের অনুমতি দেন।

প্রথমেই আমি ঠিক করি Atomic Energy Centre দেখার জন্য। কেননা, আমার এক বাল্য বন্ধু ও কলেজ ফ্রেন্ড Dr. S.R. Hossain তখন ঐ সেন্টারের একজন প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানী। লন্ডন পলিটেকনিক থেকে Neuclear Physics এর উপর পিএইচডি করে সম্প্রতি সেখানে কর্মরত আছেন জেনে আমি তাঁকে অনুরোধ করি আমার ছেলেদেরকে তা দেখার সুযোগ করে দিতে। তিনি দয়া করে অন্য একজন বিজ্ঞানীকে আমাদের সঙ্গে দিয়ে সব কিছু দেখিয়ে বুঝিয়ে সাহায্য করার অনুরোধ করেন। ড. সৈয়দ রেজা হোসেন শুধু আমার বাল্যবন্ধুই নয় বরং একই গ্রামে আমাদের জন্ম এবং পরবর্তীতে পাবনায় প্রতিষ্ঠিত। আমি ও আমার ছেলেরা দারুণ সন্তুষ্ট ও কৃতজ্ঞ তাঁদের প্রতি।

এরপর আমরা চলে যাই ডিআইটি বিল্ডিং এ যেখানে নীচ তলায় সম্প্রতি চালু

www.pathagar.com

হয়েছিল টেলিভিশন সেন্টার। সেখানে ছিলেন একমাত্র টেলিভিশন টেকনিশিয়ান জনাব আলাউদ্দীন সাহেব। যিনি অতি সম্প্রতি জাপান থেকে টেলিভিশনের উপর দক্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে আমাদের সবকিছু ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে দেন। এমন কি সংবাদ পাঠ কিভাবে করা হয় তাও আমাদের দিয়ে ডিমোনেস্ট্রেশন করে দেখান। ভদ্রলোক অত্যন্ত সুদর্শন, দীর্ঘদেহী এবং বেশ সদালাপী।

কিছু ছেলে তারা নিজেদের উদ্যোগে নারায়নগঞ্জ ডক ইয়ার্ড, ও বিশ্বখ্যাত আদমজী জুটমিল দেখার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি তাদের ছেড়ে দিই এবং বাকী ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে ঢাকার দর্শনীয় স্থানগুলি আমরা পরিদর্শন করি। ঢাকায় ২/৩ দিন অবস্থানের পর আমরা সদল বলে আবার পাবনা অভিমুখে যাত্রা করি। পাবনা পলিটেকনিকে আমি যে কজন অধ্যক্ষের অধিনে শিক্ষকতা করেছি, সে সময় একমাত্র অধ্যক্ষ মহম্মদ শাহজাহান সাহেব ছিলেন স্থাপত্য বিভাগের এবং আমার প্রত্যক্ষ শিক্ষক। ইতোপূর্বে তিনি ছিলেন ময়মনসিংহ পলিটেকনিকের এক প্রধান স্থপতি। প্রচুর সুনামের সঙ্গে অনেক গঠনমূলক কাজ সেখানে তিনি সমাধা করেছেন শুনেছিলাম। এবার পাবনা পলিটেকনিকে অধ্যক্ষ পদে যোগদানের পরপরই তাঁর সেই ক্যারিশমা দেখার প্রত্যক্ষ সুযোগ পেলাম। মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যেই তিনি স্থানীয় মতলব মোল্লার অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সাপ্লাই এর পরিবর্তে আমাদের নিজেদের জেনারেটর চালু করেন অভূতপূর্ব ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এবং তৎকালীন সারা পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম পাবনা পলিটেকনিকে ফ্লাড লাইটের মাধ্যমে বাৎসরিক স্পোর্টসের আঞ্জাম করা হয় গভীর রাত্রি পর্যন্ত অত্যন্ত সফলভাবে। সমস্ত শহরের লোক অবাক বিস্ময়ে রাতের বেলা বৈদ্যুতিক আলোর ঝলকানির মধ্যে তা উপভোগ করার সুযোগ পায়। অধ্যক্ষ শাহজাহান সাহেব বাস্তবিক পক্ষে তাঁর উদার প্রাণ চাঞ্চল্যের, কর্ম তৎপরতার প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর রাখেন পাবনায়। লন টেনিস খেলার প্রচলন করেন নিজস্ব গ্রাস কোর্টে। শহরের ছোট বড় সমস্ত ডিস্ট্রিক্ট অফিসারদের মধ্যে অধ্যক্ষ শাহজাহান সাহেব ছিলেন মধ্যমনি। তিনি আমাদের ভ্রমনের তথা এই শিক্ষা সফরের ব্যাপারে সব কিছু শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। বিশেষতঃ আনবিক শক্তি কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্রের শিক্ষামূলক ভ্রমনকে তিনি একটা উল্লেখযোগ্য দিক বলে আমাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

www.pathagar.com

দশম পর্ব

প্রথম দফায় ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আমি পাবনা পলিটেকনিকে শিক্ষকতা করি। এই দীর্ঘ তিন বছরে আমি বহুমুখী ক্রিয়াকর্মে পূর্ণ উদ্যমে জড়িয়ে পড়ি। পলিটেকনিকের ছাত্র-শিক্ষক কার্যক্রমের প্রায় প্রতিটি শাখায় আমার অবাধ বিচরণ বর্তমান ছিল। পাবনা আঞ্জুমানই-ক্বাদেরীয়ার প্রতিষ্ঠালগ্ন (১৯৫৫) থেকে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করার জন্যে আমার বয়োজেষ্ঠ্যদের সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করার প্রতি আমার ছিল প্রবল আকর্ষণ। এই সময়েই আমার প্রথম বই হযরত বড়পীর পীরানে পীর মীরানে মীর গওসল আজম (রাঃ) সম্পর্কে পাঁচশ বই প্রকাশ করে আঞ্জমান-ই-ক্বাদেরীয়া পাবনা লাইব্রেরীকে দান করি।

এই বইটি সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশিত হওয়ায়, আমার সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাদের অনুরোধে পরবর্তী পর্যায়ে একটু বিস্তারিত আকারে আমার পীর হযরত গওসল আজম (রাঃ) বইটি দ্বিতীয় পুস্তক হিসাবে বিখ্যাত ঢাকা পাবলিকেশন্স প্রকাশ করে ১৯৯০ সালে। প্রায় ২৮ খানা মূল্যবান দুস্প্রাপ্য জীবনী গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পুস্তাকাদির সাহায্যে বইটি সম্পূর্ণ অজু অবস্থায় বাংলা, ইংরেজি, উর্দূ, আরবী ও ফার্সি ভাষা সম্বলিত বহু মাত্রিক বিশ্লেষণে প্রচুর পরিশ্রমে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয় বইটি রচনার ক্ষেত্রে। বর্তমানে বইটি একটি রেফারেন্স বুক হিসাবেও অনেকে গন্য করেন। দুঃখের বিষয় বর্তমানে বইটির কোন কপি আর অবশিষ্ট নেই। পুন মূদ্রণের চেষ্টায় আছি। পাবনায় থাকতে আমরা প্রতি বছরে আঞ্জুমান-ই-ক্বাদেরীয়ার মাধ্যমে সব মিলিয়ে প্রায় তিরিশ (৩০) টির মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করতাম নিয়মিতভাবে। যার মধ্যে ছিল মিলাদ মঁহফিল, কাসিদা পাঠ এবং ওয়াজ বা ধর্মীয় বক্তৃতা ইত্যাদি। মহান আল্লাহ্ পাকের অশেষ ইচ্ছায় সেখানে আমি ছিলাম মধ্যমনি।

অন্নদা গোবিন্দ পাবলিক লাইব্রেরী পাবনা একটি সুপ্রতিষ্ঠিত নামকরা লাইব্রেরী। বাংলাদেশের অনেক জেলা শহরেই এমন উন্নতমানের পাবলিক লাইব্রেরী খুব কমই আছে। বহু পুস্তক সম্ভারে সমৃদ্ধ এই পাঠাগার। অতি সম্প্রতি এটি নূতনভাবে চারতলা ভবনে রূপান্তরিত হয়ে আরো অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে। পাবনা টাউন হলের

www.pathagar.com

সম্মুখে এর অবস্থান, মাঝে চমৎকার আব্দুল হামিদ সড়ক যেটি পাবনা শহরের প্রধান পথ। আমি এই পাঠাগারের প্রচুর পুস্তক সম্ভারের প্রতি দারুণভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ফলে, প্রথম শ্রেণীর সদস্য হিসাবে আমি প্রতি সপ্তাহে তিন খানা করে বই পাঠ করার সুযোগ পাই। আমি লাইব্রেরিয়ান মনাদা যিনি এডওয়ার্ড কলেজের লাইব্রেরিয়ান এবং ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাক্টর হিসাবে বহু বছর কাজ করেছেন, তাঁকে অনুরোধ করি, বিদেশী নামকরা লেখকদের বিখ্যাত বইগুলি পড়ার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অতএব, দেশ-ভিত্তিক বা লেখক-ভিত্তিক যত বই পাওয়া সম্ভব তা আমাকে পড়ার জন্য সরবরাহ করার ক্ষেত্রে ত'ার সাহায্য কামনা করি।

অতএব, প্রথমেই তিনি আমাকে আমেরিকার বিখ্যাত রাইটার Howard fast এর বইগুলি পড়তে দেন।

যেমনঃ The Freedom Road, the Unconquered, The Passion of the Sacco and Vanzetti, the Second Generation ইত্যাদি। বলা বাহুল্য প্রতিটি বই এর পিছনের Cover এ বড় করে মুদ্রিত আছে Not for sale in U.S.A. and Canada অর্থাৎ তাঁর কোন বই U.S.A. এবং কানাডায় বিক্রয় যোগ্য নয়। এই অকুতোভয় সাহসী লেখকের লেখাগুলি আমেরিকা সরকারের বিরুদ্ধে লেখা। ফলশ্রুতিতে তাঁকে ছয়বার মিলিটারী ট্রাইবুনালের সম্মুখীন হতে হয় কারণ দর্শানোর জন্যে। তিনি প্রতিবারেই একই উত্তর দিয়ে আসেন যে, "তোমরাই প্রমাণ কর, আমি যা লিখেছি তা মিথ্যা।" এভাবে আমেরিকার কিছু লেখকের বই পড়ার পর ধরলাম রাশিয়ার বিখ্যাত লেখকদের বিখ্যাত বইগুলি। যেমন লিও টলস্টয়, পুশকিন, আন্তন দেখভ, ডস্ট্রয় ভস্কি, ম্যাক্সিম গোর্কী ইত্যাদি লেখকদের বেশকিছু সুলিখিত সাহিত্য পড়ে রাশিয়ার সমাজ কৃষ্টি ও কালচারের পরিচিতি লাভ করি। এরপর চীনা সাহিত্য পড়ার সুযোগ পাই। এর মধ্যে পার্ল এস বার্কের লিখা Good Earth, সম্ভবত লাওয়া চাওযার লেখা The Physician খুব ভাল লেগেছে। চীনা সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট মিল খুঁজে পেয়েছি বলেই বোধ করি অনেক আনন্দ পেয়েছি। বৃটিশ উপন্যাসিক ও সাহিত্যিকদের মধ্যে সেক্সপীয়র থেকে শুরু করে ছোট বড় বহু সাহিত্যিক ও কবির সঙ্গে ছোট বেলা থেকেই পরিচিত হতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছি, যেহেতু পুরো দেশটাই তো ছিল তাদের দখলে। অতএব, ভাল লাগুক বা না লাগুক পড়তে হয়েছে বহু নামী ও দামী লেখকদের লেখা। তাঁদের নামের তালিকা এখানে দিয়ে আর কলেবর বড় করতে চাইনা। তবে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠনের জন্যে Prof. Dale Carnegie সিরিজের

www.pathagar.com

প্রায় সব বইগুলি অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে পড়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর বইগুলি এতই ভাল যে তাঁকে বলা হয় World Teacher. আমেরিকার লেখকদের মধ্যে সম্ভবত তাঁর নাম শীর্ষস্থানে থাকা উচিৎ। কেননা, মানুষকে শিক্ষিত, মার্জিত, রুচিশীল ও সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিবার জন্যে তিনি নিঃস্বার্থভাবে যে অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন তা সুধী-সমাজে অনস্বীকার্য। এই সুযোগে তাঁর লিখিত এবং আমার ব্যক্তি সংগ্রহে রক্ষিত কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করছি। যেমনঃ 1. How to win Friends and Influacuce people. 2. How to stop worring and start living, 3. The personality, 4. How to Develop Self-confideace and Influcace People by Public Speaking, 5. The Quick and Easy Way to Effective Speaking ইত্যাদি বইগুলি পুস্তক সাম্রাজ্যের সেরা সংযোজন বলে আমি মনে করি। কেননা, এ বইগুলির কোনটিই নভেল, নাটক বা উপন্যাসের পর্যায়ে পড়েনা তো বটেই, উপরন্তু প্রতিটি বইয়ের লেখার সরঞ্জাম সংগ্রহ করতে Prof, Dale কে হাজার হাজার মাইল Air Travel করতে হয়েছে নিজস্ব অর্থব্যয়ে। আমেরিকার ধনকুবেরদের মধ্যে তৎকালে কার্ণেগী পরিবারের নাম ছিল বেশ উপরের দিকেই।

আমার শিক্ষকতা জীবনের সুদীর্ঘ ৩০ বছর আমার সুপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণীকক্ষে প্রথম সপ্তাহেই আমার সুপাঠ্য বইগুলির সঙ্গে তাদের পরিচিতি লাভ এবং তাদের শিক্ষায় সার্বিক মান উন্নয়ের প্রতি আমার ছিল তীক্ষ্ম দৃষ্টি। কেবলমাত্র তাদের বৎসরান্তে সিলেবাস শেষ করার দায়িত্বটাকে আমি প্রধান এবং একমাত্র কাজ বলে কোন দিন বিশ্বাস করিনি। মূলতঃ আমার প্রধান লক্ষ্য ছিল আমার শিক্ষার্থীরা কিভাবে, কত সহজে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির এটাই মূলকথা।

Geometrical Drawing এর উপর একটা বই লিখতে শুরু করেছিলাম বেশ পরিশ্রম করে। পরে ঢাকায় এসে দেখি আমাদের ডাইরেক্টর সাহেবের টেবিলে ঐ একই বিষয়ের উপর লিখিত বিভিন্ন পশ্চিম পাকিস্তানী লেখকের বই রাখা রয়েছে। এটা দেখার পর আমি ঐ বিষয়ের উপর লেখার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। যদিও ইতোমধ্যে প্রায় ৭/৮ চ্যাপ্টার পর্যন্ত লিখেছিলাম। ছেলেরা কলেজ ম্যাগাজিনে কিছু ইংরেজিতে মৌলিক রচনার জন্য আবদার করে আমার কাছে। তখন আমি আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে লিখিঃ How to Acquire the Art of Technical Drawing নামে প্রবন্ধ, যা ছেলেদের অংকন বিদ্যার জন্য বিশেষ সহায়ক ভূমিকা

www.pathagar.com

পালন করবে। শ্রীযুক্ত নিমাই চন্দ্র দাস ছিল তখন ম্যাগাজিন সেক্রেটারী। সে ছিল আমার বেশ প্রিয় ছাত্র অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ছেলটি ১৯৭১ সালে পাক সেনাদের গুলিতে মৃত্যুবরণ করে।

১৯৬৫ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী আমার প্রথম সন্তান চৌধুরী আনোয়ারুল আজিম (ফারুক) পাবনা হেমাঙ্গীনি সদর হাসপাতালে রাত্রি ১২.১০ মিনিটে জন্মলাভ করে। তাঁর এই শুভ জন্মলগ্নে আমি ও আমার পিতা- মাতাসহ সকলেই দারুণ প্রফুল্ল বোধ করি। পাবনা শহরের তৎকালীন প্রখ্যাত মিষ্টি বিক্রেতা লক্ষী নারায়ন ঘোষকে আমার বলা ছিল, যে আমার নামে মিষ্টি নিতে আসবে তাকেই যেন মিষ্টি দেওয়া হয়। পরিশেষে তাদের নামের তালিকা আমাকে দেখালে আমি তার মূল্য পরিশোধ করি। কেননা, ঐ দোকানীর এক ছেলে আমার ছাত্র ছিল বলে এটা আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল।

তৎকালীন সদর হাসপাতালে সিভিল সার্জন ছিলেন ডাঃ শামসুদ্দীন এবং এসিসটেন্ট সিভিল সার্জন ছিলেন ডাঃ এম, আই, চৌধুরী। আমার স্ত্রী প্রসবের অনেক পূর্ব থেকেই ডাঃ শামসুদ্দীনের চিকিৎসাধীনে ছিলেন ব্যক্তিগত রুগীনি হিসাবে। বিধায় হাসপাতালে তাঁর খাতির যত্নের কোন ক্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেনি। এখানে একটি ঘটনার বিষয় উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। বিষয়টা হলো, নূরুন্নাহার বলে যে ধাত্রী মেয়েটি প্রসবের সময় সাহায্যকারী হিসাবে ছিল, হঠাৎ আমি তাকে একদিন ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখি এবং অন্যান্য নার্স তাকে সান্তনা দেওয়ার জন্যে একত্র হয়েছিলেন সে সময়। আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়র নার্সকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি, কি ব্যাপার জানতে পারি? তিনি বলেনঃ স্যার, আমাদের মেয়েদের ব্যাপার ও জেনে আপনি কী করবেন, না জানাই ভাল। আমি কোন দ্বিরুক্তি না করেই চলে আসি। তার দু'দিন পর হঠাৎ গিয়ে ঐ একই অবস্থা দেখে আমি পুনরায় ঐ সিনিয়র নার্সটিকে ডেকে বলিঃ দেখুন সিস্টার, আমি সেদিন যা দেখেছিলাম আজও তাই দেখছি। অতএব, আপত্তি না থাকলে আমাকে বলতে পারেন। আমি ক্ষুদ্র মানুষ বটে, কিন্তু তেমন কিছু সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি করতেও পারি। তখন তিনি বলেনঃ স্যার ঐ মেয়েটির স্বামী রাগারাগি করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে দীর্ঘ আট মাস; অথচ আজ পর্যন্ত কোন চিঠিপত্র বা খবরাদি কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। সে বেঁচে আছে নাকি মারা গেছে তাও জানা যাচ্ছে না। তাছাড়া মেয়েটির বয়স তো বেশী নয়, তাই যখনই মনে পড়ে তখনই ওভাবে আমাদের কাছে কান্না-কাটি করে। আমি এতটুকু শোনার পরপরই বলি, তার

www.pathagar.com

জন্যে এত কাঁদাকাটির কী আছে? বলেই অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে বলি আজ মঙ্গলবার, আগামী শুক্রবারের মধ্যেই একটা ব্যবস্থা হলেই তো হলো। অতএব আপনি তাঁকে বলেন আর অযথা মন খারাপ করার দরকার নেই। সিস্টার তো খুবই অবাক! অবশ্য আমি যখন সিস্টারের কথাগুলি শুনছিলাম তখন একটা বই কোরআনের দোয়া ও আমালিয়াত বইটির কথা আমার মনে পড়ছিল।

বৃহস্পতিবার বিকেলের দিকে হাসপাতালে যাই আমার ছেলেকে দেখার জন্যে। আমার স্ত্রী দিন সাতেক হাসপাতালে ছিলেন। হঠাৎ দেখি, সেই মেয়েটি অর্থাৎ নূরুন্নাহার খুব হাসাহাসি ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। সেই সিস্টার আমাকে দেখে ছুটে এসে বলেনঃ স্যার, ওই মেয়েটির স্বামীর চিঠি এসেছে আজ। সে চট্টগ্রামে আছে কিছুদিনের মধ্যেই আসবে লিখেছে। সিস্টার তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন স্যার, এটা কীভাবে সম্ভব হলো? আমি বলি তা তো জানার দরকার নেই।

আমার মা ছিলেন খুবই খেয়ালী, যখন যা বলতেন বা কামনা করতেন তাই কিন্তু করতে হতো বা হয়ে যেত অলৌকিকভাবে। ফলে পাবনায় অনেক পরিচিত আত্মীয় মহিলা তাঁর অত্যন্ত গুণমুগ্ধ হয়ে পড়েন। আমার প্রথম সন্তানের আকিকা ও মুসলমানী (খত্না) করার ব্যাপারে তিনি আমাকে হুকুম করেন যে, তোমার ছেলের বিয়ে আমি দেখে যেতে পারব না। অতএব, তার আকিকা অনুষ্ঠান একেবারে বিয়ের মত করেই সকলকে দাওয়াত পত্র বিলি বন্টন করে খাওয়াতে হবে। সুতরাং আমার ছেলের বছর খানিক বয়স হলেই আমি সেই উদ্দেশ্যে কার্ড ছাপিয়ে দাওয়াত পত্র প্রথম দিন বিলি করতে গিয়ে হঠাৎ শয়তান পাড়ার মোড়ে মোটর বাইক দুর্ঘটনায় সাংঘাতিক ভাবে আহত হই। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত খত-বিক্ষত অবস্থা। আমার বন্ধু আব্দুল মান্নানের 50 CC Honda সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। কেননা, আমি ইতিপূর্বে কখনও মোটর সাইকেল চালাইনি। অথচ সেদিকে কোন খেয়াল না রেখেই বাসা থেকে বেরিয়েই দেখি বন্ধুর গাড়ীটি রাখা আছে। আমি তা চাইতেই তিনি দিয়ে দেন এবং বলেন ভাই একটু তাড়াতাড়ি এসেন।

যাহা হউক পলিটেকনিক থেকে কয়েকজন শিক্ষক এই দুঃসংবাদ পাওয়ার পর গাড়ী করে আমাকে প্রথমে সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে ডাঃ চৌধুরী আমার মাথায় কয়েকটি সিলাই দেন এবং শিক্ষক জনাব শাব্বির আহমদ সাহেব আমাকে পাঁজাকোলা করে দোতালায় আমার বিছানায় শুইয়ে দেন। আমার মা আমার কাছে প্রথম আসেন এবং আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি আমি আজ গোসল করেছিলাম কিনা? তিনি বলেন হ্যাঁ গোসল করেছিলে। এরপর আমার স্ত্রী যখন

www.pathagar.com

আমার পাশে আসেন তাঁকেও জিজ্ঞাসা করি একই প্রশ্ন এবং তিনিও একই ভাবে উত্তর দেন। বস্তুতঃ আমার মাথায় পিছন দিকে প্রচন্ড আঘাতের ফলে আমি কিছুই মনে করতে পারছিলাম না। উপরন্তু আমি দুর্ঘটনার পরপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ি এবং সেই অবস্থাতেই আমি এক অদ্ভূত বা অপূর্ব দৃশ্য আমার মানষ পটে ভেসে উঠে। যাকে নিছক স্বপ্ন বলা বোধ হয় ঠিক হবে না। আমি যে দৃশ্য সেই অজ্ঞান অবস্থায় দেখি তা হল এই যে, আমাকে ৮/১০ জন ফেরেশতা কাঁধে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বেহেস্তের দিকে; কিন্তু পথিমধ্যে মাত্র তিন জন তাদেরই মত শুভ্র পোশাক পরিহিত শশ্রু মন্ডিত ব্যক্তি মৃদু আপত্তি উত্থাপন করেন এই বলে যে তিনি তো গোসল করেন নি, তাঁকে কীভাবে বেহেস্তে নিবেন? সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সমস্বরে বলে উঠেন কোন প্রয়োজন নেই, গওস পাকের লোক। আর ওদিকে দেখি কি আমারপীর ওমুর্শেদ পর্দা হুজুর পাক কলকাতায় তাঁর বাসায় (৩৩নং আলীমুদ্দিন স্ট্রীট) বারান্দার উপর পায়চারী করছেন আর কাকে যেন বলছেন, আমার ব্যাপারে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হল তা তাঁকে জানানোর জন্য তীব্র তাগিদ দিচ্ছেন।

এই দুর্ঘটনার পর আমি প্রায় দীর্ঘ দু'মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। সেই সময় পাবনা পলিটেকনিকে অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব শামসুদ্দীন আহমদ সাহেব। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী কবিতা ভাবী আমার জন্যে যথেষ্ট করেছেন। ফলে, আমিও আমার পরিবার বর্গ তাঁদের নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলাম। আমার বন্ধু মান্নানের গাড়ীটার বিভিন্ন পার্টস চট্টগ্রাম থেকে কিনে নিয়ে গেছেন আমাদের মোটর মেকানিক্স মাষ্টার তোরাব হোসেন। তিনি বহু পরিশ্রম করে সম্পূর্ণ গাড়ীটা খাড়া করে দেন। কিন্তু খুবই আশ্চর্য ব্যাপার যে, আমার বন্ধু একদিনের জন্যেও আমাকে দেখতে বা তার গাড়ীর খোঁজ নিতে আসেন নি। আমি পরে সুস্থ হয়ে এর কারণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেনঃ ভাই আপনি একসিডেন্ট করেছেন শুনার পরপরই আমি বাড়ী চলে যাই। কেননা, আমি কারো রক্ত দেখতে পারিনা- রক্ত দেখলেই আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। গাড়ীর কথা আমি মোটেও ভাবিনি, ইত্যাদি কথা বলে আমাকে উত্তর দেন। কত বিচিত্র মানুষই না পৃথিবীতে আছে! বর্তমানে পাবনা শহরের ধনকুবেরদের মধ্যে তিনি একজন। কলেজ জীবনেও আমি তাঁকে অত্যন্ত শান্ত, ধীর-স্থির প্রকৃতির ব্যক্তি হিসাবে লক্ষ্য করেছি।

আমি সুস্থ হয়ে উঠার পর আমার ছেলের আকিকার জন্যে আমার পিতা এক জোড়া বড় খাসী কিনে আনান। ২/১ দিনের মধ্যেই খাসীজোড়া একত্র বাঁধা অবস্থায় হারিয়ে যায়। তিন দিন পর অবশ্য খাশীজোড়া ঐ অবস্থায় নিকটস্থ মহল্লার এক

www.pathagar.com

ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে পাওয়া যায়। তিনি নিজেই খবর পাঠিয়ে খাসী দুটি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তখনকার দিনেও লোকজন এত যে খারাপ ছিলনা এটাই তার প্রমাণ। বর্তমান লোক সমাজের চিত্র দেখে আমার নিজেরই সন্দেহ হয়, বাস্তবিকপক্ষে শিক্ষিত লোক বেশী সৎ, না অশিক্ষিত সম্প্রদায়? সার্কিট হাউসের বাবুর্চি ছিল মহম্মদ মহসীন। তাকে ডেকে তার রান্নার সমস্ত উপকরণ যোগাড় করেদিই এবং নিজে বসে থেকে তার রান্না করা উত্তম বিরিয়ানী রান্নার প্রক্রিয়া আমিও কিছুটা রপ্ত করার চেষ্টা করি। যা পরবর্তী জীবনে আমার অনেক কাজে লেগেছে। পলিটেকনিকের জন্য নূতন ফার্নিচার ও ক্রোকারিজ কেনা হয়েছিল অতি সম্প্রতি। অতএব, সেগুলি দিয়েই আমার মেহমানদের উত্তমরূপে সেবা করার সুযোগ পাই। তখনকার দিনে ছোট খাট শহরে এত ডেকোরেটারদের প্রচলন ছিলনা।

১৯৬৬ সালের ৫ জুলাই আমার দ্বিতীয় সন্তান মোসাম্মাৎ নূরুন্নাহার ওরফে শিল্পী চৌধুরী ঐ সরকারী বাসভবনেই ভূমিষ্ট হয়। হেমাঙ্গীনি হাসপাতালের সিস্টার মুসলিমা একাজে সহায়তা করেন এবং বেশ নিরাপদেই সবকাজ সমাধা হয়। আমার সরকারী বাসভবনটা ছিল ইছামতি নদীর ঠিকপাশেই দোতালা থেকেই আমার বড় আকারের কিচেন গার্ডেনের সবটাই আমাদের দৃষ্টি সীমার ভিতরেই ছিল। আমার পিতা একটা মালী রেখেছিলেন যে বাগানের সবকিছু দেখাশুনা করত। গরু ছাগল এবং হাঁস মুরগীর সবকিছুরই অত্যন্ত সখ ছিল আমার পিতামাতার। পিতা ছিলেন কৃষি বিভাগের একজন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ। অতএব স্বভাবতই তাঁর ওদিকটায় যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। আমি আমার পিতাকে কখনও কোন নামাজ ক্বাজা করতে দেখিনি; অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং একজন সৎ চাকুরীজীবী হিসাবে তাঁর বন্ধু মহলে প্রচুর সুনাম ছিল।

অনা ও ইসলাম নামে দুটি Boy Servant ছিল আমার শিশুদের সার্বক্ষণিক সাহচর্য দিবার জন্যে। কাজের জন্য ছিল ছুটা বুয়া একজন, যে কাজ শেষেই তার বাসায় চলে যেত। তখনকার দিনে সরকারী চাকুরীতে বেশী বেতন না পেলেও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ক্রয় ক্ষমতার মধ্যেই ছিল বলে, তেমন অভাব-অভিযোগ বুঝতে পারিনি। উপরন্তু মেহমানদারীর যে ধারাবাহিকতা আমাদের বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে অভ্যাসগত স্বভাবে পরিণত হয়েছিল, সেটাতেও আমরা পরিবারের কোন সদস্যকেই কখনও বিরক্তবোধ করতে দেখিনি। বরং এটা আমাদের জন্যে ছিল আত্মতৃপ্তির একটা চমৎকার ব্যাপার।

www.pathagar.com

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি আমার ডাক আসে ঢাকা টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে Diploma -in-Technical Education করার জন্যে। কাজে কাজেই আমি প্রস্তুতি নিতে থাকি ঢাকায় যাবার জন্যে। অধ্যক্ষ শাহজাহান সাহেব আমাকে বলেনঃ দেখ চৌধুরী তুমি এখানে থাকবেনা অথচ তোমার পরিবারবর্গ এই সরকারী বাসায় থাকবে এটা ঠিক দেখায় না। বরং আমি বলি কি, তুমি আমাদের নূতন পলিটেকনিক সাইটে একটা বিল্ডিং পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে সেটা তোমার পছন্দ হয় নাকি দেখ। যদি পছন্দ কর, তবে আমি বাসোপযোগী করার জন্যে যা করার আমি করে দেব। আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের এ হেন প্রস্তাব আমি উপেক্ষা করতে পারিনা। আমি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে সিঙ্গেতে আমার পরিবার স্থানান্তরিত করি অবিলম্বে।

আমার বিদায়ের প্রারম্ভে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই আমাকে Fare Well দেওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন দেখলাম। আমার প্রচুর গুণমূগ্ধ সুপ্রিয় ছাত্র সমাজ আমার সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলল শুনলাম। সভায় সভাপতিত্ব করেন খোদ অধ্যক্ষ সাহেব নিজেই ছাত্র সংসদের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক (১৯৬৬) প্রত্যেকেই অত্যন্ত সুন্দর বক্তৃতা করেছে, মানপত্র পাঠ করেছে। এদের মধ্যে আমার সুপ্রিয় ছাত্র, প্রসান্ত কুমার আমার শিক্ষকতার ভূয়সী প্রসংশা করে বলেঃ চৌধুরী সাহেব কেবল আমাদের সিলেবাস শেষ করে দেওয়ার শিক্ষক ছিলেন না; যা সাধারণতঃ সকল শিক্ষকই করে থাকনে। বরং তিনি আমাদের এমন এক অভিনব শিক্ষা দিয়েছেন, যা আমরা ইতোপূর্বে কোথাও পাইনি। বস্তুতঃ আমরা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বেরিয়ে জীবনে কীভাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করব, সাফল্য লাভ করব, দেশ ও জাতির সামনে মাথা উঁচু করে চলতে পারব সেই টেকনিক বা কৌশল তিনি অনেক সুচারুরূপে আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন প্রাণ খুলে। এটাই তাঁর শিক্ষকতা হিসাবে বিশেষ সাফল্য বলে আমরা বিশ্বাস করি।' শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ জনাব মহম্মদ শাহজাহান সাহেব তাঁর সমাপনি ভাষণে বলেনঃ চৌধুরী আমার ডাইরেক্ট স্টুডেন্ট। তোমরা তার সম্বন্ধে এতক্ষণ যা বললে এগুলো আমি নিজেও জানতাম না। ভালই হলো, আমিও জানলাম আমারই একছাত্রের মধ্যে এত বহুমুখী গুণের সমাহার, অতএব এটা আমারও গর্ব। তাঁর একথা শুনার পর আমার চোখে অশ্রুধারা। এভাবেই সেখানে প্রচুর উপহার সামগ্রীর মধ্য দিয়ে আমার প্রথম পর্বের পাবনায় শিক্ষকতার সমাপ্তি ঘটে।

www.pathagar.com

একাদশ পর্ব

১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমি ঢাকায় টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ In-Service Training হিসাবে Diploma -in- Technical Education করার জন্যে পড়াশুনা শুরু করি। প্রথম কয়েক মাস আমি টি,টি,টি,সি, কলেজ হোস্টেলে থেকেই লেখাপড়া চালিয়ে যাই। পাবনার জনাব আনোয়ার হোসেন আমাকে তাঁর সরকারী বাসার মাত্র দুটি কামরা সাবলেট দেওয়ার প্রস্তাব দেন এবং আমি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করি।

কলেজের ছুটির একফাঁকে আমি পাবনা গিয়ে আমার স্ত্রীসহ আমার বড় ছেলে ফারুক ও মেয়ে শিল্পীকে সঙ্গে নিয়ে আসি মাত্র ক'মাসের জন্যে। আনোয়ার সাহেবের স্ত্রী ও তার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেশ আনন্দেই আমাদের এই ছোট্ট দুটি পরিবার অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই দু'চার মাস কেটেছে। এরপর পাবনায় আমার শ্রদ্ধেয় পিতামাতার কথা স্মরণ করে আমার পরিবারকে পাবনায় তাঁদের কাছে রেখে আসি। আমি পুনরায় কলেজ হোস্টেলে একটি রুমে একা থাকার ব্যবস্থা করি। পাবনার জনাব শামসুল হক সাহেব এই কোর্স করার জন্যে এসে আমার রুমেই উঠেছিলেন, আমার পিতার সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট পরিচয় থাকার জন্যে। তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যখন বিমান বাহিনী থেকে অবসর গ্রহণ করে পাবনায় ফিরে আসেন এবং তিনি একটি চাকুরীর চেষ্টায় খুবই অস্থির ছিলেন; তখন আমি সুযোগ বুঝে অধ্যক্ষ জনাব শামসুদ্দীন আহমদকে তাঁর আবেদন পত্রটি দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং যথারীতি নিয়ম মাফিক তিনি নিয়োগপত্র পেয়ে যান। কিন্তু টি,টি,টি,সি, তে পড়তে এসে দেখেন তাঁকে কর্তৃপক্ষ Diploma -in-Techincal Education পড়তে দিতে নারাজ কৌশলগত কারণে। তিনি অনেক চেষ্টা করেও থাকতে পারলেন না। শেষে পুনরায় পাবনায় জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তিনি পাবনাতেই নিজ চেষ্টায় একটা দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেন। তিনি আমার চেয়ে বেশ কিছু বড় ছিলেন বলে আমি তাঁকে শামু চাচা বলে ডাকতাম। তিনি যথেষ্ট সু-স্বাস্থ্যের এবং প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি ক্লাসের

www.pathagar.com

তাঁর ছাত্রদের প্রত্যেকের নাম মাত্র ২/৪ দিনের মধ্যেই জেনে নিতেন এবং আর কখনও ভুলতেন না। যেটা আমি বহু চেষ্টা করেও পারিনি। দুঃখের বিষয় ৫/৬ বছর পূর্বে অর্থাৎ ২০০০ সালের দিকে তিনি গলায় ক্যান্সার রোগে ইন্তেকাল করেন। মহান আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন!

আমি টি,টি,টি,সি, তে যোগদান করার অল্প কিছুকাল পরেই ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল) পদে প্রমোশন পেয়ে প্রথম শ্রেণীর অফিসার হিসাবে গন্য হই। এবং আমার সঙ্গে আরো কয়েকজন বন্ধুকেও এই পদোন্নতি দেওয়া হয়। আমার প্রাক্তন শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আমাকে মোবারকবাদ জানান। তাঁদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব মহম্মদ শাহজাহান সাহেবের নাম এই মুহূর্তে সবার আগে মনে পড়ছে।

টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে পড়ার সময় একটি বিশেষ ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারলাম না। ঘটনাটি হল; আমি আগের দিন ক্লাসে আসতে পারিনি। ফলে পরের দিন যথারীতি ক্লাসে গিয়েই দেখি আমার সকল সতীর্থই কাকে যেন অত্যন্ত মারমুখী অবস্থায় উদ্দীপ্ত। আমি কিছু বুঝে উঠার পূর্বেই তারা সদলবলে শ্রেণীকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে তৎপর। সম্ভবত আমি তাঁদের সকলের চেয়ে বয়ঃজেষ্ঠ বা তাঁদের অতীতকালের ছাত্র নেতা হিসাবেই হোক আমি যখন ব্যাপারটা একটু জানতে চাইলাম তখন তাঁরা আমাকে যা জ্ঞাত করলেন তার মূল কথা হচ্ছে, যে, অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রশিদ সাহেবের স্টেনো-টাইপিস্ট মহীউদ্দীন আহমদ আমার সিলেটি বন্ধু জনাব আব্দুর রহমান চৌধুরীকে কিছু অপমান জনক কথাবার্তা বলেছেন অকারণে। ফলে আরো কজন সিলেটি বন্ধু যেমন জনাব মাইনুদ্দীন চৌধুরী। নেসওয়ার আহমেদ, জহুরুল হক প্রভৃতি অতিশয় রাগতঃভাবে সকল শিক্ষার্থীদের সহযোগে কলেজ কতৃপক্ষের নিকট সুবিচার প্রার্থনা করেন এবং ২৪ ঘন্টার মধ্যেই বিচার দাবী করেন। আজকে সেই সময়ও উত্তীর্ণ হয়েছে অতএব এখনই তাকে পিটাতে সকলেই প্রস্তুত।

আমি ঘটনা পর্যালোচনা করে বন্ধুদের আমার দুটো কথা শুনে যাওয়ার অনুরোধ করি মাত্র। আমি তাঁদের বলিঃ দেখুন গতকাল যেহেতু আমি অনুপস্থিত ছিলাম সেইহেতু এই প্রথম আমি জানতে পারলাম যে আপনারা সকলেই অপমানিত হয়েছেন, অতএব আমিও হয়েছি। আপনাদের দেওযা ২৪ ঘন্টা সময় পার হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এই অফিস টাইমের মধ্যে কলেজ ভবনেই তাকে এখনই পিটাতে

www.pathagar.com

হবে কেন? এর পরিনতি কী হতে পারে ভেবে দেখেছেন কি? উপরন্তু আজ শুক্রবার একটু পরেই ছুটি হয়ে যাবে। যদি সে আপনাদের কাছে ক্ষমা চায় সে সুযোগটা অন্ততঃ তাকে দেওয়া যেতে পারে। নতুবা যা খুশী করতে পারেন তবে অবশ্যই কলেজের মধ্যে নয়। কেননা, এতে আমাদের অনেকেরই চাকুরী চলে যেতে পারে। নানাবিধ শাস্তিও কর্তৃপক্ষ দিতে পারে। অতএব দয়া করে একটু অবকাশ দিন মহীউদ্দীনকে ক্ষমা চাওয়ার জন্যে। এইটুকু মাত্র বলার পরই বন্ধুরা আমাকে চেপে ধরল এই বলে যে, ঠিক আছে আপনার এ পরামর্শ আমরা মানছি। তবে এ দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে এবং মহীউদ্দীনকে কীভাবে আপনি বলবেন তাও আপনিই ঠিক করুন। আমি বলি কী যন্ত্রণা! আমাকেই বলতে হবে কেন? আমিতো একটা সুপরামর্শ দিয়েছি মাত্র, আবার আমাকে দিয়েই এটা পালন করাবেন কেন? আমরা মোট ৪৫ জন শিক্ষক রয়েছি। এর মধ্যে যে কেউ এটা করতে পারেন। উপরন্তু গতকালের ঘটনায় যখন আমি অনুপস্থিত ছিলাম তখন তো আমাকে মোটেই এটাতে জড়ানো উচিৎ হবেনা বলে আমি মনে করি। আমাদের বিপদের কথা মনে করেই আমি এই পরামর্শ দিয়েছি। কেননা, জেনেশুনে তো আমরা কোন আইনের ফাঁকে পা দিতে পারিনা।

কিন্তু আমার বন্ধুদের ঐ একই আবদার এবং আমি বুঝলাম যে এ বিপদের ঝুঁকিও কেউ নিতে চায়না। শেষে আমি তাঁদের বলি আপনারা নীচে গিয়ে ঐ চায়ের দোকনে গিয়ে অপেক্ষা করুন। আমাদের শিক্ষক মন্ডলীর মধ্যে কেউ কেউ ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিলেন মনে হয়। কেননা, সে সময় আমাদের কলেজে শিক্ষকতা করতেন সর্বহারা পার্টির প্রেসিডেন্ট জনাব সিরাজ শিকদার (অবশ্য তখন পর্যন্ত তাঁর পার্টি পরিচিতি গোপন ছিল বলেই শিক্ষকতার জন্য নিয়োগ পত্র পেয়েছিলেন) তিনি নীচে নেমেই আমাকে দেখেই একটু মুচকি হেসে বলেন চৌধুরী সাহেব চলে যান। আমিও বলি হ্যা স্যার এই তো ছুটি হল এখনি আমরাও সব চলে যাব। তিনি সেখান থেকে দ্রুত প্রস্থান করেন। এরপর সবার শেষে দেখি মহীউদ্দীন ও হিসাব রক্ষক আব্বাস আলী একসঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছেন। আমি দুপা এগিয়ে গিয়ে মহীউদ্দীন সাহেবকে বলিঃ দেখুন মহীউদ্দীন সাহেব গতকালের ঘটনা যা হয়েছে তাতে আপনার দুঃখ প্রকাশ করা উচিৎ। কেননা, আমরা সকলেই দরিদ্র ভদ্র সন্তান এবং আপনার চেয়ে পদাধিকার বলে আমরা সকলেই আপনার শ্রদ্ধাভাজন

www.pathagar.com

অথচ আপনি যে ব্যবহার এবং অশোভন কথাবার্তা বলেছেন তার জন্যে অবশ্যই আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিৎ বলে আমি মনে করি। তখন মহীউদ্দীন উত্তেজিত ভাবে বলেন আমি এসব কিছু জানি না যা করার আমার অথরিটি করবে। বলেই দুহাত উচু করে আন্দোলিত করতে থাকেন। ইতোমধ্যেই আমার বন্ধুরা সকলেই তাকে চতুরদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে। আমি তবুও শেষ বারের মত তাঁকে বলি অন্ততঃ আপনি এটুকু তো পারেন যে Yes, I am Sorry এটুকু বল্লেই তো চলে। কিন্তু মহীউদ্দীন পূর্বের ন্যায় ভীষণ উত্তেজিতভাবে একই আসফালন করতে থাকেন। তখন আমি আব্বাস আলী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে বলি চলেন যাই নামাজের সময় হয়ে আসছে। আমরা দু'জনে সম্মুখে কিছু দূর এগিয়ে যেতেই পিছন থেকে জুতা পিটার ধমাধম শব্দ শুনতে পেলাম। আব্বাস সাহেব আমাকে বললেন চৌধুরী সাহেব, এটা ঠিক হলনা বলেই তিনি আবার পিছিয়ে গেলেন এবং তাঁর দেশী মহীউদ্দীনকে সঙ্গে নিয়ে সোজা দোতালায় অধ্যক্ষের কামরায় উপস্থিত হন। আমরা সকলেই নিজেদের হোস্টেলে ফিরে যাই। পরের দিন কলেজে গিয়ে এই ঘটনার জন্য তদন্ত কমিটি করা হয়েছে এবং আমাদের ৫/৬ জনের বিরুদ্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে আমাকেই Ring Leader হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছিল এবং বাকী ৪/৫ জন আমার সিলেটি বন্ধুদের যাদের নাম আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি তাদেরকে অপরাধী হিসাবে ধরা হয়েছিল। আমার বন্ধুরা আমাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে ধৈর্য ধরতে বলেছিল। এমনকি আমার চাকুরী চলে গেলে তারা আমাকেসহ লন্ডন চলে যাবে বলেও অনেক আশ্বাসবাণী শুনিয়েছিল।

পরিশেষে অনেক দেন দরবারের পর, বেশ কিছু দিন যাবার পরে আমরা জানতে পারলাম, আমাদের সকলকেই বদলীর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এমনকি মহীউদ্দীনসহ। কিন্তু মহীউদ্দীন বদলী হ্তে রাজি না হওয়ায় আমাদের সকলের বদলীর ব্যবস্থাও স্থগিত হয়ে যায়। এভাবেই সেবার নাটকের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১৯৬৮ সালের শেষ প্রান্তে আমাদের ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়। এবং পরীক্ষার ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। ইতোমধ্যে আমাদের বিভিন্ন পলিটেকনিকে বদলীর ব্যবস্থা প্রকরণ পদ্ধতির কাজ ডাইরেকটোরেট-অব-টেকনিক্যাল এডুকেশনের (ডি,টি,ই) মাধ্যমে শুরু করা হয়।

www.pathagar.com

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন জেনারেল ইয়াহ্ইয়া খান এবং ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকেই শুরু হয়ে যায় পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) গণ অভ্যুত্থান। সারা দেশ জুড়ে বিশৃঙ্খল অবস্থা, বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর কবলে পতিত হয়। আমাদের টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজও তড়িখড়ি আমাদের দেশের বিভিন্ন পলিটেকনিকে বিভিন্ন পদে যোগদানের জন্যে সরকারী নির্দেশনামা আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয়। অত্যন্ত তাড়াহুড়ার মধ্যে একাজ করতে হয় সকলকে। আমাকে বদলী করা হয় কুষ্টিয়া পলিটেকনিকে সেকেন্ড-সিফট ট্রেড প্রোগ্রামের সুপারইনটেনডেন্ট হিসাবে। বিধায়, আমি আর কাল বিলম্ব না করে সোজা পাবনায় আমার পিতামাতা ও পরিবার পরিজনদের সঙ্গে ২/৪ দিন কাটিয়ে কুষ্টিয়া অভিমুখে যাত্রা করি।
সম্ভবত ৩ মার্চ ১৯৬৯ সালে আমি আমার নূতন পদে সর্বপ্রথম অফিসার হিসাবে কাজে যোগদান করি। কেননা, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় পলিটেকনিক কর্তৃপক্ষ এই পদের জন্যে কোন উপযুক্ত অফিসার পাননি। ফলে, আমি সেখানে যোগদান করায় সেখানে সকল শিক্ষক ও স্টাফ অত্যন্ত আনন্দিত।

কুষ্টিয়া পলিটেকনিকে প্রিন্সিপ্যাল -ইন-চার্জ হিসাবে তখন ছিলেন জনাব নূরুল ইসলাম। তাঁর সঙ্গে ইতোপূর্বে আমার কোন পরিচয় ছিলনা। আসলে মূল অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব শামসুদ্দীন আহমেদ। যিনি ইতোপূর্বে পাবনায় কিছুদিন অধ্যক্ষ ছিলেন। বর্তমানে তিনি আমেরিকায় এম,এস, করার জন্যে অবস্থান করছিলেন, সেটা ছিল মাত্র এক বছরের কোর্স। বর্তমান অধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম সাহেব ছিলেন ইসলামী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ। মুখে দাড়ি ও মাথায় সর্বক্ষণ টুপী রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। আমি তাঁর অফিসে প্রথম সাক্ষাতকারের সময় কাল শেরওয়ানী ও কাল রামপুরী ক্যাপ মাথায় দিয়ে প্রবেশ করি। এবং আমাকে ঐ পোশাকে দেখে তিনি স্বভাবতই অত্যন্ত আনন্দিত হন-যাকে বলে অনেকটা Love at first sight অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই প্রীতিলাভের মত অবস্থা। তাঁর অফিসের প্রধান সহকারী জনাব খালেকুজ্জামান সাহেব তিনিও খুব খুশী এবং তিনি নিজেও ঐ একই ইসলামী ভাবধারায় প্রবুদ্ধ।

প্রথম দিনই আমার থাকার ব্যবস্থা করেন স্থাপত্য বিভাগের প্রধান জনাব জহুরে আলম খন্দকার। সিনিয়র স্টাফ কোয়াটারে সেখানে দোতালায় থাকতেন একমাত্র যান্ত্রিক বিভাগের শিক্ষক জনাব আবু সোলায়মান সাহেব কেননা, তিনি তাঁর ফ্যামিলি সিলেট থেকে এ পর্যন্ত কুষ্টিয়ায় নিয়ে আসেন নি। যেহেতু তাঁর স্বাস্থ্য এ সব শুষ্ক

www.pathagar.com

এলাকায় সুট করেনা তাই তিনি বহু চেষ্টা করেছেন এখান থেকে বদলী হবার জন্যে কিন্তু সফল হতে পারেন নি। পরিশেষে, আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয় যে, আমি যদি তাঁর বদলীর ব্যবস্থা করতে পারি তবে তিনি আমাকে তাঁর সরকারী বাসস্থানটি ছেড়ে দিবেন। প্রধান সহকারী জনাব খালেকুজ্জামান সাহেবকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করি আমার অফিস এবং বাসস্থান সম্পর্কে। তিনি আমাকে পলিটেকনিক ভবনের পূর্ব দিকের ফাঁকা মাঠটি দেখিয়ে বলেন এটাই আপনার অফিস এবং ঐ যে দেখছেন সিনিয়ার স্টাফ কোয়াটারের উপর ফাঁকা ছাদ, ওটাই আপনার ভবিষ্যতের ঠিকানা। আমি পরে বুঝলাম তিনি যথার্থই বলেছেন। কেননা, আমিই সর্ব প্রথম সুপার হিসাবে যেহেতু এখানে যোগদান করেছি, অতএব আমাকেই সবকিছু গড়ে নিতে হবে। উপরন্তু আমি যেহেতু স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক সেইহেতু একাজ আমার জন্যে যেমন সহজ তেমনই আনন্দদায়ক। অতএব আমি অনতিবিলম্বে কাজের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। ইতোমধ্যে পলিটেকনিকের শিক্ষকের স্বল্পতাহেতু ছাত্রদের ক্লাস নিতেও থাকলাম।

পলিটেকনিক লাইব্রেরীর জন্য বেশ কিছু বই কেনার খুবই প্রয়োজন ছিল। সুতরাং অধ্যক্ষ সাহেব আমাকেই এ দায়িত্ব দিয়ে ঢাকায় যাওয়ার অনুরোধ করেন এবং তৎকালীন লাইব্রেরীয়ান জনাব আবুবক্কর সাহেব আমাকে বার বার অনুরোধ করেন যেন একটি টাকাও ফেরত না আনি অর্থাৎ সমস্ত টাকাই যেন বই কেনা বাবদ খরচা করতে পারি। বেশ কয়েক হাজার টাকার বই কেনার জন্যে আমাকে অফিসের Pick up van গাড়টি দেওয়া হয় ঢাকা থেকে বইগুলি নিয়ে আসার জন্যে। ড্রাইভার ছিল মোসলেম, ভাল চালক। ঢাকায় প্রথমেই আমি নিউ মার্কেট থেকে আমার পছন্দমত যত ভাল ভাল বই পেয়েছি কিনে ফেলেছি। মাত্র ৩/৪ দিনের মধ্যেই গাড়ীভর্তি বই মোসলেম ড্রাইভারকে দিয়ে কুষ্টিয়া পাঠিয়ে দিই। এবং আমি অফিসের কিছু কাজ ও সোলায়মান সাহেবের বদলীর ব্যাপারে কিছু তদবীর করে তাঁর ট্রান্সফার অর্ডারটি আমার হাতে নিই। এরপরই আমি পাবনার উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করি।

পাবনায় ২/৩ দিন থাকার মধ্যে কাজি আব্দুস সালাম নামে এক ব্যক্তি আমার পিতাকে অনুরোধ করে তার একটা চাকুরীর জন্যে। কেননা, একগাদা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে তার সংসার একবারেই অচল হয়ে পড়েছিল। পূর্বে কিছু কাজ কাম যা করত তা সবই শেষ হয়ে গিয়েছে বর্তমানে একেবারে বেকার। এমতাবস্থায় আমার পিতা আমাকে বলেন দেখ এর জন্যে কিছু করতে পার কিনা। আমি তার করুণ অবস্থার বিবরণ শুনে তখনই তাকে আমার অফিস পিয়ন হিসাবে গ্রহণ করি।

www.pathagar.com

কেননা, আমাকে কুষ্টিয়া অফিস আমার নিজের অফিসের জন্যে লোক নেওয়ার কথা বলে রেখেছিল। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে তার পরদিনই কুষ্টিয়া চলে যাই।

কুষ্টিয়া পৌছে প্রথমেই সোলায়মান সাহেবের বদলীর আদেশ নামাটি তাঁর হাতে ধরিয়ে দিই এবং তাঁকে যতখানি সন্তুষ্ট দেখব ভেবেছিলাম তেমনটা দেখলাম না। কেননা, তিনি ইতোপূর্বেই টেলিফোনের মাধ্যমে তাঁর বদলীর হুকুম নামা জেনে গেছেন। সোলায়মান সাহেবের বাসায় আমার সঙ্গে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক জনাব আমানুল্লাহ সাহেবও থাকতেন। তিনিই আমাকে জানান আপনাকে যে কোয়াটার ছেড়ে দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন সোলায়মান সাহেব, সেটি বোধ করি আপনি আর পাচ্ছেন না। কেননা আমি হঠাৎ অফিসে দেখি তিনি তাঁর বন্ধু খোরশেদ আলম চৌধুরীকে টেলিফোনে বলছেনঃ আপনি তাড়াতাড়ি পরিবার নিয়ে এখানে চলে আসুন এবং আমি আপনাকে আমার কোয়াটারটা দিয়ে যাব চৌধুরী নূরুল আজিম সাহেবকে না দিয়ে। আমি অফিসে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম যে তাঁকে অর্থাৎ খোরশেদ আলমকে বার বার জানানো হয়েছে যে আপনি এখানে একা আসবেন, ফ্যামিলি কোয়াটার দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। অধ্যক্ষ সাহেবের অফিস থেকে তাঁকে পুনঃ পুনঃ এই অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এদিকে সোলায়মান সাহেবের বিদায় সংবর্ধনা ইনস্টিটিউট থেকে এবং হোস্টেল সুপার হিসাবে ছাত্রাবাস থেকে বিদায় পূর্ব অনুষ্ঠানাদি প্রায় সবই শেষ। এমন সময় হঠাৎ একদিন আমি ও অধ্যক্ষ সাহেব বিকেলের দিকে ক্যাম্পাসের মধ্যে ঘোরাফিরা করছিলাম। সে সময় দেখি খোরশেদ আলম চৌধুরী ট্রাক বোঝাই করে মালপত্রসহ তার পরিবার নিয়ে ঢুকছেন পলিটেকনিকে। অধ্যক্ষ নূরুল ইসলাম সাহেব আমাকে বললেন, একে বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও সে তা শুনল না। আমি বললাম, এখন আমি যেখানে আছি বোধ করি সেখানেই তিনি উঠবেন মনে হচ্ছে। ঠিক তাই, তার মালপত্র সমস্ত কিছুই সেখানে ওঠানো হল। পরদিন অধ্যক্ষ সাহেব এবং প্রধান সহকারী দুজনে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় খোরশেদ আলম অত্যন্ত বেপরওয়াভাবে কথাবার্তা বলতে শুরু করেন। অধ্যক্ষের পদাধিকার বলে তাঁর যে মর্যাদা সেটুকুও পর্যন্ত তিনি অধ্যক্ষকে দিতে নারাজ। এরপরদিনই অধ্যক্ষ সাহেব সোলায়মানের ছাড়পত্র ইত্যাদি স্থগিত রাখেন এবং ঢাকায় হেড অফিসের ডেপুটি ডাইরেক্টর জনাব হামিদ আলী শাহ্ সাহেবকে বিস্তারিত জানিয়ে টেলিফোন করেন। এবং খোরশেদ আলম সম্পর্কে শাহ সাহেব কেবল বলেনঃ Kick him out right now সে আমাদের যথেষ্ট জ্বালাতন করেছে।

www.pathagar.com

এরপর যশোরের অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব সুফিয়ান আশরাফ তাঁকে তদন্তের ভার দেওয়া হয়। তিনি সরে জমিনে এসে আমাদের ডেকে সবটা জানার পর খোরশেদ আলমকে রীতিমত তিরস্কার করেন এবং তার পরিবারকে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেন। এতকিছুর পরও কিন্তু খোরশেদ আলম অত্যন্ত নির্লজ্জ বেহায়ার মত খুঁটি গেড়ে বসে থাকল এবং আমি সেখানে না থাকতে পেরে অধ্যক্ষের বাসায় আমার পিয়নসহ উঠে আসি। কেননা, অধ্যক্ষ তাঁর পরিবার ময়মনসিংহ থেকে নিয়ে আসেননি। মজার ব্যাপার হল যে, খোরশেদ আলমকে সমর্থন করছেন যান্ত্রিক বিভাগের একদল শিক্ষক। আর আমাকে সমর্থন করছে অফিস। পরিশেষে আমি একদিন অধ্যক্ষ সাহেবকে বলিঃ স্যার আপনারা তো যথেষ্ট চেষ্টা করলেন অথচ কিছুই করতে পারছেন না। আমি কি একটু চেষ্টা করে দেখতে পারি? অধ্যক্ষ সাহেব বললেন কী করতে চান আপনি? আমি বলি না এমন কিছু না, আমি একটু থানায় যাব তবে তার পূর্বে যে শেভ্রলেট কারটি গ্যারেজে রয়েছে ঐটি দয়াকরে আমাকে কিছুক্ষণের জন্যে দিবেন। উল্লেখ্য যে, আমি কিছু দিন পূর্বে উক্ত গাড়ীসহ কুষ্টিয়া পলিটেকনিকের যাবতীয় মালামাল মিউনিসিপ্যালিটির নিকট থেকে তাদের পাওনা অর্থ মিটিয়ে উদ্ধার করি। আমাদের তৎকালীন পরিচালক ড. ওয়াকার আহমদ সাহেবের সহযোগিতায়। গাড়ীটি যখন সবার সম্মুখ দিয়ে বের করে আমি থানায় নিয়ে যাই তখন সকলে নীরবে দেখেছে কিন্তু আমার সঙ্গে কেউ যেতে রাজি হয়নি।

থানায় উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে থানার ওসি সাহেব আমাকে হাসতে হাসতে বলেন আপনি যার জন্যে এসেছেন তার আর প্রয়োজন নেই। অধ্যক্ষ সাহেব আপনাকে এখনই ফিরে যেতে বলেছেন। আমিও তাঁর কথামত তখনই থানা থেকে প্রস্থান করি। পলিটেকনিকে ফিরে এসে দেখি দোতালা থেকে খোরশেদ আলমের সমস্ত মালপত্র উপর থেকে নীচে ফেলে দিচ্ছে অফিসের পিয়ন ও দারওয়ানেরা। অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে বললেন, আপনি থানায় যাচ্ছেন জানতে পেরেই খোরশেদ আলম তার মালপত্র সব নামিয়ে দেওয়ার জন্যে আমাদের অনুরোধ করে। এবং নীচের তলায় ছিলেন যান্ত্রিক বিভাগের শিক্ষক জনাব মহম্মদ আলী মিয়া, তিনি তাঁকে আশ্রয় দেন তাৎক্ষনিকভাবে। ঘটনা প্রবাহে খোরশেদ আলমের স্ত্রী যারপর নেই বেদনাহত ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ইতোমধ্যে খোরশেদ সাহেব চাকুরী থেকে ইস্তফা দেওয়া স্থির করে ফেলেন। তাঁকে শিক্ষকেরা অনেকে বুঝিয়েও কিছু করতে পারেন নি এমন কি অফিস পর্যন্ত চেষ্টা করেও তাঁকে ইস্তফা থেকে বিরত রাখতে

www.pathagar.com

পারেনি। তিনি তাঁর বড়ভাইকে জানিয়ে তাঁর সমস্ত মালপত্রসহ দেশে ফিরে যান। এবং একই সঙ্গে তাঁর বন্ধু সোলায়মানকে ছাড়পত্র দিয়ে বিদায় করা হয়। এবং ঐ বাসাটি আমার নামে বরাদ্দ করা হয় সরকারীভাবে।

১৯৬৯ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী আমার তৃতীয় সন্তান মোসাম্মাৎ নাজমুন নাহার শাহীন ভূমিষ্ট হয়েছে পাবনার সেই বাসাতেই, তখন আমি ছিলাম ঢাকায়। আমার স্ত্রী তিনটি সন্তান নিয়ে আমার পিতা মাতার সঙ্গেই এতদিন ছিলেন পাবনায়। কিন্তু এবার তাঁকে কুষ্টিয়ায় এ বহু বিতর্কীত বাসার নিয়ে আসার প্রয়োজন পড়ে। আমার অফিস পিয়ন কাজি আব্দুস সালাম এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পাবনা থেকে সমস্ত মালপত্র ট্রেনে প্রথম শ্রেণীতে কিছু এবং বাকী ফার্নিচারগুলি গড়াই নদীপথে নৌকাযোগে কুষ্টিয়ায় আনয়ন করা হয়। আমার পিতামাতার প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য জিনিষপত্রগুলি বাদে। কেননা, আমার পিতা তখনও পাবনায় চাকুরীরত অবস্থায় ছিলেন। এবং ইতোপূর্বে কুষ্টিয়া যাত্রার পূর্বে পাবনা শহরে আমার এক নানা জনাব সৈয়দ আবুল মনসুর সাহেবের সম্প্রতি ক্রয়লব্ধ শূন্য বাড়িটিতে আমার পিতামাতাকে থাকার জন্য অনুরোধ করেন সুদূর লন্ডন থেকে। তাই সে বাড়ীতেই আমার পিতা-মাতা দীর্ঘদিন অবস্থান করেন এবং আমি পাবনার সরকারী বাসাটি ছেড়েদিই। কেননা, বিশ্বব্যাংকের সাহায্যে যে পাঁচটি পলিটেকনিক তৈরী হচ্ছিল যেমন, পাবনা, বগুড়া রংপুর, বরিশাল ও সিলেট এই বৃহৎ প্রকল্পের বাস্তবায়নের জন্যে সিংঙ্গেতে আমার ঐ বাসাটি কর্তৃপক্ষের দারুণ চাহিদা ছিল প্রয়োজনের তাগিদে। অতএব, আমি যথাসম্ভব বাসাটি দ্রুত পরিত্যাগ করি। পাবনা থেকে কুষ্টিয়া যাওয়ার সময় আমার মায়ের ইচ্ছানুযায়ী আমাদের প্রথম সন্তান ফারুককে তাঁর কাছে রেখে যেতে হয়। সঙ্গে নিয়ে যাই বড় মেয়ে শিল্পী বছর তিনেক বয়স এবং ছোট্ট মেয়ে শাহীন মাত্র মাস তিনেকের। অবশ্য আমার স্ত্রীর অস্থিরতার কারণে ক'দিন পরই ছেলেকে কুষ্টিয়ায় নিয়ে আসা হয়।

কুষ্টিয়া পলিটেকনিকে মাত্র বছর দুই ছিলাম। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে আমি বহুমুখী কাজের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ি। সত্যিকথা বলতে কি কুষ্টিয়ার আবহাওয়া আমার জন্য ছিল অত্যন্ত সুখপ্রদ। বহুপূর্ব থেকেই আমার শরীরে ছিল বাত-বেদনার যন্ত্রণা, একমাত্র এই শহরেই আমি ছিলাম সম্পূর্ণ সুস্থ। কোনদিন কোনরকম শারীরিক অসুবিধা বোধ করিনি। শহরে নিউমার্কেটের অপর পাশেই ছিল আমার এক খালার বিশাল প্রাসাদ। মোল্লা আব্দুল হাকিম ছিলেন আমার এক খালু। তিনি অনেক পূর্বেই ইন্তেকাল করেন, তিনি স্ত্রীসহ চার কন্যা ও একপুত্র

www.pathagar.com

সন্তান রেখে দুরারোগ্য ব্যাধিতে ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। পলিটেকনিক থেকে খালার বাড়ী মাত্র এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আমি প্রতি মাসেই চাঁদের ১১ তারিখে এগারই শরীফের মিলাদ মাহফিল করতাম এবং তাঁদের বাসায়ও দাওয়াত পাঠাতাম। কুষ্টিয়ায় তখন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন জনাব আব্দুল আজিজ খান এম এ; এল এল বি। তিনি আমার বন্ধু খান মকবুল আহমদের ছোটভাই। স্বভাবতঃই তাঁদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের বহু পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল। অতএব তিনিও আমাদের ড্রইং রুমে মিলাদ মাহফিলে প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। আমি নিজে যদি কখনও অফিসের কাজে কুষ্টিয়া শহরের বাইরে থাকতাম, তবে আমার স্ত্রী মহিলাদের নিয়ে মিলাদ মাহফিলটা ঠিকমত চালিয়ে যেতেন। যেহেতু তিনি আরবী ফারসী ও উর্দ্দূ ভাষায় কিছু পড়াশুনা করতে পারতেন। তখনকার দিনে বেশ সস্তার বাজার ছিল। ফলে, মিলাদ মাহফিলের তাবারুক হিসাবে প্রায়ই বিরিয়ানীর ব্যবস্থাই থাকত বেশী। আমি পত্র মারফত কলকাতায় হুজুর পাককে আরজি করে এই মিলাদ মাহফিলের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম। তখন আমার পীর ও মুর্শেদ পর্দা হুজুর কিবলা পৃথিবীতে হায়াতে ছিলেন।

কুষ্টিয়া পলিটেকনিকে থেকে আমার সেকেন্ড শিফট ট্রেড প্রোগ্রামের জন্যে অফিস বিল্ডিং ক্লাস রুম, ওয়ার্কশপ এবং আমার কোয়াটারের জন্যে যাবতীয় টেন্ডার ডেকে ওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে ফেলেছিলাম। অতএব, যথারীতি বিধি মোতাবেক দ্রুত কাজ শুরু করা হয়েছিল। এবং আমি কাজের সুপারভিশন করতাম নিজেই। মূলতঃ এটাই ছিল আমার প্রধান কাজ। ঐ সময় তখন কোন মসজিদ ছিলনা বলে, আমি নিজ উদ্যোগে একটা গোডাউনের কিছুটা অংশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে জামাতে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছিলাম। তবে শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজের জন্য পলিটেকনিকের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ওয়াপদা (WAPDA) কলোনিতে তাঁদের যে জামে মসজিদ ছিল সেখানে অথবা কখনও কখনও শহরের প্রধান জামে মসজিদেও উপস্থিত হয়ে জুম্মার নামাজ আদায় করতাম। বর্তমানে অবশ্য কুষ্টিয়া পলিটেকনিকের পুকুরের পশ্চিম পাড়ে ছাত্রাবাসের নিকট খুব সুন্দরভাবে একটা জামে মসজিদ তৈরী করা হয়ছে। এরই পশ্চিমে বিশাল খেলার মাঠ।

আমি যখন কুষ্টিয়া যাই তখন সেখানে তেমন কোন অডিটোরিয়াম বা মিলনায়তন ছিলনা। কিন্তু আমার সেখানে যাওয়ার মাত্র কিছুদিন পূর্বে কলেজ বিল্ডিং এর তৃতীয় তলায় কিছু কাঠের চৌকি তৈরী করা হয়েছিল মাত্র। অধ্যক্ষ সাহেবের অনুমতিক্রমে আমাকেই ঐ মিলনায়তনের কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেহেতু

www.pathagar.com

আমি পাবনা পলিটেকনিকে ইতোপূর্বে আমার উড-ওয়ার্কিং শপে কাজ চলার মত অধ্যক্ষ শাহজাহান সাহেবের নির্দেশে একটা মিলনায়তন তৈরী করেছিলাম, সেই অভিজ্ঞতার আলোকে কুষ্টিয়া পলিটেকনিকের তিন-তলায় কাজ চলার মত একটা মিলনায়তন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। এবং সেখানে একটা চমৎকার নাটকও আমরা উপস্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিলাম। পাবনায় নবনির্মিত মিলনায়তনে অবধুতের লিখা অন্ধকারের নীচে সূর্য এই চমৎকার নাটকটি আমরা মঞ্চস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলাম এবং আমি সেই নাটকের পরিচালকের ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যে, আমি জীবনে কখনও কোন নাট্যমঞ্চে অভিনয় করিনি। কেননা, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিই ছিল আমার প্রধান ভূমিকা পালনের উপযুক্ত ক্ষেত্র। অথচ শিক্ষকতা জীবনের দীর্ঘ ৩০ বছর আমার সুপ্রিয় ছাত্র-ছাত্রীরা শ্রেণীকক্ষে পড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে আমাকে প্রায়ই প্রশ্ন করত যে আমি জীবনে কতগুলি নাটক করেছি? সম্ভবতঃ নাটকীয় ভঙ্গিতে তাদের শিক্ষাদানের ফলশ্রুতিতেই হয়ত তাদের এরূপ ধারণা জন্মাতে পারে। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষাদানের মুহূর্তগুলি সম্ভবত আমার জীবনের সবচেয়ে মধুময় সময় বলেই আমার মনে হয়েছে। ফলে, বহু ছাত্র-ছাত্রী আমার অত্যন্ত ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে পড়ে। আমার সঙ্গে কেউ কোনদিন বেয়াদবি করেছে এরূপ ঘটনা আমার মনে পড়েনা। সত্যিকার অর্থে আমি কোনদিনই ছোট ছোট বাচ্চা ছেলে মেয়েদের পড়াতে অভ্যস্থ ছিলাম না। এমনকি, আমার নিজের চারজন সন্তানের কাউকেই কোনদিন শিক্ষাদানে বসিনি বটে। তবে আমার স্ত্রীই এর জন্যে যথেষ্ট ছিলেন। বরং প্রথম থেকেই আমি বয়স্কদের শিক্ষাদানের জন্যে ছিলাম সম্ভবত উপযুক্ত শিক্ষক। হয়ত এ জন্যেই আমি শিক্ষকতার উপর বেশ কিছু বই পড়ে ফেলার সুযোগ পেয়েছিলাম। শিক্ষকতা পেশাটি খুব সহজ নয় নিশ্চয়ই। কেননা, কেবল বিষয় বস্তুর উপর প্রগাঢ় জ্ঞানই যে যথেষ্ট নয় এটা আমি বিলক্ষণ জানতাম। অবশ্য এটাও যে মোটেই গৌন নয়, তাও আমার জানা ছিল। আর এজন্যেই বোধ করি এ পেশাটি সম্পর্কে ইংরেজিতে সুন্দরভাবে বলা হয়ঃ Teaching is the most noblest profession in the Society. "বাস্তবিকপক্ষে সমাজে যতগুলি পেশা আছে তার মধ্যে শিক্ষকতা যে নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম মহান পেশা এতে আশা করি কারো দ্বিমত নেই। আর এ জন্যেই আমাদের প্রিয় নবী মহম্মদ (সঃ) বলেছেনঃ খায়রোকুম মান্ তায়াল্লামাল কোরআনা ওয়া আল্লামা।" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে কোরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়। এই মহাবানীর প্রতি আমাদের প্রত্যেকেরই ভক্তি ও বিশ্বাস থাকা অপরিহার্য।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে কুষ্টিয়া পলিটেকনিকের মূল অধ্যক্ষ জনাব শামসুদ্দীন আহমদ সাহেব আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তাঁর কাজে যোগদান করেছেন। তিনি ফিরে আসার পর আমাকে এবং আমার পরিবারদের দেখে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী কবিতাভাবী দারুণ খুশী, যেহেতু পূর্ব থেকেই সম্পর্ক ছিল সৌহার্দপূর্ণ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই কবিতাভাবীর উদ্যোগে কুষ্টিয়া শহরের বাইরে একটা পিকনিক স্পটে গিয়ে সকল শিক্ষক-কর্মচারী মিলে খুব চমৎকার একটা বনভোজন আমরা উপভোগ করি।

পলিটেকনিকের ছাত্রদের হঠাৎ একবার এক অদ্ভুত বাসনা হয় যে, তারা সুন্দর বনে গিয়ে পিকনিক করবে এবং আমাকে তাদের প্রধান বাবুর্চি হিসাবে পছন্দ হওয়ায় আমার কাছে এ আবদার করে বসে অতি তীব্রভাবে। আমি কোনমতেই যখন এটা আর উপেক্ষা করতে পারলাম না, তখন তাদের রান্নার যাবতীয় প্রয়োজনীয় ফর্দ্দ বা লিস্ট তৈরী করে দিলাম। ছেলেদের দারুণ আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখে আমিও মনে মনে প্রস্তুতি নিলাম। শিক্ষকদের মধ্যে মাত্র দু'চার জন আমার সহযাত্রী ছিলেন। এঁদের মধ্যে কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটের শিক্ষক জনাব আকসেদ আলী সাহেব ছিলেন আমার সহকারী। আমরা প্রথমে কুষ্টিয়া থেকে যশোর হয়ে খুলনার মঙ্গলা পোর্টে পৌছাই। সেখান থেকে জলপথে মটর লঞ্চ যোগে একেবারে সুন্দরবনে গভীর অরণ্যে গিয়ে উপস্থিত হই। একশত জন ছাত্র আমাদের সহযাত্রী হিসাবে ছিল। সঙ্গে ছিল দু'টি বড় বড় খাশী, পাবনার খাঁটি গাওয়া ঘি এবং বাসমতিচাল আমি পূর্ব থেকেই একাজের জন্য ছাত্র নেতাদের বার বার বলেছিলাম যে মশলাগুলি বেঁটে নিয়ে যাবে, যেন জঙ্গলের মধ্যে মশলা বাটার ঝামেলা না করতে হয়। লঞ্চের মধ্যেই আলু, পিয়াজ ইত্যাদি পরিস্কার করে বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। খেলার জন্যে তাস, দাবা এবং কেরাম বোর্ড সঙ্গে নিয়েছিল ছেলেরা। বেলা ১০টার মধ্যে আমরা সেখানে গিয়ে যেখানে লঞ্চ থেকে নামলাম সেটা খুব নিরাপদ জায়গা নয়। বাঘের ভয় রয়েছে বলে সেখানে তৈরী করা হয়েছে উঁচু করে খুঁটি গেড়ে একটা চালাঘর। সিঁড়ি বেয়ে ছেলেরা উপরে উঠে খেলায় মত্ত হল। আমি কজন কর্মীকে নিয়ে রান্নার আয়েজন করতে একটু দূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা চালাঘর খুঁজে পেতে বের করলাম। জঙ্গলের মধ্যে মাত্র দু'চারটি ঘর ছাড়া আর তেমন কোন বস্তি চোখে পড়লনা। প্রথমেই চুলা বানানোর ঝামেলা শেষ করে চুলা জ্বালানোর ঝামেলায় পড়লাম, কেননা মুশলধারে বৃষ্টি নেমে এল। শুকনা কাঠ যা এনেছিলাম সঙ্গে তাও থাকল না উপরন্তু একটিন কেরোসিন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। চুলা জালানো হল। মশলা যা বেঁটে আনার কথাছিল, তাও দেখছি বাঁটা হয়নি। স্থানীয় দু'এক জন

www.pathagar.com

মহিলার সাহায্যে সেটাও তৈরী করা হল। প্রধান সমস্যা হল, রান্নার জন্যে যে আকারের হাতা দরকার, সেটি আনা হয়নি। এমন কী দিয়ে অতবড় ডেকচিতে খানা নাড়া দেব তা আর ভেবে পাইনা। ওখানকার লোকদের বলায় তারা নৌকার বৈঠা এনে দিল যাতে আল কাতরা লাগানো আছে। আমি অনেক বুঝিয়ে তাদের বলি যে নূতন বৈঠা যাতে কোন আলকাতরা লাগান নেই, এখন একটি বৈঠা পেলে কাজ চলতে পারে। শেষে অনেক খুঁজাখুঁজি করে একজন নিয়ে এল ঐ বৈঠা যার সাহায্যে জনাব আকসেদ আলী শক্তিমান পুরুষ প্রবল শক্তি দিয়ে নাড়া দেওয়ার চেষ্টায় রত থাকলেন। সারটি দিন ঐ বৃষ্টি বাদলের মধ্যে বহু মুশকিলের পর রান্নার কাজ শেষ হল। এখন এই একশজন লোকের খাবারের ডেকচি এতই ভারী হয়ে উঠলো যে দু'টি বাঁশের সাহায্যে চুলা থেকে নামিয়েই কাদার উপর ডেকচি ফেলে সেটিকে ঠেলে একবারে নদীর তীরে একটি ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকার উপর বহু কষ্টে উঠিয়ে যখন ছেলেদের ক্যাম্পে নিয়ে আসা হয়, তখন সন্ধ্যা প্রায়। ক্ষুধায় সকলেই প্রায় ক্লান্ত। অতএব প্রচন্ড ক্ষুধা থাকার জন্যেই হোক বা রান্না যথেষ্ট মুখরোচক হওয়ার জন্যেই হোক সকলেই প্রাণভরে ও পেট ভরে বিরিয়ানী খেয়ে তৃপ্তির আস্বাদে আনন্দে আটখানা। আমরা যে দু চারজন রান্নায় কীরূপ ব্যস্ত ছিলাম এবং বিব্রত ছিলাম তা আর তারা কেউ জানতে পারলো না। এভাবেই যেন এক রান্না যুদ্ধ থেকে বিজয়ের আনন্দে আমার সব ক্লান্তি আমি ভুলে গেলাম।

কুষ্টিয়া পলিটেকনিকের সঙ্গেই ছিল কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট, যার প্রধান ছিলেন জনাব আবু তালেব হাওলাদার (এম,কম,)। তিনি এবং আমি দু'জনে একত্রে বসে ঠিক করি যে, আমাদের দুজনের এই শিক্ষা প্রোগ্রাম এ অঞ্চলে একেবারেই নূতন। অতএব সমস্ত কুষ্টিয়া জেলায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রচারণার জন্যে একটা সফর সূচী তৈরী করা যেতে পারে। তবে এর জন্য প্রয়োজন আমাদের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর সাহেবের অনুমোদন। নতুবা আমরা এই সফরের জন্যে কোন ভ্রমন ভাতা ইত্যাদি পাবনা। সুতরাং আমরা একটা পূর্ণ কর্মসূচিসহ আমাদের ডাইরেক্টর সাহেবের নিকট ঢাকায় প্রেরণ করি এবং তিনি সানন্দে এটা অনুমোদন করেন। অবশ্য ইতোমধ্যে আমার দ্বিতীয় শিফট ট্রেড প্রোগ্রামের জন্য যাবতীয় কার্য প্রণালী সম্পন্ন হয়েছিল। শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োগ এবং ক্লাস নেওয়ার মত প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সবই প্রস্তুত ছিল। অতএব, সমস্ত কুষ্টিয়া জেলায় সর্বমোট ৭২টি হাইস্কুলের মধ্যে আমরা ৪২টি স্কুলে পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক এই প্রচার সফর করতে সক্ষম হয়েছিলাম। বন্যার জন্যে সবগুলি স্কুলে যাওয়া সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

যে সব স্কুলে আমরা যেতে পারিনি, সেই সব স্কুলগুলি পার্শ্ববর্তী স্কুলের নিকট থেকে আমাদের অপূর্ব ভাষণ বা বক্তৃতা শুনার পর তারা পুনরায় আমাদের অনুরোধ করেন যেন আমরা তাদের বন্যা কবলিত স্কুলগুলিও ভ্রমণ করি। কিন্তু দীর্ঘ মাসাধিককাল এই প্রোগ্রামের পর আর তা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি বলে আমরা দুঃখিত। তবে আমরা যে ৪২টি স্কুলে ভ্রমন করেছি তাঁরা আমাদের প্রতি যথেষ্ট ভাল আতিথেয়তা এমনকি কোথাও কোথাও রাত্রে থাকার ব্যবস্থা পর্যন্ত করেছিলেন উত্তমরূপে। কেননা, আমাদের উভয়ের এই অভিনব শিক্ষা পদ্ধতির কথাগুলি তাঁরা দারুণভাবে মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করেছিলেন ছাত্র-শিক্ষক সকলে মিলে। যেহেতু ইতোপূর্বে এমন নূতন ধরনের শিক্ষাপদ্ধতির কথা তাঁদের আদৌ জানা ছিলনা। জনাব আবু তালেব হাওলাদার সাহেব আমার একজন উত্তম বন্ধুরূপে পরিচিত ছিলেন সবার কাছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে তাঁকে একবার রাজবাড়ী রেলস্টেশনে দেখা গিয়েছিল, এরপর আর তাঁর কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। মহান আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাতবাসী করুণ, কাতর হৃদয়ে এই প্রার্থনা করি। আমীন!! সুম্মা আমিন!!!

কুষ্টিয়া পলিটেকনিকে থাকাকালীন আমার এক ফুপাত ভাই সৈয়দ আকা নওয়াজ হঠাৎ ভারত থেকে চলে আসে। এবং সেও ট্রেড কোর্সে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতে থাকে। কুষ্টিয়ায় থাকাকালীন অবস্থায় আমরা ভকেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর সুপারইনটেনডেন্টদের ঢাকায় ডাকা হয় দু'একবার কনফারেন্সের জন্যে। তখন আমরা সংখ্যায় প্রায় ৩৫ জন সুপার উপস্থিত ছিলাম। এই সময় জাতীয় বেতন স্কেলের উপর সম্প্রতি সরকার প্রধানদের আলাপ আলোচনা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌছেছিল। কেবল মাত্র গেজেট হওয়া বাকী থাকার জন্যে সর্ব সাধারণের জ্ঞাতব্যের বাইরে ছিল বিষয়টি। আমরা যখন মিটিং এর মধ্যে আমাদের পরিচালক ড. ওয়াকার আহমদ সাহেবকে পেলাম, তখন আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ কৌতুহল বশতঃ তাঁকে আমাদের পে-স্কেলের ব্যাপারটা একটু জানতে চাইলে তিনি বলেন এ মুহূর্তে তো আমার ঠিক মনে পড়ছেনা, তবে যারা জানে আমি তাদেরকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। ঠিকই তিনি পাঠিয়েছিলেন দু' তিনজনকে। কিন্তু কেউই আমাদের প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে বরং উল্টাপাল্টা একটা জবাব দিয়ে নিষ্কৃতি পান। সবার শেষে আসেন জনাব রফিকুল হক। সহকারী পরিচালক। তিনি নিজেকে বেশ একজন চৌকশ অফিসার বলে বিবেচনা করতেন। তাঁকে আমার বন্ধুরা বেশ অনেকগুলি প্রশ্ন করল বটে কিন্তু আসল উত্তর যেটা আমরা জানতে চাই তা তিনি

www.pathagar.com

অত্যন্ত কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। আমি সেখানে সম্পূর্ণ নীরব দর্শকের ন্যায় বসে ছিলাম। ইতোপূর্বে একটি প্রশ্নও কাউকে করিনি। হঠাৎ আমার মনে হল, এবার কিছু একটা প্রশ্ন জনাব রফিকুল হক সাহেবকে অবশ্যই করা যেতে পারে মনে করে আমি উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলে উঠেন, "না আর কোন প্রশ্ন নয়, আমি তোমাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছি। "বলেই তিনি উঠে চলে যেতে উদ্যত। আমি তাঁকে অনুরোধ করে বলি স্যার, আমিও কোন প্রশ্ন করবনা এমনকি আমার বন্ধুরাও আর কেউ কোন প্রশ্ন আপনাকে করবেনা। তবে, আপনি একটু পূর্বে বলেছেন যে, আমাদের পে-স্কেলের সঠিক অংকটা আপনার এখন ঠিক মনে পড়ছেনা। তবে, আপনি যা দেখেছেন সেটাতে আপনি সন্তুষ্ট। অতএব, আমরা আপনার এই কথাটির উপর ভরসা রাখতে পারি কিনা, এটাই নিশ্চিৎভাবে জানতে চাই আপনার কাছে। এ কথা শুনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখশ্রী রক্তিম আকার ধারণ করল এবং তিনি অত্যন্ত অপ্রস্তুত অবস্থায় স্থান ত্যাগ করলেন দ্রুত কেবল মাত্র হ্যাঁ এই উত্তরটুকু দিয়েই। এতে যদি আমার কোন অপরাধ হয়ে থাকে কিনা আমি তা জানিনা। তবে আমার উপর তাঁর এই ক্রোধ কখনও প্রশমিত যে হয়নি, তা আমি অনেক পরে টের পেয়েছি কুষ্টিয়া পলিটেকনিকে থাকতেই। কেননা, তিনি আমার স্থানে আমার বন্ধু লুতফর রহমানকে বদলী করে আমাকে স্থানান্তর করার উদ্দেশ্যে একটা অর্থহীন (Vague) নিয়োগপত্র পাঠান সিলেটে যাওয়ার জন্যে। অথচ আমি কার বদলে কোথায় কীভাবে কাজে যোগদান করব সেসব কোন উল্লেখ নেই। কুষ্টিয়ার অধ্যক্ষ সাহেবকে বার বার টেলিফোন করে আমাকে উৎখাত করার চেষ্টায় তিনি রত থাকেন নিরবিচ্ছিন্নভাবে। এদিকে বন্ধু লুতফর রহমান তার পুরো পরিবারবর্গসহ কুষ্টিয়ায় উপস্থিত। সে বেচারার কোন ত্রুটি নেই, সে নিজেও আমার বদলীর নির্দেশনামা দেখে হতভম্ব। আমাকে বার বার তীব্র তাগাদা দেওয়ায় আমিও কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় থেকে হঠাৎ একদিন জনাব আব্দুল আজিজ ভাইয়ের কাছে তাঁর কোর্টে হাজির হয়ে নিয়োগপত্রটা দেখালাম, তিনি বললেন আপনি কখনই এর উপর ভরসা করে এখান থেকে নড়বেন না। কেননা, আপনাকে সম্পূর্ণ বিপদে ফেলার ব্যবস্থা এটা। ইতোমধ্যে অধ্যক্ষ শামসুদ্দীন সাহেবকে বদলীর হুকুম হয়ে গেল। এবং তার জায়গায় এলেন রাজশাহী থেকে অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রফিক সাহেব, তিনি ছিলেন রফিকুল হক সাহেবের নিকট আত্মীয়। কিন্তু জনাব আব্দুর রফিকের আমি ছিলাম অত্যন্ত স্নেহধন্য এবং আমিও তাঁর অত্যন্ত গুণমূগ্ধ ছিলাম। সুতরাং এবার ঢাকা থেকে

www.pathagar.com

আমার জন্য আবার বদলীর হুকুম আসল রংপুর যাওয়ার জন্যে এবং যথারীতি পূর্ববত নিয়োগ পত্রের চরিত্র একই প্রকৃতির অর্থাৎ আমি রংপুরেও কাজে যোগদান করতে পারিনা। এদিকে আমার বন্ধু লুতফর রহমান প্রায় তিন মাস বাইরে ভাড়া বাসায় থাকতে বাধ্য হলেন। আমার প্রতি তাঁর অনুকম্পাও যথেষ্ট বলেই কোনদিন কোন মনোমালিন্য ঘটেনি। তাঁর এবং আমার পরিবারের মধ্যে প্রায়ই আসা-যাওয়া চলত।

এদিকে অধ্যক্ষ আব্দুর রফিক সাহেব আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন এই আমি এলাম আর তুমি কোথায় যাবে? তুমি না আমার ব্যাডমিন্টন পার্টনার, থাক তুমি আমি দেখছি। ইতোমধ্যে ১৯৭০ সালের সেই মহান নির্বাচন এসে উপস্থিত। আমাকে প্রিজাইডিং অফিসার হিসাবে পাঠান হয় কুষ্টিয়া জেলার সবচেয়ে উপদ্রুত এলাকা দৌলতপুরে। আমরা ক'জন অফিসার নির্বিঘ্নে নির্বাচন সমাপনান্তে কুষ্টিয়ায় ফিরে আসি। হঠাৎ দেখি অধ্যক্ষ রফিক সাহেব ধীর মন্থর গতিতে আমার বাসায় উপস্থিত হয়ে আমাকে বলেন চৌধুরী I am very sorry, আমি তোমার জন্যে কিছুই করতে পারলাম না। তুমি বরং নিজে ঢাকায় গিয়ে চেষ্টা করে দেখ কি করতে পার। আমি বলি, স্যার আপনি চেষ্টা করে যেটা পারেন নি সেটা আমার পক্ষে কিভাবে সম্ভব? তাছাড়া আমার হাতে এখন তেমন টাকা পয়সাও নাই। পরিশেষে, তিনি ক'দিন পরে আমাকে বলেন ঃ "চৌধুরী তুমি লুতফর রহমানকে চার্জ হ্যান্ডওভার কর।" আমি বলি স্যার আমি কি করব? তুমি রংপুর চলে যাও একা। লুতফর রহমানকে চার্জ দেওয়ার সময় আমি তাঁর অফিসে বসে বলি আজকের থেকে চার্জদিই। তিনি বলেন না, যখন থেকে লুতফর এখানে এসেছে ঠিক তখন থেকে দাও। আমি বলিঃ স্যার আপনার কথার উপরই কেবল আমি এটা করতে পারি তবে আমার বিপদটা তো আশাকরি বুঝতে পারছেন। তিনি বলেন, হ্যাঁ আমি দেখব কথা দিলাম। সেখানে অধ্যক্ষ হালিম সাহেব আছেন; আশাকরি তোমার কোন অসুবিধা হবে না।

২০ নভেম্বর, ১৯৭০ সালে আমি রংপুর পলিটেকনিকে উপস্থিত হই। আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ এম, এ, হালিম সাহেব আমার (Vague) অর্থহীন নিয়োগপত্র দেখে তো অবাক। তিনি আমাকে বলেন তুমি কোথায় কার বদলে কাজে যোগদান করবে এসব তো কিছুই উল্লেখ নাই। আমি তাঁকে অনুরোধ করি, স্যার আপনি দয়া করে কুষ্টিয়ায় অধ্যক্ষ আব্দুর রফিক সাহেবকে টেলিফোন করুন। তিনিই আপনাকে প্রকৃত ব্যাপারটা হয়ত জানাতে পারবেন। যাহা হউক ! রফিক সাহেবের সঙ্গে কথা

www.pathagar.com

বলার পর জনাব হালিম সাহেব আমাকে বলেন ঠিক আছে। থাক তুমি। অবশ্য ইতোপূর্বে আমার পরিবারবর্গকে পাবনায় রেখে এসেছি এবং আমার পরিত্যক্ত বাসাটি বন্ধু লুতফর রহমানকে ছেড়ে দিয়েছি। প্রায় মাস তিনেক রংপুরে ছিলাম। বেতন না পাওয়ায় স্থাপত্য বিভাগের প্রধান জনাব মহম্মদ শাহজাহান সাহেবের নিকট কিছু টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। রংপুরে প্রচন্ড শীতের জন্যে বিছানা পত্র সবই নূতন করে বাজার থেকে কিনতে হয়েছিল। ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাসে আমরা মাত্র দশ, বার জন শিক্ষক থাকতাম এর মধ্যে আমাকে একটি পৃথক কামরা দেয়া হয়েছিল। ওখানকার শিক্ষক বন্ধুরা গল্পগুজবের মাধ্যমে হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে, আমি নাকি ভাল বিরিয়ানী রান্না করতে পারি। ব্যাস, আর যাবে কোথায় যেমন কথা তেমনি কাজের প্রস্তুতি সকলেই খুবই আমোদ আহ্লাদে থাকতাম। আমি ফাঁকে ফাঁকে স্থাপত্য বিভাগের কিছু কিছু ক্লাসও নিতাম সিনিয়র শিক্ষক হিসাবে এবং বয়ঃ জৈষ্ঠতার কারণে আমাকে প্রায় সকলেই বড়ভাই বলে সম্বোধন করতেন। রংপুরে তখন কাটারীভোগ চাল মাত্র বার আনা সের এবং আস্ত মুরগী একটাকা দুআনা সের। অতএব আমার শিক্ষক বন্ধুদের আবদার অনুরোধে তাঁদের পছন্দ চিকেন বিরিয়ানী রান্নার কাজে নামতেই হল আমাকে একদিন। আমার সহযোগী থাকল মেসের বয়সারভেন্ট। বন্ধুরা টাকা পয়সা দিয়েই খালাস। আমি বাজার থেকে সবকিছু কিনে এনে রান্নার আয়োজনে নেমে পড়ি। বন্ধুরা সর্বক্ষণ তাস খেলায় মত্ত। সেদিন ছিল ছুটির দিন। অতএব দুপুরের পরপরই চিকেন বিরিয়ানী পেটপুরে খেয়ে সকলেই আমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এমন আনন্দমুখর পরিবেশ আমারও খুবই ভাল লাগল। এভাবেই রংপুরে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন বাঙ্গালী বিহারী দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। উভয় পক্ষেরই বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে কোন একদিন জেনারেল টিক্কাখান ঢাকায় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এবং সেই দিনই রংপুর থেকে একটা ট্রেন ঈশ্বরদি পর্যন্ত ছেড়ে আসে এবং আমি দেশের রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে ঐ ট্রেনেই ঈশ্বরদি হয়ে পাবনা চলে আসি। সঙ্গে কেবল মাত্র একটা হ্যান্ডব্যাগ ছাড়া আর কিছুই নিয়ে আসিনি। ধারণা ছিল মাত্র কদিন পরই আবার ফিরে আসব রংপুরে। কিন্তু সারা দেশময় একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে টালমাটাল অবস্থা। বাঙ্গালী বিহারী আক্রোশ খুনাখুনি এবং পাক বাহিনীর হিংস্র ছোবলে আবালবৃদ্ধবনিতা কেউ বাদ গেল না। দেশত্যাগ করল হিন্দু মুসলমান মিলে প্রায় এককোটি। সে সময় ভারত সরকারের বদান্যতায় বহু লোকের জীবন রক্ষা পেয়েছিল। আমি ছিলাম পাবনায়। লক্ষ্য করেছি যে, সমস্ত অবাঙ্গালী ও

www.pathagar.com

পাঠান কাবুলীওয়ালা এধরনের প্রায় ১৩৭ জনকে পাবনা শহরে গোলাগুলির মাধ্যমে নিঃশেষ করা হয়। ঢাকায় ২৫ শে মার্চের রাত্রে পাক বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালান হয়, তাতে বহু বাঙ্গালী পুলিশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পাবনার পরপরই শুরু হয় কুষ্টিয়ায় অবাঙ্গালী হত্যাযজ্ঞ। সেখানেও প্রায় তিনশত অবাঙ্গালী সিপাহীদের ঘিরে ফেলে হত্যা করা হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেনারেল টিক্কা খান ঘোষণা করেছিলেন I want the red soil of Kushtia and Pabna. এবং পরবর্তী সময়ে পাক বাহিনী যখন পাবনা ও কুষ্টিয়া দখল করে তখন তার প্রতিশোধ তারা উত্তমরূপে নেয়ার চেষ্টা করেছে। এইরূপ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমি আমার স্ত্রী, এক ছেলে ও দুই মেয়ে নিয়ে ঢাকায় গিয়ে স্বামীবাগে আমার মতলুবা খালা এবং জনাব আব্দুল ওহাব খালুর কাছে গিয়ে উঠি। পাবনার পরিস্থিতি লক্ষ্য করে এখানে থাকা নিরাপদ মনে করিনি। কেননা, পাবনায় তখন মিলিশীয়া বাহিনী এসে পড়েছিল এবং তাদের ভয়ঙ্কর চেহারায় আমাদের নিরাপত্তা বোধের দারুণ অভাব বিরাজ করছিল। আমার পিতা মাতাই আরো আমাদের পাবনা ছেড়ে যাওয়ার জন্যে পিড়াপীড়ি করেন।

দু'তিন সপ্তাহ পরই আমরা আবার পাবনায় ফিরে আসি। রংপুর থেকে ফিরে আসার পর পরই আমি ঢাকায় গিয়ে আমার পোস্টিং এর ব্যাপারে তৎপরতা শুরু করি। কিন্তু জনাব রফিকুল হক সাহেব আমাকে পুনরায় রংপুরে যাবার জন্যে পীড়াপিড়ী করতে থাকেন। তখন পাবনা থেকে ঈশ্বরদি পর্যন্ত কোন বাঙ্গালীর যাওয়া মোটেই নিরাপদ ছিলনা। সে অবস্থাতেও তিনি আমাকে রংপুর যাওয়ার জন্যে বারবার তীব্র তাগীদ দিতে থাকেন। আমি বলি স্যার এ অবস্থায় আমি গেলে তো পথেই মারা যাব। এবং তখনও তিনি বলেন তা আর কি করা যাবে, চাকুরী করতে গেলে তো তোমাকে অবশ্যই রংপুর যেতে হবে; নতুবা তুমি বকেয়া বেতন ইত্যাদি কিছুই পাবে না। অবশেষে আমি নিরুপায় হয়ে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ডাইরেক্টর ড. ওয়াকার আহমদ সাহেবের নিকট দেখা করি এবং আমার অবস্থা তাঁকে জ্ঞাপন করি এবং তিনি জানতে চান তুমি কোথায় যেতে চাও? আমি বলি স্যার, আমার বৃদ্ধ পিতামাতা পাবনায় আছেন, অতএব আমি পাবনাতেই যেতে চাই। অতঃপর তিনি আমাকে বিদায় দিয়েই জনাব রফিকুল হক সাহেবকে টেলিফোন করেন। আমি পরের দিন হেড অফিসে আসার পর আমাকে রফিকুল হক সাহেব দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন তুমি এখনও রংপুর যাওনি? তাহলে তো তুমি টাকা পয়সা কিছুই পাবেনা। আমি বুঝলাম যে তিনি কতদূর উন্মাদ হয়ে উঠেছেন আমাকে

www.pathagar.com

সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়ার জন্যে। আমি পুনরায় নিরুপায় হয়ে আবার ড. ওয়াকার সাহেবের সম্মুখে হাজির হয়ে বলি স্যার, রফিকুল হক সাহেব আমাকে আবার রংপুর যাওয়ার জন্যে তাগীদ দিচ্ছেন। এটুকু শুনা মাত্রই ওয়াকার সাহেব আমাকে বলেন, যাও তাকে ডেকে আন। আমি তাঁর হুকুম তামিল করি এবং রফিকুল হক সাহেবের সঙ্গেই ড. ওয়াকারের সম্মুখে উপস্থিত হই। ওয়াকার সাহেব তাঁকে কড়া ভাবে প্রশ্ন করেন কী হয়েছে নূরুল আজিমের? তিনি উত্তর দেন স্যার তাকে পাবনায় দিতে গেলে আবার কাটাকুটি করতে হয়। ড. ওয়াকার অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাঁকে বলেন What do you mean by কাটাকাটি? আমরা কাটাকাটি করিনা ? লাখ বার কাটাকাটি করি। I like to see him at Pabna, You go and do it now. এবার রফিকুল হক সাহেব রুম থেকে বেরিয়েই আমাকে বলেনঃ দেখলে তো তোমার জন্যে কত চেষ্টা করেছি। আমি নীরব থেকে বুঝলাম কী অভাবনীয় চেষ্টাই না তিনি করেছেন। তিনি কেরানী লতিফ সাহেবের নিকট গিয়ে বলেন লতিফ সাহেব নূরুল আজিমের এই অর্ডারটা এখনই করে দিন বড় সাহেবের হুকুম। লতিফ সাহেব অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে তাঁর দেওয়া সেই কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলে উঠেন। যান স্যার, আমি আপনার এসব ঝামেলা পারবনা। তিনি আবার কুড়িয়ে কাগজটা দিয়ে লতিফ সাহেবকে অনুরোধ করে বলেন না এটা বড় সাহেবের কড়া হুকুম করতেই হবে। লতিফ সাহেব এবার আরও উত্তেজিত হয়ে বলেন আমি না আপনাকে কতবার বলেছি অযথা এই ব্যক্তির পিছনে লাগবেন না। তবুও আপনি তাঁকে অত্যন্ত অন্যায়ভাবে একবার সিলেট একবার রংপুর ইত্যাদি জায়গায় পাঠিয়ে হয়রান করতে চেয়েছেন। আপনি তাঁকে কতটুকু চিনেন? ইনি চৌধুরী নূরুল আজিম, আমি তাঁকে অত্যন্ত ভালভাবে চিনি। তিনি যেখানে থাকতে চাইবেন সেখানেই তাঁকে রাখতে হবে। অথচ এই একটা কাজের জন্যে আপনি আমাকেও বিরক্ত করে ছেড়েছেন। ইত্যাদি জোর গালায় বলে সমস্ত হলের ভিতর আরো অনেক কর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আমি কেবল নীরবে পিছন থেকে সবটা লক্ষ্য করলাম। রফিকুল হক সাহেব কতদূর নির্লজ্জ ও বেহায়া না হলে এই অপমান সহ্য করা তাঁর পক্ষে মোটেই সহজ ছিলনা।

আমি ঢাকায় তখন উঠেছিলাম তেজগাঁ বেগুণবাড়ীতে আমার এক বোনের বাসায়। আমি দু'একদিনের মধ্যেই পাবনা যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটা ছিল পবিত্র রমজান মাস। হঠাৎ দেখি রফিকুল হক সাহেব আমাকে বলেন চৌধুরী তুমি তো পাবনা যাবে, আমিও তোমার সঙ্গে পাবনা যাব। আমি বলি কেন স্যার আপনি পাবনা যাবেন কেন?

www.pathagar.com

তিনি বলেন আমাকেও পাবনায় বদলী করা হয়েছে। অতএব, তুমি আজ রাত্রে আমার বাসায় থেকে কাল ভোরে আমরা একত্রে পাবনা রওনা হব। আমি বলি স্যার এখন রোজার মাস আমি রাত্রে সেহেরী খেয়ে যে বাসায় আছি সেখান থেকেই পাবনা চলে যাব। আপনি দয়া করে আর কোন ঝামেলা করবেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, ভাই আমরাও রোজা রাখি তোমার কোন অসুবিধা হবে না। তুমি আজ রাতেই আমার বাসায় চলে এসে খাবার খাবে এবং ভোররাত্রে সেহরী খেয়ে পরদিন ভোরে একটা গাড়ী আমাদেরকে ফেরীঘাট পর্যন্ত দিয়ে আসবে। তোমার কোন অসুবিধা হবেনা। তাঁর কথা শেষে আমাকে রাখতে হয়েছিল এবং আমরা একসঙ্গে দুজনে পাবনায় আসি।

কুষ্টিয়া পলিটেকনিকে থাকতে সেখানকার লাইব্রেরী থেকে মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মজিদের তফসির মওলানা আশরাফ আলী থানভীর সংকলিত তফসিরে আশরাফী পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। পাঁচ পারা করে প্রতিটি ভলিউম মোট ছয়টি ভলিউমে পুরো তিরিশটি পারা সম্বলিত এ মহাগ্রন্থ শেষ করতে আমার প্রায় বছর তিনেক সময় লাগে। অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে শুরু করে পাবনায় ১৯৭১ সালের শেষের দিকে আমি মহান আল্লাহ পাকের অশেষ কৃপায় সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হই, আল হামদোলিল্লাহ। এরপর আমি শুরু করি মওলানা আব্দুল হাকিম ফরিদপুরীর তফসীরুল কোরআন, মোট তিন খন্ডে সংকলিত। কিন্তু প্রথম খন্ডটি পড়ার পর, পরের দুটি খন্ড আর আমার পড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলি। কেননা, আমার বিশ্বাস ও মতাদর্শের সঙ্গে এর তেমন কোন সামঞ্জস্য আমি খুঁজে পাইনি বলে অতি সযত্নে এটি পরিহার করতে বাধ্য হই। অবশ্য আমি ১৯৮২ সালে যখন ঢাকা পলিটেকনিকে বদলী হয়ে আসি তখন ১৯৮৩ সাল থেকে শুরু করি সম্ভবত ঃ এ উপমহাদেশের সর্ববৃহত্তম তফসীর মুফতী মুহাম্মদ শফী (রাহঃ) সংকলিত মা' আরেফুল কোরআন। এটি সর্বমোট বৃহৎ আটটি খন্ডে বিভক্ত, যা আমার পাঠোদ্ধার করতে সময় লেগেছে সুদীর্ঘ ১০ বছর। সর্বশেষে আল্লামা মওদুদী অনুদিত বহু বিতর্কীত তফসীর সর্বমোট ১৯ খন্ডে বিভক্ত তাফহীমুল কোরআন ২০০১ সালে শেষ করার সুযোগ পাই। এই গ্রন্থটি অনেকের নিকট পছন্দনীয় হতে পারে, তবে যাঁরা সুফী মতবাদে বিশ্বাসী তাঁদের নিকট এটি তেমন গ্রহণীয় নয়।

www.pathagar.com

দ্বাদশ পর্ব

১৯৬৪ সালে পাবনা পলিটেকনিক স্টাফ কোয়াটারে থাকার সময় ভারত থেকে আমার এক ফুপাত ভাই সৈয়দ সেলিম নওয়াজ ১৯৬৬ সালের দিকে হঠাৎ এসে পড়ে এবং তাকে আমি ট্রেড কোর্সে বিদ্যুৎ বিভাগে ভর্তি করে দিই। ভালই পড়ছিল কিন্তু হঠাৎ করে সে আবদার করে বসে যে সে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবে। সে ভারতে কোন ক্লাস পর্যন্ত পড়ে এসেছে, তাও ঠিক আমার জানা ছিলনা। অথচ তার পীড়াপিড়ীতে আমার স্ত্রীর সংরক্ষিত প্রাইজবন্ডগুলি ভাঙ্গিয়ে তাকে শ চারেক টাকার সমস্ত বই পত্র কিনে দিই এবং তার মনোযোগ দিয়ে পড়ার জন্যে আমার অফিস রুমটি পর্যন্ত তাকে ব্যবহার করতে দিই। সে এদিকে ট্রেড কোর্স এবং ওদিকে ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি চালাতে গিয়ে হতভাগা কোনটাই শেষ করতে পারল না। ম্যাটিক পরীক্ষা শেষ করার পর ফলাফল বের হওয়ার পূর্বেই সে ভারতে গমন করে, ট্রেড কোর্সের ফাইনাল পরীক্ষাটা না দিয়েই। অধ্যক্ষ শাহজাহান সাহেবও তাকে বেশ পছন্দ করতেন। অথচ সে আমাদের এক প্রকার প্রতারণা করেই তড়িঘড়ি ভারতে চলে যায়। ফলে অধ্যক্ষ সাহেবও আমার নিকট ওর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আমিও তাঁর নিকট লজ্জিত হই।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় আমি পাবনায় ছিলাম এবং এই মাত্র ১৭ দিনের যুদ্ধের জন্যে আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে ক'জনকে এমার্জেন্সি ডিউটি করতে হয়েছে সারারাত্রি জেগে ডি,সি, সাহেবের অফিসে। সে একটা নিদারুণ সময় গেছে অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে। আমার নিজেরও ডিউটি ছিল ক'দিন। পাবনা পলিটেকনিকে Grass Court এ Lawn Tennis খেলার ব্যবস্থা করেন অধ্যক্ষ মহম্মদ শাহজাহান সাহেব। বিকেল থেকে শুরু করে প্রায় রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খেলার উত্তম ব্যবস্থা ছিল। আমাদের শিক্ষকদের মধ্যে Physical Instructor জনাব আব্দুস সাদেক ছিলেন খেলার মধ্যমনি। চমৎকার খেলতেন ভদ্রলোক। তিনি আমাকে সবসময় দুলাভাই সম্বোধনেই ডাকতেন। কেননা, আমার ছেলেমেয়েদের মামার বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদ এবং তিনিও এসেছিলেন মুর্শিদাবাদ থেকেই। অধ্যক্ষ সাহেব

www.pathagar.com

নিজেও বেশ ভাল খেলতেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার জনাব মহম্মদ হোসেন সাহেব তিনি ছিলেন Executive Engineer, C&B বিভাগের। অত্যন্ত আমোদ প্রিয় ব্যক্তি এবং বন্ধু বৎসল। আমাদের সকলকে তিনি খুবই পছন্দ করতেন। তিনি নিজেও ভাল খেলতেন। ড. কায়েস বিলেত থেকে পিএইচডি করেছিলেন রসায়ন শাস্ত্রের উপর এবং পাবনা স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালের একজন দক্ষ কেমিস্ট ছিলেন- তিনিও নিয়মিত আসতেন খেলতে। অত্যন্ত রসিক ব্যক্তি ছিলেন ড. কায়েস। আমাদের প্রায়ই কথায় কথায় হাসাতেন চুটকি বলে বলে। আমি নিজেও খেলতাম মোটামুটি। তবে কখনও সিংগল খেলিনি। আমার এক প্রাক্তন শিক্ষক জনাব আব্দুল কুদ্দুস সাহেব ছিলেন তুখোড় টেনিস প্লেয়ার। তিনি পাবনা স্টেশন ক্লাবে খেলতেন অনেক পূর্বে। তিনিই আমাকে Cannon Service করার কায়দাটা শিখিয়েছিলেন। সেটা আর কেউ জানতেন না। টেনিস খেলায় প্রধান বিষয় হল Service করা। প্রতিপক্ষ service ফেরাতে না পারলেই পয়েন্ট। এটি আমি রপ্ত করেছিলাম ভালমতই। র‍্যাকেটের একেবারে শেষ প্রান্তে চারটি আঙ্গুলের সাহায্যে অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে সমস্ত হাতটি বাহু পর্যন্ত ২/৩ বার জোরে ঘুরিয়ে বলে আঘাত করলে প্রচন্ড গতিতে বলটি বেরিয়ে যায় ও প্রতি পক্ষের কোর্টে গিয়ে পড়ে। সে বলটি প্রতিপক্ষের পক্ষে ফিরানো সত্যিই অনেক কষ্টকর এটিই ছিল আমার খেলার প্রধান বিশেষত অবশ্য ইঞ্জিনিয়ার মহম্মদ হোসেন সাহেব তাঁর অফিস সংলগ্ন এলাকায় একটি চমৎকার কংক্রিটের হার্ড কোর্ট তৈরী করেন। এবং আমাদের ক'জন খেলোয়াড় শিক্ষকদের তাঁর গাড়ী পাঠিয়ে খেলার জন্যে প্রায়ই তাঁর ওখানে নিয়ে যেতেন। মাঝে মধ্যে ভাল ভাল খাবারের ব্যবস্থাও রাখতেন তিনি। আসলে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও প্রাণ খোলা মনের আমোদ প্রিয় লোক। যার ফলে, আমাদের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রবল। ডিসি জনাব খোরশেদ আলম সি,এস,পি এবং এ,ডি,সি জনাব আজিমুদ্দীন সাহেব সি,এস,পি এরাঁও প্রায়ই আমাদের সঙ্গে খেলায় যোগদান করতেন এবং বেশ রাত্রি পর্যন্ত ফ্লাড লাইটে খেলা চলত। জনাব আজিমুদ্দীন সাহেব ছিলেন আমার বড় মামীর ভাগনা। সেই সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার বেশ সখ্যতা ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে জনাব খোরশেদ আলম সাহেব বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছিলেন এবং আজিমুদ্দীন সাহেব বাংলাদেশ সরকারের সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

১৯৫৩ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়ার সময় আমার বিশেষ বন্ধু মহলের একটা গ্রুপ ছিল। তাঁদের মধ্যে ড. সৈয়দ রেজা হোসেন, রিয়াসত হোসেন, সৈয়দ রেজা কাদের আলহাজ্ব মাইদ এরা এখনও আল্লার ফজলে জীবিত আছেন। যাঁরা আমাদের পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন তাঁদের মধ্যে বন্ধু মুশফিক আহমদ, আনিসুর রহমান এবং আরো অনেকেই। আমার দেশী বন্ধু ড. আমীন আহমদকে ১৯৭১ সারে ১৪ ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী নিধনের সময় বি,সি,এস,আই, আর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। মহান আল্লাহ, তাঁদের পবিত্র আত্মার মাগফেরাত করুন। আমীন!! বর্তমানে অষ্ট্রেলিয়ায় রয়েছেন ড. এ,কে,এম, আব্দুর রহমান। বেশ ক'বছর পরপর দেশে ফিরলে আমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। বর্তমানে আমার এই ৭৫ বছর বয়সে এখন আর অনেকেরই নাম মনে করতে পারছিনা বলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

১৯৭২ সালের প্রথম দিকেই আমার পিতামাতাসহ আমরা সকলেই ভারতে যাওয়ার জন্যে খুবই উতলা হয়ে উঠি। কেননা, আমাদের পাশের বাড়ীর মতিভাই, ভাবী ছেলে মেয়েদেরসহ তাঁদের একটা বিরাট গ্রুপ সকলেই ১৯৭১ সালের প্রথম দিকেই পাবনায় পাক আর্মি ঢুকে পড়ার পূর্বেই এদেশ ত্যাগ করে ভারত গমন করেছিলেন। আমরাও তাঁদের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম। সকলেই পায়ে হেটে সন্ধ্যার প্রাক্কালে পাবনা শহরের দক্ষিণে গ্রাম্য হাঁটা পথে বেশ কিছুদূর গিয়ে একটি গ্রামে রাতের রান্না করার সময় তাঁরা অর্থাৎ আমানুল্লাহ ভাই, বড় আব্বা, মুসা চাচা, রোজি সহ মতিভাইরা হঠাৎ করে সেই রাতের অন্ধকারেই সে গ্রাম ত্যাগ করেন অতি তাড়াহুড়ার মাধ্যমে। তখন পাবনায় ডি,সি ছিলেন জনাব নূরুল কাদের খান। তিনি আমানুল্লাহ ভায়ের এক আত্মীয় ছিলেন বলে তিনি জানিয়ে দেন যে যততাড়াতাড়ি সম্ভব পাবনা শহর ত্যাগ করা উচিত। আমার আম্মা তাঁদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত হাঁটতে পারবেন না বলে আমরা তাঁদের সঙ্গী হতে পারলাম না। আমরা সেই রাত্রে এক গৃহস্তের বাড়ীতে রাতটা কাটিয়েই পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু করি তবে হেঁটে নয়। গরুগাড়ী ভাড়া করে আমরা চর সাদীপুরে গিয়ে একটা পরিত্যাক্ত মাদ্রাসা বিল্ডিং-এ গিয়ে আশ্রয় নিই। সেখানে দু'চারদিন থাকতেই হঠাৎ করে একদিন দেখি বন্ধু ড. রেজা হোসেন তার পিতামাতাসহ পুরো পরিবারের প্রায় ১৫/২০ জনের একটি দল এসে হাজির। তাঁরাও ঐ মাদ্রাসা বিল্ডিং এর

www.pathagar.com

দু'চারটি কামরা নিয়ে থাকতে লাগলেন। একেবারেই অজ পাড়াগাঁ, ফলে পাকা পায়খানা না থাকার দরুণ আমার স্ত্রীর আর সেখানে থাকতে মোটেই ইচ্ছা হলনা। তাঁর পীড়াপিড়িতেই আমরা চর সাদীপুর ত্যাগ করে পুনরায় পাবনা শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হই। সম্ভবত ১৯৭১ সালের মে মাসের মাঝামাঝি পাবনায় পাক-আর্মি ঢুকতে সক্ষম হয়। তবে নগরবাড়ী ঘাটে তারা বাংলা বাহিনীর দ্বারা প্রচন্ডভাবে তাদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করা হয় এবং সেখানে উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহতের পর পাক সেনাদের একটা বিশাল কনভয় সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুরের দিকে অপারেশন করতে করতে গমন করে। আর একটি শাখা বাহিনী পাবনা হয়ে রাজশাহী পর্যন্ত গমন করে নানারূপ হত্যাকান্ড ও আগুন জ্বালানোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও ভয়ভীতির সৃষ্টি করে অগ্রসর হয়। অবশ্য ইতোমধ্যে বহু মানুষ এসব এলাকা ত্যাগ করে পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। নতুবা আরও অনেক মানুষের প্রাণহানী ঘটার আশংকা ছিল। আমার এক অতিপ্রিয় ছাত্র নিমাই চন্দ্র দে সে তার শহরের বাড়ীর খবরা খবর নেওয়ার উদ্দেশ্যে হঠাৎ করে গ্রাম এলাকা থেকে এসেছিল। পাক সেনাদের গাড়ী দেখার সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড় দেয়। কিন্তু বেচারা পাক সেনাদের গুলির মুখে বেশীদূর অগ্রসর হতে পারেনি।

আমরা নিজেরাও পাক সেনাদের কবলে পড়েছিলাম। পাবনা জিলা পাড়ার একটি বাড়ীতে জনাব ফজলে করিম চাচার বাসায় তাঁরা দয়া করে আমাদের স্থান দিয়েছিলেন। দোতালা বাড়ীতে আমরাসহ একটি বিহারী ছেলে তার মাকে নিয়ে ঐ বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছিল। পাক সেনাদের রুদ্ররোষের কবলে পড়েও আমরা সাহস হারাইনি। তাদের সঙ্গে আমরা পুরুষরা বাংলা কথা না বলে সর্বক্ষণ উর্দূতে কথা বলেছি। ইতোমধ্যে তারা বহু বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। শিল্প সঞ্জীবনির তিনজন পুরোহিত ঠাকুরকে রাস্তায় নিয়ে গুলি করে। ঐ এলাকার অনেক পুরুষ স্থানীয় বিহারী লাল সাহার বিশাল পাকা প্রাচীর বেষ্ঠিত বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের সকলকে ধরে নিয়ে রাস্তার চৌ মাথায় পুকুরের পাড়ে দাঁড় করিয়ে ১৩/১৪ জনকে ব্রাশ ফায়ার করে এবং নিমেষের মধ্যে সকলেই শহীদ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে কেউ কোন কথা বলতে পারেনি। এদের মধ্যে শফীউদ্দীন উকিলও ছিলেন। প্রচন্ড ভয় ভীতির ফলে যেন তাঁরা সকলেই বাকরুদ্ধ হয়ে যান। এদের মধ্যে ঐ বিহারী ছেলেটিও ছিল। কিন্তু ব্রাশ ফায়ারের পূর্বমুহূর্তে যখন একপাক সেনা বলে

www.pathagar.com

যে, তুমলোগ যো বিহারী হ্যায়, ওহ্ ইধার আ যাও। যুবক ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে লাইন থেকে বেরিয়ে আসে এবং তার পরপরই স্টেন গানের মাধ্যমে ব্রাশ ফায়ার করা হয়। আমরা এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পূর্বে কেবল মাত্র গুলির শব্দে আমি নিজে বেরিয়ে এসে দেখি মৃত দেহগুলি ইতস্ততঃ পড়ে রয়েছে। পাক সেনারা তখন প্রস্থান উদ্দত দেখে আমি তাদের প্রশ্ন করিঃ কিয়া জি আপলোক এসব উঠাকে লে যায়েঙ্গে না কিয়া? তারা আমাকে বলেঃ 'নেহী তুমলোগ টাঙ্গে পাকাড় কর এধার ওধার ফেকদো, নেই তো বদবু করেগা, গন্ধা করে গা।' বলেই তারা চলে যায় সন্ধ্যার একটু পূর্বে। সেই রাত্রেই প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। একটি লাশ পুকুরে পড়েছিল বলে উঠা আর তুলতে পারিনি পরের দিন সকালে আমি, আকানওয়াজ এবং অন্য এক ব্যক্তি অতি কষ্টে একটি কবর খনন করে তার মধ্যে কয়েকটি বিকৃত লাশ কবর দিয়ে দিই। তাঁদের কারো হাতে হাত ঘড়ি। কারো পকেটে মানিব্যাগ ইত্যাদিসহই তাঁদের কবরস্থ করা হয়। ঠাকুরদের তিনজনকে একটি চিতার মত করে এদিক ওদিক থেকে কিছু পোড়াকাঠ যোগাড় করে কেরোসিন, মবিল ইত্যাদি দিয়ে জ্বালিয়ে দিই। এ ভাবেই আমরা সে সময় মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে রক্ষা পাই।

আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালুহু
শেষ করা তো যায়না দিলে তোমার গুণগান
তুমি কাদের ও গাফফার তুমি জলিল জাব্বার
অনন্ত অসিম তুমি রহিম ও রহমান
আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালুহু
তুমি মাটির আদমকে প্রথম সৃষ্টি করিয়া
ঘোষণা করিয়া দিলে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
তাই নূরের ফেরেশতা করে আদমকে সিজদা
তুমি সবার চেয়ে দিলে মাটির মানুষকে সম্মান
আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালুহু
শিশু মুসা নবীরে যখন দুশমনেরই ডরে
সিন্দুকে ভরিয়া দিলে ভাসায়ে সাগরে
প্রাণে ছিল যাহার ভয়, সেথায় পেল সে আশ্রয়

www.pathagar.com

সেই দুশমনেরই হাতে তাহার বাঁচাইলে প্রাণ
আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালুহু
যখন ইউনুস নবীরে খাইল মাছেতে গিলিয়া
ফেরেশতা পাঠাইলে তখন এসমে আজম দিয়া
দমে দমেতে হরদম পড়েছে ইসমে আজম(২)
সেই মাছের উদর হতে সে যে পেল পরিত্রাণ
আল্লাহু আল্লাহু তুমি জাল্লে জালালুহু
শেষ করা তো যায়না দিলে তোমার গুণগান ॥

www.pathagar.com

ত্রয়োদশ পর্ব

বাংলাদেশ

সরকারী নাম	ঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
রাজধানীর নাম	ঃ ঢাকা
জনসংখ্যা	ঃ প্রায় ১৫ কোটি
আয়তন	ঃ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার
মুদ্রার নাম	ঃ টাকা
ভাষা	ঃ বাংলা, উর্দূ, হিন্দী, ইংরেজী
মাথাপিছু গড় আয় (জিডিপি)	ঃ ২৬০ ডলার
গড় আয়ু	ঃ ৫৮ বছর

১৯৭২ সালে ভারত যাওয়ার সময় কোন পাসপোর্ট বা ভিসার প্রয়োজন ছিলনা বটে; তবে ডি,সি সাহেবের নিকট থেকে একটা পারমিট বা অনুমতিপত্র আমাদের নিতে হয়েছিল। নূতন স্বাধীন বাংলাদেশ অতএব, পাসপোর্ট ভিসার আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি যথেষ্ঠ সময়ের প্রয়োজন ছিল। যা হোক। আমরা স্থলপথে সারদা ক্যাডেট কলেজের পাশ দিয়ে পদ্মা নদী পাড়ি দিয়ে হাঁটাপথে রাজশাহী সীমানা পার হয়ে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী সীমান্তে গিয়ে উপস্থিত হই বহুকষ্টে। কিন্তু পথে কোথাও কোন চেকপোস্ট বা পুলিশ পাহারাদারের সম্মুখীন আমাদের হতে হয়নি। জলঙ্গী থেকে বাসধরে আমরা সোজা বহরম পুরে পৌছাই সন্ধ্যার একটু পূর্বে। পথে যেতে যেতে আমরা বাস কন্ডাক্টরের নিকট পাক মূদ্রা ভাঙ্গিয়ে নিই এবং দ্বিগুণ পাই। তখন ভারতীয় মুদ্রার মূল্য পাক মূদ্রার চেয়ে অর্ধেক ছিল। যাওয়ার সময় পথের দুপাশে ভারতীয় সরকার বাংলাদেশীদের জন্যে যে রিলিফ ক্যাম্প প্রচুর খুলেছিলেন তাও আমাদের চোখে পড়ে। সময়টা ছিল ঈদুল আজহার পূর্বের দিন। তাই আমি পাবনা থেকে যাওয়ার পুর্বে মুর্শিদাবাদের ইন্দ্রানী গ্রামে আমার শশুর বাড়ীতে একটা টেলিগ্রাম করেছিলামঃ Arrange Cow immediately. বহরমপুর থেকে

www.pathagar.com

একটা ট্যাক্সিভাড়া করে গভীর রাত্রে গিয়ে সেখানে পৌঁছাই। পরের দিন সকালেই যখন আমি কোরবানীর জন্য গরু দেখতে চাইলাম যার জন্য আমি টেলিগ্রাম করেছিলাম। তাঁরা বলেন কৈ গরুর কথা তো টেলিগ্রামে নেই। আমি টেলিগ্রামটি দেখতে চাইলে তাঁরা দেখান এবং তাতে লেখা ছিলArrage cart immediately কী সর্বনাশ গরুকে গরুর গাড়ী বানান হয়েছে দেখে আমি হতবাক। যাই হোক, তখনই তিনটি গরু গ্রাম থেকে আনিয়ে তাদের মধ্যে থেকে ভাল দেখে একটা নিয়ে নিই মাত্র ১০০ টাকার মধ্যেই। ঈদের নামাজের পর আমার পিতামাতা, আমি ও আমার স্ত্রী এবং তিন ছেলে মেয়েসহ এই মোট সাত জনের নামে আমি কোরবানী করি নিজেই। কেননা, এ কাজটি আমি ছাত্রাবস্থা থেকে করতেই অভ্যস্থ ছিলাম। আমার শশুর বাড়ী পাশে চাচা শশুরবাড়ী জনাব সৈয়দ আলী সফদর সাহেবসহ আরো অনেকেই দেখলাম কোরবানী দিলেন।

আমরা এখানে থেকেই হঠাৎ দেখি বিনুদিয়া থেকে বড় আব্বা হযরত শাহ আবুল হারেস সাহেব অর্থাৎ আমার মতিভায়ের শশুর সাহেব আমাকে লোকমারফত একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন, যাতে আমি আমাদের পাবনা বাড়ীর চাবিটা ঐ লোকমারফত দিই। তিনি ছিলেন আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধাভাজন এবং সবার মুরুব্বী। তাঁরা এই দীর্ঘ নয় মাস ভারতে ছিলেন মেয়েদের ও জামাইদেরসহ একদল লোক। এখন তাঁরা বাংলাদেশে আসতে চান। প্রায় মাস খানিক ইন্দ্রানীতে থাকার পর, আমাদের মাড়গ্রামে আমরা চলে আসি। এখানে আমার মাতার একটা চোখের ছানি অপারেশনের জন্যে রামপুরহাটের হাসপাতালের বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাঃ আর,কে, ভৌমিককে দেখাই। এই ডাঃ ছিলেন আমার এক গুণমূগ্ধ ছাত্র অপরেশ কুমার ভৌমিকের কাকা। পাবনায় এই ছাত্রটি আমাকে তাঁর কাকা সম্বন্ধে যথেষ্ট বলে। আমি নিজেও ডাক্তারকে দেখে অত্যন্ত মূগ্ধ হই। ডাক্তারের ব্যবহার এবং চেহারা অত্যন্ত সুন্দর। আমি আমার আম্মাকে তাঁর নিজস্ব চেম্বারে অপারেশন করার জন্য অনুরোধ করি। তিনি কিন্তু কিছুতেই রাজি হলেন না। বরং আমাকে বলেন, কেন আপনি আমাকে মিছামিছি ৩০০ টাকা দিতে যাবেন। আমি এই সরকারী হাসপাতালেই অপারেশন করব, যেমন ভাবে আমার নিজস্ব চেম্বারে করতাম। আমি তাঁকে যতই বলি আমি যথেষ্ট টাকা পয়সা এনেছি আমার কোন অসুবিধা হবেনা। তবু তিনি মাত্র আট টাকা দক্ষিণা নিয়ে বলেন এর পর রোগীনীর

www.pathagar.com

রক্ত ও মূত্র পরীক্ষার রিপোর্ট আমার কাছে আনার পর দিবেন মাত্র পাঁচ টাকা অর্থাৎ মাত্র ১৩ টাকার বিনিময়ে তিনি আমার মায়ের চোখ অপারেশন করলেন অতি উত্তমরূপে। কথায় কথায় তিনি একসময় বাংলাদেশী ডাক্তারদের সম্পর্কে আমাকে বলেন, Your Bangladeshi Doctors are worst than brucher" বিলক্ষণ তিনি যথার্থই বলেছন। পরে আমাকে তিনি বলেন, আবার ছ'মাস পর আপনার মায়ের দ্বিতীয় চোখটি অপারেশন করাবেন।

অতএব, তখন যদি আবার ভারতে আসেন এবং আমি এখানে থাকি তবে অপারেশন করব। অবশ্য আমাকে সাধারণতঃ ছয় মাসের বেশী কোথাও সরকার রাখেনা, বদলী করে দেয়। তিনি আরও বলেন বাস্তবিক পক্ষে ভারতে চক্ষুচিকিৎসার ব্যাপারে নূতন করে আমার শিক্ষার কিছু নেই। কেননা, আমি সেখান থেকে পশ্চিমের কোন দেশে গিয়ে আরো কিছু শিক্ষার সুযোগ পেতে পারি। বাস্তবিকপক্ষে ডাঃ ভৌমিক গুরুমারা বিদ্যাও শিখে ফেলেছিলেন বলে তাঁর অনেক শিক্ষক তাঁকে চোখের জাদুকর বলে অভিহিত করে গৌরব বোধ করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে আমি তাঁকে কলকাতায় নীলরতন হাসপাতাল থেকে আরম্ভ করে অনেক স্থানে খোঁজ করেছি, কিন্তু কোথাও কেউ তাঁর খোঁজ দিতে পারেন নি, বা দেন নি।

ডাঃ ভৌমিক আমাদের বাংলাদেশী ডাক্তারদের সম্পর্কে যে কটুক্তি করেছেন তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমি লক্ষ্য করেছি যে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে হিপ্রোক্র্যাটস ল (Hypocrates Law) বলে যে বিষয়টি পড়ান হয়, সেটি কিন্তু ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে বা বাংলাদেশে কোথাও কোন কলেজে পড়ান হয় না। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় যে, যখন ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তার মহম্মদ ইব্রাহিম সাহেব অধ্যক্ষ ছিলেন, তখন তিনি সেটা তুলে দেন। এবং এ ব্যাপারে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আমার খালু জনাব আব্দুল ওহাব সাহেব তাঁকে বলেন ইব্রাহিম ভাই। আপনি নিজে তো এ বিষয়ের উপর কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ে এসেছেন, অথচ এখানে এটি বন্ধ করেদিলেন কেন? ডাঃ ইব্রাহিম বলেন, ওটা ওরা নিজেরাই পড়ে নিবে। আমি নিজে ঢাকায় বেশ ক'জন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করেছি ঐ হিপোক্র্যাটস ল সম্পর্কে তাঁরা কিছু জানেন কিনা? কিন্তু কী আশ্চর্য! একজন ডাক্তারও ঐ বিষয়টির সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখেন না, এমন কি তাঁরা ঐ বিষয়টির নাম পর্যন্ত শোনেন নি। অথচ মজার ব্যাপার হল যে, এই

www.pathagar.com

বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে এটাকে Doctor's Code of Profession হিসাবে গন্য করা হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন পুরুষ ডাক্তার একটি মহিলা রোগীকে দেখার সময় অবশ্যই ঐ রোগীর একজন সহযোগী ঐ সময় উপস্থিত থাকা দরকার; এটি সম্ভবত ১৯ নং ল (Law No. 19)। এভাবে বেশ কিছু নিয়ম কানুনের কথা লিখা আছে হিপোক্র্যাটস ল'তে। অথচ বাংলাদেশী ডাক্তারদের এ বিষয়ে কোন জ্ঞান না থাকার জন্যেই সম্ভবত তাঁদের প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার যথেষ্ট অভাব আছে।

আমরা ভারতে বেশ কিছুদিন থেকে তারপর যেভাবে এখানে এসেছিলাম, ঠিক সেভাবেই এবং একই পথ দিয়ে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করি। পাবনা পলিটেকনিক থেকে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি আমাকে ঢাকায় টেকনিক্যাল টির্চাস ট্রেনিং কলেজে ডাকা হয় বি-এড-ইন-টেকনিক্যাল এডুকেশনের উপর একটা ট্রেনিং কোর্সের জন্য। আমরা বেশ কিছু শিক্ষক মাত্র দু বছরের এই শিক্ষা প্রোগামের উপর কলেজে কোর্স শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন ক্লাস করার পর এই কোর্সটাকে পুরাপুরি ডিগ্রী সম পর্যায়ভূক্ত করার জন্যে আমাদের মধ্যে শুরু হয় আন্দোলন। এবং এই আন্দোলন চলতে থাকে দীর্ঘদিন। কর্তৃপক্ষের মধ্যেও নানারূপ বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ফলে দীর্ঘ সময় একটা ডামাডোলের মধ্যে কাটতে থাকে। আমাদের মধ্যে অনেক শিক্ষকেরই তখন পি,এস,সির (Public Service Commision) অনুমোদন না থাকায় যথা সময়ে বেতন পাওয়া দুষ্কর ছিল। সরকারী নীতি মালার বেড়াজালে আমরা অনেকেই অযথা ভোগান্তির শিকার হয়েছি। আমি মাঝে মধ্যে প্রায়ই সচিবালয়ে আসা-যাওয়া করতাম নানা কাজে। আমার এক চাচা জনাব আবুল বরকত সাহেব ছিলেন সে সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারী। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই তিনি আমাকে শিক্ষা বিভাগের ৮নং সেকসান যাওয়ার জন্য বলেন। তখন ৮ নং সেকশন ছিল (ডিপিআই) এবং সেকশন নং ৭ ছিল আমাদের (ডিটিই) ডাইরেক্টোরেট-অব-টেকনিক্যাল এডুকেশনের বিভাগীয় শাখা। সম্ভবত আমার চাচা আমাকে ভুলবশতঃ সেকশন নং-৮ এ যেতে বলেন এবং আমি সেখানে গিয়ে দেখি জনাব জালাল উদ্দীন আহমদ এম,এ, শাখা প্রধান। আমি তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমাকে পাশের কামরায় যেতে বলেন। মধ্যে ছিল একটি মাত্র হার্ডবোর্ডের পার্টিশান। আমি একাই সেই স্থানে অনেক সময় বসে থেকে হঠাৎ শুনতে পাই

www.pathagar.com

জালাল উদ্দীন সাহেব কাদেরকে যেন বলছেন, কৈ মিষ্টি কৈ? কাজ তো হয়ে গেল এখন মিষ্টি কোথায়? আমি কৌতুহল বশত, ঐ হার্ডবোর্ডের পাটিশনের একটি ছোট্ট ছিদ্র দিয়ে দেখি যে যাঁরা আসছেন, তাঁরা কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ। তাঁদের আলাপ আলোচনায় আমি বুঝতে পারলাম যে তাঁদের পি, এস, সি ছাড়াই তাঁরা চাকুরীতে স্থায়ী অনুমোদন লাভ করেছেন। সেখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন তাঁরা সকলে প্রস্থান করেন, তখন হঠাৎ জালাল উদ্দীন সাহেবের অলক্ষ্যে আমি বেরিয়ে আসি এবং আমাদের সেকশন নং-৭ এ এসে জনাব আফতাব উদ্দীন সাহেবের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ করি। তিনি অত্যন্ত সৎ ও প্রবীণ কর্মচারী ছিলেন। আমার কথা শুনে তিনি বলেন এটা কিভাবে সম্ভব ? এতবড় একটা কাজ হয়ে যাবে আর আমরা তার পাশের সেকশন কিছুই জানবনা তাকি হয়? আমি তাঁকে অনুরোধ করি আপনি দয়া করে একবার সেকশন নং-৮ এ যান, গিয়ে তাদের ফাইলটা দেখে আসুন তাহলেই আপনি বুঝতে পারবেন। তিনি তখনই গিয়ে সেখান থেকে বিষন্ন মনে ফিরে আসেন এবং আমাকে বলেন, তারা আমাকে ফাইলটা দেখতে দিলনা। তিনি আরো বলেন, আমি জানি কাকের মাংস কাক খায় না। কিন্তু এখন তো দেখছি সেটাও ঠিক নয়। তিনি আমাকে আরও বলেন, আপনি এই অর্ডারের কোন কপি একুট যোগাড় করতে পারেন কিনা দেখুন। তাহলে আমি এটা নিয়ে যা করার তা অবশ্যই করব। আমি তাঁকে বলি, ১৫/২০ মিনিটের মধ্যেই আমি আপনাকে কপি এনে দিচ্ছি।

এরপরই আমি সোজা আমাদের শিক্ষা ভবনে গিয়ে ডি,পি,আই এর ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক খুরশিদ আলম সাহেব। আমি তাঁকে সালাম দিয়ে বলি, স্যার যে এফিলিয়েশনের অডারটা বেরিয়েছে আমি কি তার একটা কপি পেতে পারি? তিনি বলেন, আপনার দরকার? বসুন, বলেই একজনকে হুকুম করেন আমাকে ওটা এনে দেওয়ার জন্যে। আমি সেটা পাওয়ার সাথে সাথেই তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা সচিবালয়ে জনাব আফতাব সাহেবের নিকট ঝড়ের বেগে উপস্থিত হই। তিনি সেটা দেখে তো অবাক। বলেন, এতবড় কান্ড হয়ে গেছে অথচ আমরা কিছু জানিনা। কী আশ্চর্য্য! তিনি তখনই আমাদের সেকশন অফিসার জনাব আব্দুল খালেক সাহবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এ ব্যাপারে। তিনিও অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়ে যান এই ভেবে যে, তাঁদেরকে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে অত্যন্ত গোপনভাবে

www.pathagar.com

১৫৮ জন কলেজ শিক্ষককে উইথ রেট্রোস্পেকটিভ এফেক্ট তাঁদের বেতন ভাতা ইত্যাদি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ যখন থেকে তাঁদের প্রমোশন দেয়া হয়েছিল প্রথম শ্রেণী অফিসার হিসাবে তখন থেকেই তাঁরা সব সুবিধাদি পেতে থাকবেন। আমি এই বিষয়ের উপর জনাব আফতাব ও জনাব খালেক সাহেবকে অনুরোধ করি আপনারা আমাদের ফাইল খুলুন এবং এব্যাপারে আমি আপনাদের যথা সাধ্য সাহায্য করার চেষ্টা করব। কেননা, একই দেশে একই সরকারের আমলে তো দুমুখো নীতি চলতে পারেনা। অতএব, আমি আমার সর্বশক্তি দিয়ে এর বাস্তবায়ন দেখতে চাই।

এদিকে আমাদের টিচার্স ট্রেনিং কলেজে তখন অধ্যক্ষ ছিলেন আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক জনাব এম, এ বারী সাহেব। তিনি যখন জানতে পারলেন যে আমি এমন একটি কঠিন কাজে হাত দিয়েছি। তখন তিনি একদিন হঠাৎ কলেজ লাইব্রেরীতে আমাকে দেখে বলেন, চৌধুরী তুমি যে কাজটা করতে চাও, এ কাজটা আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ডাইরেক্টর পর্যন্ত কেউ করতে পারিনি। অতএব, তুমি যদি এটি করতে পার তবে It wil be a very great job and for this reason, my car and telephone is free for you আমি তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলি, স্যার দোয়া করুন। সুদীর্ঘ তিনটি মাস আমি এ ব্যাপারে প্রায় পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করেছি। তখন শিক্ষা বিভাগের সচিব ছিলেন জনাব নূর মহম্মদ সাহেব। তিনি বেশ প্রবীণ লোক ছিলেন। এবং আমি প্রায়ই তাঁর কাছে যাওয়া আসা করতে শুরু করলাম। কিন্তু তিনি প্রতিবারই নানা টালবাহানা করে কালক্ষেপন করতে লাগলেন। একদিন তিনি আমাকে হঠাৎ বলেই ফেললেন দেখেন One Mr. Shariful Islam, Professor of Engligh he had a very close contact with our Bangobandhu Shaikh Muzibur Rahman and he did it for his fellow friends. But this is not for all and it has been done very secretly. আমি তাঁকে বলি, But Sir, We are serving under the same government, then why should we be deprived from the same fecility? তখন তিনি বলেন, However, You have come to know the matter anyway. So, let me see what can I do for you, but it will take time. ইত্যাদি দীর্ঘ আলোচনার পর আমি আমাদের ঐ বিভাগের শাখা

www.pathagar.com

প্রধান জনাব আব্দুল খালেক সাহেবকে বলি যে, দেখেন এটা আপনার জন্যে একটা Prestige Concern হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনারা পাশাপাশি দু'টি শাখা হওয়া সত্ত্বেও এটা এমন গোপনভাবে করা হয়েছে যে আপনি পর্যন্ত তা জানতে পারেন নি। অতএব, এ ব্যাপারে আপনারও একটা জিদ থাকা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

যাহোক! এভাবে ক্রমাগত দীর্ঘদিন সচিবালয়ে যাতাযাত করে এবং বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন করে এক পর্যায়ে বুঝতে পারি যে, সচিব নূর মহম্মদ সাহেবের কাছে আমি একা শুধু ঘোরাঘুরি করলে কাজ হবে না। আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষিকাদেরও তাঁর নিকট হাজির করা দরকার। এভাবে একদিন তাঁদের অনেক বুঝিয়ে কলেজের ক'জন শিক্ষক যেমন অধ্যাপক জাঁহাঙ্গীর, অধ্যাপক মাহ্‌তাবুল ইসলাম, অধ্যাপিকা নাজমা বেগম, অধ্যাপিকা মিসেস মাহবুবুর রহমান প্রমুখ বেশ ক'জন শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে সোজা শিক্ষা সচিব জনাব নূর মহম্মদ সাহেবের দফতরে উপস্থিত হই। নূর মহম্মদ সাহেব এতগুলি শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দেখে যেন বেশ কিছুটা নরম হলেন বলে আমার মনে হল। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে এক পর্যায়ে তিনি শাখা প্রধান খালেক সাহেবকে ডেকে বলেন, কৈ এঁদের ফাইলটা আপনি আমার কাছে আনেন নি কেন? সঙ্গে সঙ্গে খালেক সাহেব বলেন, স্যার বহুবার আমি ফাইলটা আপনার কাছে আনতে চেয়েছি কিন্তু আপনি তেমন আমল দেননি। সচিব সাহেব তখন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। আপনি কালই ফাইলটা একেবারে রেডি করে আমার কাছে আসবেন। এবং আমাকে বলেন আর আপনাদের কষ্ট করতে হবে না, আমি এ জন্যে দুঃখিত। আপনারা এখন আসতে পারেন।

ক'দিন পর আমি আবার সচিবালয়ে গিয়ে দেখি, বর্তমানে ফাইলটা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের First secretary জনাব রফিকুল্লাহ চৌধুরী সাহেবের নিকট। আমি আমার পরিচয় দিয়ে তাঁর নিকট দেখা করি এবং এরপর ফাইল যাবে খাস শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের নিকট। আমি খোঁজ-খবর নিয়ে জানতে পারলাম শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেবের যিনি প্রাইভেট সেক্রেটারী তাঁর নাম জনাব আব্দুল কাইয়ুম। আমি একদিন রাত্রে তাঁর বাসায় গিয়ে আমার পরিচয় দিই। এবং তখন জানতে পারি যে তাঁর স্ত্রী হচ্ছেন আমার এক ফুপু। অতএব, তিনি হচ্ছেন সম্পর্কে আমার

www.pathagar.com

ফুপা সুতরাং এই ফুপাকে আমি অনুরোধ করি যে, শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আমার একটা ইন্টারভিউ অবশ্যই করিয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন শিক্ষামন্ত্রী যথেষ্ট ব্যস্ত থাকেন, অতএব আমি আপনার জন্য তাঁকে কিছুই বলতে পারবনা। আমি তাঁকে বলি, আপনাকে কিছুই বলতে হবেনা, যা বলার আমিই বলব। আপনি দয়া করে একটা সময় ঠিক করে দিবেন মাত্র। তিনি আমাকে টেলিফোনে সাক্ষাতের তারিখ ও সময়টা জানিয়ে দেন। আমি পুনরায় আমার কলেজের ঐ সমস্ত শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের নিয়ে যথাসময়ে হোটেল শেরাটনের উল্টাদিকে শিক্ষামন্ত্রীর বাসায় বিকেলের দিকে উপস্থিত হই। আমার শিক্ষকবৃন্দ কেউ কিছু বলতে পারবেন না শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে তাও আমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছেন। আমি তাঁদের অনেক আশ্বাস দিয়ে বলেছি আপনাদের কিছুই বলতে হবে না, যা বলার আমিই বলব। আপনারা কেবল মাত্র আমার সঙ্গে থাকবেন, আমি যে একা নই এটা যেন শিক্ষামন্ত্রীকে আমি বুঝাতে পারি। যথাসময়ে শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় আমার কথাবার্তা শুনে বলেন; ভাই আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। কেননা, আমি নিজেও দীর্ঘদিন শিক্ষক ছিলাম। অতএব, শিক্ষকদের সময়মত বেতন না পেলে যে কী অসুবিধা হয়, তা আমি বিলক্ষণ জানি। বলেই তাঁর সেক্রেটারী জনাব কাইয়ুম সাহেবকে ডেকে বলেন; আপনি আগামীকাল ফাস্ট আওয়ারে এই ফাইলটা আমার সম্মুখে দিবেন। জনাব অধ্যাপক ইউসুফ আলী সাহেব যথেষ্ট ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তি বলে আমার মনে হল। এইভাবে দীর্ঘ তিনটি মাস লাগাতার ছুটাছুটি করে আমার সতীর্থ বন্ধু ও শিক্ষকবৃন্দ মিলে মোট ৪৬ জনকে পি,এস,সি, ছাড়াই স্থায়ীভাবে অনুমোদন লাভে সক্ষম হই। আমার এ কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সর্বপ্রথম আমাকে অভিনন্দন জানান অধ্যক্ষ জনাব এম,এ, বারী সাহেব। আমি কলেজ লাইব্রেরীতে ঢুকতে যাচ্ছি আর বারী সাহেব বেরিয়ে আসছিলেন। এমন সময় আমাকে দেখে তিনি হ্যান্ড শেখ করে বললেনঃ Choudhury congratulation. You have done a very great job. Thank you very much. আমিও তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার কৃতজ্ঞতা তাঁকে প্রকাশ করি। অথচ মজার ব্যাপার হল যে, আমার এসব উপকৃত বন্ধুরা এ ব্যাপারে কেউ কোন খোঁজও রাখেনি যে ব্যাপারটা কীভাবে সম্ভব হল। কেননা, আমি কারো কাছ থেকে পাঁচটি পাই পয়সা পর্যন্ত চাঁদা বা সাহায্য কিছুই গ্রহণ করিনি।

www.pathagar.com

একাজ করতে গিয়ে আমার কলেজের পড়াশুনার ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হল যে, শেখ মুজিবর রহমান সাহেব যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন অধ্যাপক শরীফুল ইসলামের অনুরোধে ডি,পি,আই এর ১৫৮ জন কলেজ শিক্ষককে এই সুবিধা প্রদান করেন যা প্রথম এবং শেষবারের জন্যে। এ রকম সুবিধা ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ না পায় সে কথাও তাঁর সেই নির্দেশনামায় স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল। বাংলাদেশের তখন রাষ্ট্রপতি ছিলেন জনাব মহাম্মদউল্লাহ। পরবর্তী পর্যায়ে যখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেব বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন, তখন আবার আমাদের এই অনুমোদনটি পুনরায় তাঁর নিকট থেকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে স্থায়ীভাবে পাকাপাকি অবস্থায় আনার জন্যে আমাকেই ফের তদবির করতে হয়। জনাব মহাম্মদউল্লাহ সাহেবকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তিনি তা গ্রহণ করেন।

১৯৭৩ সালের ৫ আগস্ট পাবনায় আমার সর্বকনিষ্ঠ পুত্র চৌধুরী হাসানুর রহমান ওরফে ফাহিমের জন্ম হয়। তার বছর খানেক বয়সের পর আমি আমার পরিবারবর্গকে ঢাকায় নিয়ে আসি। আমার প্রাক্তন ছাত্র মহম্মদ ইব্রাহীম হোসেন তখন পলিটেকনিকের শিক্ষক। সে তার ছেলেমেয়েদের পাবনায় কিছু দিনের জন্য স্থানান্তর করে এবং আমাকে তার বাসায় আপাততঃ থাকার জন্যে অনুরোধ করে। আমি তার কথামত বেগুণবাড়ী জুনিয়র স্টাফ কোয়াটারে কিছুদিন ছিলাম। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে আমার একান্ত শুভাকাঙ্খী বন্ধুবর নাফিজুর রহমান সাহেব আমাকে গ্লাস এন্ডসিরামিক্স হোস্টেল বিল্ডিং এর একটি বড় কামরায় থাকার সুযোগ করে দেন। ফলে তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। এই একটি মাত্র কামরাকে পর্দার আড়াল করে দু'টি কামরার মত করে নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। তখন দেশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষে প্রচুর লোকের মৃত্যু হয়। সাধারণ চালের মূল্য তখন ১৪/১৫ টাকা সের। খুবই ভয়াবহ অবস্থা দেশের সর্বত্র। এমতাবস্থায় হঠাৎ করে আমার মেজ ফুপু ও ফুপা তাঁদের মেয়ে-জামাইসহ পুরা পরিবারের ১০/১২ জন একরাতে হোস্টেল বিল্ডিং-এ আসেন, তখন আমরা আমার স্ত্রীর চাচাত ভাই সৈয়দ আবুল হাশেমের বাসায় দাওয়াতে গিয়েছিলাম। আমাদের ফিরতে বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। আমরা ঘরের তালা ভাঙ্গা এবং কাঁচের ফাঁক দিয়ে দেখি যে ঘরের ভিতর সকলে ঘুমিয়ে আছেন যেন কারা? এদিকে দেখি

www.pathagar.com

বন্ধুবর নাফিজুর রহমান বারান্দায় দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাঁসছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আমরা নাই দেখে আমার ফুপাফুপুরা সব ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বন্ধু তাঁদের পরিচয় জানতে পেরে তিনি নিজেই তালা ভেঙ্গে তাঁদের ঘরে থাকতে সাহায্য করেন। দীর্ঘ কয়েকমাস তাঁরা আমাদের সঙ্গে বসবাস করেন। আমি যতখানি পেয়েছি খরচ খরচাদি করেছি। অবশ্য আমি একেবারে অপারগ হলে তখন ফুপা নিজেও সংসারের ভার বহন করেছেন। তাঁদের ছেলে মেয়ের সংখ্যা মাশাআল্লাহ অনেক। ২/৩ জনকে ভারতে রেখে বাকী সবাই তাঁর সঙ্গে থাকত। তাঁদের এক ছেলের নাম সৈয়দ দস্তগীর নওয়াজ। সে ছিল অনেকটা প্রতিবন্ধী এবং রাতকানা। তাঁর বয়স প্রায় তখন ২০/২২ বছর হবে। হঠাৎ আমার একদিন মনে হল, তার একটা ভাল চিকিৎসা হওয়া দরকার যেটা এ পর্যন্ত ফুপা করাতে পারেন নি। আমি তাকে ইস্পাহানী আই হসপিটালে নিয়ে যাই। সেখানে কয়েকজন ডাক্তার তাকে উত্তমরূপে দেখেন। তাঁরা কয়েকটি ইনজেকশন নেওয়ার কথা বলেন এবং কিছুদিন পর আবার দেখার পরে তাকে একটা চশমার প্রেসক্রিপশন করেন। ডাক্তার সাহেব আরও বলেন ওর মাথার মগজের মেমব্রেনটা সব সময় থরথর করে কাঁপছে, অতএব, এর জন্যে একজন ব্রেন স্পেশালিস্টকে দেখানোর পরামর্শ দেন। আমি তার চশমা কেনার জন্যে এক সন্ধ্যার পর তাকে সঙ্গে করে দোকানে নিয়ে যাই। যেখানে পূর্বেই অর্ডার দেওয়া ছিল। চশমাটা চোখে লাগিয়েই সে এত দ্রুত চলতে শুরু করল যে আমি তাকে থামাতে পারি না। ঐ অবস্থায় আমার বাসায় ফিরে দেখি ফুপাজান বসে রয়েছেন। তিনি তাকে সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি পরীক্ষা করলেন- সে ভাল দেখতে পায় কিনা, পরীক্ষায় সে আশাতীতভাবে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। ফুপাজান নিজেও খুবই খুশী হলেন এবং চশমার দামটা আমাকে নেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। আমি বলি তাঁকে অনেক পূর্বেই ডাক্তার দেখান উচিৎ ছিল। যাহোক এখন অন্তত আপনি ওকে একজন ব্রেন-স্পেশালিস্টকে দেখানোর চেষ্টা করেন। দস্তগীর নওয়াজ এখনও আল্লার ফজলে বেঁচে আছে এবং অনেকটা ভালই আছে। আজ ক'বছর হল আমার ফুপু এবং একবছর পরে ফুপা উভয়েই জান্নাতবাসী হয়েছেন।

www.pathagar.com

চতুর্দশ পর্ব

১৯৬৮ সালে টিচার্সটেনিং কলেজে থাকতে হঠাৎ একদিন কলেজ লাইব্রেরীতে Morning News পত্রিকায় দেখি যে আমেরিকা ভিয়েতনাম যুদ্ধে কার্পেট বম্ববিং করেছে অত্যন্ত ব্যাপক আকারে এবং তাতে বহু নিরীহ লোকের প্রাণহানী ঘটেছে। এ ঘটনার ঠিক ক'দিন পরেই ভিয়েতনামের তখন মহান প্রেসিডেন্ট ছিলেন ড. হো চি মিন। তিনি এই ব্যাপক আকারে বোমা বর্ষণের পর অত্যন্ত মূল্যবান মন্তব্য করেনঃ The U.S. dollars and Bombs will not be able to bend the will of the Vietnum people, rather it is steel tampered for four thousand years right from now. এই মহান উক্তিটি আমি বার দুই পড়ি, এবং ভাবি যে দেশের নেতা এমনভাবে তেজস্বী ভাষায় কথা বলতে পারেন সে দেশ স্বাধীন না হয়ে পারে না। পক্ষান্তরে আমাদের দেশের বহু নেতা, উপনেতা, পাতি নেতা এমনকি বহু বরেণ্য জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তির নিকট থেকেও এমন ধরনের কোন বানী শ্রবণ করেছি কিনা জানিনা। সে সময় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন লিন্ডন বি জনসন। ড. হো চি মিন বেশীদিন এ ধরাধামে থাকেন নি। মাত্র ২/৪ মাসের মধ্যেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। কিন্তু অতি আশ্চর্যের বিষয় যে, এর মাত্র ছ'মাসের মধ্যেই ভিয়েতনাম স্বাধীনতা লাভ করে। এবং পাপিষ্ঠ ৫৮ হাজার আমেরিকান সৈন্যের মৃত্যু হয়, কোন বিজয় ছাড়াই। তারা নাপাম বোমা পর্যন্ত ব্যবহার করেছিল ভিয়েতনামে, যেটা ভূমিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে যেত। দীর্ঘ প্রায় ১০ বছর ধরে এই মানবতা বিরোধী যুদ্ধ চালিয়েও তারা বিজয়ের মুখ দেখেনি।

অনুরূপভাবে, আমার দৈনিক পত্রিকা পড়ার একটা প্রবণতা ছিল। সেটা বাংলা বা ইংরেজি যাই হোক না কেন। তখনকার সময় বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের প্রথম সারির মধ্যেই ছিলেন ড. মরিস বুকাইলি। ফ্রান্সের প্যারিসেই তিনি বেশী থাকতেন। তিনি একজন জাত বিজ্ঞানী হলেও ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করতে

www.pathagar.com

অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি তাঁর ধর্মগ্রন্থ পবিত্র বাইবেল পাঠ করেন অতি উত্তমরূপে। কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টি অপূর্ণ থেকে যায়। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করেন ফ্রেঞ্চ ভাষায়, তৎপর ইংরেজি ভাষায়। কিন্তু এতেও তৃপ্তি না আসায় তিনি খোদ আরবী ভাষাতেই সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন মজিদ প্রাণভরে পাঠ করেন এবং তারপরই তিনি একটি অত্যন্ত মুল্যবান মন্তব্য করেনঃ Where as I have found the movmental errors in the Holy Bible, I have never found not a single error in the Holy Quran. এই মহাবানীটি দৈনিক পত্রিকা The Observer এ পড়ার পর আমি তাঁর লিখিত অতিমূল্যবান গ্রন্থ The Bible the Quran and Science বইটি পড়ার প্রবল আগ্রহে অতি সত্ত্বর আমি তা পড়ে ফেলি এবং স্তম্ভিত হয়ে যাই। তিনি বাইবেল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন যে মার্ক, লুক মথি এবং যোহন এই চারজন পাদ্রী মিলে যে বাইবেল তারা রচনা করেছিল (তাঁদের স্মৃতি থেকে, কেননা আসল বাইবেল গ্রন্থটি ছিল আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে এবং সেটি প্রবল আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়)। এটি ঐতিহাসিক সত্য। তার মধ্যে এই চারজন পাদ্রীর কথাবার্তার মধ্যে প্রচুর গরমিল রয়েছে। এমনকি একজনের মন্তব্যের সঙ্গে অন্যজনের মন্তব্য সম্পূর্ণ বিপরীতমুখিতা (Diagonally opposite) বিরাজমান। অতএব, কোনটাই গ্রহণ যোগ্য হিসাবে অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে না।

পক্ষান্তরে, তিনি মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন মজিদ পাঠ করতে গিয়ে বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পবিত্র (আয়াত) বাক্যগুলি তিনি তাঁর নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে গভীরভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আশ্চর্যভাবে সন্তুষ্ট হয়েছেন যে, কোথাও এতটুকু গরমিল নেই। যেমন তিনি পবিত্র কোরআনের মধ্যে লক্ষ্য করেন যে, মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা সে গরুর দুধপান কর, তার এক পথ দিয়ে মল, এক পথ দিয়ে মূত্র এবং অন্যপথ দিয়ে আমি তোমাদের জন্যে বিশুদ্ধ সাদা দুগ্ধ বের করি যা তোমাদের স্বাস্থ্যের জন্য উত্তম। এতে কি তোমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন সূত্র খুঁজে পাওনা? ড. বুকাইলি এই বাক্যটি পড়ার পরপরই তাঁর নিজস্ব ল্যাবে গিয়ে গরুর পুরো এনাটমি নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল হিসাবে পবিত্র আয়াত বা বাক্যটির যথার্থতা প্রমাণ করেন। এভাবে তিনি পর্যায়ক্রমে অনেকগুলি পবিত্র আয়াতের গবেষণামূলক পরীক্ষা নীরিক্ষার মাধ্যমে সন্তুষ্ট হয়ে মহাগ্রন্থ পবিত্র কালাম মজিদ সম্পর্কে উপরোক্ত

www.pathagar.com

মন্তব্য করে বিশ্বময় এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। পৃথিবীর অনেকগুলি ভাষায় তাঁর মূল্যবান বইটি অনুবাদ আকারে পাওয়া যায়। আমি যখন ২০০২ সালে প্যারিস ভ্রমন করি তখন ড. বুকাইলির সঙ্গে দেখা করার জন্য আমার বেশ আগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে তা সম্ভব হয়নি বলে আমি দুঃখিত।

ঢাকায় থাকতে আমি পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম যে, প্যারিসে একটি স্কুলের অধ্যক্ষ দু'জন মুসলিম বালিকা শিক্ষার্থীকে মাথায় স্কার্ফ পরার জন্যে স্কুল থেকে বের করে দেন। এই ঘটনা আমার মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এমনিতেই তো ইসলাম ধর্মের জন্য তেমন কিছুই করতে পারিনা, অথচ ইসলাম ধর্মের ব্যাপারে প্রতিটি মুসলিমের প্রতি তীব্র তাগিদ আছে প্রয়োজনীয় সাধ্যমত সাহায্য সহযোগিতা করার। তাই আমি নিজে ঐ বালিকাদের পক্ষে ফ্রান্সের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁকে চিঠি লিখি, যাতে তাদের প্রতি স্কুল কর্তৃপক্ষ সুব্যবহার করেন ইত্যাদি উল্লেখ করে। প্রেসিডেন্ট আমার চিঠির উত্তর না দিলেও, পরে আমি জানতে পেরেছি যে ঐ বালিকা দু'টির অভিভাবকবৃন্দ ঐ স্কুলের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা দায়ের করেন এবং মেয়ে দুটি প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। কোর্টের রায়ে ঐ অধ্যক্ষের চাকুরীচ্যুতি ঘটে এবং স্কুল কর্তৃপক্ষকে ঐ মেয়ে দুটির জন্যে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

অনুরূপভাবে, আর একটি ঘটনার জন্যেও আমি দারুণ বিচলিত হয়ে পড়ি। ভারতীয় বংশদ্ভূত কুখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর ব্যাপারে। তিনি যখন তাঁর বই Satanic Verses লিখেন তখন সারা মুসলিম বিশ্বে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বৃটিশ নাগরিকত্ব নিয়ে তিনি লন্ডনে বাস করেন দীর্ঘদিন এবং সেখান থেকেই এই মহাবিতর্কিত বইটি লেখেন, বইটির বিষয়বস্তু আমাদের মহানবী হযরত মহম্মদ (সঃ) ও তাঁর প্রিয়তমা মহিয়ষী পত্নীদের সম্পর্কে নানাবিধ কটুক্তির বর্ণনা। যা একজন সত্যিকার মুসলিমের পক্ষে পড়ার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ইরানের প্রেসিডেন্ট আয়াত উল্লাহ খোমেনি এই কুখ্যাত লেখক সালমান রুশদীর মস্তকের জন্যে তিরিশ লক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেন। অথচ বৃটিশ সরকার তাকে নিরাপত্তা দান করার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বিশ্বের যাবতীয় কুখ্যাত অপরাধীদের নিরাপত্তা বিধানের স্বর্গরাজ্য হল গ্রেট বৃটেন। কেননা তারা তথাকথিত গণতন্ত্র ও মানবতা রক্ষার প্রতিভু হিসাবে নিজেদের দাবী করে। যাহোক, এহেন কুখ্যাত লেখকের বইটি

www.pathagar.com

যখন বিশ্বের নামকরা প্রকাশক মার্ভিন ব্রাউন নিউওয়ার্ক থেকে পেপার প্যাকেজ অর্থাৎ বিশাল আকারে ছাপার প্রস্তুতি নেন, তখন আমি তাঁকে একটা দীর্ঘ পত্র লিখে অনুরোধ জানাই যে Satanic Verses এর মত বিতর্কীত বইটি বিশেষতঃ যখন মুসলিম বিশ্বে একটা প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, তখন দয়াকরে তিনি যেন এটি ছাপিয়ে তাঁর বিখ্যাত প্রকাশনা শিল্পের ক্ষতি না করেন। উপরন্তু তাঁর মত ধনী ও খ্যাতনামা ব্যক্তির পক্ষে এটি মোটেই শোভনীয় নয়। উত্তর আমি তাঁর নিকট থেকে না পেলেও তিনি এ জঘন্য কাজ থেকে যে বিরত ছিলেন এটা জানতে পেরে আমি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট।

টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ থেকে আমাদের বি,এড কোর্সকে উন্নীত করে বি,এস,সি টেক নামে অভিহিত করে ১৯৭৫ সালের শেষের দিকে ফাইনাল পরীক্ষান্তে আমি পুনরায় পাবনা পলিটেকনিকে যোগদান করি। তখন পাবনা পলিটেকনিক ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের (World Bank) তথা বিশ্বব্যাংকের টাকায় বাংলাদেশে যে পাঁচটি পলিটেকনিক তৈরী হয়, যথা পাবনা, বগুড়া, রংপুর বরিশাল ও সিলেট। এই বিশাল প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারকে কেবলমাত্র জায়গাটুকু ছাড়া আর একটি পয়সাও খরচ করতে হয়নি। অবশ্য দখলকৃত জমির জন্যে ক্ষতিপূরণ বাবদ মূল্য ছাড়া। পাবনা শহরের একটু বাইরে সিঙ্গে এলাকার দিকে প্রায় ২৭ একর জায়গা নির্বাচন করা হয় নবনির্মিত পলিটেকনিকের জন্যে। এই শহরের মধ্যে এতদিন যে পলিটেকনিক ছিল সেটি মাত্র ৭(সাত) একর মত। অতএব, অত অল্প জায়গার জন্যে বিশ্বব্যাংক টাকা দিতে রাজি নয় দেখেই আমাদের সিঙ্গের দিকে স্থান নির্বাচন করতে হয়। পাবনার স্থানীয় ঠিকাদার কফিল উদ্দীনের ছেলে আমীর হোসেন এই বৃহৎ প্রকল্পের নির্মাণ কাজের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তখন অধ্যক্ষ ছিলেন জনাব মহম্মদ শাহজাহান। তিন ছিলেন স্থাপত্য প্রকৌশলের একজন অতি দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। ফলে অন্যান্য পলিটেকনিকের তুলনায় পাবনা পলিটেকনিকের নির্মাণ কৌশল অনেকটা উন্নতমানের হয়েছে। যেমন বিশ্বব্যাংকের প্ল্যান অনুযায়ী যে মসজিদের ছক তৈরী করা হয়, আমরা তা গ্রহণ করিনি। আমরা নিজেরাই নিজেদের মসজিদ তৈরী করেছি এবং আমি নিজেই ছিলাম মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী। পলিটেকনিকের প্রধান বিল্ডিং এর সম্মুখেই পুকুর তৈরীর প্রস্তাব ছিল বিশ্বব্যাংকের প্ল্যানে। কিন্তু আমরা সেটা পছন্দ করিনি।

www.pathagar.com

অধ্যক্ষ শাহজাহান সাহেবের তত্বাবধানে সেই পুকুরটি আমরা তৈরী করি পলিটেকনিক জামে মসজিদের পাশেই। ফলে অন্যান্য পলি টেকনিকের তুলনায় পাবনা পলিটেকনিকের সেটআপ অনেক সুন্দর। বিশ্ব ব্যাংকের টাকায় পাবনা ছাড়া অন্য যে চারটি পলিটেকনিকে মসজিদ বানান হয়েছে, তা আদৌ বিশ্বের অন্য কোন মসজিদের সঙ্গে কোন সামাঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন মসজিদের গম্বুজ ও মিনার হল প্রতিটি মসজিদের বিশেষতঃ অথচ বিশ্বব্যাংকের আর্কিটেক্ট Stanley Tigerman এই পলিটেকনিকটগুলির জন্যে যে মসজিদের নকশা অংকন করেন, তা একটা একতলা বাড়ী ছাড়া কিছু নয়। এমনকি মসজিদের কাছে গিয়েও লোককে জিজ্ঞাসা করতে হবে মসজিদ কোনটি? আরও আশ্চর্যের বিষয় যে আমাদের বাংলাদেশের বিখ্যাত ডেভেলোপার শহীদুল্লাহ এসোসিয়েটস্ এই বিশাল পাঁচটি পলিটেকনিকের কাজ পেয়েও এব্যাপারে কোন কিছু করতে পারেন নি বা করেননি। বাংলাদেশ থেকেও একজন আর্কিটেক্ট নেওয়া হয়েছিল এবং তাঁর নাম ছিল মাজহারুল ইসলাম। বিশ্বব্যাংক তাঁকেও অনুমোদন দিয়েছিল, কিন্তু তিনিও এ ব্যাপারে সম্ভবতঃ নির্লিপ্ত ছিলেন। যা হোক এ সমস্ত সাত-পাঁচ ভেবেই আমরা পাবনা পলিটেকনিকের জন্যে বিশ্বব্যাংকের অনুমোদিত মসজিদের নকশা গ্রহণ করিনি। অনেক পূর্ব থেকেই আমার মসজিদের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল বলে আমাকেই মসজিদ কমিটির সেক্রেটারীর দায়িত্বের ভার দেওয়া হয়। এবং প্রথম মিটিং এর মধ্যে তখন আমার পকেটে মাত্র ৫০ টাকা ছিল। আমি সেটাই সর্বপ্রথম মসজিদ তৈরীর ফান্ডে চাঁদা হিসাবে দান করার সুযোগ পাই। অবশ্য এরপর বহু পরিশ্রম করে আমাদের পাবনা পলিটেকনিকের জন্যে নানাভাবে চাঁদা সংগ্রহ করে বর্তমানে যে বিশাল জামে মসজিদটি করা হয়েছে, তাতে বৃষ্টি বাদলের দিনেও পবিত্র ঈদুল ফিতর বা ঈদুল আজহার মত বিশাল জামাতের ব্যবস্থাও রয়েছে। এই মসজিদ তৈরী করতে দীর্ঘ সময় ব্যয় হয়। প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে ছিলেন জনাব হাসান আহমদ সাহেব এবং পরে অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেবের সময় মসজিদের সম্পূর্ণ কাজ শেষ করা হয়। বিশেষতঃ মসজিদ কমিটির প্রেসিডেন্ট হিসাবে এই দু'জন অধ্যক্ষের অবদান অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহপাক তাঁদের এ কাজের জন্যে 'জাযা' দান করুন! আমীন!!

www.pathagar.com

পঞ্চদশ পর্ব

১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর সাংগঠনিক রূপ লাভের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি)। আইডিইবি'ই এক মাত্র সংগঠন যারা সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নিয়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। প্রাথমিকভাবে এই মহান সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব মহম্মদ তাজাম্মুল হোসেন সাহেব। তিনি তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে এবং তাঁর নিজস্ব মোটর গাড়ীটি এই সংগঠনের কাজে নিরলসভাবে বাবহার করেন দীর্ঘদিন তাঁর এই মহান ত্যাগ ছাড়া আজকের আইডিইবির এই পর্যায় পর্যন্ত আসা হয়ত মোটেই সম্ভব হত না। আমরা সকল সদস্যই তাঁর এ বলিষ্ট ভূমিকার জন্যে যারপর নাই কৃতজ্ঞ। ব্যতিক্রমধর্মী এই সংগঠন তার সকল কর্মকান্ডের শতকরা ৭৫ ভাগ দেশ ও জনগণের স্বার্থে পরিচালনা করে। আইডিইবি বিশ্বাস করে সামগ্রিকভাবে দেশের উন্নয়ন ঘটলে নাগরিক হিসেবে দেশের জনগণেরও ভাগ্যোন্নয়ন ঘটবে। আর তাই জনগণ তথা দেশের ভাগ্যোন্নয়নে এ সংগঠনটি প্রযুক্তি সেবাকে মানুষের দোরগোড়ায় পৌছে দেবার লক্ষ্যে তাদের প্রতিষ্ঠার দিন ৮ নভেম্বরকে গণপ্রকৌশল দিবস হিসেবে পালন করে আসছে।

সমস্ত বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা সদরে আইডিইবি'র ধারাবাহিকতা সংরক্ষণের জন্যে খোলা হয় অসংখ্য শাখা প্রশাখা। ফলে, পাবনা শহরের মধ্যে একটি দ্বিতল ভবনের উপরতলা ভাড়া নেওয়া হয় আইডিইবি'র অফিস পরিচালনার লক্ষ্যে। একজন প্রবীণ সদস্য হিসেবে এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব এসে পড়ে আমারই ঘাড়ে। ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সাত বছর আমি এই মহান গুরুদায়িত্ব অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় পালন করি নির্ভিকভাবে। সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আব্দুস সাত্তার। যিনি ছিলেন পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (WAPDA) একজন প্রকৌশলী। এ ছাড়াও পাবনা পলিটেকনিক থেকে ছিলেন শিক্ষক জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন মোল্লা, জনাব আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী ও আরোও অনেকেই বিভিন্ন পোর্টফোলিওরের দায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত

www.pathagar.com

আন্তরিকভাবে। অবৈতনিক এ সমস্ত গুরুদায়িত্ব পালনের জন্যে যে একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা ও পারিবারিক কাজের প্রতি অবহেলা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে সর্বক্ষণ সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, সে জন্যে আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সদস্যদের কেবলমাত্র সামান্য চাঁদার মাধ্যমে এতবড় একটি প্রতিষ্ঠান ঠিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। তাই মাঝে মধ্যে আমার ধনী ব্যবসায়ী বন্ধুদের সাহায্য ও সহযোগিতা আমাদের নিতে হয়েছে কৃতজ্ঞচিত্তে। এ মুহূর্তে তাঁদের সকলের নাম উল্লেখকরা আমার পক্ষে সম্ভব হল না বলে আমি দুঃখিত।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শুদ্ধভাবে পবিত্র কোরআন মজিদ পাঠ করা এবং অর্থ ও তফসীরসহ ব্যাখ্যা করা, এই মহান কাজটি আমার পক্ষে মহান আল্লাহ পাক বহুপূর্ব থেকেই মেহেরবানী করে সহজ করে দিয়েছিলেন বলেই হয়ত বহুস্থানে অনেক আনুষ্ঠানিকতায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান পর্বের সূচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আলহামদোলিল্লাহ। এমন কি আন্তর্জাতিকভাবেও দু'চারটি অনুষ্ঠান যা ঢাকার বিভিন্নস্থানে বহুদেশ বিদেশের বিশিষ্ট অতিথিদের সম্মুখে পবিত্র কোরআনুল করিম তেলাওয়াতের পর তা ইংরেজি ভাষায় তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর করার তৌফিক মহান আল্লাহ পাক আমাকে দান করেছেন। আল্লাহ সোবহানুতায়ালার মহান দরবারে আমি জানাই লক্ষকোটি শুকরিয়া ও সিজদা।

১৯৭৬ সালে আমি ভারতে যাই বিশেষ এক উদ্দেশ্যে। আমার পরিবার বর্গের সকলেই সেখানে তখন ছিলেন মুর্শিদাবাদে অর্থাৎ আমার ছেলে মেয়েদের নানার বাড়ীতে। এবার জুন মাসের দিকে ভারত রওনা হলেও আমি রীতিমত সব শীতবস্ত্রই সঙ্গে নিয়ে ছিলাম আমার জন্যে। দার্জিলিং দেখার সখ ছিল আমার বহুদিনের। এমনকি বিয়ের ক'মাস পরই সস্ত্রীক সেখানে যাওয়ার একটা প্রবল আগ্রহ হয়েছিল, অনেকটা এক ঢিলে দুই পাখী মারার মত সুবিধা পাওয়ার আশায়। কেননা, আমাদের হানিমুন বা মধু চন্দ্রিমাটাও সেরে ফেলা যেতে পারত। কিন্তু সেই ১৯৬৩-৬৪ সালে রাজনৈতিক বাধা নিষেধের বেড়াজালে সেটা আটকাপড়ে। এবার কিন্তু আমি দার্জিলিং যাওয়ার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অতএব, আমার স্ত্রীকে যখন প্রস্তাবটা দিলাম, তখন তিনি বলেন তাঁর সঙ্গে কোন শীতবস্ত্র নেই সুতরাং তাঁর নেতিবাচক মনোভাব দেখে আমি আর অপেক্ষা না করে একাই সব ঠিক করে ফেললাম। আমার পিতা অবশ্য

www.pathagar.com

ইতোপূর্বে একবার দার্জিলিং থেকে ঘুরে এসেছিলেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে। তিনি আমাকে একা সেখানে যেতে দিতে নারাজ, এ অনেকটা বাৎসল্যপ্রীতির কারণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। ফলে, পাঁচগ্রামে এসে তিনি আমাকে বলেন তোমার এই ছোট ফুপাকে নিয়ে যাও সঙ্গে। ফুপা ছিলেন প্রায় আমারই সমবয়সী এবং আমার পিতার আপন মামাতো ভাই সৈয়দ গোলাম মোস্তফা ওরফে কচি। তাঁর পিতা ছিলেন এক সময় সিউড়ী জিলা স্কুলের মাওলানা সাহেব সৈয়দ সাইদ আহমদ। যা'হোক পরিশেষে আমরা দু'জনেই বিকেলের বাসে রওনা দিলাম মুর্শিদাবাদ, মালদা হয়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। সারা রাত্রি বাস চলল। যখন ফারাক্কা ব্যারেজের উপর দিয়ে আমাদের বাস অতিক্রম করে তখন গাড়ীর গতি ছিল ঘন্টায় ৫ কিঃ মিঃ মাত্র। আমি জিজ্ঞাসাবাদ করায় জানতে পারলাম ব্যারেজের কোথাও কোথাও ফাটল দেখা দিয়েছে। মালদহে রাতের খাওয়া সেরে বেশ কিছু বিরতীর পর আবার হল যাত্রা শুরু। সারাটা পথ প্রায়ই জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম বলে পথের দু'পাশে মালদহের বিশাল বিশাল আম বাগানের প্রতি আমাদের নজর ছিল খুবই আগ্রহপূর্ণ। রাত্রি হলেও সম্ভবত জ্যোসনা রাতে আম বাগানের চমৎকার মন মুগ্ধকর দৃশ্য আমাদের ভালই লাগছিল। এ জন্যেই বোধ করি সুমিষ্ট ফলের রাজা আমের জন্যে এত বিখ্যাত মালদহ।

সকাল সাতটার মধ্যেই পৌছালাম শিলিগুড়িতে। একটা ভাল হোটেলে গিয়ে প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে উত্তমরূপে চা-নাস্তা খেয়ে এখন দার্জিলিং এর পাহাড়ী পথে যাত্রা করতে হবে। অতএব, বেশী বিলম্ব না করে আমরা যাতে তাড়াতাড়ি দার্জিলিং পৌছাতে পারি সে জন্যে রেলপথে না গিয়ে সড়ক পথে 4-wheel drive মাইক্রোবাসে উঠে পড়লাম। পাহাড়ী পথে অনেক এঁকে বেঁকে প্রায় ৬০ কিঃ মিঃ দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের উঠতে হবে ৭,০০০ ফুট উপরে। পথের উভয় পাশে পাহাড়ী পথের সুদৃশ্য দেখতে কিন্তু বড়ই মনোরম। কখনও রেল চলছে উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি নীচে সড়ক পথে; আবার কখনও বা রেল চলছে নীচ দিয়ে তো আমরা আছি উপরে আবার কখনও বা পাশাপাশি। অনেকগুলি লেবেল ক্রসিংও পার হলাম। দূরে শুধু অন্ধকার পাহাড় দেখা যায়। আবার মাঝে মাঝে প্রায়ই কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া। প্রায় মাঝামাঝি পথে সোয়েটার বের করে গায়ে চাপালাম, যদিও জুন মাস। বেশী শীত আমরা সহ্য করতে পারবনা বলেই ঐ সময়টা বেছে নিয়েছিলাম আমি। ঘুম রেলস্টেশন পার হওয়ার কিছু পরই আমরা

www.pathagar.com

সড়ক পথে একেবারে সোজা প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টা পর দার্জিলিং শহরে পৌঁছালাম। শিলিগুড়ি শহর থেকে আমরা মাইক্রোবাসে এসেছিলাম বলেই এত দ্রুত আসতে পেরেছি। নতুবা যদি টয়ট্রেন ব্যবহার করতাম তবে আমাদের সময় লাগত প্রায় সাড়ে দশঘন্টা। কেননা, দু'টো রেল ইঞ্জিন টয়ট্রেনকে একটা সামনে টানে এবং অপরটা পিছন থেকে ধাক্কা মেরে পাহাড়ী পথে ধীরে ধীরে ঘুরপাক খেতে খেতে চলতে থাকে বলেই এত দীর্ঘ সময় লাগে। অবশ্য পাশ্ববর্তী চমৎকার দৃশ্যাবলী দেখার কিন্তু বেশ সুযোগ পাওয়া যায়। সমতল পথে, যাত্রা আর পাহাড়ী পথে যাত্রার এখানেই বিশেষ পার্থক্য। যা'হোক আমরা দুপুরের কিছু পূর্বেই দাজিলিং শহরে পৌঁছে গেলাম। এবং আমরা গিয়ে উঠলাম একটু উপরে আঞ্জুমানে ইসলামিয়া হোটেলে যার সংলগ্ন বিশাল মসজিদ। যোহরের নামাজের পর আমরা অন্য একটি হোটেলে গিয়ে দুপুরের খাবার খাই। বেশ শীত শীত ভাব তখন। স্থানীয় অধিবাসীদের প্রত্যেকের গায়ে একটা করে সোয়েটার বা শীতবস্ত্র অবশ্যই রয়েছে। অবশ্য পথে আসার সময় আমরা পথের পাশে চায়ের দোকান থেকে কিছু নাস্তা করেছিলাম। মেয়েদের সংখ্যা অনেক বেশী মনে হল এবং দোকান পাঠ প্রায় সব মেয়েরাই পরিচালনা করছে বেশী। বিকেলের দিকে বেরুলাম চতুর্দিক ঘুরে দেখার জন্যে পথের পাশে বেশ কিছু চায়ের বাগান এবং উপরেরদিকে তাকালেই দেখা যায় পাহাড়। আমরা দু'জনে ভাবলাম উপরের পাহাড়টা ঘুরে দেখি। সেখানে যাওয়ার পর দেখি আবার পাহাড় উপরে এভাবে একটার পর একটা পাহাড় যেন থাকে থাকে সাজানো। আবার নীচের দিকে দেখলে মনে হয় এইতো বেশী নীচু মনে হচ্ছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো যে, পাহাড় পর্বতের যে আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে, সমতল ভূমি থেকে সেটা সেখানে না গেলে কখনও বলে বা লিখে বুঝানো সম্ভব নয়। দার্জিলিং শহরটি মূলত কয়েকটি বিষয়ের জন্যে প্রসিদ্ধ। যেমন চা-বাগান, কমলা লেবুর বাগান, ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে বেশ উৎকৃষ্ট মানের কতকগুলি স্কুল ও কলেজ আছে। সেখানে ইংরেজি মাধ্যমের দ্বারা বেশী শিক্ষা দান করা হয়। ফলে প্রত্যেকেই ভাল ইংরেজি বলতে পারে। আর মধু চন্দ্রিমা বা হানিমুনের জন্যেও স্থানটি অনেকেরই পছন্দ, পাশেই কিছু দূরেই রয়েছে কার্শিয়াং শহর এবং অন্য একটি রাস্তা চলে গেছে কালিংপঙের দিকে। এই তিনটি প্রধান শহরই স্বাস্থ্যকর ও স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

www.pathagar.com

পরের দিন ভোর বেলায় উঠার পর বুঝতে পারলাম প্রচন্ড শীত। কেননা, রাতে আমাদের প্রত্যেককে দুটি করে লেপ দেওয়া হয়েছিল গায়ে দিবার জন্যে, যদিও জুন মাস। তাই ভাবলাম ডিসেম্বর জানুয়ারী মাসে না জানি কী প্রচন্ড শীত পড়ে। অবশ্য ঐ সময়টাই নাকি টুরিস্টদের বেড়ানোর জন্যে প্রকৃত সময়। মাঝে মধ্যে প্রায়ই কুয়াশা ও মেঘবৃষ্টি হচ্ছে। আকাশ দেখে তেমন কিছু আন্দাজ করা বেশ মুশকিল। তবে বাইরে যাবার পূর্বে আমরা জানালাগুলি সবই বন্ধ করে যেতাম, নতুবা ঘরের মধ্যে মেঘের বৃষ্টিতে সবকিছুই বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। উঁচু-নীচু রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে পায়ের হাঁটু যেন আমার ভেঙ্গে আসছিল। মাঝে মাঝে ফুপাকে ধরে আবার একটু পরেই ঠিক হয়ে যেত। আমার এই অবস্থা দেখে একজন ট্রাকচালক আমাকে জানাল পাহাড়ী রাস্তায় দ্রুত না হেঁটে ধীরে ধীরে যেন চলতে থাকি। বিশেষত উঁচু পথে উঠার এটাই নিয়ম। পাহাড়ের উপর রয়েছে বেশ কয়েকটি নামকরা কলেজ সেন্ট লরেটো, সেন্ট পল ইত্যাদি। আমরা বটানিক্যাল গার্ডেন যাওয়ার উদ্দেশ্যে পথ চলছি যদিও দিক নির্দেশনা আমাদের জানা নেই। এমন সময় হঠাৎ দেখি একটি পাহাড়ের উপর থেকে একটি সূশ্রী মেয়ে নেমে আসছে আমাদের দিকে। আমি তাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করি বটানিক্যাল গার্ডেনটি কোন দিকে? সে বেশ চমৎকার ইংরেজিতে আমাদের বলে আমার সঙ্গে এস। আমি ঐ দিকেই যাচ্ছি -আমার কলেজের দিকে। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কোত্থেকে এসেছ? আমি বলি বাংলাদেশ থেকে। তখন সে বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলে আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ কিন্তু একজন বাঙ্গালী। অতএব চল আমাদের কলেজটা আগে দেখে নাও। সে সময় কলেজে এসেম্বলী শুরু হয়ে গেছে বলে অধ্যক্ষের সঙ্গে আর দেখা করা সম্ভব হল না বটে, তবে মেয়েটি আমাদের দুজনকে তার কলেজের অনেকগুলি ক্লাসরুম এবং ল্যাব ইত্যাদি দেখাল। আমি তাকে একফাঁকে জিজ্ঞাসা করি তোমার নাম কি? সে বলে সুনীতি ছেত্রী। আমি আবার জিজ্ঞাসা করি তুমি কোন ইয়ারে পড়? সে বলে চতুর্থ বর্ষ বিজ্ঞান। আমি আবার প্রশ্ন করি ক্লাসে তোমার পজিশন কি? সে দ্রুত উত্তর দেয় প্রথমস্থান। আমি দারুন খুশী হয়ে তাকে কংগ্রেচুলেশন জানাই। এরপর আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গার্ডেনের দিকে রওনা দিই। পথে চলতে চলতে হঠাৎ দেখি একটা বিশাল আকৃতির পাথর সামান্য একটা পাথরের উপর থেকে রাস্তার উপর এমনভাবে ঝুলে রয়েছে যে, এই

www.pathagar.com

বুজি মাথার উপর পড়ল। তার নীচে দিয়ে যেতে যে কোন মানুষের ভয় পাওয়ার কথা। অথচ সেটি নাকি বহু বছর ধরে ঐভাবেই রয়েছে। বুঝলাম তার সেন্টার অব গ্র্যাভিটি ঐ ছোট্ট পাথরটির ভিতর দিয়েই চলে গিয়েছে বলেই এই অবস্থা। মজার ব্যাপার বা ভয়ের ব্যাপারটা হল যে, পুরো রাস্তাটার উপরই বিশাল আকারের পাথরটি ঝুলে রয়েছে। আমরা দীর্ঘক্ষণ ধরে সেটি বার বার দেখলাম। পাহাড়ী পথের আঁকা বাঁকা পথে চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে পেলাম মাইক্রোফোনে কে যেন কি বলছে? চতুর্দিকে উপর নীচে তাকিয়ে হঠাৎ দেখি অনেক উঁচু একটি পাহাড়ের কিনারায় পা ঝুলিয়ে একটি ছেলে বসে বসে পড়া মুখস্ত করছে এবং সেটাই আমাদের কানে মাইকের আওযাজের মত শুনাচ্ছিল। বাস্তবিকই বড়ই বিচিত্র পাহাড়ী এলাকা এগুলি বাস্তবে না দেখলে সহজে বুঝান যাবে না। এরপর আমরা উঠলাম চৌরাস্তা বা চৌমাথার উপর। এটি একটি বেশ বড় সমতল ভূমির মত যার চারপাশে এক এক ধরনের ব্যবস্থা। যেমন একদিকে রয়েছে পার্কের মত চমৎকার বাগান। একদিকে রয়েছে সারি সারি দোকান পাঠ এর ঠিক উল্টো দিকে রয়েছে, বিশাল আকৃতির খাদ ও জলাভূমি। আবার যাবা ঘোড়ায় চেপে ঘুরতে চাই তাদের জন্যে বেশ কিছু ঘোড়া। আমার শশুর আমাকে বলেছিলেন, দার্জিলিং থেকে কিছু চা এবং কমলা নিয়ে এস। আমি কমলা কোথাও পাইনি যেহেতু কমলা সিজন তখন নয় বলে। তবে ভাল চা আনতে পেরেছিলাম বেশ সস্তায়। যেটি কলকাতায় অনেক বেশী দামে পাওয়া যায়। এছাড়াও সেই ১৯৭৬ সালে দার্জিলিং এ অনেককিছু দেখার ছিল। যা বর্তমানে নেই। এখন সেখানে সমস্ত পাহাড়ের গায়ে গায়ে এত বেশী বাড়ী ঘর তৈরী হয়েছে যে সত্যিকার পাহাড়ের সে সৌন্দর্য আর নেই। চা-বাগানের কোথাও কোন চিহ্ন আর এখন অর্থাৎ ২০০১ সালে আমি দেখতে পাইনি। ছোট্ট একটি চিড়িয়াখানা দেখেছিলাম তখন। আর বিশেষ করে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শিখরে এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গে সেটা প্রায় ২৯,০০০ ফুট উপরে অভিযানের সময় স্যার এডমন্ড হিলারী এবং শেরপা তেনজিং যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলি একটি মিউজিয়ামে রাখা আছে দেখলাম। আমি ১৯৫৪-৫৫ সালে কলকাতায় লাইট হাউস সিনেমা হলে হিমালয় অভিযানের উপরে যে বিখ্যাত ছবিটি তৈরী হয়েছিল "The conquest of Evarest" তা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছিলাম এবং সে দিনই শেরপা তেনজিং তাঁর অভিযানে বাবহৃত যন্ত্রপাতি নিয়ে হলে উপস্থিত হয়েছিলেন। সঠিক তারিখটা এখন আর আমার মনে নেই বলে দুঃখিত।

www.pathagar.com

দার্জিলিং থেকে অনেকগুলি View Card কিনেছিলাম। যেগুলি দেখে দেখে আমরা দুজনে অনেক মনমুগ্ধকর স্থান পরিদর্শন করেছিলাম। পরের দিন ভোর ৩টার সময় আমরা যাব টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার জন্যে। সেজন্যে একজন জীপ চালককে পূর্ব থেকেই বলে রেখেছিলাম যেন আমাদের হোটেলে এসে আমাদের ডেকে নিয়ে যায়। কথামত ঠিক সে এসেছিল এবং আমরা জীপে কয়েকজন মাত্র ১২/ টাকা মাথাপিছু ভাড়ায় রওনা দিলাম। অনেকটা আঁকাবাঁকা এবং খুব খাড়া পথের উপর দিয়ে জীপ ছুটল বিদ্যুৎ গতিতে। অনেকগুলি জীপকে ওভারটেক বা পাশ কাটিয়ে জীপ চালক আমাদের নিয়ে দ্রুত গতিতে গাড়ী চালিয়ে ১২০০ ফিট উপরে টাইগার হিলে উঠলাম। এবং এটাই দার্জিলিং এর সর্বোচ্চ পাহাড়। অর্থাৎ মিন সীলেবেল (এমএসএল) থেকে ৮২০০ ফিট উচ্চতা সম্পন্ন পাহাড়। সারা বিশ্বের মধ্যে সূর্যোদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দরতম স্থান। কেননা, পূর্ব দিক থেকে সূর্য ধীরে ধীরে উঠতে থাকে বিভিন্ন রং-এ এবং তা পশ্চিম দিকের হিমালয় পর্বতের কাঞ্চনজঙ্ঘায় প্রতিফলিত হয় অত্যন্ত সুদৃশ্য রামধনুর মত বিভিন্ন রঙ্গে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে সাদা বরফের বিশাল পাহাড় জুড়ে। এবং প্রতি ক্ষণে ক্ষণে সে রং বদলায় আর এটিই হলো দেখার আসল বিষয় বস্তু। আমরা গিয়ে দেখি বহু শত লোক তাদের ক্যামেরা, বাইনোকুলার ইত্যাদি নিয়ে অনেক পূর্বেই প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। তখনও একটু একটু অন্ধকার আছে, আর একটু পরেই সূর্য্য উঠবে আমরা সকলেই দারুণ আবেগ ও উৎকন্টার মধ্যে অপেক্ষা করছি। আমার কাছে তখন কোন ক্যামেরা ছিল না বটে, তবে একটা বাইনোকুলার ছিল। কিন্তু আমাদের সব আশা ভরসা ধূলিসাৎ করে দিয়ে একখন্ড হতভাগা মেঘ ঠিক সূর্যোদয়ের স্থানে এসে আটকে গেল তো গেলোই। আর এক চুলও সরলনা বলে আমরা সকলেই হতাশ এবং মনক্ষুন্ন অবস্থায় ফিরে এলাম দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর। এ দারুণ ব্যাথা ভুলার নয় কখনই। পুনরায় পাহাড় থেকে নীচে নেমে এলাম দার্জিলিং মূল শহরে। প্রচন্ড শীতের জন্যে সোয়েটার, কোট মাফলার সবই ছিল সঙ্গে তবুও যেন শীত মানে না। যাহোক আমি জীপচালককে শেষে একটি প্রশ্ন করতে বাধ্য হলাম যে, তুমি যেভাবে এই খাড়া পাহাড় বেয়ে অতিদ্রুত জীপ চালিয়ে উপরে উঠলে, যদি ব্রেক ফেল করে গাড়ীটা পিছনে গিয়ে পড়ত, তবে তো কয়েক শ'ফুট পাহাড়ের নীচে আমরা সবাই পড়তাম কিনা? চালক আমাকে জানাল, বিগত ৭০ বছরে এমন

www.pathagar.com

ঘটনা এখানে ঘটেনি। অতএব, তোমাদের অযথা ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমরা ফিরে এসেই একটা হোটেলে গিয়ে পেটপুরে খেয়ে নিলাম। দার্জিলিং ছেড়ে চলে আসার জন্যে হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি সেখানে বসে রয়েছেন আমার পীরভাই অধ্যাপক ড. আব্দুস সোবহান। আমি তো অবাক, আপনি এখানে কীভাবে? তিনি আমাকে বলেন, ছোট হুজুর পাকের সঙ্গে আমরা জনা দশেক লোক এসেছি ট্রেনে গতকাল। আমি বললাম, আমরা তো এখন বিদায়ের পথে। তিনি বল্লেন, চলেন ছোট হুজুর পাকের সঙ্গে একটু হাজির হয়ে যান, তিনি উঠেছেন একটি ভিলাতে। আমি ফুপাকে বললাম, ফুপা আমি তাহলে ওখান থেকে একটু হাজির হয়ে আসি তারপর এখান থেকে বিদায় নিব। বলেই ড. সোবহান সাহেবের সঙ্গে পথে নামলাম। বেশ একটু দূরে ভিলাটি ছিল বলে পথে যেতে যেতে ড. সোবহানের সঙ্গে আমার অনেক কথা হল। বিশেষত আমার একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি আমার পীর হযরত গওসল আজম (রাঃ) এটা দেখে দেওয়ার জন্যে বর্তমান বড় হুজুর পাক কেবলা তাঁকে অনুমতি দিয়েছিলেন। সে ব্যাপারে তিনি আমাকে জানালেন যে, বইটি যথেষ্ট ভাল হয়েছে, আপনি অনেক পরিশ্রম করেছেন বুঝতে পারছি। অতএব, এখন আপনি এটি ছাপার জন্যে প্রেসে দিতে পারেন। আমি তাঁর কাছে একটু অনুযোগের সুরে বলি যে, বইটি তো আমি অনেক পূর্বেই লিখেছিলাম এবং এর পাণ্ডুলিপিটা দেখে দেওয়ার জন্যে পরদা হুজুর পাক আলম ভাইকে ভার দিয়ে ছিলেন। কিন্তু আলম ভাই নানা রকম টালবাহানা ও গড়িমসি করে আমাকে পাণ্ডুলিপিটা ফেরত দিয়ে বলেন, ভাই আমি তো তেমন দেখতে পারিনি তবে খুবভাল একজন আলেমকে দিয়ে দেখিয়েছি। আপনার প্রশংসা তো আপনার সম্মুখে করার দরকার নাই ওটা আমি হুজুর পাককেই জানাব। বলেই আমার পাণ্ডুলিপিটা আমার হাতে ফেরত দেন। কিন্তু আমি যখনই কলকাতা বা মেদিনীপুরে যাই হুজুর পাককে জিজ্ঞেসা করলে তিনি বলেন কৈ আমাকে তো কিছু জানায়নি। আচ্ছা আবার ও আসুক তখন জানব। এভাবে বেশ ক'বছর পার হয়ে যায়। পরিশেষে ১৯৭৮ সালে পরদা হুজুর পাক আমাদের শোক সাগরে ভাসিয়ে মহান আল্লাহ পাকের চির শান্তি ধামে মহা যাত্রা করেন মহা মিলনের উদ্দেশ্যে। আমি এতটুকু পর্যন্ত বলার পর ড. সোবহান সাহেব আমাকে বলেন, সে কেন আপনার লেখার রিপোর্ট হুজুরপাকের নিকট দেয়নি তা জানেন? আমি বলি না।

www.pathagar.com

তিনি তখন আমাকে বলেন, আসল কথা হল সে তার নিজের লেখা বইটা হুজুর পাকের নিকট থেকে অনুমোদন লাভ করিয়ে নেওয়ার ফিকিরে ছিল বলেই আপনার লিখার রিপোর্টটা জমা দেয়নি। জনাব মনজুর আলম ভায়ের এহেন নীচ মনোবৃত্তির কথা আমি ঘুর্ণক্ষরেও জানতে পারতাম না, যদি না ড. সোবহান সাহেব আমাকে এটা জানাতেন।

যাহোক ইতোমধ্যে আমরা কথোপকথনের মধ্যে ছোট হুজুর পাকের ভিলায় গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে দেখলাম অনেক খাদেম পীরভাই এসেছেন। এমনকি আলম ভাই সঙ্গে এসেছেন। কিছুক্ষণ পরই ছোট হুজুর পাকের কদমুসীর সৌভাগ্য হল। হুজুর পাক আমাকে দেখার পরই একজন খাদেমকে হুকুম করলেন আমাকে খাবার দেবার জন্যে। আমি আরজ করলাম হুজুর পাক আমি একটু আগেই হোটেল থেকে খেয়ে এসেছি। তবুও হুজুর পাক বললেন, ঠিক আছে যতটুকু পার খাও। পুরো এক প্লেট খাবার আর্থাৎ ভাত গোস্ত আলু ইত্যাদি আমাকে দেওয়া হল। আমি তো অবাক, ভরা পেটে কীভাবে এতগুলো খাব বুঝতে পারছিনা। আবার নষ্ট করারও কোন নিয়ম নেই। অতএব, বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করলাম। আমার খাওয়া শেষ হলে, ছোট হুজুর পাক আবার আমার কাছে এসে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমার গলায় ঝুলছিল বাইনোকুলার এটা পাঁচগ্রাম থেকে আমার মেজ দুলাভাই জনাব সৈয়দ আব্দুর রব সাহেবের নিকট থেকে এনেছিলাম। হুজুর পাক সেটা নিয়ে একটু এদিক ওদিক দেখলেন। বললেন খুব একটা ভাল নয়। অবশ্য ওটি আমার নিজের হলে আমি তাঁকে নজরানা হিসেবে হাজির করতে পারতাম। শুনলাম তাঁরা আগামীকাল ভোরে টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখতে যাবেন। আমার সীমিত পয়সা তখন প্রায় শেষের দিকে তাই ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আর দার্জিলিং -এ থাকা সম্ভব হলনা। একটা জনশ্রুতি আছে সেখানে জানলাম যে, সবার ভাগ্যে নাকি এই বিশেষ সূর্যোদয় দেখা সম্ভব হয় না। শিলিগুড়ি থেকে ট্রেনে যেতে যেতে দার্জিলিং ফেরত বহু টুরিস্টদের সঙ্গে দেখা ও কথাবার্তায় জানতে পারলাম কেউ কেউ ১০/১১ বার পর্যন্ত চেষ্টা করেও তাঁরা অনেকেই এই মহা সূর্যোদয়ের মহানন্দ থেকে বার বার বঞ্চিত হয়েছেন। অবশ্য কলকাতায় গিয়ে পরে আমি জানতে পারলাম ছোট হুজুর পাক এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা সকলেই সেটা ভাল মতই উপভোগ করেছেন। দার্জিলিং যাত্রা শেষে আবার শিলিগুড়ি হয়েই আমাদের গন্তব্যস্থানে যেতে হবে। বাস্তবিকপক্ষে শিলিগুলি শহরটা এমনস্থানে অবস্থিত যে উত্তর ভারতের

www.pathagar.com

যে কোন স্থানে যেমন নেপাল, ভূটান, সিকিম, দার্জিলিং, কার্সিয়াং, কালিংপঙ্গ ইত্যাদি স্থানে যেতে হলে শিলিগুলি অবশ্যই যেতে হবে। অবশ্য এটি সড়ক পথের হিসাব। তাছাড়া বিমান বা আকাশ পথের কথা আলাদা। শিলিগুড়ি শহরের আশে পাশে প্রচুর চা-বাগান দেখা যায়। শিলিগুড়িতে একটা বিমান বন্দরও আছে। তার নাম বাগডোগরা। শিলিগুড়ির আবহাওয়া অনেকটা নাতিশীতোষ্ণ। বেশ বড় শহর এবং অনেক দিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণও বটে। আমরা রাত্রি ১০টার দিকে দার্জিলিং মেলট্রেন ধরে রওনা দিলাম। রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটার দিকে আমি আমার রামপুরহাট স্টেশনে নামলাম এবং ছোট ফুপা ঐ ট্রেনেই চলে গেলেন বোলপুর। সেখান থেকে নানুর হয়ে তিনি যাবেন তাঁর গ্রাম বালিগুনি। আমি ভোর না হওয়া পর্যন্ত রামপুরহাট রেল স্টেশনেই অপেক্ষা করলাম মাড়গ্রাম যাওয়ার উদ্দেশ্যে। দার্জিলিং-এ ছোট হুজুর পাক আমাকে হুকুম করেছিলেন যে তাঁর দার্জিলিং-এ পৌছার সংবাদটা যেন আমি কলকাতায় বড় হুজুর পাকের নিকট জানিয়ে দিই এ ব্যাপারে মাড় গ্রামে পৌছার পর আমি জনাব চৌধুরী কাদের নওয়াজ চাচার সঙ্গে আবার ২/৩ ঘন্টা পর রামপুর 'হাট আসি। কাদের নওয়াজ চাচা তখন রামপুরহাটে মোক্তারী করতেন। তিনি তাঁর সিনিয়রের টেলিফোনে বহু চেষ্টা করেও কলকাতায যোগাযোগ করতে পারলেন না। কেননা, গতরাত্রে ঐদিকে বেশ ঝড়-ঝাপটায় অনেক টেলিফোন পোস্ট ও গাছ ইত্যাদি পড়ে গিয়েছিল বলে টেলিফোনে আর যোগাযোগ সম্ভব হল না। শেষে চাচা আমাকে বলেন, তুমি একটি পোস্টকার্ড লিখে হুজুর পাককে জানিয়ে দাও এবং তাই করলাম। ছোট হুজুর পাকের সঙ্গে দার্জিলিং এ দেখা হওয়ার পর আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে তাঁর নিকট একটি আরজি করেছিলাম এই বলে যে, "হুজুর পাক এই দার্জিলিং এর উচ্চ পাহাড়ের উপর আপনি যেমন আমার হাজিরী কবুল করলেন, এরপরও যেন ঐখানে (আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে) এ রকমই হাজিরী আমার সৌভাগ্য হয়। হুজুর পাক আমার কথা শুনে কেবল একটু মুচকি হাসলেন।

মাড়গ্রামে দু'একদিন থাকার পর আমি মুর্শিদাবাদ চলে যাই। সেখানে ক'দিন কাটিয়ে এবং দার্জিলিং এর খুশবুদার চা তাঁদের খাইয়ে আমি সপরিবারে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করি। আমার সঙ্গে আমার পিতা মাতা না এসে তাঁরা মাড়গ্রামে থেকে আমার চাচাদের মধ্যে আমাদের বিশাল বাড়ীটা ভাগ বাটোয়ারা করে আসেন। আমার বরাবরের ইচ্ছা ছিল উপর তলাটা যেন আমাদের জন্য রাখা হয়। কিন্তু

www.pathagar.com

আমার ফুলচাচা আলহাজ্ব চৌধুরী আজিজুর রহমান সাহেব তাঁর চার ছেলে ও দুই মেয়ের কথা চিন্তা করেই হয়ত বাড়ীর বেশীর ভাগই নিজ দখলে রাখেন এবং নাম মাত্র মূল্যে আমার পিতাকে বাকী তিন ভাই মিলে আমাদের অংশটুকু কিনে নেন। এরপর আমার মা আর কখনও ভারতে যেতে চাননি। ১৯৮৪ সালের ৩০ জুলাই ইন্তেকাল করে জান্নাতবাসী হয়েছেন এবং পাবনা আরিফপুর কবরস্থানে তাঁর মাযার রক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

ষোড়শ পর্ব

পাবনা থেকে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি যখন ঢাকায় টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে আসি, তার পূর্বেই আমি পাবনা আমিন উদ্দীন আইন কলেজে ল'পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমার বন্ধু জনাব এম,এ, গনিকে টেলিফোন করে বলি, ভাই আমি আপনার কলেজে ল' পড়তে পারি কিনা? আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা বলতে তখন পর্যন্ত আমার ডবল ডিপ্লোমা ছিল। তিনি আমাকে বলেন, ভাই আমি এই কলেজে দিনের বেলায় অধ্যক্ষ, কিন্তু রাতের বেলায় আমি নিজেই আইনের ছাত্র। অতএব, আপনি যদি আসেন তাহলে ভালই হবে দু'বন্ধু মিলে এক সঙ্গে আইন পড়ব। আমি বলি, আপনি দয়া করে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে একটু আমার ব্যাপারে খোঁজ নিয়ে দেখেন আমি ল' কলেজে ভর্তি হতে পারি কিনা? তিনি খোঁজ-খবর নিয়ে আমাকে জানান যে, ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ তাঁকে জানিয়েছে যে, আইন বিদ্যা হল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স। অতএব, ভার্সিটি থেকে কোন গ্র্যাজুয়েশন না থাকলে ল'পড়া সম্ভব নয়। অতএব, আমি বুঝতে পারলাম যে ডিগ্রী পাশ না করা পর্যন্ত ল'পড়া যাবে না। এর পরই আমি ঢাকা ভার্সিটিতে প্রাইভেট ক্যান্ডিডেট হিসেবে পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে আবেদন করি। তখন ঢাকা ভার্সিটিতে অধ্যাপনা করতেন আমার এক সুহৃদ ড. এ,কে,এম, আব্দুর রহমান। আমার এবং সিভিল ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর জনাব নজমুল হক ভায়ের জন্যে মাত্র দু'টি আবেদন পত্র ঢাকায় পাঠিয়ে দিই সাইকোলজি ডিপার্টমেন্টের প্রধান অধ্যাপক ড. আব্দুর রহমানের নামে। তিনি ঢাকা ভার্সিটির অধ্যাপনায় ইস্তফা দিয়ে চলে যান অস্ট্রোলিয়া এবং যাওয়ার আগে আমাকে বলে যান, আমার কিছু টাকা পয়সার দরকার বলেই এই শিক্ষকতাটা এখান থেকে ছেড়ে দিলাম। তিনি কানাডা থেকে পিএইচডি করে এসেছিলেন এবং ছাত্র হিসাবে বরাবরই খুবই ভাল ছিলেন। একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে তাঁর বেশ সুনাম ছিল সর্বত্র। অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়াতে এক ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। মাঝে মধ্যে ঢাকা আসলেই তিনি আমার বাসায় দাওয়াত গ্রহণ করেন সস্ত্রীক।

www.pathagar.com

টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষা কোর্সের ডামাডোলের মধ্যেই আমি এবং আমার মত আরও বেশ কিছু বন্ধু বইপত্র কিনে রীতিমত ডিগ্রী পরীক্ষার প্রস্তুতি চালাতে থাকি। এবং যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বারেই উত্তীর্ণ হয়ে যাই। অতএব, ল' পড়ার জন্যে আমার আর কোন বাধা রইল না।

১৯৭৬ সালেই আমি পাবনা আমিনউদ্দীন আইন কলেজে ভর্তি হবার জন্যে ফরম জমা দিই। কেবলমাত্র রাতের শিফট চলত। তখন পাবনা উকিল বারে শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ ছিলেন জ্ঞান বাবু এবং তিনিই ছিলেন আইন কলেজের অধ্যক্ষ। এটা জানতে পারার পরই আইনের জ্ঞান পাওয়ার জন্যে আমি আরও বেশী ল' পড়ার প্রতি আকৃষ্ট হই। ভর্তি হওয়ার কিছুদিন পর যখন জানতে পারলাম যে জ্ঞান বাবু কলেজে আর আসেন না, কেননা তিনি রোগ শয্যায় শায়িত আছেন দীর্ঘদিন। অথচ তিনি প্রতি মাসেই তাঁর বেতন ইত্যাদি নিয়ে থাকেন যথারীতি। কলেজ বিল্ডিং এর অবস্থাও তথৈবচ। ১৯৭১ সালে ক্যাপ্টেন জাহেদী এই দ্বিতল ভবনটি ছেড়ে পাকিস্তান চলে যাওয়ার পর এটিকে শহীদ আমিন উদ্দীন আইন কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। অনেক পুরানো বিল্ডিং ছিল এটি। ফলে, কলেজে কোন সিলিং ফ্যান, টাইপরাইটার, বসার মত তেমন কোন ভাল ব্যবস্থা এসব কিছুই দেখলাম না। ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে রয়েছেন জনাব খোরশেদ আলম সাহেব, তিনি থাকেন সপরিবারে উপর তলায়। বাকী দু'চারজন শিক্ষক সকলেই পার্ট টাইম হিসেবে রয়েছেন। আমার কিছুতেই বুঝে আসেনা যে এভাবে কেমন করে একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ চলতে পারে। মাত্র জনা পঁচিশেক ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ২/৩ ঘন্টার মত ক্লাস চলে। অফিসে একমাত্র একজন চ্যাংড়া কেরানী। চতুর্দিকে ঝুলে ভরা অপরিষ্কার নোংড়া অবস্থা দেখে আমি ভাবলাম, এটার পরিবর্তন আশু প্রয়োজন। আমি ঢাকা থেকে পাবনা যাওয়ার সময় আমার এক মামা জনাব কাজি গোলাম আজমিরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাই। মামা যখন শুনলেন আমি পাবনা যাচ্ছি, তখন আমাকে বললেন ওখানে এখন মতিন আছে ডি,সি, ওর সঙ্গে দেখা করো ও আমার বন্ধু। আমি একদিন সকালে ডিসি সাহেবের বাসায় যাই সৌজন্য সাক্ষাতের জন্যে। আমার এক ফুপা জনাব সৈয়দ মনজুর আহমদ ছিলেন তাঁর কনফিডেন্সিয়াল এসিস্টেন্ট। এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন জনাব মহম্মদ আলী চাচা। ওঁদের দু'জনই ছিলেন বীরভূম জেলার সিউড়ী থেকে আগত। ওঁরা আমাকে

www.pathagar.com

যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আমাকে হঠাৎ এত সকালে ডিসি সাহেবের বাংলোয় দেখে একটু অবাক হলেন তাঁরা। আমি বললাম না এমন কিছু না। একটা কার্টসি ভিজিট দিতে এসেছি ডিসি সাহেবের সঙ্গে। একটু পরে ডিসি জনাব আব্দুল মতিন সাহেব দেখা করেন, আমার পরিচয় দিই এবং আজমিরী মামার কথা আলাপ করি। তিনি মামার নাম শুনে বেশ খুশী হলেন। মামা ছিলেন বহুদিন "আফ্রো এশিয়ান কান্ট্রিজের" জেনারেল সেক্রেটারী। আমি নিজে পাবনা জেলা শাখার আইডিইবির সভাপতি জেনে ডিসি সাহেব বেশ মুগ্ধ হলেন। তাঁর সঙ্গে পাবনা পলিটেকনিক নিয়েও বেশ কিছুক্ষণ আলাপ হল। আমি তাঁকে জানালাম প্রয়োজন হলে আমি কিন্তু স্যার আপনার সাহায্য নিব, যেহেতু আমি নিজে একটি সংগঠনের কর্ণধার। ইত্যাদি নানাবিধ আলাপের পর আমি চলে আসি। পাবনা শহীদ আমিন উদ্দীন আইন কলেজে ক্লাস করতে শুরু করেছি বেশ কিছুদিন। ইতোমধ্যে হঠাৎ আমি একদিন ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব খোরশেদ আলম সাহেবের চেম্বারে ঢুকে পড়ি এবং সেখানে যে ক'জন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্যে বলি, I like to see a Principal here, please tell me who is fit for the post ? খোরশেদ আলম সাহেব উত্তর দিলেন, I am vice Principal here for long nine years, So I think, I am the fit person to be a principal here তখন আমি তাঁকে বলিঃ So please get ready, I like to see you as Principal within a week. খোরশেদ আলম সাহেব প্রায় সর্বক্ষণ ইংরেজিতে কথা বলতেন এবং আমাদের পড়াতেনও ঐ একই ভাষায়। তিনি জজকোর্টে তখন পিপি ছিলেন পরে অবশ্য জিপি হয়েছিলেন। চমৎকার ইংরেজি বলায় বেশ পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মিসেস ছিলেন পাবনা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা যেখানে আমার বড় মেয়ে শিল্পী চৌধুরী নবম শ্রেণীতে পড়ত এবং ছোট মেয়ে শাহীন চৌধুরী পড়ত পাবনা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। সেখানে প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন তাঁরই বড় বোন সুফিয়া খাতুন।

যা'হোক, আমি ইতোমধ্যে ডিসি সাহেবের অফিসে গিয়ে একদিন তাঁকে আমাদের আইন কলেজে ভিজিট করার জন্যে দাওয়াত দিই। তিনি তাঁর সময়ের অভাব ইত্যাদি বলে আমাকে বিদায় করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি নাছোড় বান্দার মত লেগে থেকে তাঁর সুবিধামত সময় নিয়ে তাঁরই ডাইরীতে তারিখটা

www.pathagar.com

তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিই।

যথারীতি একশুভ সন্ধ্যায় তিনি আমাদের কলেজে উপস্থিত হন। আমি কলেজের অসুবিধাগুলির যাবতীয় বর্ণনার উল্লেখ করে ইংরেজি ভাষায় একটা দীর্ঘ রিপোর্ট লিখে সেটি পড়ে তাঁকে শুনাই এবং তাঁকে আরও বলি যে পাবনা শহরের সমস্ত কলেজগুলির তিনি প্রেসিডেন্ট পদাধিকার বলে। তাছাড়া বাংলাদেশের মফস্বল শহরের অনেক স্থানেই এ ধরনের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ নেই। অতএব, এটির প্রতি তাঁর শুভদৃষ্টি না থাকলে আমাদের দুঃখের অন্ত নেই। তিনি অতি মনযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেন এবং অধ্যক্ষের ব্যাপারে আমি জনাব খোরশেদ আলম সাহেবের নাম প্রস্তাব করি সকলের সম্মুখে এবং আমার জনৈক বন্ধু সহপাঠী এটি সমথর্ন করায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে অধ্যক্ষ হিসেবে মৌখিকভাবে নিয়োগদান করেন। এরপর নবনির্বাচিত অধ্যক্ষ জনাব খোরশেদ আলম সাহেব আমাদের সকলের জন্যে চা-নাস্তা ইত্যাদির আয়োজন করেন। ডিসি সাহেব উঠে চলে যাবার পূর্বেই আমি তাঁর নিকট গিয়ে বেশ বিনয়ের সুরে বলি, স্যার কলেজের জন্য কিছু টাকা পয়সার ব্যবস্থা না করলে কীভাবে এ হতশ্রী কলেজ চলবে? তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলেন, আমি টাকা কোথায় পাব? আমার কাছে তো কোন টাকা নেই। আমি বলি আছে, আপনার কাছেই টাকা আছে। যেমন এই পাশেই রূপকথা সিনেমা হল, বাণী সিনেমা হল এবং অনন্ত সিনেমা হল। এই তিনটি সিনেমা হলের যে রেভিনিউ সেটি সম্পূর্ণ আপনার এখতিয়ারে। আপনি ইচ্ছা করলেই এটি দিতে পারেন। তিনি তখন হেসে ফেলে আমাকে বলেন, আপনি বেশ চালাক এবং বুদ্ধিমান দেখছি। ঠিক আছে তাই হবে, তবে আমাকে দু'এক মাস সময় দিতে হবে।" বলেই তিনি আমাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নেন। অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম সাহেব তো আমার উপর খুশীতে ডগমগ। তিনি এতটা আশা করতে পারেন নি যে আমি এই দুরূহ কাজটা এত সহজেই সমাধা করতে পারব। বাস্তবিকই মাস দুয়েকের ভিতর ডিসি সাহেব তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনি প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেন এবং আমি অধ্যক্ষ সাহেবকে অনুরোধ করি দয়া করে টাকাটা যথাস্থানে যথাযথ ব্যবহার করার জন্যে। তিনি আমার কথাটাও রেখেছিলেন। সমস্ত টাকাটা তিনি অতি দ্রুত কলেজের যা যা প্রয়োজন ছিল সবটাই সম্পন্ন করেন নিরলস ভাবে। রাজশাহী ভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন তখন

www.pathagar.com

জনাব সৈয়দ আলী আহসান সাহেব। তিনিও এক ফাঁকে এসে কলেজের উন্নতি অবলোকন করে যান।

আমি ল' কলেজে পড়ার সময় বিভিন্ন বিষয় বস্তুর প্রতি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তে থাকি এবং এক সময় আমি উপলব্ধি করি যে, এ পেশা আমার জন্যে নয়। তবুও প্রথম বর্ষের পরীক্ষা দিলাম এবং মোটামুটি ভালই দিয়েছিলাম বলা চলে। দীর্ঘদিন পর পরীক্ষার ফলাফল বের হয় এবং তাতে দেখা যায় আমি অল্পের জন্যে বাদ পড়েছি ও আরও অনেকে। এরপর অধ্যক্ষ সাহেব আমাকে বার বার অনুরোধ করেন আর মাত্র একটি বার যেন আমি পরীক্ষা দিই। কিন্তু আমি মানসিকভাবে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, এ পেশা আমার জন্যে কখনই উপযুক্ত নয় বরং শিক্ষকতাই আমার উপযুক্ত পেশা এবং নেশা। ফলে, সারা বাংলাদেশে বহিরাগত পরীক্ষক হিসেবে আমি বহু পলিটেকনিকে একাধিকবার গমন করেছি। এমন কি কখনও কখনও সপরিবারে। কুমিল্লা সার্ভে ফাইনাল ইনস্টিটিউটে দীর্ঘ আট দশ বছর পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়নি বোর্ড কর্তৃপক্ষের নানা কারণে। আমাকে সেখানে পাঠানো হয় এমন কতকগুলি বিষয়ের উপর পরীক্ষা নেওয়ার জন্যে যা আমার নিজেরও বিষয় বহির্ভূত। ফলে, আমি বাংলাদেশ সার্ভে অফিস থেকে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি পূর্ব থেকে জেনে নিয়ে সেখানে গিয়ে পরীক্ষা নিই। পরীক্ষার্থীরা যথেষ্ট বয়সের কারণে এবং দীর্ঘদিন এই অবহেলিত পরীক্ষার ফলে তারা আমাকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হয়। তখন সেখানে অধ্যক্ষ ছিলেন বন্ধু আবু বকর সিদ্দিক সাহেব। স্থানীয় শিক্ষকবৃন্দ আমাকে যথেষ্ঠ সহায়তা করায় ঐ সমস্ত বয়স্ক ছাত্রদের যথারীতি পরীক্ষা নিতে আমি সক্ষম হই।

১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮২ পর্যন্ত এই টানা সাত বছর ছিলাম পাবনা পলিটেকনিকে এবং আইডিইবি'র সভাপতি হিসাবে বহু মিটিং, মিছিল, আন্দোলন ইত্যাদি করতে হয়েছে বার বার। তখন ঢাকায় আইডিইবি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক জনাব মহম্মদ তাজাম্মুল হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন জনাব এ,কে,এম এ হামিদ। এঁদের নির্দেশে পাবনা শহরে আমাদের বেশ কয়েকবার মহাসম্মেলনের আয়োজন করতে হয়। এমন একটি সম্মেলনের জন্যে প্রধান অতিথি হিসাবে কাকে নিমন্ত্রণ করা যায়? সেটি অনেক আলাপ আলোচনার পর ঠিক হয় রাজশাহী বিভাগের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের সর্বশ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্বকেই আমাদের আমন্ত্রণ জানানো উচিৎ, যেহেতু আমরা দেশের শিক্ষা পরিকল্পনা বিভাগের উপর অনেক বেশী কথা বলি। যা আপামর জনসাধারণের জন্যে বিশেষ জরুরী এবং অপরিহার্য। সেই মোতাবেক ঠিক হয় যে, তাহলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলর যিনি রয়েছেন ড. এম,এ, বারী তাঁকেই আমাদের এই মহতি অনুষ্ঠানের জন্যে প্রধান অতিথি হিসেবে দাওয়াত দেওয়া যেতে পারে।

ফলে, পাবনা থেকে আমার সঙ্গে কয়েক জন সদস্য যেমন, সাধারণ সম্পদক জনাব আব্দুস সাত্তার, জনাব সাখাওয়াৎ হোসেন মোল্লা, জনাব আমিনুল ইসলাম সিদ্দিকী প্রমুখ কয়েকজন রাজশাহীর উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। এবং সেখানে জনাব কাজি লুতফুল কবীর ও আরও দু'এক জনকে সঙ্গে নিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হই। সে সময় ড. এম,এ, বারী সাহেব ছিলেন খুব জাঁদরেল উপাচার্য্য এবং নামকরা বাগ্মী ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই কষ্টকর ব্যপার জানতে পেরে, আমি খবর নিয়ে জানতে পারলাম তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী আমার এক আত্মীয়। রাজশাহী পলিটেকনিকের সুপার জনাব আমীর আফজল চাচার সম্বন্ধী। সেই সূত্র ধরে আমি তাঁকে অনেক অনুরোধ করি একটা সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। তিনি নিজে যেহেতু তাঁর চরিত্র জানেন, বলেই একটু গড়িমসি করছিলেন। আমি পরিচয় দিয়ে যখন তাঁকে বলি, আপনাকে কিছুই বলতে হবে না যা বলার কেবল আমরাই বলব। আপনি কেবল আমাদের ভিতরে ঢুকার অনুমতিটুকু মাত্র নিয়ে আসেন। শেষে অনেক কষ্টে আমরা মাত্র চারজন ভিতরে গিয়ে উপাচার্য্য সাহেবের সম্মুখে বসার সুযোগ পেলাম। আমার বন্ধুরা কেউ কেউ কথা বলতে শুরু করল তাঁর সঙ্গে এবং আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য তিনি বুঝতে পেরেই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠেন, এ জন্যে তো আপনাদের উপযুক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন ড. এম, এ, রশিদ, আপনারা তাঁকে নিমন্ত্রণ করুন। আমাকে কেন? তাছাড়া আমি এত ব্যস্ত থাকি যে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হবেনা। এ কথা শুনার পর আমার বন্ধুরা একদম চুপ এবং হতাশ। আমি কিন্তু এতক্ষণ একটা কথাও বলিনি। এবার আমি উপাচার্য সাহেবকে বলি, স্যার আপনাকে প্রধান অতিথি করার মূলে আমাদের একটা ফিলোসফী আছে। তখন তিনি জানতে চান কী সেই ফিলোসফী? আমি বলি স্যার, আমরা শিক্ষার উপর কথাবার্তা বলি বেশী। অতএব দেশের সার্বিক

www.pathagar.com

শিক্ষাপদ্ধতির স্বার্থে এমন একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের দরকার যিনি হবেন এই বিভাগের সর্বোচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তি। সুতরাং সেই হিসাবে আমরা আপনাকেই একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি হিসাবে দেখতে পাচ্ছি। অতএব, আপনার যখন সুযোগ সুবিধা হবে ঠিক তখনই আমরা এই মহতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করব। অবশ্য এর জন্যে আমরা আপনাকে কিছু ছাপা ব্রিফিং দিয়ে যাচ্ছি। আপনার সদয় অনুমতি পেলেই আমরা আপনার দেওয়া নির্ধারিত তারিখেই দাওয়াত পত্র ইত্যাদি ছাপার কাজ আরম্ভ করব। এতক্ষণে তিনি কিছুটা নরম হয়ে তাঁর সেক্রেটারীকে ডেকে বলেন, দেখেন তো আমার সিডিউলে কোন ফাঁক আছে নাকি? তিনি একটা তারিখ তাঁকে দেখালে তিনি বলেন, ঠিক আছে, তাহলে ঐ তারিখেই আপনারা ব্যবস্থা করতে পারেন। যদিও প্রেসিডেন্ট জিয়া আমাকে বার বার ঢাকায় যাওয়ার জন্যে তাগিদ দিচ্ছেন। তবুও আমি চেষ্টা করব আপনাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে। এ পর্যন্ত কথাবার্তা শেষ করে আমরা তাঁকে অশেষ ধনাবাদ জানিয়ে চলে আসি।

এই মহতি অনুষ্ঠানের জন্যে আমি বেশ কিছু প্ল্যাকার্ড, ফেস্টুন ইত্যাদি বেশ বড় আকারে প্রেস থেকে ছাপিয়েছিলাম বিভিন্ন রঙ্গে অনুষ্ঠানের পূর্বেই সেগুলি যাতে পাবনা শহরে বিভিন্ন স্থানে লাগাতে পারি। কিন্তু ডিসি আব্দুল মতিন সাহেব এটা জানতে পেরে আমাকে অনুরোধ করেন এগুলি ব্যবহার না করার জন্যে। আমি তাঁকে বলি, স্যার যখন ছাপিয়েই ফেলেছি অতগুলি পয়সা খরচা করে তখন অন্তত আমাদের ইনষ্টিটিউট ক্যাম্পাসে সেগুলি লাগানোর অনুমতি দেন। তিনি আমার চেয়েও বিনয়ের সঙ্গে বলেন দেখুন বর্তমান ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল ছাড়াও তো আরও অনেক রাজনৈতিক দল আছে। অতএব, তারা এটিকে নিয়ে একটি ইস্যু বানিয়ে হৈ-চৈ শুরু করতে পারে। অতএব, ইতোপূর্বে আমি আপনার কিছু অনুরোধ যেমন রেখেছি, এবার দয়া করে আমার এই অনুরোধটুকু আপনি রাখুন। পরিশেষে, আমার প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর এই অনুরোধটুকু রাখতে আমি বাধ্য হয়েছিলাম। ও দিকে নির্ধারিত দিনে এই নিমন্ত্রণ পত্র ছাপার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। এতে বিশেষ অতিথি হিসাবে নাম ছিল আমার ল' কলেজের অধ্যক্ষ জনাব খোরশেদ আলম সাহেবের এবং সভাপতি হিসেবে আমাদের কেন্দ্রীয় আইডিইবি'র সভাপতি হিসেবে জনাব মহম্মদ তাজাম্মুল হোসেন সাহেবের নাম।

www.pathagar.com

তিনি যথারীতি ঢাকা থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনাব এ,কে,এম, এ হামিদসহ বিমানে ঈশ্বরদি হয়ে পাবনা যথাসময়ে চলে আসেন। রান্নার ভার দিয়েছিলাম আমি সার্কিট হাউসের বাবুর্চি মহসীন আলীকে। সবই ঠিক ছিল। কিন্তু আসল মুহূর্তে আমাদের বহু কাঙ্খীত প্রধান অতিথি আর আসতে পারলেন না। কেন না, প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সাহেব তাঁকে ঢাকায় আটকে রাখেন। সম্ভবত রাজনৈতিক কারণেই হয়ত এই চাল চালা হয়েছিল বলেই আমাদের বিশ্বাস। যা' হোক যাথারীতি আমি যে মানপত্র প্রধান অতিথির জন্যে নিজে লিখে ছাপিয়ে ছিলাম, সেটি আমিই পাঠ করি এবং প্রধান অতিথি ছাড়াই সমস্ত অনুষ্ঠান যথারীতি সম্পন্ন করা হয়। পরে রাজশাহীতে উপাচার্যের বাড়ীতে তাঁর জন্য লিখিত মানপত্র, ফুলের মালা ইত্যাদি যথারীতি পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

সপ্তদশ পর্ব

আমার ছোট বেলা থেকেই আমি ছিলাম অত্যন্ত দুর্দান্ত প্রকৃতির। কোন রকমের ভয়-ভীতি আমাকে কখনই দুর্বল করতে পারেনি। ফলে আমার গুরুজনেরা আমাকে নানাজনে নানা রকম নামে ডাকতে ভাল বাসতেন। আমার এত দুরন্তপনার জন্যেও কিন্তু আমার সব গুরুজনেরাই আমাকে আশ্চর্য রকম স্নেহ করতেন। কেউ কখনও আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন এমনটা আমি লক্ষ্য করিনি একমাত্র আমার পিতা ছাড়া। তিনি আমাকে যেমন স্নেহ করতেন, তেমনি শাসনও করতেন অত্যন্ত কঠোরভাবে। অর্থাৎ ঐ কথাটা এখানে প্রযোজ্য 'শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে।' বাস্তবিকই তাই, কেননা আমি আমার পিতৃকুল এবং মাতৃকুলের মধ্যে সকলের চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ হওয়ার জন্যেই বোধ করি আমার এই সৌভাগ্য। সাধারণত বোধ করি বংশের সবচেয়ে বড় ছেলে বা মেয়ের ক্ষেত্রেই হয়ত এটাই স্বাভাবিক। আমি যেমন সাইকেল চালাতে বেশপটু ছিলাম, তেমনি খুব বড় তেজী ঘোড়ায় চাপাও ছিল আমার দারুণ আগ্রহ। আমার মেজ ফুপা সৈয়দ শাহনওয়াজ সাহেবের ছিল এমন একটি ঘোড়া, যেটা কেবল তিনি এবং তাঁর সেজ ছেলে সৈয়দ সেলিম নওয়াজ ছাড়া আর কেউ চালাতে পারা দূরের কথা ঘোড়ার কাছেও কেউ যেতে পারত না। ঘোড়া সামনের দুপা উপরে উঠিয়ে আক্রমণ করত। অর্থাৎ ঘোড়াটি যেমন দেখতে ছিল সুন্দর এবং অতিকায় তেমনি ছিল ভীষণ দূর্দান্ত প্রকৃতির। আমার একমাত্র ভাগনা নোমান জাহেদীর বয়স তখন মাত্র ৩/৪ বছর। তাকে আমি গুসকরা থেকে মাড়গ্রাম নিয়ে আসি বেড়াতে কিন্তু তার কানের লতিতে একটা ঘা দেখা যায়। সেটির ওষুধ মাড়গ্রামে কোথাও না পেয়ে শুনলাম বিষ্ণুপুর (মাড়গ্রাম থেকে ২/৩ মাইল পূর্বে) গ্রামে ভাল ওষুধের দোকান আছে, সেখানে পাওয়ার সম্ভাবনা। একদিন প্রত্যুষে আমি সেলিমকে বলি, তোদের ঘোড়াটা একটু আমাকে দেতো। নোমানের জন্যে বিষ্ণপুর থেকে একটা ওষুধ কিনে আনি। সেলিম বলল, ভাই আপনি কি ঐ ঘোড়ায় চাপতে পারবেন? ঘোড়াটা খুবই বেয়াড়া। আমি বলি তুই জিনটা ঠিকমত লাগিয়ে আমার কাছে নিয়ে আয় তো দেখি। ঘোড়া আমাকে

www.pathagar.com

দেখার সঙ্গে সঙ্গে লাফা লাফি শুরু করল। আমি বুঝলাম, এরপিঠে না উঠা পর্যন্ত একে জব্দ করা যাবে না। হঠাৎ করে এক ফাঁকে এক লাফ দিয়েই আমি উঠে পড়ি। তারপরই তাকে গ্রামের বাইরে এক দৌড়ে নিয়ে যাই। কিন্তু মাঝ রাস্তায় গিয়ে ঘোড়া আর যেতে চায়না। এমন কি রাস্তা ছেড়ে চষা ক্ষেত্রের উপর নেমে পড়ে কিছুতেই রাস্তায় উঠবেনা। শেষে আমি ঘোড়ার উপর থেকেই দু'জন চাষীকে বলি তোমরা ওর মুখের লাগামটা ধরে রাস্তায় নিয়ে যাও। এরপরই ঘোড়া এক দৌড়ে সোজা বিষ্ণুপুর যে দোকান থেকে ওষুধু কিনলাম সেখানে আমি ঘোড়া থেকে না নেমে জানালা দিয়ে মূল্য মিটিয়ে আবার যেই মাড়গ্রামের দিকে ঘোড়াটি ঘুরাতে যাব, অমনি বিদ্যুৎবেগে ঘোড়াটি বাম দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে মুর্শিদাবাদের পথে রেসের ঘোড়ার মত গ্যালোপে ছুটতে লাগল এবং আমাকে কিভাবে আহত করা যায়, সে চেষ্টায় গাছ পালা বা রাস্তার মোড়ের বা বাঁকের কোন বাড়ীর দেওয়ালের কোনা কোন কিছু লক্ষ্য না করে পথে দুটো নদী নিমিষের মধ্যে পার হয়ে গেল। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিনা, ঘোড়ার এই হঠাৎ প্রকৃতির কারণ। আমার মা কথায় কথায় ছড়া কাটতে পারতেন নানা বিষয়ের উপর তেমনি একটি ছড়া তখন আমার মনে পড়লঃ

"আঠে পিঠে দড় (দৃঢ়), তো ঘোড়ার উপর চড়

আর ঘোড়ার উপর থেকে যদি পড় তো সেও লাজ বড়। আমার মায়ের নিকট থেকে আমি এমন বহু ছড়া বহুবার শুনেছি। যা হোক মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে ঘোড়াটি প্রায় ১০ মাইল পথ বিদ্যুৎ বেগে দৌড়ে সোজা ইন্দ্রানী গ্রামে গিয়ে আমার বড় ফুপা সৈয়দ আলী হায়দর সাহেবের বাসার সম্মুখে গিয়ে আমি ঘোড়া থেকে নামি। পরে আমি ঐ বাড়ীর একটা কাজের লোককে বলিঘোড়াটাকে খাওয়া দাও। বলেই আমি বাড়ীর ভিতর ফুপা এবং ভাই বোনদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম। আসলে ঘোড়াটি হচ্ছে সাদলের জনাব আব্দুল আজিজ সাহেবের নিকট থেকে কেনা। এবং সাদল আরও একটু পূর্বে দু'তিনটি গ্রাম পরেই। আজিজ সাহেবের অনেকগুলি ঘোড়া ছিল এবং একমাত্র সখ ছিল ঐ রকমের খুব বড় ধরনের ঘোড়া পোষার। এমন সময় হঠাৎ দেখি, সেই কাজের লোকটি দৌড়ে আমার কাছে এসে বলে আপনি তাড়াতাড়ি আসেন নতুবা আমরা সেই ঘোড়াটাকে আটকাতে পারছিনা। আমি এসে আবার তাকে শক্ত করে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখি।

www.pathagar.com

বাড়ীর সকলের ইচ্ছা ছিল যে আমি যেন অন্তত সে দিনটা থাকি তাঁদের মাঝে এবং পরদিন মাড়গ্রাম যাই। কিন্তু আমি যেহেতু আমার মেজফুপাকে কিছু বলে আসিনি এবং তাঁরা নানারকম দুশ্চিন্তা করতে পারেন ভেবেই আমি দুপুরে খাওয়ার পর সন্ধ্যার একটু আগে মাড় গ্রামের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। জয়পুর গ্রামে হঠাৎ দেখি জিনের একটা বেল্ট ছিঁড়ে গেছে। একবার ভাবলাম আবার ইন্দ্রানী ফিরে যাব কিনা? ঘোড়া থেকে নেমে জিনটা কষে বেঁধে নিলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। আমি আমার দায়িত্বের কথা চিন্তা করে সোজা মাড়গ্রামে উপস্থিত হলাম এবং আমাকে অক্ষত অবস্থায় দেখে সকলেই যেমন অবাক তেমনই মূগ্ধ। মাড়গ্রামে মাত্র ক'দিন ছিলাম। এই ফাঁকে আর একবার ঘোড়াটি ছোটাবার খুবই আগ্রহ হল আমার। সাধারণত ঘোড়ার দু'ধরনের চাল আছে। একটি হলো কদম (Trottle) এটি দুলকি চালে ঘোড়া ছোটে এর সওয়ারের তেমন কোন অসুবিধা হয় না। আর ছাত্তক (Gallop)। এটি সাধারণত রেসে বা প্রতিযোগিতামূলক দৌড়ে ব্যবহৃত হয়। আমি বরাবরই গ্যালোপে ঘোড়া ছুটানো পছন্দ করতাম। শুনেছি আমার পিতারও ২/৩টি ঘোড়া ছিল। তবে আমি তখন খুব ছোট থাকায় আমার তা স্মরণ নেই।

যা'হোক আমি দ্বিতীয়বারের মত ঘোড়াটি নিয়ে চাপার সঙ্গে সঙ্গে সেলিম ঘোড়ার পিছনে কষে একটা চাবুক মারে। আর যাবে কোথায়, ঘোড়া বিদ্যুৎ গতিতে আমাকে নিয়ে ছুটলো গ্রামের বিভিন্ন রাস্তায় ২/৩ বার আমি পুরো গ্রামটা ঘুরে আসার সময় ফুপা ঘোড়ার পায়ের প্রচন্ড শব্দ শুনে বাড়ীর ভিতর থেকে ছুটে আসেন আমাকে থামানোর জন্যে কিন্তু ব্যর্থ হন। গ্রামের রাস্তায় যে অমন ভাবে ঘোড়া ছুটানো যায় না এ জ্ঞান তখন আমার ছিল না। যৌবনের উদ্দাম শক্তি ও আমার দূর্দান্ত স্বভাবের জন্যে আমি তখন সম্পূর্ণ বেসামাল অবস্থায় ছিলাম। যে কোন দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারত। আমার হাত থেকে রুমাল পড়ে গেল তাও আর তুলতে পারলাম না। পরে ঘোড়া থেকে যখন নেমে এলাম ফুপা আমাকে বললেন তুই একটা আস্ত ডাকাত। এই ঘোড়ায় কেবল আমি ও সেলিম ছাড়া কেউ চাপতে পারে না। সেখানে তুই এতবড় ঘোড়া নিয়ে গ্রামের রাস্তায় যেভাবে ছুটালি যদি কোন একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত তবে কী হত বলত? ফুপা আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন ছোট বেলা থেকেই। রামপুরহাট শহরে সে সময় ছিল একমাত্র একটি টকি হল

www.pathagar.com

অর্থাৎ নির্বাক সিনেমা। সেটা মাইকের মাধ্যমে দর্শকদের বুঝিয়ে দেওয়া হত ছবির কথা। সে সময় থেকেই আমি যতবারই হলে গেছি, সব সময়ই ফুপার সাইকেলে রড়ে বসে, কিন্তু আমার পিতা বা অন্য কারো সঙ্গে যেতাম না। যদিও বেশ কয়েকজনই সঙ্গে থাকতেন। সে সময় মাড়গ্রাম রামপুরহাট রাস্তা ছিল অতিরিক্ত খারাপ কাঁচা রাস্তা। সাইকেল ছাড়া একমাত্র গরুরগাড়ীই ছিল সম্বল। কোন বিদ্যুৎ বাতি ছিল না। ফলে, হলে ছবি দেখার পর হাতের টর্চ লাইট সম্বল করে আমাদের আসতে হতো। ফুপা খারাপ রাস্তার দরুন প্রায়ই আমাকেসহ ছিটকে পড়তেন রাস্তায়। আমি বহুবার এভাবে তাঁর সঙ্গে টকি হলে গেছি। অনেক পরে সবাক চিত্র চালু হয়েছিল রামপুরহাটে।

১৯৫৪ সালে আমি আমার এক খালাকে নিয়ে যাই ভাদাই গ্রামে। এটা বর্ধমান জেলার অন্তর্ভূক্ত একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। সে গ্রামের চৌধুরী সাহেবরা ছিলেন বেশ প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ঢাকা আনজুমান-ই-ক্বাদেরীয়ার প্রেসিডেন্ট জনাব চৌধুরী গোলাম মহীউদ্দীন ভাই হচ্ছেন আমার ঐ আমেনা খালার এক নাতি। জনাব চৌধুরী আলী হায়দর সাহেব ছিলেন একজন প্রবীণ জমিদার এবং অত্যন্ত সদালাপী মানুষ। আমি তাঁর থেকে বয়েসে অনেক ছোট হলেও তিনি আমার সঙ্গে বন্ধুরমত সদালাপ করতে ভাল বাসতেন। জনাব চৌধুরী আনওয়ার হোসেন ভাই এবং তাঁর ছোট ভাই জনাব চৌধুরী মনোয়ার হোসেন ভাই ছিলেন আমার আমেনা খালার দুই ছেলে। তাঁদের দুই বোনের মধ্যে ছোট বোন জনাবা জীবন্নাহার ছিলেন আমার বড়মামী। তাঁর বড় বোন সামসুন্নাহারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল আমার আবি নানার সঙ্গে সিজগ্রামে। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। মজার ব্যাপার হল যে, মুসলিম পরিবারে যেভাবে বিয়ে থা হয়, তাতে প্রখ্যাত জজ সাহেবদেরও সম্বন্ধ বুঝতে দারুণ অসুবিধা হত এবং এখনও হয়।

যা হোক আমাকে মনোয়ার ভাই তাঁর ঘোড়ায় চাপার জন্যে খুবই উৎসাহিত করতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর ঐ ছোট ঘোড়া দেখে আমার মোটেই পছন্দ হল না। আমি বললাম, ভাই এত ছোট ঘোড়া আমার মোটেই পছন্দ নয়। উপরন্তু খুব দ্রুত বেগে ঘোড়া ছুটানো আমার স্বভাব। তিনি বলেন তুমি আমার এই ঘোড়ায় চেপে দেখ কত জোরে ছুটে। শেষে আমি দেখি তাঁর ঘরে একটা নূতন লাগাম ঝোলানো রয়েছে। আমি তাঁকে অনুরোধ করি আপনি দয়া করে নূতন ঐ লাগামটি আমাকে

www.pathagar.com

ব্যবহার করতে দিন। নতুবা, ঐ পুরাতনটা আমার মোটেই বিশ্বাস হচ্ছেনা। তিনি বলেন, আমরা সব সময় এই পুরাতনটা দিয়েই ঘোড়া ছুটাচ্ছি। তুমি চলতো দেখি কত জোরে তুমি ঘোড়া ছুটাতে পার? ফুটবল খেলার মাঠে গিয়ে তিনি এবং তাঁর এক শ্যালক বেশ ভালই ঘোড়াটা ছুটালেন দেখলাম। এরপর আমার পালা। আমি ঘোড়ায় বসার পরপরই তাঁর শ্যালক ঘোড়ার পাছায় এক চাবকু মারে। ঘোড়া আমাকে নিয়ে দুর্দান্ত বেগে ছুটলো। দেখি খেলার মাঠ ছাড়িয়ে সে চষা ক্ষেতের দিকে ছুটতে চায়। আমি প্রবল ভাবে লাগাম টেনে ধরে তাকে ঘোরানোর চেষ্টা করতেই লাগামটি হঠাৎ ছিড়ে গিয়ে আমি ঘোড়ার মাথার উপর দিয়ে সম্মুখে ছিটকে পড়ে চিৎপটাং। কিন্তু কী আশ্চর্য যে ঘোড়া তার একটা পা আমার বুকের উপর রাখতে গিয়ে না রেখে নামিয়ে নিল। আমি অবশ্য কোন আঘাতই পাইনি। মনোয়ার ভাইরা দৌড়ে এসে আমায় উঠালেন। আমি বললাম, এ জন্যেই আমি বার বার আপনাকে নূতন লাগামটি ব্যবহারের জন্যে অনুরোধ করেছিলাম। এরপর তাঁর শালা আর একবার ঘোড়াটি ছুটাতে গিয়ে সম্মুখে চাষীদের একটি ছোট ছেলেকে ঘোড়ার সম্মুখের দুপায়ের ধাক্কায় ছেলেটি ছিটকে পড়ে কয়েক হাত দূরে। ভাগ্যভাল ছেলেটিও তেমন আহত হয়নি। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে গিয়েছে। অতএব, আর বিলম্ব না করে আমরা বাসায় ফিরে আসি। ঘোড়াটি অতিরিক্ত দৌড়ের ফলে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার সারা শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকে। ঘোড়া ছোট হলেও যে এত দ্রুত দৌড়াতে পারে ইতোপূর্বে আমার তা জানা ছিলনা।

ভারতে থাকার সময় আমার পিতা বেশ দামী সাইকেল ব্যবহার করতেন। গ্রীন র‍্যালে ছিল তেমনি একটি উত্তম সাইকেল। আমি ছোট বেলায় সীটে বসে সাইকেল চালাতে না পারলেও রডের নীচে দিয়ে দুপা প্যাডেলে রেখে বেশ বেগেই সাইকেল চালাতাম। একবার লুকিয়ে সাইকেলটা নিয়ে বাজারে গিয়ে কিছু চিনা বাদাম কিনে খুব তাড়াতাড়ি চালাতে গিয়ে এবং ব্রেক কন্ট্রোলটা তখনও অত রপ্ত করতে পারিনি বলেই বোধ করি মাড়গ্রামে সাহেব পুকুরে যেটা রাস্তা থেকে অনেক নীচে ছিল, সাইকেল সহ একেবারে গভীর পানিতে পড়ে গেলাম। পায়ে ছিল নূতন স্লীপার তার একপাট পড়ল রাস্তায় এবং আর একপাট পড়ল পুকুরের মাঝখানে। চিনা বাদাম গুলো হাফ প্যান্টের পকেট থেকে বেরিয়ে সব পানিতে ভাসতে লাগল। আমি ছিলাম বেশ দক্ষ সাঁতারু। অতএব, এতটুকু না ঘাবরিয়ে প্রথমে সাইকেলটাকে

www.pathagar.com

পাড়ে টেনে উঠালাম। এরপর বাদামগুলি এবং শেষে অনেক ডুব সাঁতার দিয়ে তুললাম, ডুবে যাওয়া একপাট স্লীপার। ঠিক এমনটিই ছিলাম আমি দুর্দান্ত। আমার পিতা ভারত থেকে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে আসার সময় তাঁর গ্রীণ র‍্যালে সাইকেলটি আমার ছোট চাচা জনাব চৌধুরী ফজলুর রহমান সাহেবকে দিয়ে তাঁর রেসিং সাইকেল 'এসকা' যেটা ছিল চেকোশ্লাভিয়ার তৈরী সেটি নিয়ে আসেন পাবনায়।

১৯৫৩ সালে আমি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে পড়ার সময় বার্ষিক স্পোর্টসে দ্রুত সাইকেল চালনায় প্রথম স্থান অধিকার করি, সেটা ছিল Open to all অর্থাৎ পাবনা এবং সিরাজগঞ্জ মিলে সমস্ত প্রতিযোগীদের জন্য উন্মুক্ত। আমার বিশেষ বন্ধু ফারুক কোরায়শী তো আমার দু'পা দাবিয়ে দিয়েছিল উত্তমরূপে। তার পিতা ছিলেন জনাব আব্দুল হামিদ কেরায়শী শহরের সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি এবং তাঁরই নামে পাবনা শহরের প্রধান রাস্তার নাম আব্দুল হামিদ রোড।

এর পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৪ সালে আমার ফাইনাল পরীক্ষা বলে আমার পিতা তাঁর সাইকেলটি গোপনে এক সাইকেল মেকারের কাছে রেখে ভারতে আসেন কিছুদিনের জন্যে এবং আমাকে পরীক্ষার জন্য তীব্র তাগিদ দিয়ে আসেন এবং যেন স্পোর্টসে অংশ গ্রহণ না করি সেজন্য নিষেধ করে আসেন। আমি তখন তাঁর অফিসের কর্মচারী আবেদ আলী চাচার কাছে থাকতাম পেয়িং গেস্ট হিসেবে। একটি আলাদা ঘরে। কিন্তু যে দোকানে আমার পিতা সাইকেলটি গোপনে রেখে গেছিলেন, সেই সাইকেল মেকার গোবিন্দ আমাকে আবার সাইকেল প্রতিযোগিতায় নামার জন্যে উৎসাহ দিতে থাকে এবং বলে আপনি গতবারে প্রথম হয়েছেন। অতএব, এবারও যাতে প্রথম হতে পারেন তার জন্যে আমি সাইকেলটি ঠিকমত উপযুক্ত করে আপনাকে দিব। আপনার পিতা জানতে পারবেন না। ওদিকে আমার কলেজ বন্ধুরাও আমাকে প্রতিযোগিতায় নামার জন্যে বার বার পীড়াপিড়ি করতে থাকে। শ্রদ্ধেয় পিতার নিষেধ তখন আর কোনমতেই ধোপে টিকলনা। আমি যেন অনেকটা চাপে পড়ে নিরুপায় হয়ে প্রতিযোগিতায় নামতে বাধ্য হলাম। প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখি আমার হাতে রয়েছে আমার পিতার দেওয়া সে কালের দামী 'রিস্ট ওয়াচ সাইমা লন্ডন'। আমি ঘড়ির ব্যালান্স নষ্ট হতে পারে ভেবে একটু দ্রুত সাইকেল চালিয়ে সবার আগে আমার অধ্যাপক জনাব আব্দুস

www.pathagar.com

সাত্তার সাহেবকে হাত বাড়িয়ে ঘড়িটি দিতে গেলাম। কিন্তু তিনি ঠিক বুঝতে না পারায় আমার এক বন্ধু আমিন উদ্দীন আহমদ (পরবর্তীতে ড. আমিনউদ্দীন আহমদ) দৌড়িয়ে এসে তাড়াতাড়িতে ঘড়িসহ আমার হাতটি ধরে ফেলায় এবং ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পিছনের চাকায় অন্য প্রতিযোগী হঠাৎ ধাক্কা মারায় আমি, সাইকেল এবং ঘড়ি তিনদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ি। আমি পড়েছিলাম Across the track অর্থাৎ পথের আড়া আড়িভাবে এবং বুঝেছিলাম যে এখন আমার উপর দিয়েই সকল সাইকেল প্রতিযোগীকে যেতে হবে। আমি সর্ট, হাঁটু পর্যন্ত উলের মোজা ও কেডস পরেছিলাম। মহান আল্লাহকে সেই মুহূর্তেই স্মরণ করে বলি, আল্লাহ আমার মাথার উপর দিয়ে যেন কেউ না যায় আর আমার প্রধান প্রতিযোগী রবি ভাই যেন প্রথম হতে না পারে। মহান আল্লাহ্ পাক আমার দুটি আরাধনাই রেখেছিলেন। কেননা, মোট দশজন প্রতিযোগীর প্রায় সকলেই আমার শরীরের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়ে পার হয়ে গেছিল বটে; কিন্তু সবার শেষে রবি ভাই তার সাইকেলের প্রথম চাকাটিকে ঝাঁকি মেরে উপরে উঠিয়ে পার করাতে তার পিছনের চাকাটি আমার কোমরের কাছে এসে আটকে যায়। আমি পড়েছিলাম উবুড় হয়ে এবং সম্পূর্ণ দমবন্ধ করে পড়েছিলাম আঘাত সহ্য করার জন্যে। উঠেই দেখি রবি ভাই (বর্তমানে মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুস সামাদ) তিনি তাঁর সাইকেলটি তাড়াতাড়ি উঠানোর চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাঁর সাইকেলের প্যাডল্ এবং আমার সাইকেলের প্যাডল্ পরস্পরের মধ্যে এমন ভাবে জড়িয়ে পড়েছে যা পৃথক করতে বেশ কিছু সময় পার। তবুও রবি ভাই সাইকেলে উঠেছেন দেখে আমিও তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে পড়লাম। কিন্তু আমাকে ডিসকোয়ালিফাই করে ট্র্যাক থেকে ভিতরে টেনে নেওয়া হল। আর রবি ভাই খুব জোর একপাক চালিয়েই বুঝতে পারলেন যে প্রতিযোগিতায় টিকা যাবে না। অতএব, তিনিও রনে ভঙ্গ দিয়ে হতাশ হয়ে আমাকে বললেন নমস্কার দাদা, আমার সর্বনাশটা করলেন। একথা বলার অর্থ তিনি প্রতিবারেই স্পোর্টসে চ্যাম্পিয়ন হন বলেই তাঁর দুঃখটা বেশী। ওদিকে আমার ঘড়িটা কে যেন কুড়িয়ে নিয়েছিল। সেটি আমিন ভাই লক্ষ্য করেছিলেন বলেই তিনি সেটি উদ্ধার করে আমাকে ফেরত দেন।

আবেদ আলী চাচা মাঠেই খেলা দেখছিল। সে আমাকেসহ সাইকেলটি বাসায় নিয়ে আসে। তার বাসার সম্মুখেই ছিল বিখ্যাত ডাক্তার শিশির বাবুর ডিসপেনসারী।

www.pathagar.com

তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে বহু পূর্বে পাশ করা প্রবীণ ডাক্তার। আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করতেন। আমার দুর্ঘটনার কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি এলে কিসে? আমি বললাম হেঁটে এসেছি। তিনি বললেন তাহলে তোমার কিছুই হয়নি। কেবল কম্পাউন্ডারকে বললেন একটা ATS ইনজেকশন দিয়ে দাও এবং কাটা ছিঁড়া স্থানে একটু ড্রেসিং করে দাও সঙ্গে দু'চারটে পেন কিলার দিও। আমাকে বললেন তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই। নয় দশ জন লোক তোমার উপর সাইকেল চালিয়ে গেছে তোমার কোন হাড়গোড় ভাঙ্গেনি। এটাই তোমার সৌভাগ্য।

পরের দিন সকালে আমি অধ্যাপক ঘোসের নিকট পড়তে গেলে তিনি আমার গত কালের কথা উল্লেখ করে বলেন, অধ্যক্ষ এন, আর, রায় ও আমি ভেবেছিলাম তুমি মরে গেছ। যার ফলে নড়াচড়া একদম বন্ধ। আবার হঠাৎ যখন দেখি তুমি সাইকেল চালাচ্ছ তখন আমরা বলাবলি করছিলাম এটা তুমি নও তোমার প্রেতাত্মা।

এভাবে আমার জীবনে বহু দুর্ঘটনা ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেই হোক বা আমার মায়ের আর্থরাইটিস থাকার ফলেই হোক, আমি কিন্তু ছোট বেলা থেকেই নানা প্রকার ব্যাথা-বেদনার শিকারে পরিনত হই। যেমন আমি যতবার ঘোড়ায় চেপেছি ততবারই আমি ব্যাথায় আক্রান্ত হয়েছি। এটা আমি ঘোড়ায় চাপার পূর্বেই বুঝতে পারতাম যে, আমার শরীরে ব্যাথা-বেদনা হবে এরপর। তবুও দুরন্তপনায় আমার সীমা ছিলনা। ১৯৭৭ সালের দিকে পাবনা সদর হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট হিসেবে আসলেন ডাঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ। তাঁকে প্রায়ই আমার ব্যাথা বেদনার কথা নিয়ে আলোচনা করতাম তিনি মাঝে-মধ্যে কিছু ওষুধপত্র দিতেন। আবার কখনও বা বলতেন ও কিছু নয়। পাবনায় কোন এম, বি,বি,এস, ডাক্তার সহজে আমার চিকিৎসা করতে সাহস করতেন না। বলতেন আমাদের চেয়ে অনেক বড় ডাক্তার আপনি দেখাবেন। আপনার রোগ আমাদের কাছে বড় জটিল মনে হয়। এমতাবস্থায় আমি হঠাৎ সাইটিকা রোগে প্রচন্ড ব্যাথায় প্রায় অজ্ঞান হওয়ার মত অবস্থা। পলিটেকনিক স্টাফ কোয়ার্টার থেকে এ্যাম্বুলেন্সে করে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে প্যাথেড্রিন ইনজেকশন দিয়ে আমাকে ঘুমপাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় পর আমার নিদ্রা আসে। ডাঃ শহীদুল্লাহ আমার চিকিৎসা শুরু করেন এবং আমাকে বলেন, আপনি শিক্ষক মানুষ বলে আপনাকে আমি বেডের সঙ্গে বাধলাম না। কিন্তু দয়া করে আপনি কোন প্রকার

www.pathagar.com

নড়াচড়া করবেন না বা উঠে বসবেন না। যা করার দরকার সব কিছু এই নার্সরাই করবে। বেড প্যান ব্যবহার করবেন। ইত্যাদি অনেক নির্দেশনামা আমার প্রতি আরোপ করেন। আমি কিন্তু তাঁর সব কথা মানতে পারিনি বলে দুঃখিত। অধ্যক্ষ হাসান আহমদ আমাকে তাড়াতাড়ি রিলিজ দেওয়ার জন্যে ডাঃ শহীদুল্লাহকে অনুরোধ জানালে ডাঃ সাহেব বলেন, তাঁর যা অসুখ তাতে আমি তাঁকে ইচ্ছা করলে তিন মাস পর্যন্ত বেডে ফেলে রাখতে পারি। অতএব আমি তাঁর এই দীর্ঘ চিকিৎসার ভয়ে বেশ অস্বস্তি বোধ করতে থাকি। বেডপ্যান আমি ব্যবহার করব না বা করতে পারব না বলে প্রতিদিন আমার স্ত্রী বিকেলের দিকে হাসপাতালে আসতেন এবং ডাক্তারের অজ্ঞাতে সিস্টার হাসিনা ও আমার স্ত্রীর সাহায্যে টয়লেটে চলে যেতাম যেটা একটু দূরে ছিল। এইভাবে দু'তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থাকার পর আমি হঠাৎ খবরের কাগজে দেখি ফাতেহা ইয়াজ দহমের মিলাদ উপলক্ষে বাংলাদেশের বহুস্থানে যেমন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজবাড়ী, রাজশাহী, খুলনা, পাবনা ইত্যাদি অনেক স্থানে বড়পীর হযরত গওসল আজম (রাঃ) এর ওরস মোবারকের মিলাদ মাহফিলের সংবাদ আগামী দু'দিনের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ি হাসপাতাল ত্যাগ করার জন্যে। খবরের কাগজে আমি ঐ অংশটুকু আনডার লাইন করি ডাক্তারকে দেখানোর জন্যে। পরে ডাক্তার সাহেব আমার কাছে আসলে আমি তাঁকে সেটা দেখাই এবং বলি, আগামীকাল আমি প্রয়োজন হলে স্ট্রেচারে করে হলেও ঐ পবিত্র ওরস পাকে পাবনা আনজুমান-ই-ক্বাদেরীয়াতে উপস্থিত থাকতে চাই। দরকার হলে আমি আবার হাসপাতালে ফিরে আসব। কথাগুলি ডাক্তারকে বলার সময় আমার চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে এবং ডাক্তার সাহেব আমার অন্তরের অনুভূতি উপলব্ধি করতে পেরে আমাকে বলেন, আপনাকে বোধহয় আমি আর আটকে রাখতে পারব না। ঠিক আছে, আমি আপনাকে ৩০ মিনিট পরে আমার সিদ্ধান্ত জানাব। তাঁর কথামত ডাক্তার আমাকে তাঁর চেম্বারে ডেকে পাঠান এবং বলেন আমি স্বেচ্ছায় আপনাকে রিলিজ করতে পারিনা। তবুও যদি আপনি যেতে চান, তবে আপনি আনডারটেকিং দিয়ে যেতে পারেন নিজের দায়িত্বে। আমি সঙ্গে সঙ্গে আনডারটেকিং এ সই করলে, ডাক্তার আমাকে বলেন, আমরা তো আপনার ঐ মাহফিলে যেতে পারবনা। তবে দয়া করে আমার পক্ষ থেকে এই বাইশটি টাকা সেখানে দিবেন। বলেই আমার হাতে টাকাগুলি দিয়ে

www.pathagar.com

দোয়া করতে বলেন। আমি সেদিনই হাসপাতাল ত্যাগ করি খোঁড়াতে খোঁড়াতে। বাসায় গিয়ে উত্তম রূপে গোসল করে মাহফিল পাকে যাওয়ার পথে কিছু ওষুধ কিনে খেয়ে যথাসময়ে বাদ মাগরিব মাহফিল পাকে অংশ গ্রহণ করি চিরাচরিত ভাবে। তবে এবার উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াজ না করে, বসে বসেই ওয়াজ করি ঘন্টাখানেক। এবং বলি হুজুর গওসপাকের ইচ্ছা না হলে আমি আজ কখনই এখানে হাজির হতে পারতাম না। কেননা, তিনি প্রতিটি মানুষের কলবের মালিক ইত্যাদি। অবশ্য পরের দিন সকালে ডাক্তারের বাসায় তাঁর প্রাপ্য তাবাররুক পাঠিয়ে দিই।

১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি আমি পিঠের প্রচন্ড ব্যাথায় যখন তখন কাতর হয়ে পড়ি। যেটাকে বলা হয় সুটিং পেন। ব্যাথা একবার শুরু হলে কয়েক দিন বিছানায় পড়ে থাকতে হত। এভাবে পাবনায় আর কোন চিকিৎসা সম্ভব না দেখে আমি সোজা ঢাকায় চলে আসি ভাল চিকিৎসার উদ্দেশ্যে। অবশ্যতার পূর্বে রাজশাহীর বিখ্যাত হোমিও প্যাথ ডাঃ আবু বকর সাহেবের চিকিৎসায় দীর্ঘদিন ছিলাম এবং তাঁর ওষুধ খেয়ে আমার রোগ আরো বৃদ্ধিপায় এবং কানেও অত্যন্ত কম শুনতে পাই। তিনি তাঁর ওষুধ কোন মতেই পরিবর্তন করতে রাজি নন দেখে তাঁর চিকিৎসা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হই। ঢাকায় আসার পর জনাব হুমায়ুন খালু আমাকে বলেন, আমি আপনার চিকিৎসার ভার নিতে পারি। তবে একটা শর্তে যদি আপনি আমার বাসায় থাকেন। আমার হেলেন খালারও ঐ একই মত। শেষে আমি তাঁর ওখানেই থাকতে লাগলাম এবং ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়লাম। শেষে হঠাৎ আমার স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে ঢাকায় আমাকে দেখতে আসেন দু'একদিনের জন্যে। হঠাৎ একদিন দুপুরে ঘুমের পর আসরের নামাজ পড়ার পরে অত্যন্ত ক্লান্তভাবে Observer পত্রিকাটা টানদিতেই প্রথমেই শেষের পাতার শেষ কলমে দেখি Taltola peer saheb passes away এটা দেখেই আমি বুঝতে পারি আমার পীর ও মুরশেদ পরদা হুজুরপাক এ মরজগৎ ছেড়ে মহাপ্রস্থান করেছেন (ইন্নালিল্লাহে রাজেউন)। আমি খালুকে সংবাদটা জানিয়ে দ্রুত পোষাক পরে মাহফিল পাকে অর্থাৎ সেদিন কুলখানিতে হাজির হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হতেই খালুও আমার সঙ্গ নিলেন। ঢাকায় ১৩/২ নং এ জনাব খসরু চাচার বাসায় উপর তলায় তখন বরাবর মহফিল পাক হত। সেখানে গিয়ে দেখি প্রচুর পীরভাই, মুরিদ ও মোয়াতেক্বাদগণ হাজির হয়েছেন।

www.pathagar.com

আমি দেওয়ান পাকের "যায়ে না দিলসে ধেয়ান এ তুমহারা কিসি তরাহ্" পড়তে গিয়ে কান্নায় আকুল ভাবে ভেঙ্গে পড়ি। আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে অনেকেই চেষ্টা করেন। উপরন্তু আমি এমনিতেই শারীরিকভাবেই ছিলাম অসুস্থ।

হুমায়ুন খালু ছিলেন তখন বিখ্যাত আমেরিকান ওষুধ কোম্পানি স্কুইবের রিপ্রেজেন্টেটিব। তিনি আমাকে একদিন সঙ্গে নিয়ে পিজি হাসপাতালে প্রফেসর ড. এ,কে, আজাদ সাহেবের কাছে নিয়ে যান। ড. আজাদ আমার শুটিং পেনের বিবরণ শুনে এবং অন্যান্য ডাক্তার সাহেবদের সঙ্গে আলাপ করে আমাকে বলেন সম্ভবত আপনার হয়েছে পলিমিয়ালজিয়া রিউম্যাটিকা, অথবা পলিমাওসিস' অথবা 'সিক্লোডারমা' ইত্যাদি বেশ কিছু রোগের কথা বলেন। তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ একটি পেয়িং বেডে ভর্তি করে নেন। এবং আমাকে নিয়ে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে নানা প্রকার গবেষণায় লিপ্ত হন। আমার বহু রকমের জটিল রক্ত পরীক্ষা শুরু করেন। অর্থাৎ আসলে আমার রোগটা কি সেটাই জানার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পুরো দেড় মাস আমি তখন তাঁর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। শেষে তিনি E.S.R. কমানোর জন্যে আমার কাছে আসেন একদল ডাক্তারদের নিয়ে এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কখনও স্টেরয়েড খেয়েছেন কিনা? আমি বলি না। তিনি বলেন আমরা আপনাকে স্টেরয়েড খাওয়াতে চাই। বলে সহযোগী ডাক্তারদের বলেন এঁকে প্রথমেই ৪০ মিগ্রি করে পাঁচ দিন তারপর ৩০ মি,গ্রি করে পাঁচদিন এবং সেই সঙ্গে E.S.R. এর গতি প্রকৃতির লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দান করেন। এভাবে তিনি নানাভাবে দের মাস আমাকে অবজারভ করেন পিজি হাসপাতালে রেখেই। অবশ্য আমি কিন্তু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কখনও মসজিদে কখনও রুমে ঠিকই আদায় করেছি। এমন কি মাসিক ১১ই শরীফের মিলাদ মাহফিলে পর্যন্ত সিস্টারদের বলে চলে যেতাম। পরিশেষে প্রফেসর ড. আজাদ আমাকে কিছু নির্দেশনা দিয়ে হাসপাতাল থেকে আমাকে রিলিজ করেন। এবং আমাকে তিনি বলেন, আপনার E.S.R. কম থাকলে আপনি ভাল থাকবেন। অতএব, প্রতি সপ্তাহে আপনি E.S.R. চেক করাবেন। এইভাবে প্রায় বছর দুই তাঁর অনুমোদিত ডেলটাকডিল খাওয়ার পর আর সেটা আমার প্রতি কোন কাজ করে না দেখে, আমাদের পলিটেকনিকের ডাঃ সাহাদত সাহেব আমার ওষুধ পরিবর্তন করে আমাকে বেটনালেন খেতে পরামর্শ দেন। তিনিও বেশ অভিজ্ঞ ডাক্তার ছিলেন এবং আমার একান্ত বন্ধু হিসেবে আমাকে

www.pathagar.com

যথেষ্ট ভালবাসতেন। কিন্তু আবার প্রায় বছর দুই পরে এই নতুন ওষুধ আমার শরীরে আর কোন কাজ করে না। ইতোমধ্যে পাবনা সদর হাসপাতালে আসেন নূতন কন্সালটেন্ট হিসেবে একজন ডাক্তার। যাঁর নামটি এই মুহূর্তে আর আমার মনে নেই। তিনি ফ্রান্স থেকে পিএইচডি করে আসেন এবং আমার রোগের বিবরণ শুনে বলেন, সম্ভবতঃ বাংলাদেশে আপনার চিকিৎসা সম্ভব নয়। আমি এ পর্যন্ত দেশে বিদেশে আপনার মত কোন রুগীর দেখা পাইনি। অতএব, আমি আপনার কোন চিকিৎসা করতে অপারগ। দয়া করে আমাকে মাফ করবেন। বলে তিনি আমাকে হাসপাতাল থেকে বিদায় করেন। আমি বাধ্য হয়ে সিভিল সার্জন সাহেবের সঙ্গে দেখা করি এবং তাঁর কথা বলি। তিনি আমাকে বলেন এই নূতন ডাঃ আপনাকে দেখতে বাধ্য। আমার এই চিঠি নিয়ে যান তাঁর কাছে এবং আমার কথা বলেন তাঁকে। নূতন কন্সালটেন্ট ডাক্তার আমাকে বলেন তাঁর চিঠিখানা পড়ে, দেখুন আমি আপনার ব্যাপারে আমার অপারগার কথা বলা সত্ত্বেও আপনি সিভিল সার্জন সাহেবের কাছ থেকে এ চিঠি নিয়ে এসেছেন। ঠিক আছে আমি আপনার চিকিৎসা করব তবে কিন্তু কোন দায়িত্ব নেবনা। আপনার কোন ক্ষতি হলে, আমাকে দোষারোপ করতে পারবেন না। কেননা, আপনি আমার কাছে একটা অদ্ভূত কমপ্লিকেটেড পেশেন্ট। যা হোক, আপনি কি কখনও কেনাকর্ট খেয়েছেন? আমি বলি না। তাহলে আমি আপনাকে কেনাকর্ট খাওয়াতে চাই। আমি বলি ঠিক আছে। এভাবে বেশ কিছুদিন তাঁর কথামত ঐ ওষুধ খেতে থাকি।

পাবনা শহরে তখন জার্মান কোম্পানী "হোয়েকস্টের" একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দাওয়াত পেয়ে সেখানে যাই। সেখানে বসে থাকতে দেখে আমার এক ভাগনা নজরুল ইসলাম, যে ছিল স্কুইত কোম্পানীর মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ সে আমাকে সেখানে দেখে ইশারায় আমাকে বাইরে ডাকে। এবং বলে, মামা আপনি কী ওষুধ খাচ্ছেন? আমি বলি কেনাকর্ট। সে বলে এটা আমার কোম্পানীর ওষুধ। এটার রিয়্যাকশন আপনার প্রতি শুরু হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারছি। আপনি আপনার জামাটা একটু খুলে দেখান তো দেখি। দেখেই বলে হ্যাঁ আপনার শরীরে র‍্যাশ বেরিয়েছে। আপনার চেহারা 'মুনিং অবদি ফেস' হয়েছে দেখেই আপনাকে আমি ডেকে বাইরে আনলাম। আপনার আর এখানে থাকার দরকার নাই। আপনি এখুনি যে ডাক্তার আপনার চিকিৎসা করছেন তাঁর কাছে চলে যান। এবং সম্ভবত আজই

www.pathagar.com

আপনাকে ঢাকায় যেতে হতে পারে চিকিৎসার জন্যে। আমি সেখান থেকে সোজা হাসপাতালে ঐ ডাক্তারকে গিয়ে বলি। তিনিও আমার শরীর দেখে বলেন, এ জন্যেই আমি আপনার চিকিৎসা করতে চাইনি। আপনি আজই ঢাকা চলে যান। তখন বিকেল বেলা দেখে আমি ঢাকা যাত্রা থেকে বিরত থাকি। পরের দিন সকালেই আমি সোজা সিভিল সার্জন সাহেবকে সব কথা জানাই এবং তিনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি দেন, যাতে উল্লেখ থাকে যে আমাকে যেন একাডেমিক ইন্টারেস্টের উপর পিজি হাসপাতালে আমার চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়। এবং আমাকে মুখে বলেন যে, আপনি প্রফেসর ডাক্তার নূরুল ইসলাম সাহেবকে না দেখিয়ে কখনও হাসপাতাল ত্যাগ করবেন না। আমি যাথারীতি সেই দিনই ঢাকা রওনা হয়ে যাই। এবং আমাকে ড. হারুন-অর-রশিদের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা শুরু করা হয়। যদিও আমি প্রথমেই পিজি হাসপাতালে গিয়ে জানিয়ে দিই যে আমি ডাইরেক্টর প্রফেসর নূরুল ইসলাম সাহেবের নিকট চিকিৎসা করাতে এসেছি অন্য কারো কাছে নয়। তাঁরা বলেন, ডাঃ নূরুল ইসলাম সাহেবের অধিনে কোন বেড বর্তমানে খালি নেই। তাছাড়া আমাদের এখানে সব ডাক্তারই সমান। প্রয়োজন হলে ডাক্তার নূরুল ইসলাম আপনাকে অবশ্যই দেখবেন। অতএব, বর্তমানে যে সিটটা খালি আছে সেটি আপনি এখন না নিলে আবার কবে সিট পাবেন আমরা বলতে পারি না। অবশেষে সেই বেডেই আমাকে বাধ্য হয়ে ভর্তি হতে হয়। ডাক্তার হারুণ-অর-রশিদের বাড়ী ছিল পাবনা শহরে। জেলা স্কুল শিক্ষক ছিলেন তাঁর পিতা। আমার বন্ধু ড. সৈয়দ রেজা হোসেন আমাকে হাসপাতালে দেখতে এসে ঐ ডাক্তার হারুণকে ডেকে বলে এ আমার বন্ধু একে একটু ভাল করে দেখ। ডাক্তার রশীদ আমাদের চেয়ে অনেক জুনিয়র ছিল এবং লন্ডনে ওরা দু'জনে পিএইচডি করার সময় ড. রেজা তাকে ভাল করে লক্ষ্য করেছিল যে, সে ছাত্র হিসেবে সেখানে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। রেজা আমাকে ডাক্তারের অসাক্ষাতে এসব জানায় এবং বলে তোর চিন্তার কোন কারণ নেই।

১৯৭৮ সালে প্রফেসর আজাদ সাহেব আমার যে ফাইল খুলেছিলেন সেটিই আবার এই ১৯৮২ সালে অর্থাৎ এই দীর্ঘ ৪/৫ বছর পরে পুনরায় আলোচনায় আসেন। ড. হারুণ যখন দেখলেন যে ড. আজাদ আমার অসুখকে পলিমিয়ালজিয়া রিউমাটিকা হিসেবে ধরেছিলেন। তখন ড. হারুণ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন আপনার

www.pathagar.com

এই শুটিং পেন কতদিন ধরে? আমি বলি প্রায় ৩০/৩৫ বছর আগে থেকে। তিনি আমাকে বলেন, তাহলে এটা কখনই পলিমিয়ালজিয়া নয়। বলেই তিনি তাঁর চেম্বার থেকে একটা মোটা ডাক্তারী বই নিয়ে এসে আমাকে ঐ বিশেষ লাইনটি দেখান। সেখানে লিখা আছেঃ Polymealgia Rheumatica can never start before the age of fifty" আমি বলি তাহলে আপনারাই বলুন আমার কী রোগ এটা? তিনি বলেন, হ্যাঁ আমরা এখন আপনার এরোগটা নিয়ে কয়েকটি সেমিনার করেছি। ইতোমধ্যে আমার বুকের হাড়ের মধ্য থেকে বোনম্যারো Bone Marrow বের করে নেওয়া হয়েছে। সেটাতে আমার প্রচন্ড কষ্ট হয়েছিল। প্রথম বার একদল ডাক্তার এসে বড় মোটা নিডল বুকের হাড়ের মধ্যে বসাতে গিয়ে নিডলটা বেঁকে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঐ রকম নিডল দিয়ে অন্য একজন ডাক্তার বোনম্যারো বের করেই দ্রুত ল্যাবে নিয়ে যান পরীক্ষার জন্যে। এক্সরে করা হয়েছে প্রচুর।

পরিশেষে আমাদের বাংলাদেশের মহাচিকিৎসা বিজ্ঞানী ডাইরেক্টর প্রফেসর নূরুল ইসলাম সেদিন এক দল ডাক্তার নিয়ে আমাকে দেখতে আসেন, তখন আমি যে ম্যাগজিনটি একটু পূর্বেই কিনে পড়ছিলাম বেড়ে বসে তাতে প্রফেসর নূরুল ইসলামের কভার পেজে বিরাট ছবি এবং সেখানে লেখা আছে বাংলাদেশে ১৯০০ ওষুধ বাতিল করেছেন এই চিকিৎসা বিজ্ঞানী প্রফেসর। তিনি স্বভাব সিদ্ধভাবে কথা বলেন অত্যন্ত কম। আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত প্রায় সবটাই টিপেটাপে দেখে, আমার ফাইলটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে আমাকে বলেন আপনার ফাইলটা আমি একটু নিয়ে গেলাম। আমি তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে অনুরোধ করে বলি আমার খালু জনাব আব্দুল ওহাব সাহেব আমার ব্যাপারে আপনাকে একটু দয়া করে দেখতে অনুরোধ করেছেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, O yes, I am also interested about you. এরপর শুরু হল গিনিপীগের মত আমার উপর নানা প্রকার পরীক্ষা নীরিক্ষা। ইতোমধ্যে প্রায় একমাস পার হয়ে গেছে। আমি দুপুরে খেতে বসেছিলাম এমন সময় দেখি হঠাৎ একদল ডাক্তার আমাকে খেতে দেখে বলেন, ঠিক আছে আপনি খেয়ে নেন। পরে আমরা আসছি। আমি খাওয়ার পরপরই তাঁরা প্রায় ১৭ জন ডাক্তার আমার কাছে এসে হাজির। আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁদের কী ব্যাপার? তাঁরা বলেন, না এমন কিছু না আপনার একটা মাসল বায়াপসি করতে চাই আমরা, প্রফেসর নূরুল ইসলাম সাহেবের নির্দেশ। আমি বলি কোথা থেকে করতে চান

www.pathagar.com

বলুন। তাঁরা বলেন, আপনার পায়ে তো অনেক মাংস, অতএব পা থেকেই করি। আমার এক মামা সৈয়দ শাহ্ আব্দুস সমী, যিনি কলকাতা পিজি হাসপাতালে তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুলের চিকিৎসা করাতে গিয়ে ডাক্তারের ভুলে তাঁর ডান পাটা হাঁটু থেকে কেটে ফেলতে হয়। অথচ তখন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম,এ, ল একসঙ্গে পড়ার চেষ্টা করছিলেন। ছাত্র হিসেবে বেশ মেধাবী ছিলেন বলেই হয়ত তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারত। তাঁর কথা আমার স্মরণ হওয়ায় আমি বলি, তাহলে কাপ মাসল থেকে নিতে পারেন। তাঁরা বলেন আপনার এই বেডেই আপনি উবুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। আপনার একটা ডিপমাসল আমরা কেটে নেব। আমি জিজ্ঞাসা করি এত ডাক্তার কেন ? তাঁরা বলেন, মাসল বায়াপসি' তাঁরা অনেকেই দেখেননি তাই দেখতে এসেছেন। আমি শুয়ে পড়ি এবং আমিও দেখার জন্যে ঘাড় ঘুড়িয়ে বার বার দেখার চেষ্টা করি। তাঁরা বলেন, আরে আপনি কী দেখেন? আমি বলি কেন আমি তো মেয়েছেলে না। আমার দেখতে অসুবিধা কোথায়? আমার এরূপ সাহস দেখে ডাক্তারদের অনেকেই অবাক হয়ে যান। এভাবে দেড়মাস তাঁরা আমাকে গিনিপীগের মত নানা রকম পরীক্ষা-নীরিক্ষা চালাতে থাকেন পরিশেষে আমি বিরক্ত হয়ে একদিন তাঁদের বলি, আপনারা যথেষ্ট করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। এখন দয়াকরে আমাকে রিলিজ করার চেষ্টা করেন। আমি তাঁদের ইতিপূর্বে এমনও বলেছি যদি আপনারা মনে করেন আমার চিকিৎসা এদেশে সম্ভব না, তবে বিদেশে কোথাও পাঠাবার জন্যে মেডিক্যাল বোর্ডের মাধ্যমে সুপারিশ করেন। তবুও তাঁরা নির্বিকার ভাবে বলেন, আপনি তো তেমন কোন রুগী না, আমরা চেষ্টা তো করছি ইত্যাদি।

আমি হাসপাতালে থাকতে পেইয়িং বেডে ছিলাম বরাবরই। সরকারী অফিসার হিসেবে ৫০% ছাড় পেতাম এবং খাবারও পেতাম। কিন্তু তবুও আমার মেজফুপু ও ফুপা প্রতিদিন দুপুরে তাঁদের ছেলে সৈয়দ আহলে বায়েতকে দিয়ে মিরপুর থেকে খাবার পাঠাতেন, আমি নিষেধ করা সত্ত্বেও। এমন কি তাঁরা আমাকে মাঝে মধ্যে প্রায়ই দেখতে আসতেন। ভারত থেকে নাসিম ও গোলাম মোস্তফা ঢাকা এসে আমার কথা শুনে পিজি হাসপাতালে দেখতে এসেছিল। আমার আর একফুফাত ভাই সৈয়দ মকবুল-উন-নবী ওরফে বুলবুল তার ব্যাংক থেকে আমাকে মাঝে মধ্যে দেখতে আসত। যার ফলে, আমি আমার অনেক আত্মীয় স্বজনের নিকট যথেষ্ট

www.pathagar.com

কৃতজ্ঞ। পাবনা থেকে আমার স্ত্রী আমার বেতন থেকে মাঝে মাঝে ঢাকায় টাকা পাঠাতেন আমার কোন কোন বন্ধু শিক্ষকের মাধ্যমে। তাও দুবার আমার পকেটমার হয়ে যায়। যা হোক ডাক্তাররা আমার ঐ শুটিং পেনটা দেখতে চেয়েছিলেন যেন তাঁদের সম্মুখেই আমি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ি। কিন্তু সেটা আর সম্ভব হয়নি। আমি একবার ডাক্তারদের বলি দেখুন কুষ্টিয়া আমার শরীরের জন্যে খুবই ভাল আবহাওয়া। কিন্তু তাঁরা তা স্বীকার করেন না। বলেন গড়াই নদীর দক্ষিণে কুষ্টিয়া এবং উত্তরে পাবনা। আপনি পাবনা, রাজশাহী, ঢাকা এসব স্থানে ভাল থাকেন না অথচ কুষ্টিয়াতে ভাল থাকেন এটা হতে পারে না। পরিশেষে আমি তাঁদের বলি দয়া করে আপনাদের পুরো রিপোর্ট আমাকে ফটোকপি করে দেন। প্রয়োজনে আমি দেশের বাইরে গিয়ে চিকিৎসা করাব। তাঁরা আমাকে ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত দেড় মাস দেড় মাস করে পুরো তিনমাসের রিপোর্ট আমাকে দিয়ে রিলিজ করেন।

আমি হাসপাতালে থাকতেই আমার একবন্ধু আমাকে জানান যে আমাকে রংপুরে বদলী করার চেষ্টা চলছে। অতএব, আমি পিজি থেকে হঠাৎ একদিন আমার হেড অফিসে গিয়ে আমাকে চিকিৎসার খাতিরে যাতে ঢাকায় রাখা হয় এমন অর্ডার সঙ্গে নিয়েই পাবনা যাই। এবং ১৯৮২ সালে ঢাকা পলিটেকনিকে এসে কাজে জয়েন করি।

আমি পরে কলকাতায় রিপোর্টটি নিয়ে গিয়ে অধ্যাপক ডাক্তার আমিন আহমদ এমডি কে দেখাই এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করি। তিনি আমার পীরভাই এবং যথেষ্টভাল ডাক্তার হওয়া সত্ত্বেও আমাকে তিনি পিজি হাসপাতালের ডাইরেকটর ডাক্তার মনি ছেত্রীকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেন দেখার জন্যে। কিন্তু কয়েকবারই আমি তাঁকে কলকাতায় পাইনি। তিনি বড় ডাক্তার হিসাবে ভারতের বহুস্থানে ঘুরে বেড়ান বলে কোন বারই আমি তাঁকে ধরতে পারিনি। শেষে ডাক্তার আমিন আমাকে বলেন, কয়েকবারই তো আপনি বাংলাদেশ থেকে এলেন চিকিৎসার জন্যে কিন্তু ডাঃ মনি ছেত্রীকে ধরা সম্ভব হল না যখন, তখন তাঁর মতনই প্রায় সমপর্যায়ের এক ডাক্তার তাঁকে আপনি দেখাবেন কি? আমি বলি হ্যাঁ। আপনি বলেন তো দেখাতে পারি। তখন তিনি একটা চিঠি লিখে দেন ডাক্তার হীরেন কুমার পালকে। আমাকে বলেন তিনি থাকেন বাগবাজারে, আপনি একটি ট্যাক্সি নিয়ে ওখানে একটু জিজ্ঞেস করলেই যে কেউ দেখিয়ে দেবে তাঁর বাড়ী। এটা ছিল

www.pathagar.com

১৯৮৮ সাল, আমার বড় মেয়ে শিল্পীও সঙ্গে ছিল সেবার। প্রথমে আমি একাই গেলাম ডাক্তার এইচ,কে, পালের নিকট। সেখানে দেখি মাত্র কয়েক জন রুগী অপেক্ষা করছেন। ডাক্তার বাবুর যে সহকারী সম্ভবত লোকটি বোবা। আমি তাকে চিঠিটা দিয়ে অন্য ঘরে অপেক্ষা করতে লাগলাম অন্য রুগীদের সঙ্গে। আমার পাশেই একটি চেয়ারে যিনি বসেছিলেন তাঁকে আমি কথায় কথায় হঠাৎ জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা বলুন তো কলকাতায় সবচেয়ে সেরা ডাক্তার কে? তিনি আমাকে বলেন দেখুন মশায় আপনি খুব কঠিন একটি প্রশ্ন করেছেন। আমি ডাঃ মনি ছেত্রীর নাম বলতেই তিনি বলেন, দেখুন মনি ১৯৪৪ সালে আমার সঙ্গেই ডাক্তারী পরীক্ষা দিয়েছিল। কিন্তু সে সেবার পাশ করতে পারেনি। আমি ডাঃ চৌধুরী, ডাঃ মনির চেয়ে এই ডাঃ পালকেই বেশী ভাল মনে করি বলে এখানেই বেশী আসি। তাছাড়া এখানে যে কজন রুগী দেখছেন এরা প্রায় সকলেই ডাক্তার। ইতোমধ্যে ডাঃ পাল চেম্বার থেকে বেরিয়েই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক দেন এবার ডাঃ চৌধুরী আসুন। অনেকক্ষণ পর যখন আমার পালা আসল। তখন আমি প্রথমেই ঢাকার পিজি হাসপাতালের রিপোর্টটি তাঁর হাতে দিই। তিনি দীর্ঘ সময় উভয় পৃষ্ঠা দেখে আমাকে বলেন, ঢাকার পিজি হাসপাতাল তো বহুত কিছু করেছে আপনার জন্যে। এখন আমাকে আপনি বলুন তো আপনার অসুখটা কোথায়? আমি বলি 'ব্যাক য়েক' (পিঠের ব্যাথা)। তিনি বলেন, কিন্তু আপনার স্পাইনাল কডের কোন রিপোর্ট এখানে নেই। থাকলে আমি এখনই আপনার জন্যে একটা প্রেসক্রিপশন করতে পারতাম। এরপর আমাকে বলেন, আপনার জামাটা একটু খুলুন তো। জামাটা খোলার পর আমাকে বলেন আপনি একটু ব্যায়াম করুন তো দেখি। শেষে তিনি একটা কাগজে কিছু লিখে আমাকে বলেন, আপনাকে যে ডাক্তার আমার কাছে পাঠিয়েছেন আপনি তাঁকে এটি দিবেন। আপনার আমি পাঁচটি রক্ত পরীক্ষা এবং ছয়টি স্পাইনালকডের এক্সরে রিপোর্ট চাই। তবেই আমি আপনার জন্য প্রেসক্রিপশন করতে পারব। এবং এগুলি কোথা থেকে করাতে হবে সব আপনার ঐ ডাক্তার আমিন জানেন। আপনি মাস খানেক পরে আসলেও আমাকে এখানেই পাবেন।

সেবার আমার কাছে যে টাকা ছিল তাতে দিল্লী হয়ে আজমীর শরীফে খাজা বাবার দরবার শরীফে যাওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল। আর যদি চিকিৎসা করাতে যাই, তাহলে আর চিকিৎসা করানো সম্ভব নয়। আমার কিছু বাংলাদেশী শিক্ষক বন্ধু

www.pathagar.com

সেবার কলকাতায় সল্টলেকে একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামের জন্যে এসেছিলেন। বেশ ক'মাসের জন্যে। আমি তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আমার ইচ্ছার কথাটা তাঁদের জানিয়ে বললাম, ভাই আমাকে আপাততঃ কিছু টাকা আপনারা কেউ দিয়ে সাহায্য করলে আমি ঢাকায় আপনাদের এ টাকা বাটাসহ যা হয় পুরোটাই ফেরত দিব। বিশেষত জনাব আব্দুর রশিদকে আমি কথাগুলি বলি। তাঁরা আপারগ হওয়ায় আমাকে রশিদ সাহেব পরামর্শ দেন আপনি চৌধুরী সাহেব আজমীর শরীফ চলেযান এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর দেখবেন একটা ব্যবস্থা হয়ে গেছে ইত্যাদি। যা হোক আমি ভগ্নমনে সদ্য নির্মিত সল্টলেকে তৈরী বিশাল ফুটবল স্টেডিয়ামটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার আসন বিশিষ্ট স্টেডিয়ামের উপর থেকে অনেক নীচে খেলার মাঠটা দেখতে একটু ছোটই মনে হল আমার কাছে।

এরপর আমি কাসেমনগরে আমার বোনের ওখানে গিয়ে দেখি আমার মেজ ভাগনী রুহী তার স্বামী হাবিব এবং তাদের দু'ছেলে ফারহান ও শারহান সব বেড়াতে এসেছে। আমার বড় মেয়ে শিল্পীও সেখানে ছিল। তাদের সকলের সঙ্গে দেখা করে বেশ আনন্দ পেলাম দীর্ঘদিন পর। আমার ভাগনী জামাই হাবিব খুবই ভাল ছেলে। সে যখন জানল যে আমি আজমীর শরীফ যেতে চাই ভায়া দিল্লী হয়ে, তখন আমাকে তার মামাতো বোন রওশন আরার বাড়ীর ঠিকানাসহ তাদেরকে ইংরেজিতে একটি চমৎকার চিঠি লিখে দেয় যাতে আমার দিল্লীতে কোন অসুবিধা না হয়। উপরন্তু সে আমাকে তার ভারতীয় রেলওয়ে গাইড বইটাও দিয়ে দেয়। আমার মেয়ে আমার সঙ্গে দিল্লী না গিয়ে কিছু টাকা তার সঙ্গে রেখে দিল।

www.pathagar.com

অষ্টাদশ পর্ব

কলকাতায় আমি প্রথমেই বড় হুজুর পাকের নিকট আজমীর শরীফে হাজির হওয়ার জন্যে অনুমতি প্রার্থনা করি। তিনি আমাকে দয়া করে অনুমতি দেন। সে সময় আমি উঠেছিলাম খিদিরপুরে আমার চাচাত ভাই চৌধুরী ফকরুল আলমের বাসায় এবং আমার ফুলচাচার বড় মেয়ে নাসিম ছিল তার স্ত্রী। তারা তৎকালীন মন্ত্রী কলিমউদ্দীন শামসের বাড়ীতে ভাড়া থাকত। আমি নাসিম এর কাছে আমার পাসপোর্ট এবং বাংলাদেশ ফিরে যাওয়ার মত কিছু টাকা রেখে বাকী টাকা নিয়ে একদিন রাতে হঠাৎ হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকেট কেটে ট্রেনের অপেক্ষা করি। এটা ছিল জানুয়ারী মাসের শেষের দিকের ঘটনা। অর্থাৎ তখন বেশ শীত। আমার উচিৎ ছিল রিজার্ভেশন করে টিকিট কাটা। কিন্তু তাড়াহুড়া এবং অভিজ্ঞতার অভাবে এটা সম্ভব না হওয়ায় একটা কুলিকে বিশটাকা দিলে সে কেবলমাত্র আমার বসার একটা স্থান করে দেয় কালকা মেল ট্রেনে। রাত প্রায় সাড়ে দশটায় ট্রেন ছাড়ল। সারা গাড়ী ভর্তি অবাঙ্গালী যাত্রী তাদের গায়ে সব কম্বল। আমি কেবমাত্র একটা কালস্যুট পরে তাদের মাঝে ঐ যে বসলাম আর উঠার কোন সুযোগ পাইনি। ভ্যাগ্যিস টয়লেটে আমার যাওয়ার দরকার পড়েনি তাই রক্ষে। নতুবা ফ্লোরে পর্যন্ত গাদাগাদী মানুষ বসে ছিল। হাবিব আমাকে পূর্বেই বলেছিল যে মামা আপনি তো আগে আগ্রা সফর শেষ করে দিল্লী যাবেন; অতএব, আপনি নামবেন টুন্ডলা স্টেশনে সেখান থেকে বাসে মাত্র ৩০ মিনিটে আগ্রা পৌছে যাবেন। আমি ঠিক তার কথামত পরের দিন বিকেল ৫ টায় টুন্ডলা স্টেশনে নামলাম। ট্রেনের মধ্যে এই দীর্ঘ ১৭ ঘন্টা আমি একটুকুও ঘুমাইনি বা ঘুমানোর কোন অবকাশ ছিলনা। আমার হাতে ছিল মাত্র একটি ইংরেজি বই The Musalman of Bengal বইটির লেখক ছিলেন আমার এক আত্মীয় জনাব আবুল হায়াত সাহেব। অবশ্য এই প্রায় একই নামে বই লিখেছিলেন I W.W. Hunter The Indian Musalmam যা হোক সারা পথের কষ্ট আমি বই পড়ার মধ্যে অতটা উপলব্ধি করতে পারিনি। পরিশেষে স্টেশনে নেমেই দেখলাম অনেক যাত্রী ওভারব্রীজের উপর দিয়ে ছুটছে। আমিও তাদের দেখাদেখি ছুটলাম। গিয়েই দেখি কিছু বাস আগ্রার উদ্দেশ্যে ছাড়ছে। আমি ওরই একটাতে উঠে যাত্রা করলাম। বাসের মধ্যেই একভদ্র লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় জানলাম তিনি একজন ব্যবসায়ী, বোম্বে থেকে

www.pathagar.com

প্রায়ই আগ্রা আসেন। তিনি আমাকে ইংরেজি এবং হিন্দীতে বলেন, আমার সঙ্গে থাকুন কোন অসুবিধা নেই।

আমরা আধা ঘন্টা পরই আগ্রাতে পৌছালাম। তিনি আমাকে হোটেল সারাং-এ নিয়ে উঠলেন এবং ম্যানেজারকে বললেন আমাদের দুজনের জন্যে একটা বেডরুম চাইলেন। কিন্তু ম্যানেজার রাজি হলনা। তিনি যতই বলেন আমি তো এখানে প্রায়ই উঠি উনি আমার বন্ধু হিসাবে একরুমে থাকলে কী অসুবিধা। অর্থাৎ ৬০ রুপীতে আমরা দুজনে একটি বেডরুম পেতাম। সেখানে আমাদের দুজনকে দুটি বেডরুম দিয়ে ১০০ রুপী নিল। যাহোক আমার রুমে গিয়ে দেখি চমৎকার দুটি বেড পাশাপাশি জোড়া লাগানো। মাগরিবের নামাজ পড়ার জন্যে আমি তাড়াতাড়ি অজু করে নামাজ আদায় করলাম। বুঝলাম আগ্রায় প্রচন্ড শীত। মাথার দিকে বেডের কাছে বই পড়ার চমৎকার ব্যবস্থাই বিছানা, কম্বল সবই বেশ উন্নত মানের। নীচে রাতের খাবার খেতে গেলাম ঐ একই হোটেলে কিন্তু খাবারটা আমার তেমন পছন্দ হলনা। অথচ দাম নেহাত কম নয়। সাহেবী কায়দায় কেতাদুরস্ত ডাইনিং টেবিল ইত্যাদি সবই পছন্দনীয়। আমি পরের দিন খুব ভোরে উঠে নামাজ পড়ে একটু পরেই দেখি পূর্ব দিকে লাল হয়ে সূর্য উঠছে। আমি দোতালায় ছিলাম এবং পূর্ব দিকটা বেশ ফাঁকা থাকায় সূর্যোদ্বয়টা বেশ খানিকক্ষণ উপভোগ করলাম। এরপর সুটকোট, মাফলার ইত্যাদি জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আগ্রার উঁচু-নীচু বিভিন্ন রাস্তায় আগ্রা শহরের বাদশাহী শ্রী দেখার জন্যে। পথের ধারে এক দোকানে গরম গরম পুরী, তরকারী ও চা খেলাম-বেশ ভাল লাগল।

ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আর আমার দেখা হলনা। কেননা, আমি এসেছি যত কম সময়ে বেশী জায়গা ঘোরা যায় এই উদ্দেশ্যে। অতএব, সকাল ৮টার পরই আমি হোটেল থেকে বিদায় নিলাম আমার লাগেজসহ। যদিও হোটেলের নিয়ম অনুযায়ী আমার চেক আউট ছিল বেলা ১১টা পর্যন্ত। বিদায় নিতে গিয়ে দেখলাম হোটেল ম্যানেজার আমার সঙ্গে বাংলা ভাষায় কথা বলেছেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম তিনি এসেছেন কলকাতা থেকে। আমি আর বিলম্ব না করে সোজা আগ্রা ক্যান্ট রেল স্টেশনে আমার লাগেজটা প্রথমেই 'লেফট লাগেজে' জমা রেখে টুরিষ্ট বাসের টিকিট কিনে জানালার ধারে একটা সিটে গিয়ে বসলাম। হঠাৎ দেখি এক ফেরিওয়ালা হেঁকে বেড়াচ্ছে মামফুলী, মামফুলী। আমি ইতোপূর্বে এ শব্দটা শুনিনি। অতএব, কৌতুহল বসত জিজ্ঞাসা করতেই দেখি চিনা বাদাম বিক্রি করছে। কিনলাম কিছু। আমার পাশে যে সিটটা খালি ছিল, দেখি সেখানে এসে বসল এক সাহেব ছোকরা। পরিচয়

www.pathagar.com

করে জানতে পারলাম, তার নাম পল টেলর, স্কটল্যান্ড ইউনিভার্সিটির এক ছাত্র। তার সঙ্গে তার কাঁধে ঝুলছে একটা সাইড ব্যাগ সেটাতে রয়েছে বেশ কিছু ক্যামেরা ও তৎসংলগ্ন ফিল্ম ইত্যাদি। ইতোমধ্যে আমাদের টুরিস্ট গাইড জনাব এম এইচ খান এসে উঠলেন এবং গাড়ী ছাড়ার একটু পূর্বে ছোট একটা বক্তৃতা দিয়ে জানালেন, আমাদের গন্তব্যস্থান, প্রথমে ফতেহপুর সিক্রি সম্রাট আকবরের যাবতীয় কীর্তিকলাপ দেখা যাবে সেখানে। আগ্রা থেকে ফতেহপুর সিক্রি প্রায় ঘন্টা দেড়েকের পথ। ভদ্রলোকের মাথায় একটা রামপুরী ক্যাপ এবং পরনে ছিল সাফারী সুট। আমি তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে জানতে পারলাম তিনি আগ্রাভার্সিটি থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছেন এবং টুরিজমের উপর ইউরোপ থেকেও একটা কোর্স করে এসেছেন। তিনি ইংরেজি এবং হিন্দীতেই বেশী কথাবার্তা বলছিলেন, তবে আমি তাঁর সঙ্গে উর্দূতে কথা বলে বুঝলাম তিনি চমৎকার উর্দূ জানেন।

ফতেহপুর সিক্রির ব্যাক গ্রাউন্ড বলতে গিয়ে তিনি জানালেন এই স্থানে পানির দারুণ অভাব ছিল। হযরত শাহ্ সেলিম চিশতী (রহঃ) নামে এক দরবেশ থাকতেন ঐ এলাকায়। সম্রাট আকবরের সন্তানাদি হয়ে মারা যেত। ফলে দরবেশের স্মরণাপন্ন হন সম্রাট আকবর। হযরত সেলিম চিশতী তাঁর জন্যে দোয়া করেন। এবং তাঁকে বলেন, এই এলাকার লোকের পানির কষ্ট দূর করার জন্যে সম্রাট যেন ব্যবস্থা নেন। দরবেশের নির্দেশ রক্ষা করেছিলেন সম্রাট আকবর আর এ জন্যেই এই এলাকার নাম হয় ফতেহপুর সিক্রি অর্থাৎ বিজিত এলাকা বিশাল এলাকা নিয়ে লাল রঙ্গের পাথরের প্রকান্ড ইমারত, না দেখলে বিশ্বাস করা মুস্কিল যে কীভাবে এতবড় প্রকল্প বা প্রোজেক্ট তৈরী করা যেতে পারে। জনাব খান সাহেব মাঝে মাঝে আমাদের সকল দর্শনার্থীকে ইংরেজি এবং হিন্দীতে বুঝিয়ে বর্ণনা দিচ্ছিলেন। কেননা, আমাদের সঙ্গে বেশ কিছু বিদেশী টুরিস্ট ছিলেন বলেই তাঁকে ইংরেজিতে বলতে হচ্ছিল। এক ভারতীয় ভদ্রলোক তিনি খান সাহেবকে প্রথমে ইংরেজিতে না বলে হিন্দীতে বলার জন্যে তর্ক করতে থাকেন। যদিও তিনি নিজে যথেষ্ট ভাল ইংরেজি জানেন। কিন্তু তাঁর মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ অথবা বেশ কিছু ভারতীয় মহিলা তাঁর সঙ্গে ছিলেন বলেই বোধ করি তাঁর এই তর্ক। যা হোক, খান সাহেব অভারতীয় বিদেশীদের কথা চিন্তা করেই প্রথমে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে অভ্যস্ত ছিলেন। খান সাহেবের সঙ্গে আমার বেশ খানিকটা হৃৎদ্যতা হয়ে যায়। এবং আমি অতি কৌতুহলী হয়ে তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু জানার সুযোগ পাই অন্যদের চেয়ে। সম্ভবত আমি ছাড়া অন্য কোন মুসলমান টুরিস্ট আমার চোখে পড়েনি। আমরা সর্বমোট প্রায় জনা চল্লিশেক টুরিস্ট সে সময়

www.pathagar.com

উপস্থিত ছিলাম। সম্রাট আকবরের মোট চার জন বেগম ছিলেন। তাঁদের মধ্যে দু'জন ছিলেন মুসলিম একজন হিন্দু এবং একজন রাজপুত মহিলা মহারানী যোধাবাই। এঁর গর্ভেই জন্ম গ্রহণ করেন সেলিম যিনি পরবর্তী পর্যায়ে সম্রাট জাঁহাঙ্গীর নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। মহারানী যোধাবাই এর ভ্রাতা ছিলেন রাজপুত মানসিং। ইনিই ছিলেন সম্রাট আকবরের প্রধান সেনাপতি।

ফতেহপুর সিক্রিতে সম্রাট আকবর তাঁর চার বেগমের জন্যে চারদিকে চারটি প্যালেস বা মহল তৈরী করেন। এবং দরবার কক্ষটি এমনভাবে তৈরী করা হয় যেখান থেকে সম্রাট তাঁর চার বেগমের চারটি মহলের প্রতি নজর রাখতে পারেন। আরও মজার ব্যাপার হল যে, সম্রাট আকবর সর্বধর্মের প্রতি সমান ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে, সেখানে চাঁদ-তারা থেকে শুরু করে সূর্য হনুমান কিছুই বাদ পড়েনি তাঁর বিশাল প্রকল্পের নক্সাচিত্রে। খান সাহেব একসময় হঠাৎ বলে উঠেন, This is the creation of Akbar the Great. আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বলি, I Differ from your opinion that Akbar was great. তখন তিনি আমাকে নিভৃতে বলেন, আমিও আপনার সঙ্গে একমত। তখন তাঁকে আমি আবার প্রশ্ন করি, তবে কেন তাঁকে গ্রেট বলা হয় বলুন তো দেখি। এমনিতে তো তিনি ইসলাম ধর্মের বিকল্প হিসাবে দ্বীন-ইলাহী চালু করেছিলেন। যেটি মাত্র ১৭ জন ব্যক্তি সে সময় গ্রহণ করেছিলেন। সম্রাট আকবর মারা যাবার পরপরই ঐ ১৭ জন ব্যক্তি পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে এসেছিলেন। তারপরও কেন তাঁকে গ্রেট বলা হয় এটা আমি বুঝিনা। এটা কোন রাজনৈতিক কলা-কৌশল কিনা তাও আমার জানা নেই। খান সাহেব আমাকে বলেন, দেখুন মহান আল্লাহ জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলকেই সূর্যের আলো থেকে শুরু করে বৃষ্টি-বাদল, বাতাস ফসল কোন কিছু থেকেই তাঁর সৃষ্টিকূলকে বঞ্চিত করেন নি। অতএব, সম্রাট আকবরের কথা হল, আমি কেন মানুষের মধ্যে ধর্ম নিয়ে এত ভেদাভেদ করতে যাব? আর এটাই বোধ করি তাঁকে এই শ্রেষ্ঠত্বের শিখরে বসিয়েছে। যদিও সুলতানে হিন্দ হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) থেকে শুরু করে বহু ওলি দরবেশের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধা।

ফতেহপুর সিক্রির বিশাল মূল কোর্ট ইয়ার্ডের বা প্রাঙ্গনের পশ্চিমে প্রকান্ড মসজিদ, উত্তরের শেষ সীমায় অবস্থিত সাদা মর্মর পাথরের জালিসহ নির্মিত হযরত শাহ্ সেলিম চিশতীর (রহঃ) মাযার শরীফ। সম্ভবত পশ্চিমে অবস্থিত বিশাল আকৃতির বুলন্দ দরওয়াজা। যা ভূমি থেকে প্রায় ১৭৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট প্রধান গেট। ইতোপূর্বে আমি এত উচ্চতা বিশিষ্ট গেট আর কোথাও বোধকরি দেখিনি। দরবার হলও অতি

www.pathagar.com

প্রকান্ড আকারের। প্রায় কয়েক একর স্থান নিয়ে সমস্ত প্রকল্পটি স্থাপত্য কৌশলের একটা তুলনাহীন অপূর্ব ইমারত। পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখতে আমাদের বেশ কয়েক ঘন্টা সময় লেগেছে। এর একটু দূরে মাঠের মধ্যে একটা বিশাল স্তম্ভ। সেটি সম্পর্কে খান সাহেব আমাদের জানালেন, এটিই সম্রাট আকবরের প্রিয় হাতীর কবর। যেটাতে তিনি অনেক যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। এটি মারা গেছিল এখান থেকে বহু দূরে। কিন্তু তবু সম্রাট তাঁর প্রিয় হাতীর মরদেহটি বহুকষ্টে এখানে এনে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তার কবর দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এবং স্তম্ভটি ঐ কবরের উপরেই তৈরী করা হয়েছে। স্তম্ভটির উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চতুর্দিকে প্রায় দুইফুট মত লম্বা লম্বা হাতলের মত বহু কাঠামো তৈরী করা হয়েছে।

বেলা প্রায় ১২টার পর আমরা ফতেহপুর সিক্রি থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্বে সেখানেই একটি চায়ের দোকান থেকে ইচ্ছা মত চা-নাস্তা ইত্যাদি সেরে নিই। এরপর যাত্রা, একেবারে আগ্রার বিখ্যাত তাজমহলের কাছাকাছি হোটেল তাজ খেমায় অবতরণ। সেখানে দুপুরের খাবার নিজ খরচায়। আমি খান সাহেবকে অনুরোধ করি দুপুরের নামাজ পড়তে চাই। অতএব, কোথায় নামাজ পড়তে পারি আমাকে স্থানটা দেখিয়ে দিন। তিনি বলেন এখানে ধারে কাছে কোন মসজিদ নেই। সুতরাং আপনি আগে খেয়ে নিন পরে এই হোটেলের পিছনে একটি ছোট পাহাড় আছে সেখানে নামাজ পড়তে পারেন। আমি খাবার সময় ঐ বিদেশী বন্ধু টেলর আমার পাশেই খেতে বসে। কিন্তু তার সে খাবার ভাল না লাগায় সে পরে পাউরুটি ইত্যাদি খেয়ে নেয়। আমি নামাজ পড়ে আসার পর গাড়ী ছেড়ে দেয় সারা পৃথিবীর অপূর্ব সৃষ্টি সৌন্দর্য্যের প্রতীক বিখ্যাত তাজমহলের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু তাজমহল যাওয়ার পূর্বেই আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় আগ্রা ফোর্টে। যেখানে সম্রাট শাহজাহানকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হয়েছিল। আগ্রা ফোর্ট ও বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত লাল পাথরের সুউচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত দূর্গ। এখান থেকে তাজমহল যদিও বেশ একটু দূরে, কিন্তু তবুও যে উঁচুস্থানে সম্রাট শাহজাহানের দিনের বেশীর ভাগ সময় অবস্থানের ব্যবস্থা ছিল সেটার উপরে একটা গম্বুজের আকৃতির ঠিক নীচেই তাঁর বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকায় তিনি শুয়ে থেকেও দূরের তাজ মহলের প্রতিচ্ছবি তাঁর দৃষ্টিসীমার মধ্যেই সর্বক্ষণ বিরাজ করত। কেননা গম্বুজের সিলিং-এ এবং অনেকগুলি পিলারের উপর অবস্থিত যে গম্বুজ তার প্রতিটির গায়ে বসান ছিল অসংখ্য হীরামুক্তা মানিক্যের বর্ণিল ঘনঘটা। যার উপর পড়ত তাজ মহলের অপরূপ রং-বেরং-এর প্রতিচ্ছবি সেটা দেখে বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহান মৃত্যুর

www.pathagar.com

প্রহর গুণতেন। আমরা অবশ্য সেই হীরামুক্তামানিক্যের কোন কিছুই অবশিষ্ট দেখতে পাইনি। যেহেতু জাট এবং বিদেশী অসভ্য বর্বর সৈন্যরা সেগুলি তুলে নিয়ে গেছে অমূল্য রত্ন হিসাবে লোভের বশবর্তী হয়ে। তবে সেগুলি যে তুলে নিয়ে গেছে কেবল সে চিহ্নগুলি দেখলেই বুঝা যায় কত বড় পাষন্ড না হলে এমন অপরূপ সৌন্দর্যের, বিনাশ সাধন করা সম্ভব। এটা দেখার পর আমাদের মর্মবেদনা বৃদ্ধিছাড়া আর কোন লাভ হয়নি। এখানেই আমি বেশ কিছু ভিউকার্ড কিনে নিই ফেরীওয়ালাদের নিকট থেকে যাতে সমস্ত দিল্লী, আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রির বহু সুন্দর ফটোগ্রাফ ছিল। যা মোঘল বাদশাহদের অপূর্ব স্থাপত্য কৌশলের নিদর্শন হিসেবে আজও টিকে আছে। বাস্তবিক পক্ষে, এগুলি দেখার বিষয়, যা বলে বা লিখে জানান কোন মতেই সম্ভব নয়।

এবার যাত্রা শুরু হল সারা বিশ্বের অপূর্ব সৃষ্টি সৌন্দর্যের বাস্তব নিদর্শন তাজমহলের দিকে। এখানে আমি আমার বিজ্ঞ পাঠক ও পাঠিকাদের জন্যে তাজমহল সৃষ্টির পটভূমি সম্পর্কে আমার ক্ষুদ্রজ্ঞানে যতটুকু স্মরণ আছে, সে সম্বন্ধে সামান্য জানাতে চাই। সম্রাট শাহজাহানের অনিন্দ সুন্দরী প্রিয়তমা পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগম মোট ১৪টি সন্তান প্রসব করেন। কিন্তু সর্বশেষ সন্তান আলম-আরা প্রসবের পর তাঁর স্বাস্থ্য হানীর কারণ ঘটে। এবং তিনি বুঝতে পারেন যে বোধকরি আর বেশী দিন বাঁচবেন না। তাঁর পতি সম্রাটের অকৃত্রিম ভালবাসা, প্রেম ও প্রীতির অসীম প্রকাশ তিনি টের পেয়েছিলেন। বোধ করি সে জন্যেই তিনি সম্রাটের সঙ্গে দাবা খেলতে খেলতে হঠাৎ প্রশ্ন করেন, আচ্ছা আমি মারা গেলে আপনি আমার জন্যে কী করবেন? সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট উত্তর দেন আমি তোমার জন্যে এমন এক অপূর্ব স্মৃতি সৌধ নির্মাণ করব, যা পৃথিবীতে আর কারো পক্ষে করা সম্ভব হবে না। আর বাস্তবিকই তা আজ পর্যন্ত কেউ কোন দেশে বহু চেষ্টা করেও তা করতে পারেন নি। আবার একদিন সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগম তাঁর এই প্রিয়তম স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি যদি আমাকে সত্যিই ভালবাসেন, তবে আমাকে কথাদিন যে আমার মৃত্যুর পর আর কোন বিয়ে করবেন না? সম্রাট একটু নীরব থেকেই বলে ফেলেন ঠিক আছে আমি আর কোন বিয়ে করব না। আশ্চর্য এই যে, সম্রাট শাহজাহান তাঁর এই দুটি প্রতিজ্ঞাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর সম্রাট শাহজাহান তাঁর প্রতিজ্ঞা পালনে সুদৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইরানের সুবিখ্যাত প্রকৌশলী মোহম্মদ ঈসা খাঁকে নিয়োগ করেন তাজমহলের নকশা অংকনে এবং সেটার বাস্তব আর্কিটেক্ট হিসেবে কাজ করেন বাদশা

www.pathagar.com

নিজেই। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর মনোমত পছন্দ না হয়েছে ততক্ষণ পর্যন্ত বাদশা নকশা পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ইত্যাদি করতে থাকেন। পরিশেষে নকশা চূড়ান্তভাবে পছন্দের পরই তার নির্মাণ সামগ্রীর প্রতি নজর পড়ে সম্রাটের। সেটি হচ্ছে শ্বেতশুভ্র মর্মর পাথরের প্রতি। তাই আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে, স্থান নির্বাচন করেন যাতে নদীর পানিতে তাজমহলের প্রতিচ্ছবি পড়তে পারে পূর্ণচন্দ্র ভরা জ্যোৎসনায়। এই সাদা মর্মর পাথর সংগ্রহ করতে হয়েছে ভারত থেকে নয়, মধ্য এশিয়া থেকে অর্থাৎ কাজাকিস্থান, তুর্কমেনিস্থান ইত্যাদি স্থান থেকে। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে হাজার হাজার টন পাথর প্রায় হাজার মাইল দূর থেকে স্থল পথে বহন করতে হয়েছে সে সময় যখন কোন চাকা বিশিষ্ট গাড়ীর ব্যবস্থাই ছিল না; অতএব এক হাজার হাতীর সাহায্যে এই সুকঠিন এবং সুবৃহৎ কাজ সম্রাট শাহজাহান করেছিলেন। সেটি সম্পূর্ণ করতে সময় লেগেছে সুদীর্ঘ বাইশ বছর এবং শ্রমিক কর্মচারীর মোট হিসেবে পাওয়া যায় বিশ হাজার। আর বিস্ময়কর ব্যাপার হলো যে তাজমহলের সৌন্দর্যের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে পশ্চিমে সুবৃহৎ মসজিদ ও পূর্বে প্রকান্ড মেহমান খানা। বাস্তবিকই, এই দু'টি প্রকল্প বা ইমারত তৈরী না করলে যেন তাজমহলের সত্যিকার সৌন্দর্যের হানী হত অনেক খানি। Only to balance the Beanty of the Tajmahal the two constructions were made very skillfully বলেই আমার বিশ্বাস।

এবার আমাদের টুরিস্ট বাসটি তাজমহলে প্রবেশের পূর্বেই যে বেশ কয়েকটি বিশাল গেট আছে, যেগুলি পার না হতে পারলে তাজমহল মোটেই দৃষ্টি পথে আসবে না। তখন সেই প্রধান গেট বা ফটকের সামনে এসে থামতেই আমরা সকলে নেমে গাইড খান সাহেবের নির্দেশ মোতাবেক এবং একই সঙ্গে তাঁর বর্ণনা মোতাবেক এগুচ্ছি। চতুর্দিকেই লাল পাথরের বিশাল প্রাচীর ও অট্টালিকা। যারা ইতিপূর্বে তাজ মহলের ছবি না দেখেছে বা প্রকৃত তাজমহল প্রত্যক্ষ না করেছে তাদের এমনটি মনে হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, এটাই বুঝি তাজমহল। অনেকটা কৌটার ভিতর কৌটা, তার ভিতর আর একটা কৌটা এমনি ভাবে যেমন অনেকগুলি কোটা খোলার পর আসল বস্তুটা দেখার অদম্য কৌতুহল বাড়তে থাকে; ঠিক তেমনি ভাবেই যেন প্রকৃত তাজমহলের অপূর্ব সৌন্দর্যকে আড়াল করার জন্যেই এমন স্থাপত্য কৌশলের সাহায্য নেওয়া হয়েছে বলে আমার নিজের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

বাস্তবিক পক্ষে, যেখান থেকে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম তাজমহলের দৃশ্য দেখা যায়, এমন একটি প্রকান্ড এবং অতি সুউচ্চ ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

স্থাপত্য কৌশলের সৃষ্টিসেরা তাজমহলকে দেখার পর বেশ কিছুক্ষণ আমাদের সকল দর্শনার্থীকে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় নির্বাক বিস্ময়ে। যদিও ঐ স্থান থেকে তাজমহলের প্রকৃত দূরত্ব ৯৯৯ ফুট। সম্মুখে দীর্ঘ পানির ফোয়ারা এবং তার দু'পাশে দৃষ্টি নন্দন ঝাউ গাছের সারি। এরপর আমরা ধীরে ধীরে তাজের পাদপীঠে গিয়ে হাজির হলাম এবং সকলে জুতা খুলে অন্ততঃ প্রায় ১০ ফুট উপরে উঠে তাজ মহলের প্রকৃত বিশাল চত্বরে উপস্থিত হলাম। অপূর্ব শ্বেতমর্মর পাথরের তৈরী সুবিশাল মসজিদ আকৃতির ন্যায় মাঝে প্রকান্ড গম্বুজ এবং এই গম্বুজকে ঘিরেই বেশ নিকটে চারপাশে সমদূরত্বে চারটি ছোট মিনার যা অতি সুউচ্চ গম্বুজের উচ্চতা থেকে নীচু অবস্থায় বিরাজ করছে। বিশাল চৌকোনা চত্বরের চারদিকে সমদূরত্বে রয়েছে চারটি উচ্চ মিনার যা সুউচ্চ গম্বুজকে উচ্চতায় ছাড়িয়ে যায়নি। তাজমহলের চারদিকই একই আকৃতির বলে প্রথম খিলান আকৃতির ফটকের উপর মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরান মজিদের সুরা ইয়াসীন পর্বের পুরোটাই বিসমিল্লাহ হির রাহমানির রাহীম সহ আরবী ক্যালিগ্রাফীতে কাল পাথরের অক্ষর, সাদা মার্বলের মধ্যে খোদাই করে বসানো আছে। কোমর সমান উচ্চতা থেকে শুরু করে বাম দিকে ঠিক একই উচ্চতায় তা শেষ করা হয়েছে। হাত বুলিয়ে এতই মসৃন মনে হয় যেন এটা কাল পেইন্ট দিয়ে লেখা হয়েছে মনে হয়। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে, নীচে থেকে অত উচ্চ খিলানের উপর দিয়ে লেখাগুলি সব সময় একই আকারের দেখা যায়। কোনটা ছোট বড় মনে হয়না। এই একই ভাবে চারদিকের চারটি সুরা ফটকের উপরই পবিত্র কোরান মজিদের চারটি বিভিন্ন সুদৃশ্য ক্যালিগ্রাফীর মাধ্যমে সন্নিবেশিত রয়েছে সৃষ্টির এমন অপূর্ব কৌশল আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের দুর্বল ভাষায় বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব।

যা হোক এরপর প্রকৃত কবর অনেক নীচে। ফলে আমাদের গাইড খান সাহেব ইংরেজিতে বললেন; While you going down to see the real grave, One should bow down his head, otherwise his forehead may be broken down. অর্থাৎ নীচে নামার সময় মাথা নীচু করে না প্রবেশ করলে তার কপালটি ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। নির্মান কৌশলটাই এভাবে করা হয়েছে। প্রথমেই মমতাজ বেগমের কবর এবং তার ঠিক ডান পাশেই একটু উঁচু আকৃতির কবরটি সম্রাট শাহজাহানের। সমস্ত কবর দুটির উপর আল্লাহ পাকের বহু নাম এবং পবিত্র কিছু আয়াত শরীফ যথাস্থানে রং বেরং এর পাথর খোদায় করে বসান আছে। উপরন্তু বিভিন্ন রং এর লতাপাতা ও ফুলের সমারোহ পুরো কক্ষটির সিলিং ও দেওয়ালের গায়ে অংকিত আছে। কিছু কিছু টাকা পয়সাও দর্শনার্থীরা যা দিয়েছেন তাও পড়ে

www.pathagar.com

আছে। এই কবর দুটির ঠিক উপরেই তৈরী করা হয়েছে আরও দুটি কবর ডামি হিসেবে। এবং সেখানও ঐ একই নির্মাণ কৌশলের সৌন্দর্য বিরাজমান। ভাষায় বুঝিয়ে বলা বা লেখা আমাদের মত দুর্বল লেখকের পক্ষে মোটেই সম্ভব নয় বলেই আমি আমার সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকাদের জন্যে বিশ্বকবি রবীন্দ্র ঠাকুরের বিখ্যাত শাহজাহান কবিতার সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরলাম।

হীরামুক্তা মানিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক
একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

আমি এক সময় খান সাহেবকে প্রশ্ন করি যে, একটা জনশ্রুতি আছে যে যারা তাজমহলের নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের নাকি হাত কেটে ফেলা হয়েছিল, এটা কি ঠিক? খান সাহেব উত্তরে বলেন, এটা একদম বাজে কথা। তাজ মহলের নির্মাণ কাজে যারা অংশ নিয়েছিল, তাদের সঙ্গে সম্রাটের চুক্তি ছিল যে, তারা জীবনে আর অন্য কোথাও কাজ করতে পারবে না। তাদের মজুরীও সেই ভাবেই দেওয়া হয়েছিল, যা তাদের চৌদ্দ গুষ্টি খেয়ে পরে বেঁচে ছিল।

মাত্র ঘন্টা দেড়েক আমরা সেখানে ছিলাম এবং আমি আসরের নামাজ পড়ার জন্যে গাইডকে বলে তাজমহলের পশ্চিমে অবস্থিত বিশাল মসজিদ চত্বর সংলগ্ন মসজিদের ভিতরে গিয়ে নামাজ আদায় করি একাই। কেননা, ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এখানে তেমন কোন জামাত হয়না। মসজিদের ভিতরে পশ্চিম দিকের দেওয়ালে লাগান রয়েছে বেশ বড় বড় আকারের শ্বেত মর্মর পাথর, যার উপর পড়েছে তাজমহলের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহান সেখানে বসেও তাজমহলই স্বচ্ছন্দে দেখতে পারতেন সব মুসল্লীদের সঙ্গেই। আসল কথা হল, তাজমহলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর সম্রাটের মস্তিষ্কে বোধ করি তাজমহল ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের প্রতি তাঁর কোন চিন্তা-চেতনা বা আকর্ষণ ছিলনা বলেই আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। সম্রাট তাঁর অতি আদরের এই প্রেয়সী মমতাজ মহলকে দেয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন যা বাস্তবিকই অনন্য, একক। তাজমহল নির্মাণের সম্পূর্ণ কাজ শেষ হওয়ার পর সম্রাট মাত্র এক বছর

www.pathagar.com

জীবিত ছিলেন। আমরা ঐ একটু সময়ের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম বহু বর্ণের বিদেশী পর্যটকদের আগমন ঘটেছে সেখানে : যেমন, সাদা, কালো, হলুদ, তামাটে ইত্যাদি বহু দেশের বহু বর্ণের মানুষের সমাহার।

আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পথে একটু দূরে দেখলাম একটি শপিং মল। সেখানে থেকে আমি আমার স্ত্রীর জন্যে প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ কিনলাম একটি ছোট্ট তাজমহলের মডেল। দোকানে প্রবেশ করতেই দেখি দিল্লীতে কিছুদিন পূর্বে যে এশিয়ান গেমস হয়েছিল তাতে দেশী বিদেশী দর্শকদের আকৃষ্ট করার জন্যে তৈরী করা হয়েছিল। ৪´x ৪´ একটি হুবহু তাজমহলের নকশা মডেল। যেটা তৈরী করতে বেশ কয়েক বছর সময় লেগেছিল একদল প্রকৌশলীর এবং সেই অনুপাতে খরচও হয়েছিল প্রচুর। এটা বিক্রির জন্যে নয় কেবল মাত্র দর্শকদের দৃষ্টি নন্দনের জন্যে রাখা হয়েছে। আমি দিল্লীতে যে বাসায় উঠব বলে ঠিক করেছিলাম সেই বাসার জন্যে কিছু খাদ্য সামগ্রীও কিনলাম পাশের দোকান থেকে।

একেবারে মাগরিবের নামাজের সময় এসে পৌঁছালাম আগ্রা ক্যান্ট স্টেশনে। আমি নামাজ আদায় করার পর দেখি আমাদের গাইড জনাব এম,এইচ খান সাহেব আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। তিনি আমাকে ট্রেনে উঠিয়ে দেওয়া পর্যন্ত অনেক গল্প করলেন। ওদিকে আমার বন্ধু টেলর সে কিন্তু গাইডের কোন বক্তব্য শুনেনি। বরং আমাক বলেছিল তুমি ভাল করে শোন, আমি তোমার কাছ থেকে জেনে নিব এবং তাই করেছিল। সমস্ত সময় সে কেবল অসংখ্য ছবি তুলে বেড়িয়েছে। সে আমারও বেশ কিছু ছবি তুলে ছিল এবং আমাকে বলেছিল তোমার ছবিগুলি আমি পাঠাব, তবে বেশ ক'মাস দেরী হবে। কেননা আমি ছ'মাসের ছুটিতে বিশ্ব ঘুরতে বেরিয়েছি এবং এই ছবিগুলি বিক্রি করেই আমার ভ্রমনের খরচ মিটাব। সে তার কথা ঠিকই রেখেছিল। বেশ কয়েকমাস পর হঠাৎ দেখি তার একটা মোটা খাম আমার নামে ঢাকায় পাঠায়। আমিও তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখি। সে তারও উত্তর দিয়েছিল এবং জানতে চেয়েছিল তার ভার্সিটির কি কি ম্যাগাজিন আমার দরকার ইত্যাদি। আমি তাকে উত্তর দিয়ে পুনরায় চিঠি দিয়েছিলাম কিন্তু সেটি আমার নামে ফেরত আসে। যেহেতু সে তখন ইউনির্ভার্সিটি ত্যাগ করে অন্যত্র কোথাও চলে গেছে বলে।

www.pathagar.com

উনবিংশ পর্ব

আমার ইচ্ছা ছিল যেন দিনের বেলায় দিল্লীতে উপস্থিত হতে পারি। যেহেতু এই প্রথমবার সেখানে যাচ্ছি বলেই নয় বরং দিল্লী বলেও কথা। অতএব, অতবড় শহরে ঠিকানা খুঁজে বের করে একটা সম্পূর্ণ নতুন এবং অপরিচিত ভদ্রলোকের বাসা বের করা আমার কাছে সহজ মনে হয়নি। তাছাড়া আজমীর শরীফে হাজির হতে গেলে সাধারণত নিয়ম হচ্ছে প্রথমেই হযরত আমীর খসরু (রহঃ) এর মাযার জিয়ারত করে তার সংলগ্ন হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) পবিত্র মাযার মোবারক জিয়ারত সম্পন্ন করা উচিৎ। এছাড়াও হযরত বখতিয়ার কাকীর (রহঃ) মাযার শরীফ জিয়ারত করাও উত্তম। আর এ জন্যেই আমি দিল্লী যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। পথে যেহেতু আগ্রা পড়ে তাই আবার দিল্লী থেকে যাতে আগ্রা না যেতে হয় সে জন্যেই আগ্রা ভ্রমনটা সেরে নিই। ভারতের সব বড় বড় শহরগুলিতেই একাধিক রেল স্টেশন রয়েছে। যেমন আগ্রা ফোর্ট এবং আগ্রা ক্যান্ট রেলস্টেশন। তেমনি দিল্লী নুতন রেল স্টেশন। আমার যাওয়ার ঠিকানা ছিল কালকাজী এক্সটেনশন এলাকা। এটা দিল্লীর দক্ষিণে নতুন ভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে নব নির্মিত সরকারী বাসভবনসমূহ। অতএব, আমি রাত প্রায় ১০টার দিকে নিজামুদ্দীন আউলিয়া রেল স্টেশনে অবতরণ করি। তখন জানুয়ারী মাসের শেষ দিক অতএব প্রচন্ড শীত ছিল। অতরাতে কোন বাসও সহজে পাচ্ছিলাম না। রাস্তার ধারে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটা বাস পেলাম বটে, তবে তারা বলল কালকাজী এটা যাবেনা। সর্বনাশ। তাহলে কী হবে? তারা আমাকে তবুও তুলে নিল এবং বলল, রাস্তা থেকে একটা বেবী ট্যাক্সি নিয়ে আপনি যেতে পারেন। ঠিক বেশ কিছুদূর গিয়েই বাস আমাকে নামিয়ে দিয়ে জানাল এখানে থেকে একটা বেবী আমি পেয়ে যেতে পারি। আমি একটু অপেক্ষা করতেই একটা বেবী ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। তাদেরকে ঠিকানাটা বলতেই তারা আমাকে নিয়ে মাত্র ৫ রূপীতে নিয়ে যেতে রাজি। আমি উঠে পড়লাম। চতুর্দিকে আলোর বেশ অভাব লক্ষ্য করলাম। তারা ঠিকমত খুঁজে খুঁজে প্রকৃত ঠিকানায় আমাকে পৌছে দিল। এবং মাত্র ১ রুপী বেশী চেয়ে নিল।

www.pathagar.com

বাসার মালিক জনাব এ,এ, শেখ আমি দরজায় বেল দিতেই তিনি খুলে দিলেন এবং আমি আমার পরিচয় দিয়েই তাঁকে চিঠিটা যেটা হাবিব আমাকে দিয়েছিল সেটা তাঁর হাতে দিয়ে পড়তে বলি, যদিও তিনি আমাকে ভিতরে যাওয়ার জন্যে বার বার অনুবোধ করছিলেন তবুও আমি তাঁর চিঠি পড়ার পরই ভিতরে প্রবেশ করি। যেহেতু তখন রাত প্রায় ১১টা এবং তাঁরা সবে মাত্র রাতের খাওয়া শেষ করে উঠেছেন। তাঁর স্ত্রী রওশন আরা বেগমকে দেখলাম প্রায় এডভান্সস্টেজ ও একটি মাত্র ছেলে প্রায় ৫/৭ বছরের হবে। আমার রাতের খাবার জন্যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রী বেশ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমি যতই বলি দয়া করে বেশী ব্যস্ত হবেন না, ক্ষুধার চেয়ে আমার এখন শীত লাগছে অনেক বেশী। দিল্লীতে এত শীত এটা তো ইতোপূর্বে আমার জানা ছিলনা। যা হোক ঐ রাতে রওশন আরা ডিম ভেজে আবার আমার খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ছোট ফ্ল্যাট দু'বেড় রুম এবং ড্রইং -ডাইনিং এক সঙ্গে। আমাকে চমৎকার ভাবে শেয়ার ব্যবস্থা করে তারপর তাঁরা ঘুমাতে গেলেন।

পরদিন সকালে উঠে আমি গোসল ইত্যাদি সেরে কালো গরম শিরওয়ানী, চুড়িদার পাজামা, কালো রামপুরী ক্যাপ এবং সু পরে সকালে নাস্তার পর বেরুলাম হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) মাযার শরীফ জিয়ারতের উদ্দেশ্যে। জনাব শেখ সাহেব আমাকে খালুজান সম্বোধন করায় আমি মুগ্ধ হই। এছাড়া তাঁরা আমার চেয়ে বয়সেও অনেক ছোট। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী উভয়েই আমাকে বার বার তাঁদেরকে তুমি সম্বোধন করতে অনুরোধ করা সত্ত্বেও আমি তা পারিনি। যা হোক শেখ সাহেব তাঁর ভেসপাতে করে আমাকে রাস্তায় কিছু দুর এগিয়ে দেন ও বাস ধরার নির্দেশনা দিয়ে দেন যাতে আমি সহজেই মাযার শরীফে পৌছাতে পারি।

রওজা মোবারক এলাকায় পৌছাতেই দেখি বহু দোকান পাঠ। বিরাট ঔষধের দোকান AZIM STORE লেখা মস্ত বড় সাইন বোর্ড। তাছাড়া আতর, গোলাপ পানি, আগরবাতি, ফুল, ইত্যাদির প্রচুর দোকান। আমি কিছু কিনে একটু এগুতেই দেখি আমার মতই পোষাক পরা খাদেম কুল আমার দিকে দ্রুত এগিয়ে আসেন। এবং আমাকে প্রথমেই হযরত আমীর খসরুর (রহঃ) মাযারে তাঁরা জিয়ারত করতে বলেন এবং তার একেবারে সংলগ্ন হযরত নিজামুদ্দীন আউলিয়ার (রহঃ) মাযার জিয়ারত করি। আমার ফুলচাচি সামান্য কিছু টাকা নজরানা স্বরূপ এখানের উদ্দেশ্যে দিয়েছিলেন। অতএব, আমার নিজের এবং তাঁর তরফের কিছু নজরানা আমি বড় লোহার সিন্দুকের মধ্যেই দিয়ে দিই। পার্শ্ববর্তী সংলগ্ন মসজিদ, সেখানে দু'রাকাত নামাজ আদায় করি। মসজিদের ভিতরে যে প্রকান্ড আকারের সাদা মার্বল পাথরের

www.pathagar.com

মিম্বর আছে, সেটি সম্ভবত সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। জুম্মার দিনেই বেশী মুসল্লীর সমাবেশ ঘটে অন্যান্য দিনের তুলনায়। মুয়াজ্জিন সাহেবেকে উর্দূতে কোন ওয়াক্তে কত মুসল্লী জমায়েত হন জিজ্ঞাসা করতে তিনি যেন আমার উপর একটু বিরক্ত হয়ে বলেন : "এতনা তো হাম্ গিন্ গিনকে নেহী রাখতে হেঁ, কে ফজর মে কিত্না, যোহর মে কিত্না" ইত্যাদি। অর্থাৎ আমার জিজ্ঞাসা করার উদ্দেশ্য ছিল মসজিদ তো অনেক সুন্দর, কিন্তু নামাজীদের পরিসংখ্যার একটা মোটামুটি হিসাব উদ্ধার করা। যা, হোক সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পূর্বে মাযার শরীফের খাদেম সাহেবা নরা আমার সম্মুখে বিরাট একটা রেজিষ্ট্রার খাতা খুলে ধরেন এবং তাতে বহু রকমের খাত বিশিষ্ট বিভিন্ন কলামে কত টাকা আমি দিতে চাই জানতে চান। আমি তাঁদের সবিনয়ে জানিয়ে দিই আমার পক্ষ থেকে যা দেওয়ার তা ঐ লোহার বাক্সেই দিয়েছি। অতএব এই রেজিষ্ট্রারে আমার নাম তোলার কোন প্রয়োজন নেই। ভারতের অধিকাংশ তরিকাপন্থীদের মাথা ভিত্তিক টাকা-পয়সা উঠানোর এমনকি তাদের নামে নামে পত্র প্রেরণ করে অর্থ উপার্জ্জনের এটা একটা মহাকৌশল মাত্র। অথচ একমাত্র কাদেরীয়া তরিকা ছাড়া ভারত এবং বাগদাদ শরীফের অন্য কোথাও এ ব্যবস্থা আমাদের চোখে পড়েনি। এমন কি জেরুজালেমেও আমরা যত নবী (আঃ) দের মাযার জিয়ারত করেছি সেখানেও কেউ অর্থ উপার্জনের জন্যে আমাদের পীড়াপিড়ী করেননি। তবে, স্বতপ্রণোদিত হয়ে কেউ কিছু দিলে সেটা স্বতন্ত্র ব্যাপার। এর পরদিন আমি বেরুলাম দিল্লী দর্শনের জন্যে টুরিস্ট বাসের উদ্দেশ্যে। যথাসময়ে প্রায় ১০টার মধ্যেই আমরা যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের বাসের টুরিস্ট গাইড মোটামুটি একটা ধারণা দিল যে আমরা কোথায় কোথায় যেতে পারি। লক্ষ্য করলাম প্রথমেই রাজঘাটে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল ইন্দিরা গান্ধীর চিতাভস্মের উপর নির্মাণাধীন বেদীর সম্মুখে। সেটা বহু ফুলেরমালা দিয়ে সজ্জিত। অনেকটা ইসলামী কায়দায় যেন অনুকরণ করা হয়েছে। এরপর জওহরলাল নেহরুর প্রতিকৃতির সম্মুখে। কাছাকাছি সঞ্জয় গান্ধীর বেদীর নিকট এবং সবশেষে বিরাট আকারের চতুর্দিকে প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গনের মধ্যে কালো পাথরের বেশ বড় চৌকোনা আকৃতির বেদীর একপ্রান্তে জলন্ত অগ্নিশিখা যেখানে সোনালী অক্ষরে হিন্দী ভাষায় লেখা আছে "হায়রাম"। এটিই হচ্ছে সর্বভারতীয় নেতা মহাত্মা গান্ধীর চিতা ভস্মের উপর নির্মাণ করা বেদী। জুতা পরে ভিতরে যাওয়ার নিয়ম না থাকায় আমি কলকাতা থেকে কেনা নতুন মোজা পায়ে দিয়েই বরফেরমত শীতল নুড়ি পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে ভিতরে প্রবেশ করি। কিছুক্ষণ পর বেরিয়ে এসে দেখি আমার মোজার পুরো তলাটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গিয়েছে। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল লাল কেল্লা। সেটার পশ্চিমে একটি টিলার উপর অবস্থিত সম্রাট শাহজাহান নির্মিত দিল্লীর বিখ্যাত জামে মসজিদ। মসজিদের পাশেই আর একটি ছোট মসজিদ রয়েছে। পূর্বদিকে

www.pathagar.com

রয়েছে নেতাজী সুভাস চন্দ্র বসুর নামে একটি পার্ক। পার্কের সম্মুখেই রয়েছে প্রধান বড় রাস্তা এবং রাস্তার সর্বপূর্বে রয়েছে রেডফোর্ট বা লালকেল্লা। কেল্লার ভিতর ঢুকতেই গেটের দুপাশে নানা রকমের মনোহারী জিনিষপত্র বিক্রি হচ্ছে। যা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক এবং বেশীর ভাগই রমনীদের ব্যবহার্য অলংকারাদী। আর ভিতরে প্রকান্ড এলাকা যেখানে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস রাজদরবার ইত্যাদি ইমারত রয়েছে। তখনকার দিনে এগুলি শীতল রাখার উদ্দেশ্যে ঠান্ডা পানি প্রবাহের ব্যবস্থাও ছিল। মোঘল বাদশাদের প্রকৌশলীয় চিন্তা চেতনা নিঃসন্দেহে প্রশংসাযোগ্য। ওদিকে রয়েছে মতি মসজিদ। দীর্ঘসময় আমরা ভিতরে কাটিয়ে বাইরে বেরিয়ে এক দোকানে দুপুরের খাবার খেয়ে নিই। এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল সংসদ ভবন এলাকা এবং নতুন দিল্লীর দিকে, যে দিকে বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের সব অবস্থান রয়েছে বেশ কাছাকাছি। যেমন, পাকিস্তান, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড ইত্যাদি পৃথিবীর বহুদেশের দুতাবাসগুলি এই চমৎকার পরিচ্ছন এলাকায় অবস্থিত। একসময় যেতে যেতে বাসের টুরিস্ট গাইড আমাদের একটি বাগানের ভিতর কিছুটা নালার মত লম্বা একটা স্থানের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল এই সেই স্থান যেখানে সঞ্জয় গান্ধী জেট প্লেন চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। খুব নীচে দিয়ে ট্রেনিং কোর্স পালন করতে গিয়েই তারমৃত্যু হয়। এরপর আমরা গেলাম বিড়লা মন্দির দেখতে সেটাও বেশ মজার দর্শনধারী ছিল। যেহেতু বিশাল একটা পার্কের মধ্যে তৈরী করা হয়েছে প্রকান্ড হাতি, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি নানা প্রকার জীবজন্তু যার ভিতরে ঢুকে থাকা যায় বা একদিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিকে বেরিয়ে আসা যায়। এরই সন্নিকটে তৈরী বিড়লার মন্দির, যেখানে মহাত্মা গান্ধী বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন বা শুনতেন। ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর হঠাৎ একদিন মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রার্থনা পর্বশেষে মন্দিরের ঠিক বাইরে আসার সময় হতভাগা পাপিষ্ঠ নাথুরাম গডসে তাঁকে সেখানে গুলি করে তাঁর মৃত্যু ঘটায়। সে স্থানটিও দেখলাম। আমার ইচ্ছা ছিল মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করে কিছু দেখার। কিন্তু আমার ইসলামী পোষাকের জন্যে তেমন সাহস পেলামনা। পরদিন আমি একাই বেরুলাম দিল্লীর জামে মসজিদে যোহরের নামাজ পড়ার জন্যে এবং পুরো মসজিদটা ঘুরে ফিরে দেখার জন্যে। নীচে মসজিদের টয়লেটগুলি সেদিন বন্ধ থাকার জন্যে আমি নিকটস্থ মসজিদের টয়লেট থেকে প্রস্রাবের কাজ সেরে এবং ঐ মসজিদ থেকেই উত্তমরূপে অজুসেরে জামে মসজিদে হাজির হই এবং এক ভদ্রলোক মুসল্লীকে ইতোপূর্বে জিজ্ঞাসা করে গিয়েছিলাম যোহরের নামাজ ক'টায়। তিনি আমাকে একটা সময় বলেছিলেন বটে কিন্তু আমি ঐ ছোট মসজিদ থেকে ফিরে আসার পরই আমাকে তিনি জানান আসল সময়টা। তাঁর নাম জনাব মুজাফ্ফর। তিনি এসেছিলেন হায়দরাবাদ (নিজাম) থেকে। আমার সঙ্গে কিছু খাতির জমার পর

www.pathagar.com

তিনি আমাকে হায়দরাবাদ গেলে দেখা করতে বলেন এবং আমি তাঁর ঠিকানা জানতে চাইলে বলেন, 'বাস আপ উঁহা যাকে বাজারমে মেরা নাম বাতাইয়েগা তো হর কোয়ি দেখা দেগা'। সঙ্গে তাঁর ফ্যামিলি ছিল। মক্কা শরীফের দিকে যাচ্ছিলেন সম্ভবত ওমরাহ পালনার্থে। প্লেনের গোলমালের কারণে জন্যে দিল্লীতে ২/১ দিনের জন্যে তাঁকে আটকে থাকতে হয়েছে।

শীতের সময়, কাজেই জামে মসজিদের বিশাল চত্বরে রৌদ্রের মধ্যে নামাজ আদায় করা হল। প্রায় এক লক্ষ লোক নামাজ পড়তে পারেন কেবলমাত্র মসজিদের চত্বরেই। এত দীর্ঘ যে এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত কোন লোককে চিনতে পারা যায় না। আমি নামাজ শেষে মসজিদের মূল ভবনে প্রবেশ করলাম, কিন্তু সেটা খুব বেশী প্রশস্ত নয়। মসজিদের ভিতরে দুই প্রান্তে দুটি ছোট সাইনবোর্ড রাখা আছে। যাতে উর্দূতে লেখা আছে: "ইয়ে মসজিদ হ্যায়, খোদা কা ঘর হ্যায়, এ নামাজ পড়নে কা জাগা হ্যায়। লেহাজা কোস শখস ইহাঁ সোনেকা এরাদা না কিযিয়েগা।" আমার দুটি সাইনবোর্ড পড়ার পর মনে হল, সম্ভবত তাবলীগ জামাতের কোন ব্যাক্তি বা দলের প্রতি লক্ষ্য করেই যেন এই নিষেধাজ্ঞা। এরপর আমি দক্ষিণ প্রান্তে সুউচ্চ মিনারের উপর ওঠে পুরো দিল্লীটা একনজরে দেখে নেওয়ার সুযোগ পেলাম। অবশ্য আমার মত আরও অনেক দেশী-বিদেশী পর্যটক মাত্র দুরূপীর বিনিময়ে কাসেমরাসহ উপরে উঠে ছবি তোলার সুযোগ পাচ্ছে। আমি অত উপরে বেশ কষ্ট করেই উঠেছিলাম। কেননা, টুরিস্ট গাইডের সঙ্গে গতকাল আমরা কুতুব মিনার পর্যন্ত গিয়েও সেখানে উঠতে পারিনি। যেহেতু ইতোপূর্বে বিদ্যুৎ বাতি চলে যাওয়ার ফলে অনেক লোক আতঙ্কে হুড়মুড় করে নামতে গিয়ে মারা যায় বলে, তখন সেটা বন্ধ রাখা হয় দীর্ঘদিন। এই কুতুব মিনার পর্যন্ত গিয়েও দেখি মেরামতের কাজ চলছে। এই কুতুব মিনার তৈরী করেছিলেন সুলতান কুতুবদ্দীন আইবেক। এরই নিকটস্থ বেশ কিছু মাযার লক্ষ্য করেছি। সম্ভবত এখানেই হযরত বখতিয়ার কাকীর (রহঃ) মাযার অবস্থিত। যিনি ছিলেন হযরত খাজা গরীব নওয়াজের (রহঃ) প্রথম শিষ্য।

ইতোমধ্যে দিল্লীর অনেক রাস্তা ঘাটের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে গেছে। সেখানে বাসে উঠার নিয়ম হল পিছনের গেটটা দিয়ে এবং বাস কন্ডাক্টর এখানেই এক সিটে বসে থেকেই সব যাত্রীদের নিকট থেকে ভাড়া আদায় করছে বা যাত্রীরা নিজেরাই ভাড়া মিটিয়ে খালি সিটে গিয়ে আসন দখল করছে। কিন্তু নামার সময় যাত্রীদের সামনের গেট দিয়ে বের হতে হবে। এটাই নিয়ম। সকলে বসতে না পারলে অনেক যাত্রীকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। এমন কি মেয়েদেরও। একটা জিনিষ দেখে আমার অত্যন্ত দুঃখ লাগল যে এক মুসলিম মহিলা তাঁর উঠতি বয়সের এক মেয়েকে নিয়ে সামনের গেট দিয়ে নামতে গিয়ে প্রচন্ড ভীড়ের চাপে তাঁর মেয়ে গায়ের উড়নাটা ছাড়াই তাঁদের নামতে হল এবং মহিলা কেবল মুখে বার বার তাওবা তাওবা উচ্চারণ

www.pathagar.com

করতে করতে দুঃখ প্রকাশ করে নেমে গেলেন। এটা আমার কাছে খুবই খারাপ লেগেছে। মাত্র দুরূপীতে অনেক দুর পর্যন্ত ভ্রমন করা যায় কিন্তু চার রূপীতে সারা দিনের জন্যে টিকিট পাওয়া যায়। দিল্লীতে লাল কেল্লার ভিতর সন্ধ্যার পর লাইট এন্ড সাউন্ড প্রোগ্রাম দেখানো হয় প্রতিদিনই ইংরেজি ও হিন্দীতে। কলকাতা থেকে আমার চাচাত ভাই চৌধুরী ফখরুল আলম আমাকে বলেছিল তুমি দিল্লীতে অবশ্যই 'লাইট এন্ড সাউন্ড' প্রোগ্রামটা দেখে আসবে। আমি সেইমত একদিন সন্ধ্যার একটু পূর্বে লাল কেল্লার ভিতরে প্রবেশ করে এক ফাঁকে মাগরিবের নামাজটা আদায় করে নেই। বাসা থেকে শেখ সাহেব ও তাঁর স্ত্রী রওশন আরা আমাকে সুট পরার পরও একটা চাদর তাঁরা দিয়েছিলেন এই বলে যে, মামা প্রচন্ড শীত, উপরন্ত খোলা আকাশের শিশিরের মধ্যে চেয়ারে বসে থাকতে হবে দীর্ঘক্ষণ। অতএব এই চাদরটা নিয়ে যান নতুবা কষ্ট পাবেন। "আমি তাঁদের কথামত চাদরটা ব্যবহার করেছিলাম। সত্যিই দেখার মত একটা প্রোগ্রাম বটে। বহুলোকের বসার ব্যবস্থা আছে। ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়ের গাছ লাগান আছে। সেখানে গোপনে মাইক্রোফোন লাগান আছে বলে মনে হয়। ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই প্রোগ্রামটা শুরু হল। প্রথমেই ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খানের গুরু গম্ভীর গলায় একটি শেরের মাধ্যমে ঃ-

"না থি হাল কে যব্ হামে দেখতে রহে আউরওঁ কী আয়েব ওহনর,
পড়ি জো নজর আপনি বুরাযুঁ পর তো নেগাহমে কোয়ীবুরাহ না রাহা
জাফর আদমীনা উসকো জানিয়েগা ওহ্হো কায়সাহী সাহেবে ফহম ও জাকা,
জিসে আয়েশ মে ইয়াদে খোদানা রাহী, জিসে তায়েশ মে খওফে খোদা না রাহা।"

আমার অবস্থা একদিন এমন ছিল যে কেবল অপরের দোষ ক্রটির প্রতি নজর পড়ত। অথচ যখন নিজের দোষ ক্রটির প্রতি দৃষ্টি পড়ত তখন মোটেই খারাপ লাগত না। অতএব, হে জাফর আপনি এমন ব্যক্তিকে মানুষ মনে করবেন না। বরং সে কী প্রকৃতির মানুষ? যখন সে আনন্দ, করে তখন যেমন খোদাকে স্মরণ রাখে না। আবার যখন বিপদে পড়ে তখনও সে এ ভয় করে না যে এটাও আল্লাহ্ প্রদত্ত শাস্তি। এটি আসলে মোঘল সম্রাটদের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ্ রচিত শের (কবিতা)। যিনি ছিলেন বাস্তবিক অর্থেই একজন কবি। ফলে সাম্রাজ্য চালান তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি বলেই বৃটিশ সরকার তাঁকে বন্দী করে বার্মাতে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বৃটিশ সরকারের নিকট মাত্র ৬ ফুট জায়গা প্রার্থনা করেছিলেন ভারতের মাটিতে যাতে তাঁকে কবরস্থ করা যায়। কিন্তু তাঁর এই শেষ সামান্য প্রার্থনাটুকুও নিকৃষ্ট বৃটিশ সরকার রাখেনি বরং তাঁকে বার্মার মাটিতেই কবর দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

"লাইট এন্ড সাউন্ড" প্রোগ্রামের সবটাই অপূর্ব সুন্দর। আফগানিস্তানের বাদশা নাদির শাহের হাজার হাজার সৈন্য যখন দিল্লীতে প্রবেশ করে, তাদের ঘোড়ার পায়ের শব্দসমূহ দূর থেকে অতি নিকটে আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়। ঘটনাটা তখন সম্পূর্ণ বাস্তব বলে মনে হয় শ্রোতাদের। দিল্লীতে নাদির শাহের সৈন্যদের মার মার কাট কাট পীড়ন চিত্র যেন শব্দের মাধ্যমে আমাদেরও মর্ম যাতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ওদিকে আলো-ছায়ার মাধ্যমে সম্রাটের দরবারের বিচার আচার যেন আমাদের সকলের সম্মুখে বাস্তবমুখী হয়ে ফুটে উঠে। যা ভাষায় বর্ণনা করা এভাবে মোটেই সম্ভব নয়। এগুলি বাস্তবিকই দেখার ও শুনার বিষয়, বর্ণনার নয়।

ইন্ডিয়া গেটের উপর হাজার হাজার সৈনের নাম লিপিবদ্ধ আছে যারা ছিলেন প্রকৃতই দেশ প্রেমিক। অনেকটা প্যারিসের বিজয় স্তম্ভের মত। ২৬ জানুয়ারী ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই সে দিন ছুটির দিন। কিন্তু আমার সেদিন ভোর বেলায় আজমীর শরীফের উদ্দেশ্যে যাত্রার কথা। পূর্ব থেকেই শেখ সাহেবকে দিয়ে আমি টিকিট কাটিয়ে রেখেছিলাম রিজার্ভেশন সহ। অতএব রাস্তায় আমাকে শেখ সাহেব কিছুদুর এগিয়ে দিয়ে বাসে তুলে দেন। কিন্তু পুরাতন দিল্লী রেলস্টেশন যেতে অন্য বাস আমাকে ধরতে হবে, কিন্তু আমি তা ঠিক জানি না কোন বাস। যা হোক একজন পুলিশ তার রাতের ডিউটি শেষে ফিরছিল। সে আমার কথায় আমাকে সাহায্য করার জন্যে অন্য একটি বাসে উঠে আমাকে নিয়ে চলল। বাস থেকে নেমে আমার মালপত্র আমাকে টানতে না দিয়ে সে নিজেই টেনে নিয়ে চলতে লাগল। আমি অবাক হয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করি। সে সঙ্গে সঙ্গে তার ছবিসহ আইডেনটিটি কার্ড বের করে আমাকে দেখায়। দেখি তার নাম ইমতিয়াজ খান, ২৪/২৫ বছর বয়স হবে। হালকা পাতলা কিন্তু বেশ সবল দেহের অধিকারী। সে তার ইউনিফর্ম পরেছিল এবং আমি পরে ছিলাম একটি সুট। হঠাৎ দেখি একটি বুড়ি ভিখারী মহিলা তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে হিন্দীতে বলে "বাবা হামকো কুচ খিলাও হাম রাত ভর কুছ খায়ে নেহী।" সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছেলেটি খুবই আগ্রহ করে আবার শুনতে চাইল এবং সে ঐ কথায় আবার বলল সামনে দশ্য হাত দুরেই একটি রুটি ওয়ালা বসে খাবার তৈরী করছিল। পুলিশটি তাকে বলে "এসকো খিলাও"। রুটি ওয়ালা কটি রুটি ও ভাজি দিল মহিলাকে। আমি দামটা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ায় ইমতিয়াজ বলল, "আপ কিউ দিয়া হ্যায়? আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, ম্যায় আপকি তরফ সে দে চুকা হুঁ"। এরপর ইমতিয়াজ সোজা পুরাতন দিল্লীর ১৯টি প্ল্যাট ফরমের মধ্যে যেটিতে আমার ট্রেনটা দাঁড়িয়ে ছিল, সেটিতে আমার মালপত্রসহ আমাকে সিটে বসিয়ে দিয়ে সে বিদায় নিল। আমি ট্রেনে বসে বসে ভাবতে লাগলাম ঐ বুড়ি ভিখারিণীর কথা। সে আমাকে কিছু না বলে, কোন সাহসে একটা পুলিশের নিকট খাবার চাইল? এটি আমাদের বাংলাদেশে একটি অসম্ভব ঘটনা বলে আমার মনে

www.pathagar.com

হল। আমাদের এখানকার পুলিশ মহাজনকে কখনই এত ভদ্র ও দয়ালু দেখেছি বলে মনে পড়েনা। এভাবে ভাবতে ভাবতে এবং পথের দুধারে ক্ষেত খামার ময়ূর, উট, গাধা, বানর ইত্যাদি দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখি একসময় অর্থাৎ সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে ট্রেন এসে থামল। আমার টিকিট যদিও ছিল আজমীর পর্যন্ত কিন্তু তবুও জয়পুর দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না। পত্রিকাতে প্রায়ই দেখতাম বিদেশীরা এসে ভারতের জয়পুর বেড়াতে যায়। এই কৌতুহল আমাকে পেয়ে বসল। এবং আমি জয়পুরে ব্রেক জার্নি করে ষ্ট্রেশনের উপরের তলায় একটি রুম ভাড়া নিলাম। ডরমাটরিতে থাকতে গেলে কম পয়সায় থাকা যায় বটে, তবে নামাজ পড়ার অসুবিধা বলেই আমি একটু বেশী খরচা করে সিংগল বেডরুম নিলাম এবং ঘরের ভিতরেই ওয়াশ হ্যান্ড বেসিন ছিল যেখানে অজুকরা যায়।

পরদিন ভোর বেলায় প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে ফজরের নামাজের পর একটু বেলা হলে চা-নাস্তা খেয়ে টুরিস্ট বুরোতে গিয়ে বাসের জন্যে টিকিট কাটতে গেলাম। সেখানে দেখি দু' রকমের টিকিট বিক্রি হচ্ছে। একটা হল সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত এবং আর একটি হল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আমি যেহেতু আজমীর শরীফ যাচ্ছি, অতএব গোসল ইত্যাদি সেরে দুপুরের নামাজ ও খাওয়া প্রভৃতির জন্যে এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই আমার ট্রেন ধরতে হবে। এইসব সাত পাঁচ ভেবে বেলা ১ টা পর্যন্ত টিকিট কাটলাম। যদিও তারা চাচ্ছিল যে আমি যেন সারাদিনের জন্যেই টিকিট কাটি। যা হোক টুরিস্ট বাসে আবার সেই দিল্লীর মত টুরিস্ট গাইডের সহচর্য্যে রাজস্থানের রাজধানী পিংক সিটি জয়পুর ঘরে ঘুরে দেখার সুযোগ পেলাম। রাস্তায় দুধারে সমস্ত বাড়ীঘর প্রাসাদ সবই পিংক কালার অর্থ্যাৎ গোলাপী রং এর। ভিতরে সম্ভবত অন্য রং এর ব্যবহার আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু যেহেতু বাইরের সমস্ত বিল্ডিং গুলি ঐ একই পিংক রঙ্গের বলেই বোধ করি শহরের নামই হয়েছে "পিংক সিটি অব জয়পুর"। মজার ব্যাপার হল যে, এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা জয়সিং এবং মানসিং, এরা শহরটি প্রথমে তৈরী করে রাস্তা ঘাট বাড়ী ইত্যাদি সব নির্মাণ কাজ শেষ করার পরই লোকদের দখলে ছেড়ে দেন। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে, পুরো শহরটা একটি কচ্ছপের পীঠের আকৃতির মত বলে, শহরের ঠিক মধ্যে একটা পাঁচতলা বাড়ীর ছাদের উপর এমনভাবে কিছু আয়না রক্ষিত আছে যে, নিজের ছবিসহ শহরের বিশাল একটা অংশের ছবিও তোলা যায় এবং ঐ বাড়ীর ছাদের রাস্তার ধারে হাওয়া মহল বিশেষ ভাবে প্রকৌশলীয় কায়দায় এটি তৈরী করা হয়েছে। সেখানে কোন ভিত্তি বা ফাউন্ডেশন ছাড়াই ৫/৬ তলা উচ্চতা বিশিষ্ট এই বিশাল ইমারত খাড়া আছে। কোনরূপ ঝড়-বাতাসে এটা পড়ে যাওয়া বা ধ্বংস হওয়ার কথা নয়। আমরা উপর তলা পর্যন্ত সবটা দেখারপর আমি একজন প্রকৌশলী হিসাবে যে রহস্যটা উদ্ধার করেছি, তা হল এই যে প্রথমতলা প্রশস্ত

www.pathagar.com

পিছনের দিকে যতখানি, দ্বিতীয় তলা তার চেয়ে কম প্রশস্ত। এমনিভাবে ক্রমশ প্রশস্ত কমাতে কমাতে একবোরে উপরেরটা কেবল একটা পাতলা ওয়াল তুলে দেওয়া হয়েছে। তবে সমস্ত বিল্ডিংটার উপর যথেষ্ট নকশা ও কারুকার্য করা আছে। যা দেখতে অত্যন্ত মনোরম। প্রচন্ড ঝড়-ঝাপটার ধাক্কা সামলাবার জন্যে কিন্তু পুরো প্রাসাদের উপরের দিকের কয়েকটি তলায় বহু মাঝাড়ী ধরণের গোলাকার ছিদ্র রাখা হয়েছে যাতে ঝড়-বাতাস সহজেই পার হয়ে যেতে পারে। আর এ জন্যেই এই প্রাসাদের নাম রাখা হয়েছে হাওয়া মহল। বড় রাস্তার পাশেই এটা অবস্থিত বলে বাইরে থেকে বেশী কিছু বুঝার উপায় নেই। প্রথম দর্শনেই অবাক হতে হবে যে এটা কীভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর আমাদের নিয়ে যাওয়া হল রাজা জয়সিংহের মূল রাজ প্রাসাদে। সেখানে বহু কিছু মুল্যবান রাজকীয় দ্রব্য সামগ্রী দেখে আমরা বাস্তবিকই বিস্মিত হয়েছি। সাধারণ ধনী লোকের এবং রাজা বাদশাদের রুচিবোধের যে কত পার্থক্য তা এগুলি দর্শন না করলে উপলব্ধি করার কোন উপায় নেই। বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ বিশাল মূলবান কার্পেটটি সুউচ্চ হল ঘরের সিলিং থেকে রোল করে ঝুলানো আছে এবং সর্ববৃহৎটি রয়েছে সম্ভবত ইংল্যান্ডের বাকিংহাম প্যালেসে। এরপর যে বিশাল আকারের একটা স্যান্ডোলাইট হল ঘরে ঝুলতে দেখলাম, সেটিও শুনলাম বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম। প্রথমটি রয়েছে নাকি প্যারিসের এলিসি প্রাসাদে। আমি ২০০২ সালের ১১ সেপ্টেম্বর এলিসি প্রাসাদে প্রবেশ করার বহু চেষ্টা করেও ঢুঁকতে পারিনি। কেননা গার্ডরা আমাকে জানাল একমাত্র ২২ সেপ্টেম্বর ছাড়া বছরের আর কোনদিন সাধারণ মানুষকে সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়না। এর কারণ তারা আমাকে জানাতে পারেনি। রাজা জয়সিং বিলাতে বেড়াতে গেলে সেখানকার জলে তিনি স্নান করতেন না বলে, বিশাল বিশাল আকৃতির জলাধারে গঙ্গাঁর পবিত্র জল(!) তাঁর সঙ্গে জাহাজে যেত। সেই পিপে বা জলাধারগুলিও একস্থানে বাইরে রক্ষিত আছে দেখলাম। এরপর দেখলাম যন্তর মন্তর। এটি একটি বিশাল আকৃতির গোলাকার গর্তের মধ্যে স্থাপিত সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে সময় নির্দ্ধারণপূর্বক কিছু যন্ত্রপাতি যা ঘড়ির বড় বড় আকৃতির কাঁটার সাথে সমন্বয় সাধন করা আছে। ঘুরে ঘুরে বিশাল রাজ প্রাসাদের অনেকগুলি দর্শনীয় বস্তু দেখার শেষে আমাদের যাত্রা শুরু হল পাহাড় ও পার্বত্য এলাকার দিকে, রাজা মানসিংহের তৈরী সুউচ্চ পাহাড়ের উপর রাজপ্রাসাদ এরপর আমরা সকলে পার্বত্য অঞ্চলের দিকে এগিয়ে গেলাম। সেখানে উপরে উঠার জন্য তিন প্রকারের ব্যবস্থা আছে। যেমন হাতীর পীঠে চেপে যাওয়া, জীপ গাড়ীতে যাওয়া অথবা পায়ে হেঁটে সম্ভবত ২৭২টি বিশাল প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা। আমরা কয়েকজন ঠিক করলাম পায়ে হেঁটেই উপরে উঠব, পার্শ্ববর্তী দৃশ্যগুলি অবলোকন করতে করতে যাওয়া যাবে। এক সময় উপরে ঠিকই উঠলাম বটে, তবে নীচে থেকে

www.pathagar.com

আমরা কেউ কিছুই বুঝতে পারিনি যে এত সুদৃশ্য বিশাল প্রাসাদ উপরে থাকতে পারে। প্রাসাদের নানারূপ রংবেরং এর কারুকার্য ও অপূর্ব নকশা দেখে আমরা সত্যিই অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। উপরন্ত পাইপের সাহায্যে পানির ব্যবস্থাও রয়েছে। সবচেয়ে দর্শনীয় ছিল রাজা-রানীর শীষমহল বা বেডরুম। মোটা গোলাকার এবং অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির। উপরে গম্বুজের মত ডোম। যার উপর অসংখ্য ছোট ছোট তারকার ন্যায় আয়না বসান রয়েছে। ঘরের ভিতর মাত্র ৪/৫ জনের বেশী লোক প্রবেশ করতে দেওয়া হয়না। একটি মাত্র দরজা। অতএব, আমরা দরজা বন্ধ করে ভিতরে থাকা অন্ধকার অবস্থায় সেখানকার একজন গাইড দু'হাতে দুটো জলন্ত মোমবাতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে সুমিষ্ট সুরে গাইতে শুরু করল সেই বিখ্যাত ইংরেজি শিশু সংগীত। যেমন।

Trwnkle, Twinkle, little Star,
How I Wonder what you are!
Up above the world so high
Like a diamond in the sky.

বাস্তঠিকই তখন উপরের দিকে তাকিয়ে আমরা সকলে হাজার হাজার তারার মেলা দেখতে শরু করলাম, ঠিক যেমন বাস্তব ক্ষেত্রে অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষের রাতে আমরা আকাশে লক্ষ লক্ষ তারাকে মিট মিট করা অবস্থায় দেখতে থাকি। প্রকৃতপক্ষে অবিশ্বাস করার উপায় নেই যে, রাজা-রানী রাতে শুয়ে থেকেও যেন খোলা আকাশের নীচে তারকামালার অপূর্ব সৌন্দর্য্য লীলা উপভোগের এমন কলা কৌশল নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। ১৯৯৫ সালে আমরা পারিবারিকভাবে কজন পবিত্র হজ্জ পর্ব আরাফার ময়দানে প্রচন্ড তাপদাহের পর সারাদিন শেষে যখন মুজদালিফার ময়দানে খোলা আকাশের নীচে মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে শেষ করার পর এবং রাতের খাবার পর আমরা লক্ষ লক্ষ হাজী সাহেবানদের সঙ্গে শীতল পরিবেশে কাঁকর বালির উপর সামান্য একটা চাদর বিছিয়ে অন্ধকারে আকাশের তারাগুলিও ঠিক এমনই দেখতে দেখতে এক সময় সামান্য ক্ষণের জন্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সমস্ত পাহাড়ের বিভিন্ন প্রাসাদগুলি দেখার পর আমরা দুপুরের দিকে জয়পুর রেল স্টেশনের নিকট ফিরে আসি। অবশ্য ইতোমধ্যেই আমরা কিছু জাদুঘরও দর্শন করেছি। আমি গরম পানির সাহায্যে বাথরুমে উত্তমরুপে গোলস ইত্যাদি সেরে দুপুরের খাবার একটা হোটেলে সমাপ্ত করি। পোস্ট অফিসে গিয়ে একটা পোস্ট কার্ডে আমার বড় ছেলে ফারুককে একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখে আমার অবস্থান জানাই। পরে আমার রুমে একটু বিশ্রাম করার পর আসরের নামাজান্তে ধীরে ধীরে রেল স্টেশনের দিকে আমার নির্দিষ্ট প্লাট ফরমে ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। ইতোমধ্যে মাগরিব নামাজের সময় হয়ে যাওয়ায়, আমি ওখানেই এক রেল কর্মচারীর

www.pathagar.com

সহায়তায় কিবলামুখী হয়ে যেই নামাজ শুরু করেছি অমনি দেখি আমার সম্মুখের দিকে পবিত্র আজমীর গমনের ট্রেন এগিয়ে আসছে। কিন্তু আমি নামাজের মধ্যে কোনরূপ তাড়াহুড়া না করে, সম্পূর্ণ নামাজ আদায় করি। কেননা, আমি জানি এই জয়পুর রাজধানী স্টেশনে গাড়ী বহুক্ষণ দাঁড়াবে। ঠিক তাই হল, আমি গাড়ীর সম্মুখে আসতেই আমার নির্ধারিত বগিতে দেখি আমাদের নামের লিস্ট লাগান রয়েছে। বিসমিল্লাহ্ বলে উঠে পড়লাম, হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারতের উদ্দেশ্যে।

প্রায় রাত ১০টা দিকের আজমীর শরীফে উপস্থিত হতেই দেখি বেশ কজন মোয়াল্লেম আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। টুপী শিরওয়ানী পরিহিত একজন চমৎকার মোয়াল্লেম আমার দিকে এগিয়ে এসেই বললেন, চলিয়ে, দরগা শরীফ যায়েগা তো? আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়া দিতেই তিনি বললেন, একটা বেবী ট্যাক্সী হলেই ভাল যদিও বেশী দূর নয়। এমনকি হেঁটেও যাওয়া যায়। অতএব, বেবী ট্যাক্সী করেই দরগা শরীফের নিকটস্থ স্থানে নেমে পড়লাম। ভাড়া নিল আমার নিকট থেকে। মোয়াল্লেম সাহেবের নাম এই মুহূর্তে আর আমার স্মরণ নেই বলে দুঃখীত। আমি প্রথমেই বাংলাদেশীদের জন্যে যে বিশ্রামাগার বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জেনারেল হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ ঠিক করে এসেছিলেন, সেখানেই আমি উঠতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার নিকট পাসপোর্ট না থাকায় তাঁরা বা সেখানকার কর্তৃপক্ষ আমাকে উঠতে সাহায্য করলেন না। যদিও আমি আমার কলেজ অধ্যক্ষের চিঠি তাদের দেখাই, তাতেও কোন কাজ হয় না। অবশ্য সেখানে থাকতে পারলে হয়ত বিনামূলে থাকা যেত। যা হোক মোয়াল্লেম সাহেব আমাকে একটি ভাড়া বাসা দেখালেন আমার পছন্দ না হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে 'ক্যাপটেন্স হাউসে নিয়ে যান যেটি একদম দরগা শরীফের নিকট এবং দরজা খুলে বেলকনিতে দাঁড়ালেই সুলতানুল হিন্দ হযরত খাজা গরীব নওয়াজ (রহঃ) মাযার শরীফ পুরোপুরি দেখা যায়। তখন ছিল প্রচন্ড শীত ও সেদিন ছিল বুধবার। আমি মোয়াল্লেমকে অনুরোধ করি যেন ফজরের নামাজের পূর্বেই তিনি আমাকে বাদশা শাহজাহানের নির্মিত জামে মসজিদে নিয়ে যান। কিন্তু পরদিন ভোর বেলায় তাঁর আসতে সামান্য বিলম্ব হওয়ায় আমরা দু'জনেই ঐ মসজিদে জামাতের সঙ্গে নামাজ পেলাম না, আমার মনটা খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু মোয়াল্লেম সাহেব সঙ্গে সঙ্গেই ঐ মসজিদেরই সংলগ্ন বাদশা আকবর মসজিদে নিয়ে গেলে আমরা জামাতের সঙ্গে ফজরের নামাজ আদায় করার সুযোগ পাই। আল হামদোলিল্লাহ। প্রচন্ড শীতের কারণে সব মসজিদগুলিই মোটা ত্রিপল দিয়ে উপর থেকে নীচে পর্যন্ত ঢাকা রয়েছে যাতে মসজিদের ভিতর কোন রূপ শীতল বাতাস প্রবেশ করতে না পারে। এটা আমি জীবনে প্রথম দেখলাম। আরও একটি মসজিদ রয়েছে রওজা মোবারকের ঠিক

www.pathagar.com

পূর্বে। এটি নির্মাণ করেছিলেন বাদশা আউরঙ্গজেব মোঘল বাদশাদের মধ্যে এই তিন প্রধান সম্রাটই রওজা পাককে ঘিরে এত কাছাকাছি তিনটি মসজিদ নির্মান করেছিলেন, যা পৃথিবীতে আর কোথাও এত কাছাকাছি মসজিদের অবস্থান আছে কিনা আমি জানিনা। অর্থাৎ বুঝা গেল, প্রত্যেক সম্রাটই এই মহান সুফী সাধকের কৃপাভাজনের প্রতি তাঁদের প্রবল আকর্ষণ ছিল শ্রদ্ধাবনত। এরপর আমি রওজা মোবারকে হাজির হয়ে যিয়ারত করতে গিয়ে খাজা বাবা রচিত একটি অত্যন্ত চমৎকার ফারসী কবিতা যা আমার স্মরণ ছিল সেটি নিবেদন করি। যেমন ঃ-

"বা খোদা গায়রে খোদা, দরদে জাঁহা নিস্ত কসে,
সদ্ দলীল আস্ত ওয়ালে, ওয়াক্‌ফে আঁজা নিস্ত কসে।
ইঁহামা জমজমা কজ, সিনায়ে খোদ মি সানুভী,
তু চা গোয়ী, কে দরী খানা নাহা নিস্ত কসে।
দাস্তানে গুলে-স্তর হীচ তসল্লীনা দেহদ,
আয় হায়াতে দিল ওমন্ গায়রে, খোদা নিস্ত কসে।
জররা জররা দরীইঁ আফাক গাওয়াহী মি দেহদ,
বা খোদা গায়রে খোদা রুহ্ ও রওয়াঁ নিস্ত কসে।

অর্থাৎ হযরত খাজা গরীব নওয়াজ এই কবিতায় যা বলতে চেয়েছেন তা হল মহান আল্লাহপাকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, প্রথমেই তিনি বলেন, আল্লাহর কসম, এই বিশ্বব্রহ্মান্ডে যাকিছু সৃষ্টি তার একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক মহান আল্লাহপাক ব্যতীত আর কেউ নয়। আর এই কথার উপর শত কোটি দলীল মওজুদ আছে, কিন্তু লোকে তা খুব কমই জানে। তোমার বুকের ভিতর যে হৃদপিন্ডের ধড়াক ধড়াক শব্দ শুনতে পাও তা কিন্তু ঐ কথারই সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। তবে তুমি কেন বল যে, কৈ আমি কিছু বুঝতে পারছিনা। গোলাপ ফুল যদি কেউ কখনও না দেখে থাকে, তবে তাকে তার বর্ণনা যত সুন্দরভাবেই দেওয়া হোক না কেন, সে যেমন তা বুঝতে পারবেনা, তেমনি আমাদের আয়ু মন প্রান কোনটাই মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না। পৃথিবীতে প্রতিটি অনুপরমানু তাঁর উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করছে এবং আল্লাহর কসম, আমার এই আত্মারও একমাত্র প্রভু ঐ মহান আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ নয়।

রওজা মোবারকের ভিতর প্রচুর লোকের ভীড়ে পুরুষ মহিলা একত্রে জিয়ারত পর্ব এবং আমার মাথার উপর আমার মোয়াল্লেম সাহেব বিশাল গিলাফ পাকের কিছু অংশ স্থাপন করেন যা তখনই চাপান হচ্ছিল রওজা পাকের উপর। আমি কিছুক্ষণ কান্নায় অভিভূত হয়ে পড়ি। আমি সেখান থেকে বেরিয়ে আসতেই আমার মোয়াল্লেম সাহেব তাঁদের প্রধান কর্মকর্তার নিকট আমাকে হাজির করেন, সেখানে তাঁরা জানতে

www.pathagar.com

চান আমি কোন খাতে কত দিব ইত্যাদি। আমি তাঁদের হাতে ১০০ রুপীর একটা নোট ধরিয়ে দিয়ে বলি এর থেকে সামান্য কিছু রেখে দিল্লি ফিরে যাওয়ার টিকিটটা আমাকে দয়া করে দিবেন। তাঁরা আমার পোষাক পরিচ্ছদ দেখে হয়ত আরও কিছু বেশী আশা করেছিলেন। কিন্তু জয়পুর ঘুরে দেখতে গিয়ে আমি অনেকটা খরচা করে ফেলি। যা হোক এরপর আমি হোটেলে প্রাতঃরাস সেরে প্রায় ৯টার দিকে পাহাড়ের দিকে রওনা দিই। পথে কিছু খুচরা পয়সা বাটা দিয়ে নিয়ে নিই। এঁকে বেঁকে উঠে গেছে বিশাল পাহাড়ের দীর্ঘপথ। কিন্তু আশ্চর্য হলাম অসংখ্য ভিখারীর সুশৃঙ্খলভাবে সেই প্রচন্ড শীতের মধ্যে লাইন বেঁধে কম্বল জড়িয়ে সম্মুখে একটি থালা বা পাত্র নিয়ে বসে রয়েছে নীরবে। কেউ কাউকে বিরক্ত করছেনা। তাদের সংখ্যা দেখলে মনে হবে বোধ করি সারা ভারতের ভিখারী যেন এখানে একত্র হয়েছে। আমাদের মত দর্শনার্থীরা যে যা পারছে পাঁচ পয়সা দশ পয়সা করে দিয়ে যাচ্ছে। ভিখারীদের পক্ষ থেকে তেমন কোন বিড়ম্বনা কর যাঞ্জা লক্ষ্য করিনি যেটা আমাকে বেশ ভাল লেগেছে। অথচ আমাদের এই বাংলাদেশে ভিখারীদের নানা প্রকার বিরক্তিকর কার্যকলাপ আমাদের পথে চলার সুযোগটুকু পর্যন্ত দিতে চায় না। আরও মজার ব্যাপার হল যে, এদের মধ্যে কে সত্যিকারের ভিখারী এবং কে নকল ভিখারী তাও চেনার কোন উপায় নেই। এখানে রাস্তায় রাস্তায় গাড়ী থামিয়ে যে ভিক্ষা তারা সংগ্রহ করে, তারও কিছু অংশ ট্র্যাফিক পুলিশ এমনকি বাসের কন্ডাক্টারকেও আমি নিতে দেখেছি। আরও বিস্ময়কর ব্যাপার হল যে এই সমস্ত তথাকথিত ভিখারীদের নাকি অনেকেরই ব্যাংক একাউন্টে অনেক টাকা আছে শোনা যায়। অথচ গোটা ভারতে বর্তমানে প্রায় ১২০ কোটি লোকের মাঝে আনুপাতিক হারে ভিখারীর সংখ্যা অনেক কম এবং তারা বেশ ভদ্র।

যা হোক সমস্ত পাহাড়ের উপর যতগুলি মাযার ও মসজিদ ছিল প্রায় সবগুলিই জিয়ারত ও দর্শন শেষে অন্য পথ ধরে যখন নীচে নেমে এলাম তখন প্রায় বেলা ১টা। যোহরের নামাজ অন্তে একটা নিকটবর্তী হোটেলে দুপুরের খাবার শেষে যখন ওয়াশ বেসিনে আমি হাত পরিস্কার করছি, তখন হঠাৎ একসঙ্গে প্রায় এক ডজন মহিলা হোটেলে প্রবেশ করে বসে পড়েছেন। তাঁদের প্রতি একঝলক দৃষ্টিপাত করে বুঝলাম সম্ভবত এঁরা সকলেই কাশ্মীরি। কেননা, তাঁদের প্রত্যেকের টানা চোখ, গৌরবর্ণ ও খাড়া নাক দেখে আমার এমনই অনুমান হয়েছিল তবুও কৌতুহলবশত আমি উর্দূতে তাঁদের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করি, "আপ সব মাহতরমা কাঁহা সে তশ্‌রিফ কা টুকরা উঠাকে লায়ে হেঁয়?" সকলের মধ্য থেকে মাত্র একজন উত্তর দিলেন 'কাশ্মীর'। তাঁদের হালকা পাতলা দেহ এবং উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সেটাই প্রমাণ করে। অবশ্য পরে আমি ২০০১ সালে জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগর বেড়াতে গিয়েও ঠিক এমনটিই দেখেছি। আসরের নামাজ পড়ার পর সমস্ত দরগা শরীফের দর্শনীয় বস্তু

www.pathagar.com

যেমন বিশাল আকৃতির দু'টি ডেগ যাতে রান্না করা হয়। একটি ১২০ মন এবং অন্যটিতে ৬০ মন খানা পাকান হয়। মোঘল বাদশাহগন এগুলি নজর করে নিজেদেরকে ধন্য করেছিলেন, যাতে হযরত খাজা গরীব নওয়াজের (রহঃ) দোয়া ও শুভদৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। হায়দরাবাদের নিজাম বাহাদুরের পক্ষ থেকে নির্মাণ করা হয়েছে প্রকান্ড সুউচ্চ ফটক বা গেট, যা রীতিমত একটা দর্শনীয় বস্তু। এগুলি দর্শনের পর আমি চলে যাই আজমীরের একটি গার্লর্স কলেজে। সেখানে আমার ভাগ্নী রুহীর ছোট ননদ কুহু লেখাপড়া করত তার সঙ্গে দেখা করতে। ওখানে দারওয়ানের হাতে আমি আমার একটি পরিচিতি পত্র দিয়ে আসি। অধ্যক্ষার অনুমতি ব্যতীত সেখানে বাইরের কোন পুরুষের সাক্ষাতের নিয়ম নেই। কিন্তু অধ্যক্ষা মহিলা একটু পূর্বেই বাইরে বেরিয়ে ছিলেন। সেজন্যে আমি নিকটবর্তী একটা মসজিদ থেকে মাগরিবের নামাজ আদায় করে পুনরায় সেখানে গিয়ে দেখি আমাকে একটি ড্রইং রুমে বসতে দেওয়া হয় ও কিছুক্ষণের মধ্যেই কুহু তার এক সহপাঠিনীকে সঙ্গে নিয়ে এসে আমাদের পরিচয় পর্ব ইত্যাদি শেষ করার পর বেশ কিছুক্ষণ গল্প গুজব করি। আমি উঠে আসার একটু পূর্বেই অধ্যক্ষা মহিলা আমাকে রাতের খাবার খেয়ে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে পাঠিয়েছেন। শুনলাম বাংলাদেশী কোন মহিলা ছিলেন ঐ অধ্যক্ষা, যদিও তিনি আমার সম্মুখে আসেন নি। হোস্টেল বিল্ডিং দেখে আমি অবাক হয়েছি সে এমন পরদা পুশিদার মধ্যে ভারতে কোন ছাত্রীনিবাস থাকতে পারে তা আমার কল্পনার অতীত ছিল। যা হোক রাতের খাবারের পর কুহুর বান্ধবী আমার জন্য অত্যন্ত চমৎকার এককাপ কফি বানিয়ে আনে যার স্বাদ আমার আজও মনে আছে। আমি জয়পুর ঘুরলাম অথচ তার দেশ লেকসিটি উদয়পুর ঘুরলাম না বলে সে অনেক আক্ষেপ করল। বর্তমানে আমার এক নাতি অর্থাৎ রুহীর বড় ছেলে ফাবহান সেখনে (উদয়পুরে) ফিজিও থেরাপি কোর্স পাঠ করছে। পরিশেষে কুহুর সঙ্গে এই কথা হল যে, আগামীকাল শুক্রবার আমি সকালের দিকে এসে তার বড় বোন মুন্নিকে দেখতে যাব যে আজমীর থেকে বেশ একটু দূরে বি,এড, কোর্সে পড়াশুনা করছে।

পরের দিন শুক্রবার ফজরের নামাজ পড়ার পর মাযার জিযারত ইত্যাদি সেরে আমি এক ফুল ওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে প্রতিদিন কত ফুল ব্যবহার করা হয়? সে আমাকে জানাল প্রায় ৪০/৫০ মন গোলাপ ফুল প্রয়োজন পড়ে। আমি আবার জানতে চাইলাম এইসব ফুল কোথা থেকে আনা হয়? সে উত্তর দিল পুশকার থেকে। অতএব, আমি ঠিক করলাম এই বিশাল গোলাপ ফুলের বাগান অবশ্যই আমার একবার দেখা দরকার। সকালে চা-নাস্তা খাওয়ার পর আমি কুহুর কাছে যেতেই দেখি সে প্রস্তুত। আমরা দুজনেই একটি বাসে করে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর পৌছালাম মুন্নির কলেজে। আমি তো কলেজের পুরো এলাকা দেখে অবাক। আমাদের চট্টগ্রামের নাসিরাবাদে যে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে, হুবহু তার

www.pathagar.com

সঙ্গে মিল রয়েছে। ফুলের বাগান, একদিকে কলেজ ভবন অন্যদিকে ছাত্রাবাস, ক্যাফেটরিয়া ইত্যাদি। সেখানে মুন্নির আর এক মুসলিম বান্ধবী (যার নাম এখন মনে নেই) সে বেনারস থেকে পড়তে এসেছে এখানে। এই মাত্র দুটি মুসলিম মেয়ে এখানে তাদের বি,এড, কোর্সে পড়াশুনা করছে। তাদের অনেক পুরুষ বন্ধু বা সহপাঠীদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। কলেজ ভবনটা ঘুরে ঘুরে দেখাল এবং শেষে আমাকে তাদের ক্যাফেটরিয়াতে নিয়ে গিয়ে নাস্তা খাওয়াল। আমি বিলটা পরিশোধ করার জন্যে টাকা দিয়েছিলাম ওয়েটারকে। কিন্তু মুন্নি আমাকে কোন মতেই বিল পরিশোধ করতে দিলনা বরং টাকাটা পুনরায় ফেরত নিতে আমাকে বাধ্য করল। ওখান থেকে আর কিছুদূরে বাসে করে যেতে পারলেই আমি পুশকারের বিখ্যাত গোলাপ ফুলের বাগান দেখার সুযোগ পেতাম। কিন্তু যেহেতু সেদিন ছিল শুক্রবার এবং আমি জুম্মার নামাজ পড়ব বড় জামে মসজিদে (শাহজাহান মসজিদে) সুতরাং বেশী বিলম্ব না করে আমি আর কুহু আজমীরে ফিরে আসি। পোশাক বদলিয়ে মসজিদে গিয়ে দেখি প্রচুর মুসল্লি। খুব ভাল লাগল নামাজ পড়ে। কিন্তু সমস্ত নামাজ শেষে দেখি, একজন ভদ্রলোক মাঝবয়সী চমৎকার গলায় কাসিদা উর্দূ ভাষায় গেয়ে শুনালেন এবং মুসল্লীরা তাঁকে অনেকেই প্রচুর টাকা পয়সা দিলেন মাঝে মাঝে। আমার মনে হচ্ছিল যে এ সুযোগটাতো আমিও নিতে পারতাম। কেননা, ঐ একই ভাবে গজল গাওয়া আমার বহু পুরানো অভ্যাস। এরকমের কোন প্রোগ্রামের কথা আমার পূর্ব থেকে জানা থাকলে হয়ত আমি নিশ্চয়ই অংশগ্রহন করতাম। মুসল্লী ভাইরা সকলেই খুবই খুশী হয়েছেন বুঝা গেল। এরপর দুপুরের খাবারের জন্যে আমি নির্দিষ্ট যে হোটেলে খেতাম, সেখানে খাওয়া শেষ করলাম। সমস্ত ভারতের অন্য কোন স্থানে এতসস্তায় সুস্বাদু খাবার খুবই বিরল। আসরের নামাজ পড়ার পর যে ইমাম সাহেব ঐ মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়িয়ে ছিলেন, তাঁকে আমি একা পেয়ে আরজ করি যে, দেখুন আমি একটু বিপদে পড়েছি। আমার নিকট টাকা পয়সা প্রায় শেষ। এখন ঘরভাড়া দেওয়ার মত পয়সাও আমার কাছে নেই। মেহেরবানী করে একটি খাস দোয়া করুন। তিনি আমার কথা শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন ঃ "ইয়ে কোয়ী বাত নেহী, এয়সা হর ওয়াক্ত ইহাঁ হোতাই হ্যায়"। বলেই ঐ জায়নামাজে বসেই আমার জন্যে দোয়া করতে লাগলেন দু'হাত তুলে আর আমি আমীন আমীন বলতে লাগলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, আমি আমার মোয়াল্লেমকে কী বলব তাই ভাবতে ভাবতে মসজিদ প্রাঙ্গনে ঘুরাঘুরি করছিলাম। এমন সময় হঠাৎ দেখিযে তিনি আমাকে খুঁজছেন। আমি এগিয়ে এসে তাঁকে টাকার কথা বলতেই তিনি আমাকে বরং বলেন যে, "কোয়ী রূপেয়া কা জরুরত নেহী, বালকে আপ হামারা ইয়ে কুছ কার্ড রাখ দিজিয়ে। আগর কোয়ী ইহাঁ আনে চাহেতো উনকো দিজিয়েগা।" আমি অবাক হয়ে গেলাম যে মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যেই মামলা ডিসমিস ঐ ইমাম সাহেব

www.pathagar.com

ছিলেন সুরাটের অধিবাসী। অত্যন্ত সুদর্শন ব্যক্তি। গতরাতে অর্থাৎ জুম্মার রাতে এশার নামাজ বাদ শুরু হয়েছিল কাউয়ালীর আসর। দীর্ঘক্ষণ বসে থেকে আমি যা লক্ষ্য করেছি তা হচ্ছে কিছু টাকা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার বিতরণ কাউয়ালদের মধ্যে। অর্থাৎ এটা দেখে যাতে দর্শক ও শ্রোতাদের মধ্যে টাকা প্রদানের আগ্রহ বাড়ান যায়। শুক্রবার বাদ মাগরিব তিনটি জানাজার নামাজ আদায় করা হয়। সেগুলি ছিল কাশমীরি ভক্তদের। রাস্তা পারাপারের সময় হঠাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এই তিন জনের। এদের মধ্যে একটি শিশু ছিল। খাজা বাবার ভক্তদের মধ্যে কাশমীরিদের প্রাধান্য অনেক বেশীই মনে হল। যা হোক আমরা রাতের খাবার শেষে পায়ে হেঁটেই রেল স্টেশনের দিকেই যাচ্ছিলাম। এমনসময় সালোওয়ার কামিজ পরিহিত একজন সুর্দশন ব্যক্তি আমার সঙ্গে পরিচিত হতেই জানতে পারলাম তিনি একজন কাশ্মীরি এডভোকেট। আমি কৌতুহলবশতঃ তার কাছে কথায় কথায় জানতে চেয়েছিলাম কোন দিকে তাঁরা যোগদান করতে চান? ভারত না পাকিস্তান ভদ্রলোকের ঝটপট্ উত্তর Definitly in Pakistan.

পরের দিন সকালে দিল্লী পৌঁছে শেখ সাহেবের বাসায় গিয়ে দেখি তিনি আমার কলকাতার টিকিট কিনে রেখেছিলেন। যেহেতু আমি তাঁকে পূর্বেই টাকাটা দিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু রিজার্ভেশন করা ছিলনা টাকার অভাবে। যা হোক মাতাজান রওশন আরা সে জোর করে ৫০ রূপী আমাকে নিতে বাধ্য করল এবং বলল, কলকাতায় আমার মাকে এটা ফেরত দিলেই চলবে। ঠিকই তাই ভারতে দূর পাল্লার যাত্রায় রিজার্ভেশন ছাড়া যাওয়া আহমকী বটে। আমি অবশ্য টিকিট কালেক্টারকে দিয়ে রিজার্ভেশনটা করিয়ে নিয়েছিলাম। তারপূর্বে আলীগড় পর্যন্ত আমাকে দাঁড়িয়ে আসতে হয়েছে। শিখদের একটা বিয়ের পার্টির দলবল আলীগড়ে নেমে যাওয়ায়, আমি, সুবিধাটা পাই। ইতোপূর্বে আমি দিল্লীতে বাজারদর যাচাই করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি আলু থেকে টমেটো পর্যন্ত প্রায় যাবতীয় সবজির দাম এক রূপী প্রতিকেজি।

কলকাতায় খিদিরপুরে আমার চাচাত বোন নাসিমের নিকট নেমেছিলাম। দু'একদিন পরই তার কাছে রাখা আমার টাকা ও পাসপোর্টটা নিয়ে প্রথমেই রওশন আবার মায়ের সঙ্গে দেখা করি এবং ঐ ৫০ রূপী তাঁদের দিয়ে দিই। এরপর আমি চলে যাই কাসেম নগর যেখানে আমার মেয়ে শিল্পী ছিল। আমার ভাগনা নোমান জাহেদী তখন আবুধাবী থেকে তার বোন পারুর বিয়েতে এসেছিল কয়েক দিনের জন্যে। সুতরাং সে আমাদের প্রথমে বর্দ্ধমানে ইসলামবাজারে বিয়েতে উপস্থিত হওয়ার জন্যে দাওয়াত করেছিল।

www.pathagar.com

বিংশ পর্ব

১৯৮৮ সালে আমার একমাত্র বোন আমাতুর রসুলের সেজ মেয়ে পারভীন সুলতানার (পারু) বিয়ে উপলক্ষে আমার পিতা, আমার বড় মেয়ে শিল্পী সহ আমি সোজা বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই। কামার কুন্ডুর জনাব সিরাজুল ইসলাম সাহেবের সেজ ছেলে শাহাবুদ্দীন আহমদের (শাবু) সঙ্গে পারুর বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল এবং সেটা গ্রহণযোগ্য হওয়ায় বিয়ের নির্দ্ধারিত দিনের পূর্বেই আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম। নববর শাবু চমৎকার বর বেশে যখন গাড়ী থেকে নামল, তখন আমার তাকে দেখে একজন রাজপুত্র যুবরাজের মত মনে হয়েছিল। বাস্তবে ঠিকই পরে আমি বুঝতে পেরেছি সে শুধু সুন্দরই নয় বরং তার মনটাও অনেক মহৎ। তার স্ত্রী আমার ভাগনি পারুও খুবই চমৎকার আদর্শ বধু হিসাবে তাদের পরিবারে স্থানে পেয়েছে। এই বিয়ের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষেই আমি দিল্লীর পথে রওনা দিয়েছিলাম। এবং আজমীর শরীফ পর্যন্ত হাজির হয়ে পবিত্র রওজা মোবারক জিয়ারত শেষে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করি। বাংলাদেশে ফিরে আসার পূর্বে ৪ ফালগুন অর্থাৎ ১৬ ফেব্রুয়ারী মেদিনীপুর পাকে ওরস্ শরীফে আমার মেয়ে শিল্পীসহ আরও অনেকেই হাজির হই। পরিশেষে আমার ভাগনা নোমান জাহেদী আমার চিকিৎসার জন্যে ১০০০ রূপী আমকে নিতে বাধ্য করে এবং চিকিৎসা শেষেই বাংলাদেশে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করে। আমি ঠিক তাই করেছিলাম। ডাঃ এইচ,কে, পালের পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক আমার পীর ভাই প্রখ্যাত ডাঃ আমীন আহমদের সাহায্যে আমার পীঠের শিরদাঁড়ার ছটি এক্স-রে (X-RAY) এবং পাঁচটি রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টসহ যখন ডাঃ পালের নিকট যাই, তখন আমার মেয়ে শিল্পীও আমার সঙ্গে ছিল। সে নিজেও যথেষ্ট কৌতুহলী হয়ে ডাক্তারের নিকট জানতে চায়, আমার পিতার কী রোগ হয়েছে? ডাঃ পাল রিপোর্টগুলি দেখে বলেন ঃ কোনই রোগ নাই। তবে যেটা আছে সেটা মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত থাকার কথা। আর সে রোগটার নাম হল বাতরোগ। এখন পর্যন্ত এ রোগের তেমন কোন প্রতিষেধক বের হয়নি সারাবিশ্বে। তবে তাঁর বয়স যেমন

www.pathagar.com

বাড়ছে, তেমনি এ রোগের প্রকোপটাও তেমনি কমতে থাকে। এখন আমি একটা মাত্র ওষুধ তাঁকে লিখে দিচ্ছি যার কমার্শিয়াল নাম হল আইবুপ্রোফেন ৪০০ মিঃগ্রাঃ। এটা বাংলাদেশেও পাওয়া যাবে। সব সময় ওষুধটা সঙ্গে রাখবেন, পকেটে অথবা হ্যান্ডব্যাগে, ব্যাথা উঠলেই খাবেন প্রতিদিন তিনটি ট্যাবলেট। তবে অশ্যই দু'তিনদিনের বেশী নয়। সেরে যাবে ব্যাথা, আবার হলে আবার খাবেন এভাবেই চলবে।

বাস্তবিকই তাই, ঐ ওষুধ খেয়েই আমি দীর্ঘ কয়েক বছর বেশ ভাল ছিলাম। পরে অবশ্য সে ওষুধ আর কাজ করেনি। অন্য উচ্চ মাত্রায় বিদেশী ওষুধ খেয়ে আমাকে থাকতে হয়েছে দীর্ঘদিন যা হোক আমি বাংলাদেশ চলে আসার জন্য আমার মেয়ে শিল্পী সহ বর্তমান বড় হুজুর পাকের নিকট হাজির হই। বড় হুজুর পাক শিল্পীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার হাত ধরে বাড়ীর ভিতর তাঁর পরিবার পরিজনদের নিকট কিছুক্ষণের জন্যে নিয়ে যান। আমি হুজুর পাককে তার বিয়ের ব্যাপারে দোয়া করতে অনুরোধ করি। হুজুর পাক প্রশ্ন করেন ছেলে ঠিক হয়েছে কী? আমি আরজ করি হুজুর পাক আপনি দোয়া করলেই ইনশাআল্লাহ ঠিক হয়ে যাবে। এভাবেই আমরা তাঁর অনুমতি নিয়েই বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিই।

১৯৮১ সালের ২৮ অক্টোবর ড. এম, এ, রশিদ পাবনার সড়ক দুর্ঘটনায় প্রচন্ড ভাবে আহত হন। কিভাবে দুর্ঘটনা ঘটে এবং তাঁকে ঐ দিনই ডাক্তারদের অনুরোধে হ্যালিকপ্টার যোগে ঢাকা পাঠানোর যাবতীয় ব্যবস্থা আমি করি, তার বিস্তারিত বিবরণ তাঁর পরিবারের কোন সদস্যই দীর্ঘদিন পর্যন্ত জানতে পারেননি বলে, তাঁর গ্রামের জনৈক পানি উন্নয়ন বোর্ডের চীফ ইঞ্জিনিয়ার আলহাজ্ব মোঃ আব্দুর রশীদ সাহেবের অনুরোধে আমি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন লিখিত আকারে জানিয়ে দিই সেটির কপিটা এ প্রসঙ্গে এখানেই সংযোজন করা হল। ড. রশিদ তখন ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা, World Bank এর Consultant হিসাবে সে সময় বাংলাদেশে এসেছিলেন John Willium Gayler, কেননা World Bank এর টাকায় তৎকালীন বাংলাদেশে পাঁচটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট তৈরী করা হয়েছিল। যেমন পাবনা, বগুড়া, রংপুর, বরিশাল এবং সিলেট। এই পলিটেকনিকগুলির কাজের

www.pathagar.com

অগ্রগতি ও সাফল্য দেখার জনেই Gayler সাহেব এসোছিলেন বাংলাদেশে। ঢাকা থেকে তিনি বগুড়ায় গিয়ে অবস্থান করছিলেন ড. রশিদ ঢাকা থেকে বিমানে ঈশ্বরদী Airport এ নামেন এবং সেখান থেকে পাবনা পলিটেকনিকের তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব আব্দুর রাজ্জাক সাহেব তাঁকে পাবনায় নিয়ে আসেন স্বল্প সময়ের জন্যে। যেহেতু রাজ্জাক সাহেব ছিলেন ড. রশিদের ছাত্র সেজন্যে তিনি তাঁকে একা বগুড়া যেতে দিতে খুবই নারাজ ছিলেন। কিন্তু ড. রশিদ বলেন তুমি কেন যাবে অযথা? তুমি বরং এখানেই থাক, আমি তো Gayler কে আনতেই যাচ্ছি। Driver আব্দুল আজিজ World Bank এর দেওয়া নতুন Lancer Car এ ড. রশিদকে নিয়ে রওনা হয়ে যায়। পাবনা থেকে ১২ মাইল দূরে আতাইকুলা সেটা ছাড়িয়ে ২/১ মাইলের মধ্যেই গাড়ীর ব্রেক ফেল করে চালকের এর পা ভেঙ্গে যায় এবং গাড়ীটি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যায়। গাড়ীটি রাস্তার পাশে একটা বিরাট জাম গাছের সঙ্গে প্রচন্ড ধাক্কা খায়। চালক বিপদ বুঝতে পেরে তার মাথাটি জানালার বাহিরে দ্রুত বের করে ফেলে বটে কিন্তু তার বুকে প্রচন্ড আঘাত পাওয়ায় সে ছয় মাস চিকিৎসাধীন ছিল। ওখানে ধারে কাছে অধ্যাপক মাহতাব বিশ্বাস (বি,এন,পি) দলীয় রাজনৈতিক সভা করছিলেন। ইট ভাটার কিছু শ্রমিক এই দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তারা দ্রুত গিয়ে মাহতাব বিশ্বাসকে জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সভাবন্ধ করে পাবনা পলিটেকনিকের গাড়ী দেখে মনে করেন, পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ বোধকরি আহত হয়েছেন, কেননা তিনি ড. রশিদকে চিনতেন না। তিনি যখন দেখেন যে গাড়ীর ৪টি দরজাই সম্পূর্ণ বিকল হয়ে গেছে তখন ড. রশিদকে সম্মুখের সিট থেকে Wind Screen এর মধ্যে দিয়ে উদ্ধার করেন সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায়। যদিও ড. রশিদ পিছনের সিটে বসা অবস্থায় রওনা দিয়েছিলেন। মাহতাব বিশ্বাস ড. রশিদ এবং চালককে সদর হাসপাতালে দিয়ে আমাদের সংবাদটা দিয়েই চলে যান।

তখন আমরা মসজিদে যোহরের নামাজ আদায় করছিলাম। অধ্যক্ষ রাজ্জাক সাহেবও আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। অতএব, সেই অবস্থাতেই অধ্যক্ষসহ আমরা কয়েকজন ছুটলাম হাসপাতালের দিকে। ডাক্তার সাহেবদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলাম ড. রশিদের Head Injury খুবই Critical. আমি ডাক্তার সাহেবদের জিজ্ঞাসা করি শরীরের আর কোথায় কী আঘাত পেয়েছেন, ডাক্তারদের

www.pathagar.com

মতামত হচ্ছে শরীরের আর কোথায় কী হয়েছে না হয়েছে আমরা কিছুই জানিনা। কেননা তাঁর Head Injury এতই সিরিয়াস যে, আমরা চাই আপনারা তাঁকে আজই ঢাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করুণ। তাঁদের এই কথা শুনার পর আমাদের অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব আমাকে বলেন, চৌধুরী! তুমি যে ভাবে পার তাঁকে আজই ঢাকা পাঠাবার ব্যবস্থা কর। আমি সে সময় ছিলাম পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার প্রেসিডেন্ট (IDEB) এবং আমার কিছু ছাত্র পাবনা Controll Room (WAPDA) তে কাজ করত। আমি সঙ্গে সঙ্গে আর আমার বাসায় না গিয়ে আমার এক কলিগকে সঙ্গে নিয়ে সোজা Controll Room এ হাজির হই। সেখানে দেখি বদিউজ্জামান এবং আরও একজন ছাত্র কাজ করছে। আমি তাদের বলি ঢাকা পলিটেকনিকের অধ্যক্ষ মোহাম্মদ শাহজাহান সাহেবকে Connection দাও। কেননা, তিনি ছিলেন আমার প্রাক্তন শিক্ষক এবং ড. রশিদের প্রত্যক্ষ ছাত্র।

শাহজাহান সাহেব এই ঘটনা শোনার পর তাঁর মাথায় যেন বাজ ভেঙ্গে পড়ে এভাবে আমাকে বলেন, বল এখন আমি কি করতে পারি? আমি বলি স্যার, আপনি Army Helicopter আজই পাবনা পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমাকে এখনই জানান কোথায় এবং কখন Helicopter নামবে। তিনি আমাকে বলেন তুমি Controll Room এ বসে থাক, আমি একটু পরে তোমাকে জানাচ্ছি। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে তিনি আমাকে জানান পাবনা জিন্নাহপার্কে Helicopter নামবে ঠিক বিকাল ৪টায়। অতএব তুমি ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে ড. রশিদকে তাতে তুলে দিবে। ঠিক বিকেল ৪টায় Helicopter জিন্নাহ পার্কে এসে নামে। আমি হাসপাতালে যখন ড. রশিদকে বেড থেকে তুলতে যাই, তখন দেখি তাঁর হাত, পা ভাঙ্গা চোরা অবস্থায় ছিল এবং তিনি সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায়। ঐভাবেই তাঁকে Oxygen Cylinder সহ Ambulence এ উঠিয়ে ৩.৩০ মিনিটের মধ্যেই তাঁকে নিয়ে জিন্নাহ পার্কে আমরা হাজির হই। Helicopter এ স্থান সংকুলান না হওয়ায় অধ্যক্ষ রাজ্জাক সাহেব যেতে পারলেন না। তবে আমাদের পলিটেকনিকের Compounder কে তাতে তুলে দেওয়া হয় কোন মতে। পাবনায় অনেক ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন সেখানে Helicopter আসার শব্দ পেয়ে। কিন্তু তাঁরা কেউ ড. রশিদ সাহেব সম্পর্কে তেমন ওয়াকেফহাল ছিলেন না। আমাদের নিকট শুনার পর জানতে পারেন ড. রশিদদের

www.pathagar.com

পরিচয় এবং তাঁর গুরুত্ব। একজন ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের মন্তব্য করেন ভাই শুনেছি কান দিয়ে রক্ত পড়লে সহজে কেউ বাঁচেনা। পরে তার কথায়ই সত্যি বলে প্রমানিত হয়। সিলেটের হবিগঞ্জে ১৯১৯ সালে ড. রশিদের জন্ম হয়।

যদিও ঢাকায় ড. রশিদকে নিয়ে যাওয়ার পর পরই পাকিস্তান থেকে দুজন বিখ্যাত Brain Specialist Dr. Zumma, এবং সম্ভবত Dr. Shafi কে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় তাঁর চিকিৎসার জন্যে। কিন্তু দীর্ঘ ৯ দিন তিনি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে মহান আল্লাহ্ পাকের নিকট হাজির হয়ে চিরশান্তিধাম জান্নাতের ঠিকানায় মহাপ্রস্থান করেন ৬ নভেম্বর ১৯৮১ সাল। মহান আল্লাহ্পাক তাঁকে শাহাদাতের জীবন দান করে শহীদ হিসাবে গ্রহণ করুন। আমিন !! সুম্মা আমীন!!

১৯৮২ সালে আমি ঢাকা পলিটেকনিকে যোগদানের পর আমার পিতামাতা আমার সরকারী বাসভবনে ঢাকায় আমাদের নিকট বেড়াতে আসেন ১৯৮৪ পবিত্র রমজান মাসে এবং দীর্ঘ মাসাধিককাল অবস্থান করে পবিত্র ঈদ উৎসব পালনের পর ঢাকায় বহু আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে গিয়ে তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ করে এবং অনেককে আমার বাসায় দাওয়াত করে আসেন। পরিশেষে তাঁদের যাওয়ার পূর্বে আমি ও আমার স্ত্রীসহ বাজারে গিয়ে তাঁদের জন্যে পছন্দমত শাড়ী কাপড় ইত্যাদি কেনাকাটা করার পর, আমার মনে হয় আরও কিছু কাপড় কেনা দরকার। কিন্তু আমার মা তাতে বাধা দিয়ে বলেন না, আর, কোন কাপড় কিনতে হবে না বরং কিছু টাকা আমাকে দাও। তাঁর ইচ্ছামত তাই করা হয়। এবং তাঁকে আমরা যখন বলি আবার বকরী ঈদের অর্থাৎ কোরবানীর সময় আপনারা চলে আসবেন ঢাকায়। সঙ্গে সঙ্গে আমার মা বলেন না, এবার তোমরাই যাবে পাবনায় কোরবানী করতে। আমার ছোট মেয়ে শাহীন পাবনা সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ত এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিল বলে সেও তাঁদের সঙ্গেই ছিল।

মাত্র মাস দুয়েকের মধ্যে হঠাৎ রাত একটার সময় আমার প্রাক্তন শিক্ষক জনাব মুসা মৃধার বাসায় টেলিফোন আসে। এবং তিনি তখন আমাকে মৃত্যু সংবাদ না দিয়ে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে বলেন, চৌধুরী দরজাটা খোল। আমি তাঁকে ড্রইং রুমে বসতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করি কী ব্যাপারে স্যার এত রাতে আপনি? তিনি বলেন পাবনায় তোমার পিতামাতা আছেন তাইনা? আমি বলি জি হ্যাঁ। তিনি বলেন তোমার

www.pathagar.com

মার খুব অসুখ। অতএব, তোমরা কালই পাবনা চলে যাবে। আমি বলি ঠিক আছে যাব। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করেন, না কখন যেতে চাও। আমি বলি অসুখ যখন তখন তো টাকা পয়সা নিয়ে যেতে হবে। অতএব, ব্যাংকিং আওয়ারের পরেই যাব। শেষে তিনি বলেন, না তোমার কত টাকা দরকার বল আমি দিই। আমি আরও কিছু প্রশ্ন করায় তিনি বলতে বাধ্য হন যে, তোমার মা ইন্তেকাল করেছেন রাত ১২টা পর। এবং আমাকে সান্তনা দিয়ে তিনি বলেন, তুমি আমার সঙ্গে এস দেখি কত টাকা আমার বাসায় আছে? ৮০০ টাকা তিনি দিতে পারলেন। আমি টাকা নিয়ে আসার পর পরই আমার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলেন তুমি তাঁর বাসার টেলিফোনে ঢাকার দু চার জন আত্মীয়কে জানিয়ে দাও। আমি ৮০০ টাকার একটা চেক তখনই লিখে নিয়ে গিয়ে মুসা সাহেবকে দিয়ে বলি স্যার দয়া করে কাল সকালেই আপনি টাকাটা আমার একাউন্ট থেকে উঠিয়ে নিবেন। জনাব মুসা মৃধার এ উপকার আমি সারা জীবন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ রাখব। তিনি ছিলেন তখন এসিসট্যান্ট ডিরেকটর (D,T,E) অবশ্য আমার নিকটও বেশ কিছু টাকা ছিল। আমি বাসায় ফিরে এসে ফজরের নামাজের পূর্বেই গোসল অজু ইত্যাদি সেরে মসজিদে গিয়ে ফজরের আজান দিই এবং নামাজ শেষে দোয়া করার জন্যে জনাব ইমাম সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। ভোর ছটার মধ্যেই দেখি আমার মায়ের ফুল চাচা জনাব সৈয়দ শাহ আব্দুল মতি তথা মতিভাই, আবার দেখি এ্যাডভোকেট জনাব চৌধুরী মোহম্মদ বদরুদ্দোজা সাহেব এসে উপস্থিত হয়েছেন। আমাকে মতিভাই বলেন তুমি তোমার পরিবারদের নিয়ে আগেই বেরিয়ে পড়। তোমার বোন ও ভগ্নিপতির জন্যে অপেক্ষা করার কোন দরকার নাই। তোমার মেজ মামা বসির ওদেরকে সঙ্গে নিয়ে যাবে। এদিকে বদরুদ্দোজা চাচা বলেন তোমার বোনকে সঙ্গে না নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। প্রসঙ্গতভাবে উল্লেখ করা যায় যে, এই প্রথম আমার ভগ্নীপতি মোহম্মদ আব্দুল কবি তার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ঢাকায় এসেছেন মাত্র ৪/৫ দিন পূর্বে। যদিও প্রথম যাওয়ার কথা ছিল পাবনা কিন্তু তাঁর মেয়েদের চাপে প্রথম ঢাকা আসেন।

যা হোক আমি ঐ ভোরে অধ্যক্ষ জনাব আব্দুল হালিম সাহেবের বাসায় গিয়ে তাঁকে টেলিফোনে সব জানাই। আমার বাসার পরই তাঁর সরকারী বাসভবন। বাসা থেকে বেরুবার সময় দেখি তাঁর ছেলে গাড়ী নিয়ে কোথায় যেন যাবে। আমি তাকে

www.pathagar.com

বলি বাবা আমাদের একটি লিফ্‌ট দাও তারপর তুমি চলে যেও। সে আমাদের সকলকে তুলে নিয়ে পথে দুএকটা বাসায় আমার বোনের খোঁজ না পেয়ে আমরা সকলেই বাস ষ্ট্যান্ডে ফুলবাড়িয়ায় গিয়ে বাস ধরি। মতিভাই আমাকে বলেন আসাদ গেটে তোমার আয়না ভাবী দাঁড়িয়ে আছেন তাঁকেও পাবনা নিয়ে যেও। ঠিক তাই, আমার সবচেয়ে ছোট নানা জনাব সৈয়দ শাহ আব্দুল কাদেরের স্ত্রী আয়না ভাবী ঠিকই দাঁড়িয়ে ছিলেন জায়গা মত। তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যায় ওদিকে ধানমন্ডি ২৭ নং থেকে আমার মায়ের ছোট চাচী বিবি সুফিয়া খাতুন, মায়ের ছোট ফুপু বিবি সাজেদা খাতুন, মতিভায়ের স্ত্রী পান্নাভাবী এভাবে আমার মায়ের তিনভাই দুই ভাবী সব মিলে প্রায় ৩০ জনেমত আমরা পাবনা পৌঁছাই বেলা ২টার মধ্যেই। দলে দলে ২/১ ঘন্টা আগে পিছে । আমি নেমেই কাফন বাবদ ৩০০ টাকা আমার এক ভাতিজা টুটুলকে দিয়ে দিই যা সে একটু আগে কিনে এনেছিল। এরপর আমি কোরআন শরীফ নিয়ে পড়তে বসেছিলাম। কিন্তু আমার পিতা আমাকে কবরস্থানে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। আমি আরিফপুর গোরস্থানে গিয়ে দেখি আমার এক ফুফাতভাই সৈয়দ মুরাদ আহমদ রাঙ্গা সে আমাকে দেখেই বলে, ভাই দেখেন দু'টি কবর খোঁড়া হয়েছিল। একটিতে পানি উঠেছে আর একটি ধসে পড়ে গেছে। এখন কি করব বলেন। আমি আরিফপুর গোরস্থানের মত এত চমৎকার কবরস্থান আর কোথাও দেখিনি। ভিতরে পাকা কংক্রিটের রাস্তা। ঠিক তারই প্রথম চৌরাস্তার একপাশে সাবু গাছের নীচে অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গা দেখে সেখানেই কবর তৈরী করা হয়।

পাবনার বড় জামে মসজিদে ঠিক মাগরিবের নামাজান্তে জানাজা পড়ান হাফেজ মওলনাা ইদ্রিস আলী সাহেব। আমরা সকলে লক্ষ্য করলাম জিলহজ্বের চাঁদ উঠেছে সে দিনই। করবস্থানে গিয়ে দেখি কবরের মধ্যে কেবল কাদা সেখানে লাশ নামান যায়না। তাই কলাগাছের ভ্যালা তৈরী করে তার উপর লাশ নামান হয়। আমি নিজেও নেমেছিলাম। মা প্রায়ই বলতেন, আমাকে শক্ত মাঠিতে দাফন করো না। ঠিকতাই হলো। আমি আমার পিতাকে দোয়া করতে অনুরোধ করি। কিন্তু তিনি নিজে আমাকেই দোয়া করার জন্যে হুকুম করেন। এভাবে প্রায় প্রতি বছর আমি তাঁর কবর জিয়ারত করে এসেছি পাবনায় গিয়ে। চারদিনে কুলখানি করার পর সব আত্নীয় স্বজন ঢাকায় ফিরে আসেন। আমি আবার কোরবানী উপলক্ষে পাবনা গিয়ে

www.pathagar.com

একটা গরু কিনে কোরবানী করে আসি। এরপর চল্লিশার সময় আবার ঢাকা থেকে অনেক আত্মীয় স্বজন সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। আমার মায়ের মৃত্যুর মাত্র ১৫/২০ মিনিট পূর্বে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁকে পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে। অতএব, দোয়া কালাম যা পড়ার সবশেষেই তিনি ইন্তেকাল করেন। ১৯৮৪ সালের ৩০ জুলাই। আমি ঢাকা থেকে মার্বল পাথরের উপর তাঁর নাম ফলক তৈরী করে নিয়ে গিয়ে লাগিয়ে দিই তাঁর মাথার দিকে। চল্লিশার অনুষ্ঠানে প্রায় শ'দুই ভিখারীকে উত্তমরূপে আপ্যায়ন করা হয়। বেলা ৩টা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত তাদের দফায় দফায় বসে খাইয়ে বিদায় করা হয়। এতে আমার বসির মামা ও শহীদ মামা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন সবদিক দিয়ে। নতুবা আমার একার পক্ষে এতবড় কাজের আনজাম করা বেশ কঠিন ছিল। আরিফপুর গোরস্থানের সমস্ত কবরবাসীর উদ্দেশ্যে একটি অতি মূল্যায়ন বই রচনা করেছেন অধ্যাপক মনোয়ার হোসেন জাহেদী অনন্ত ঘুমের দেশে। বেশ কিছু চমৎকার রঙ্গীন চিত্রসহ বইটি ছেপেছেন। এই বইয়ের ৫৫ পৃষ্ঠায় প্রথমেই সৈয়দা জারিয়াতুর রসুল নামে সংক্ষিপ্তাকারে কিছু বিবরণ লেখা আছে।

www.pathagar.com

একবিংশ পর্ব

১৯৭৯ সালে পবিত্র রমজান মাসে আমি মসজিদে এতেকাফের মধ্যে ছিলাম। ফজরের নামাজের কিছু পরেই বৃষ্টির মধ্যেই জনাব মহীউদ্দীন নামে এক ব্যক্তি আমাকে মসজিদে একটা বাড়ীর প্ল্যান দেখান। আমি এতেকাফে থাকার দরুন তাঁকে ভিতরে প্রবেশ করতে না দিয়ে কেবলমাত্র জানালা দিয়ে এক ঝলক তাঁর ছোট বাড়ীর প্ল্যানটার উপর দৃষ্টি বুলাই এবং এটাই ঠিক কিনা জিজ্ঞাসা করি মাত্র। এরপর অধ্যক্ষ আব্দুর রাজ্জাক সাহেব যিনি আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসতেন, তিনি আমাকে ওটা কিনে ফেলার জন্য চাপ দেন। বায়না নামার জন্যে সামান্য কিছু টাকাও তিনি আমাকে ঋণ দেন। যা হোক একসময় বাড়ীটা কিনে ফেলি। আমার মায়ের ভারতে কিছু জায়গা জমি তখনও ছিল। সেটা আমার পিতা বিক্রি করে ঐ টাকার প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ আমি বাংলাদেশী মুদ্রায় গ্রহন করি আমার এক বন্ধু হিমাংশুদার নিকট থেকে। তবে ভারতে তাঁদেরকে পূর্বেই টাকা দিতে হয়। বাড়ীটা নেওয়ার পর আমি বুঝতে পারিযে, আমাকে যে প্ল্যান দেখানো হয়েছিল এটা তার চেয়ে অনেক নিম্নমানের। আমি প্রায় হাজার পঞ্চাশেক টাকা খরচা করে বাড়ীটি কে বাসোপযোগী করে তুলি। পাবনা রাধানগরের ঐ এলাকায় কোন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকায়, আমি নিজ উদ্যোগে কয়েকটি পোস্ট বসিয়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করি। কিন্তু আশেপাশের লোকজন তেমন শিক্ষিত ও ভদ্র না হওয়ায় আমরা একরাত্রিও সেখানে কেউ থাকিনি। বাড়ীর নাম ফলক "জারিয়া মঞ্জিল" টাঙ্গিয়ে দিয়ে দীর্ঘদিন বাড়ীটি ভাড়া দিয়ে রাখি।

আমার ছোট মেয়ে শাহীনের ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর পাবনার বসবাস গুটিয়ে একেবারে ঢাকায় আমার পিতাসহ আমার সরকারী বাসভবনে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। আমার পিতার পেনশনটাও পাবনা থেকে ঢাকায় ট্রান্সফার করা হয়। আমার পিতার পোলট্রি ফার্মের শখ থাকায় তিনি সিনিয়র স্টাফ কোয়ার্টারে খোলা প্রাঙ্গনের এক কোনায় রীতিমত খরচা করে একটা পোলট্রি ফার্ম করেন। সাধারণত বিদেশী মুরগীর প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী বলে, R,I,R ও White Leghorn জাতীয় বড় বড় মুরগী উচ্চমূল্যে কিনে রাখতেন। আমাদের কোয়ার্টারের সমদূরত্বে দু'দিকে দুটি মসজিদ ছিল। একটি ছিল T,N,T, মসজিদ এবং অপরটি ছিল BRI

www.pathagar.com

মসজিদ। এই উভয় মসজিদেই আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়তে যেতাম। BRI মসজিদ ছিল টিন শেড়ের। ফলে, প্রচন্ড গরম লাগত উপরন্তু বৃষ্টি হলেই মসজিদের অনেকস্থানেই বৃষ্টির পানি পড়ত। আমি ইমাম সাহেবকে, এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন; আমি দীর্ঘ ৩৭ বছর এখানে হাফেজ হিসাবে ইমামতি করছি কিন্তু BRI মালিক পক্ষকে বহুবার অনুরোধ করেও কিছু করতে পারিনি। তাঁরা কেবল বলেন হবে, তবে আপনি যদি তাঁদের একটু বলেন তবে হয়ত ইনশাআল্লাহ তাড়াতাড়ি হতে পারে। ইমাম ও মোয়াজ্জেন সাহেবের এই আকুতি আমি রক্ষার জন্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হিসবে BRI এর মালিক জনাব নজরুল ইসলাম সাহেবের নিকট দেখা করি এবং বলি যদি আপনাদের কোন অসুবিধা থেকে থাকে তবে কিন্তু আমি নিজের উদ্যোগেই মসজিদ করে ফেলব। কেননা, মসজিদ তৈরীর ব্যাপারে আমার বেশ কিছু অভিজ্ঞতা আছে। নজরুল সাহেব আমার হাত চেপে ধরে বলেন, না না ওটি করবেন না। আমাদের যথেষ্ট টাকা আছে মসজিদ এবং শ্রমিকদের স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য। অতএব, কোনটা আগে তৈরী হবে এটা নিয়েই গোল বেঁধেছে। যা হোক আরও দু একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার পরই মসজিদের কাজ শুরু করা হয়, অনেকটা আমারই সুপারভিশনে। কেননা, মালিক পক্ষের বেশীর ভাগ মুসল্লীই ফ্যাক্টরীর প্রাঙ্গনে নামাজ পড়ার ব্যবস্থা থাকায় এ মসজিদে কেউ আসতেন না বলে তাঁদের খুব একটা গরজ ছিলনা এই মসজিদ নির্মাণের ব্যাপারে। যা হোক মাত্র বছর খানেকের ভিতরেই আমি তাঁদের চাপ দিয়ে প্রকান্ড দোতালা মসজিদ তৈরী করাতে সাহায্য করি-আলহামদোলিল্লাহ।

আমার বড় ছেলে ফারুক পাবনা কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট থেকে ফাস্ট ডিভিশনে ডিপ্লোমা-ইন-কমার্স পাশ করার পর তাকে তেজগাঁ কলেজের অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ চৌধুরী সাহেবের সহায়তায় বি,কম কোর্সে ভর্তি করে দিই। এবং বড় মেয়ে শিল্পীকে কলা এবং শাহীনকে বিজ্ঞানে ভর্তি করা হয় ঐ একই কলেজে। কেননা, আমার একখালা ছিলেন কলেজেরই অধ্যাপিকা। খালার দুই ভাইজিও ঐ কলেজেই পড়ত। অধ্যক্ষ তোফায়েল আহম্মদ চৌধুরী সাহেব ছিলেন করিতকর্মা ব্যক্তি। কলেজে কোন ছাত্র আন্দোলন তিনি কখনও বরদাস্ত করতেন না, বেশ দৃঢ় চেতা মানুষ হিসাবে পরিচিতি ছিল তাঁর। ফারুক বি,কম পাশ করার পর ঢাকা ভার্সিটিতে তার পড়ার আগ্রহ না থাকায়, তাকে একটা Special Spoken English Course এ ঢাকা ভার্সিটির বিশেষ কয়েকজন দক্ষ শিক্ষদের নিকট একটা Short

www.pathagar.com

Course এ ভর্তি করা হয়। এবং এটাতে সে বেশ ভালই ফল লাভ করে। ফারুকের হাতের লেখা ভাল এবং ছবি আঁকার প্রতি ঝোঁক থাকায় তাকে আমি পলিটেকনিকে ছয়মাসের স্বল্পকালীন ট্রেড কোর্সে ভর্তি করে নেই। এবং এই কোর্সের প্রধান শিক্ষকও আমিই ছিলাম। প্রতি মাসে এদের স্টাইপেন্ড দেওয়া হত। মাত্র ২৫/৩০ জন ছাত্রের মধ্যেই এই শিক্ষাক্রমটা সীমাবদ্ধ ছিল। মাত্র দু'টি ছেলে 'A'Grade-এ পাশ করে তাদের মধ্যে ফারুক একজন। বাকী ছেলেরা 'B'-Grade এ পাশ করে। ১৯৮৬ তে ফারুককে ক্যাপটেন আনিসুর রহমান সিনহার অধীনে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়োগ করা হয়। এবং তাকে কর্নেল আনওয়ারুল আজিম এবং মেজর হুদার তত্ত্বাবধানে কাজ শিখান হয়। অবশ্য এই চাকুরীর ব্যাপারে আমার পীর ভাই জনাব বজলে মওলা রুমী ভাই যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তিনি তখন অগ্রনী ব্যাংকের জি,এম ছিলেন।

ফারুকের এই সময় প্রচন্ড পরিশ্রমের ফলে পর পর দুবার জন্ডিস রোগে সে আক্রান্ত হয়। এবং স্বাস্থ্যহানী ঘটার ফলে আমি তাকে চাকুরী ছেড়ে দিতে বলি। কিন্তু ক্যাপটেন সিনহা তাকে ছাড়তে মোটেই রাজি নয়। বরং একটা দামী মোটর বাইক তাকে কোম্পানী থেকে দেওয়া হয়েছিল অফিস যাওয়া আসার জন্যে। কিন্তু আমি সে গাড়ীটা পরে তাকে ফেরত দিতে বলি কিন্তু সিনহা সাহেব গাড়ীও ফেরত নেবেনা তাকে ছাড়বেও না যা হোক চেষ্টা তদবীরের পর তাকে চাকুরী থেকে রেহাই দেওয়া হয়। এরপর সে বেশ সুস্থ হওয়ার পর, সে নিজ চেষ্টায় ইসলাম গার্মেন্টসে চাকুরী পায়। তাঁরা যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করেন এবং তাকে অতিরিক্ত পছন্দ করায়, কয়েক মাস পর প্রথম তাকে হংকং-এ পাঠানো হয় ট্রেনিং এর জন্যে। দীর্ঘ তিন মাস পর সে দেশে ফিরে আসে।

এদিকে আমার বড় মেয়ে শিল্পীকে সেক্রেটারিয়েল সাইন্স কোর্সে ভর্তি করে দিই। এই কোর্সটা সে ভালভাবেই সম্পন্ন করে। ইতোমধ্যে তার বিয়ের প্রস্তাব দু'চার জায়গা থেকে আসতে থাকে। পরিশেষে, আমার স্ত্রীর চাচাত ভাই সৈয়দ আবুল হাশেম তার বড় সম্বন্ধীর বড় ছেলে কাজি রাশেদ মুনির (বনি) কে আমাদের পছন্দ হয়। এবং ১৯৯০ সালের ২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার আগারগাঁও কমিউনিটি সেন্টারে বাদ জুম্মা তার বিয়ে খুব আড়ম্বরের মধ্যে ৬০০ মেহমানকে দাওয়াত করে বিয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠানাদি শেষ করা হয়। বরপক্ষের পিতা জনাব কাজি আব্দুল করিম সাহেব তাঁর ছেলের বৌ-ভাত এর আয়োজন করেন আজিমপুর কমিউনিটি

www.pathagar.com

সেন্টারে। খুবই সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশে এই বিয়ের যাবতীয় অনুষ্ঠনাদি সম্পন্ন করা হয়। বড় জামাই বনি UCEP এ ইনস্ট্রাকটর পোস্টে থাকাকালীন অবস্থায় ১৯৯০ সালে ১ ডিসেম্বরে তার প্রথম সন্তান হলি ফ্যামিলি ক্রীসেন্ট হাসপাতালে ভূমিষ্ঠ হয়। তার নাম রাখা হয় কাজি মুস্তাফিজুল গণী ওরফে বান্টি ওরফে সাফা। ১৯৯২ সালের নভেম্বর মাসে বনি ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলের একটা স্কলারশিপ নিয়ে লন্ডনে যায় একটা ট্রেনিং প্রোগ্রামে এবং ফিরে আসে ১৯৯৩ সালের জুলাইতে। ছাত্র হিসাবে বনি বেশ ভাল এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ও যথেষ্ট কর্মঠ। অত্যন্ত অমায়িক ও বন্ধুবৎসল ইত্যাদি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। ওরা তিন ভাই ও দু'বোন। বড় বোন শরমিনের পরই তার জন্ম। ওদের আদি বাসস্থান ছিল কলকাতা ব্রাইট স্ট্রীটে। ওদের অনেক নিকট আত্মীয় বর্তমানে আমেরিকায় বসবাস করছেন। বর্তমানে বনির ৯ বছরের মেয়ে সারা ৪র্থ শ্রেনীতে পড়ে। শিল্পীর বিয়েতে আমি তার গয়না ও পোষাক ইত্যাদি বাবদ ৭০,০০০/-(সত্তর হাজার) টাকা তার হাতেই তুলে দিই। অবশ্য ৬০০ জন নিমন্ত্রিত অতিথিদের খরচা ছাড়া। ফারুক শিল্পীর জন্যে যাবতীয় ফার্নিচার দান করে।

আমার ছোট মেয়ে শাহীন ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট থেকে Electical Engg এ Diploma করার পরপরই নানা দিক থেকে তার বিয়ের প্রস্তাব আসতে থাকে। পরিশেষে, আমার স্ত্রীর আপন ফুফাত বোন জনাবা মতলুবা খাতুনের সর্ব কনিষ্ঠপুত্র সৈয়দ মকবুল ইলাহী রুমীর সঙ্গে শাহীন পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হয়। ছেলের পিতা জনাব সৈয়দ আতা ইলাহী মুর্শিদাবাদের বিনুদিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁর বড় ভাই সৈয়দ আল্লাহ হাফেজসাহেব ছিলেন জেলাজজ। রুমীরা চার ভাই একবোন। বড় ভাই সৈয়দ মতলুব ইলাহী ওরফে বলুবুল, মেজভাই সৈয়দ মাকসুদ ইলাহী ওরফে লাবলু বর্তমানে আমেরিকায় দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে। সেজভাই সৈয়দ মুশতাক ইলাহী ওরফে বেলাল। বর্তমানে রুমী ও বেলাল দীর্ঘ ১৫/২০ বছর ধরে সুইডেনে বসবাস করছে। তাদের একমাত্র বোন সুলতানার বিয়ে হয়েছে ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালামের সঙ্গে। ১৯৯২ সালের ১৪ জানুয়ারী ঢাকায় ২৭ নং রোডে মোহনা কমিউনিটি সেন্টারে শাহীনের বিয়ে হয় ছেলেদের পক্ষ থেকে বউ ভাতের আয়োজন করা হয় শাপলা কমিউনিটি সেন্টারে। শাহীনের বিয়েতেও আমি ৬০০ মেহমানকে দাওয়াত পাঠাই। আমার পলিটেকনিকের শিক্ষক মন্ডলীও আমার দু' মেয়ের বিয়েতেই অংশ গ্রহন করেছিলেন। রুমী সুইডেনে ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে

www.pathagar.com

একটা বিখ্যাত কোম্পানীতে কাজ করে। ওরা সব ভাই অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। যেহেতু ওদের পিতামাতাও ছিলেণ অতীব চমৎকার চেহারার অধিকারী। বর্তমানে একমেয়ে এগার বছরের মোনামী এবং এক ছেলে সৈয়দ ফাবিয়ান ইলাহী বছর চারেকের হবে। রুমী সুইডেন থেকে এক বছরের মধ্যেই শাহীনের সুইডেন যাওয়ার ব্যবস্থা করে। ফলে শাহীন ১৯৯২ সালের ২৬ শে ডিসেম্বর BOAC বিমান যোগে একাই লন্ডনের হিথরো বিমান বন্দর হয়ে রাত ১১টার দিকে জিয়া বিমান বন্দর ত্যাগ করে সুইডেনের উদ্দেশ্যে।

সর্বকনিষ্ঠ ছেলে চৌধুরী হাসানুর রহমান ফাহিম তেজগাঁও পলিটেকনিক হাইস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করার পর আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ হতে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে ইন্টারমেডিয়েট পাশ করে, বিকম পাশ করে ধানমন্ডি আইডিয়াল কলেজ থেকে। ১৯৯৬ সালে আমি তাকে ঢাকা কলেজে মার্কেটিং-এ মাস্টার্স করার জন্যে ভর্তি করি। এরপর আমি আলগিলানী ট্রাভেলের মাধ্যমে ৩০ জন যাত্রীসহ ৪০ দিনের জন্যে মধ্যপ্রাচ্য ভ্রমনে চলে যাই। আমি যখন সফরের শেষ পর্যায়ে করাচিতে অবস্থান করছি তখন ফারুক হঠাৎ আমাকে টেলিফোনে করাচিতে জানায় যে ফাহিম একটা মোটর কার কিনেছে। আমি তো অবাক! কী ভাবে কিনল জানতে চাওয়ায় সে বলে শেয়ার মার্কেটে বেশ কিছু লাভ হওয়ায় গাড়ী কিনেছে। ড্রাইভিং সে আগেই জানত। তবুও আমি বলি ড্রাইভার যেন অবশ্যই রাখা হয়। আমি ফিরে এসে দেখি খুব রমরমা ব্যবসা। অনেক আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব তার মাধ্যমে ব্যবসা করছে ধুমসে। আমার কাছ থেকেও কিছু টাকা নিয়ে আমাকে কিছু লাভ দেয়। পড়া থেকে ধীরে ধীরে সরে এসে পুরোপুরি ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে। সম্ভবত আমিই প্রথম বুঝতে পারি এ ধরণের ব্যবসার পরিণতি অনতিবিলম্বে সর্বনাশ ডেকে আনবে। আমি আমার টাকা তার কাছ থেকে নিয়ে নিই এবং আরও কয়েকজনকে বলি টাকা না খাটানোর জন্যে। যেহেতু আমার বেশ কিছু আত্মীয় আমাকে এ ব্যাপারে কিছু কিছু পূর্বাভাস দিয়ে ছিলেন ইতোপূর্বে বি,কম পাশের পূর্বে ফারুক হঠাৎ আমার হাতে ৮,০০০/-(আট হাজার) টাকা দিয়ে বলে, আব্বা ফাহিমকে বৃটিশ কাউন্সিলে ভর্তি করে দেন স্পোকেন ইলিংশটা কিছুটা রুপ্ত করতে পারবে। এবং সেখানে থেকে একটা শর্ট কোর্স সমাপ্ত করে। যে সমস্ত আত্মীয় এই ব্যবসায় জড়িত ছিল, তাদের মারকত আমি জানতে পেরে অনেককে সাবধান করে দিই। কিন্তু তবুও বেশী লাভের আশায় ফাহিম আরও একটা দামী গাড়ী কিনে ফেলে। ফারুক তার অফিসের পাজেরো গাড়ী ব্যবহার করে যেখানে,

www.pathagar.com

সেখানে ফাহিম দু'টো গাড়ী রাখার আর গ্যারেজ পায়না। আমরা তখন থাকতাম হাতিরপুলে ইস্টার্ণ প্লাজার পাশেই ড. আব্দুল্লাহ আল মূর্তি শরফুদ্দীন সাহেবের উপর তলায় একটি ফ্ল্যাটে। তাঁর মাত্র চারটি গ্যারেজ। ফাহিম তাঁকে অনেক অনুরোধ করে ১০০০/-(এক হাজার) টাকায় একটা গ্যারেজ ভাড়া নেয়। ফারুকের একটা, তাঁর নিজের একটা, উপর তলার অন্য ভাড়াটিয়ার জন্য একটা। অতএব ফাহিমের অন্য একটি গাড়ী দীর্ঘদিন বাইরেই পড়ে থাকত, অবশ্য গেটের ভেতরে। ফারুক ১৯৯০ সালে একটি বিখ্যাত বিদেশী বৃটিশ ফার্ম Swire & Maclaine নামে বায়িং হাউসে এ যোগদান করে। কোম্পানী তাকে উত্তমরূপে ট্রেনিং এর মাধ্যমে বিদেশে যাওয়ার উপযুক্ত করে গড়ে তুলে। মতিঝিলের সেনাকল্যান ভবনে ১৮ তলায় তার অফিস। এই কোম্পানী তাকে বহুবার হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান ব্যাংকক, ফিলিপিন, আমেরিকা, সুইডেন ও লন্ডনে বার বার পাঠিয়ে ব্যবসা করতে থাকে। উল্লেখ্য যে, 'ওয়াল মার্ট' বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বায়িং হাউজ। যেটা আমেরিকার টেকসাসের পেনটন'ভিলে অবস্থিত। যার ফলে তাকে সেখানে বার বার যেতে হয়, কখনও একা কখনও বা দলবলসহ। ফলে সে প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করে বায়িং হাউস ও গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজের উপর। পরে তাকে রেসিডেন্ট ম্যানেজার হিসাবে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করা হয় ১৯৯৭ সালে। এবং ২০০০ সালে সে চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহন করে।

১৯৯০ সালের মাঝামাঝি দেশের প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের আমলে টেলিফোন গ্রাহকদের জন্য বার বার উচ্চ থেকে উচ্চতর মূল্যের হাঁকডাক শুরু করেন। প্রথমে ছিল ১০,০০০/- তারপর হল ২০,০০০/- তার অল্প কিছু দিনের মধ্যেই হঠাৎ করে ৩০,০০০/- টাকার ফরমান জারী করার সাথে সাথে অনেকেরই এরূপ ধারণা হয় যে, এবার বোধ করি ৫০,০০০/-টাকায় টেলিফোনের গ্রাহক হওয়া যাবে। আশঙ্খা আমার ছেলেকেও পেয়ে বসে, যা খুবই স্বাভাবিক। অথচ আমার বাসায় তখন একটা টেলিফোনের খুবই প্রয়োজন ছিল। বিশেষত ফারুকের জন্যে। সে একদিন হঠাৎ আমার হাতে ২০,০০০/- টাকার একটা বান্ডিল ধরিয়ে দিয়ে বলে আব্বা বাকী টাকা দিয়ে এ সময়েই একটা টেলিফোন আপনি নিয়ে নেন। নতুবা পরে আরও অনেক ঝামেলা হতে পারে। আমি তার কথামত সোনালী ব্যাংকে ৩০,০০০/- টাকা সেদিনই জমা দিই এবং আরও কিছু টাকা খরচ করে STD ও ISD সংযোগ সাধন করেনিই তড়িঘড়ি। অথচ কী আশ্চর্য্য। আমাদের টেলিফোন নেওয়ার মাত্র

www.pathagar.com

কিছু দিন পরই আবার সরকারী হুকুমে ঐ পূর্বের মত মাত্র ১০,০০০/- টাকায় গ্রাহকদের মধ্যে টেলিফোন নেওয়ার ব্যবস্থা চালু হয়ে যায়। ফলে, আমাদের অর্থদন্ডের মত অযথা একটা ব্যাথা যেন পীড়া দিতে থাকে।

আমার ছেলে ফারুক হঠাৎ একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করে আব্বা কত বছর বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছে? আমি বলি ৩০ বছর বয়সে। তখন সেও সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠে, তাহলে আমিও ৩০ বছর বয়সে বিয়ে করব। তার এই মনভাবের প্রতি খেয়াল রেখেই আমরা দু'চারটি স্থানে খোঁজ খবর নিতে থাকি। ইতোমধ্যে ভারত থেকে আমার স্ত্রীর আপন দু'ভাগনা আসিক ও খসরু আমাদের কাছে বেড়াতে আসে। ওদের পিতা সৈয়দ আবুল ফজলের হঠাৎ ইন্তেকাল হওয়ায় ওরা দুভাই ও এক বোন ছোট বেলাতেই এতিম হয়ে যায়। ওরা নানা বাড়ীতেই দীর্ঘদিন অবস্থান করতে বাধ্য হয়। ওদের মা সৈয়দা বদরে মুনীর বহুকষ্টে ওদের লালন পালন করেন। ওদের পিতাও ছিলেন আমার এক ফুপাত ভাই। আমার চেয়ে বছর দুয়েকের বড়। বেচারা খুবই সাদালাপী এবং বন্ধুবৎসল ছিলেন। মহান আল্লাহ পাক তাঁকে জান্নাত নসীব করুন এই দোয়া করি। আমীন!! বাংলাদেশে ওদের বড়খালা ও মাসহ সকলেই বেশ কয়েকবার আমাদের কাছে ঢাকায় বেড়াতে আসেন। আসিফ পরিণত বয়সে ডিগ্রী পরীক্ষার পর আমাদের কাছে আসে তার ভাগ্যোন্নয়ের চেষ্টায়। সে খুব ভাল লিখতে পারত বলে, আমি তাকে আইডিইবিতে রিপোর্টার হিসাবে ঢুকিয়ে দিই এবং সেখানে সে খুবই চমৎকারভাবে প্রতিটি বড় বড় মিটিং এর রিপোর্টার হিসাবে উপস্থিত থেকে বেশ নাম করে। কিন্তু সামান্য টাকায়, তার ওঠা আর পোষাল না বলে ভারতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়। অবশ্য আইডিইবি তাকে ধরে রাখার জন্যে বেশ চেষ্টা করেছিল, এমনকি পরে একটু বেশী বেতনে রাখতেও তারা খুবই আগ্রহ প্রকাশ করে। আমি তাকে বিখ্যাত সাংবাদিক শেখ দরবারে আলম সাহেবের নিকট গিয়ে সাংবাদিকতায় যোগ দেওয়ার জন্যে বলেছিলাম কিন্তু বোধকরি তার ভাগ্য ভারতের মাটিতে আটকে ছিল বলেই যেন সে এদেশ ত্যাগ করে চলে যায়। খুব চমৎকার গানের গলা ছিল তার। ওদিকে চেষ্টা করলে হয়ত অনেক উপরে উঠে যেতে পারত। মোটকথা, বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর'ও তার মধ্যে আমি টের পেয়েছিলাম। ১৯৯৩ সালে তার ছোট মামার মেয়ে বিলকিস বেগমের সঙ্গে সে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। মেয়েটি কলকাতা থেকে গ্র্যাজুয়েশন করেছিল, তার বড় খালার বাসায় থেকে। ওদের বর্তমানে দুটি চমৎকার কন্যা সন্তান রয়েছে। আসিফ একটি ভাল পাকা বাড়ী

www.pathagar.com

তৈরী করেছে। আসিফ ও বিলকিসের বিয়েতে আমিসস্ত্রীক ফারুকসহ ভারতে গিয়ে খুব আনন্দের সঙ্গে কদিন সেখানে কাটিয়ে এসেছি।

আসিফের ছোট ভাই খসরু ভারত থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে পাকাপাকিভাবে বাংলাদেশে এসে বসবাস শুরু করেছে। সে অত্যন্ত সাহসী এবং দৃঢ়চেতা ব্যক্তি হিসাবে এদেশে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। বিয়েও করেছে ঢাকায় ১৯৯৫ সালে, আমি সস্ত্রীক পবিত্র হজ্বে যাওয়ার মাত্র ২/৪ দিন পূর্বে। অত্যন্ত ভাল ছেলে হিসেবে সে আমাদের সকল আত্মীয়-স্বজনের অতি প্রিয়পাত্র হিসেবে গন্য হতে পেরেছে। খুবই পরিশ্রমী ও মেধাবী বলে সে বর্তমানে লি এন ফাং নামে একটি বিখ্যাত বিদেশী ফার্মের বায়িং হাউসে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছে। ইতোমধ্যে তার কোম্পানী তাকে কয়েকটি দেশ যেমন, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক, হংকং, আমেরিকা পর্যন্ত পাঠিয়ে সফল ব্যবসা করছে। অবশ্য মাঝে সে একবার প্রচন্ড সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয় এবং প্রায় দীর্ঘদিন কাজে যোগদান করতে পারেনি। তার হাঁটুতে কম্পাউন্ড ফ্র্যাকচার হওয়ায় ঢাকায় এবং কলকাতায় দুবার মেজর অপারেশন করা হয়। কিন্তু তবুও তার কোম্পানী তাকে ছাড়েনি বরং তার পুরো বেতনসহ চিকিৎসার যাবতীয় ব্যয় বহন করেছে দীর্ঘ কয়েক মাস। বর্তমানে তার দু'টি ছেলে রেদওয়ান ও রুম্মান উত্তরায় একটি ভাল ফ্ল্যাটে বসবাস করছে। তার নিজস্ব একটা গাড়ী ছাড়াও কোম্পানী তাকে আরও একটা নতুন গাড়ী দিয়েছে সর্বক্ষণ ব্যবহারের জন্যে। উল্লেখ্য যে, তার বিধবা মায়ের প্রতি প্রবল ভক্তিশ্রদ্ধা ও ভালবাসা যা অনেকের জন্যেই অনুকরণীয় হতে পারে। যে কোন মূল্যে সে তার মা ও ছোট বোনের প্রতি ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত। বর্তমান কালে সমাজে এটা একটা অতিবিরল ঘটনা বলা চলে। আমাকে সে ডাকে খালু আব্বা সম্বোধনে, ওর বড় ভাই আসিফ বলে খালুজান এবং ছোট বোন সুলতানা যার পিতার কথা হয়ত মোটেই মনে নেই, তাই সে আমাকে ডাকে তার পিতা বেঁচে থাকলে যেভাবে ডাকত, সেভাবেই অর্থাৎ আব্বা। আমার অন্তরের অন্ত স্থল থেকে ওদের তিনভাই বোন এবং আমার ঐ বিধবা বোনটির জন্য রইল সার্বক্ষণিক দিলী দোয়া।

www.pathagar.com

দ্বাবিংশ পর্ব

১৯৯৪ সালের ২০ জানুয়ারী ফারুকের বিয়ের দিন ধার্য্য করা হয় উভয় পক্ষের সম্মতিতে। মেয়ের পিতা জনাব শেখ আনোয়ার আলী তখন ছিলেন জনতা ব্যাংকের এজিএম, তাঁর আদিবাস ছিল ভারতের বিখ্যাত কানপুরের বালিয়া গ্রামে। অবশ্য ১৯৪৭ এর দেশ বিভাগের পরই তাঁদের পরিবারের অনেক সদস্যই চলে আসেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে এবং তাঁর তিন বোনের বিয়ে হয় পাকিস্তানের করাচী শহরে। শেখ সাহেবের এক ছেলে ও তিন মেয়ে এবং এরা সকলেই সুশিক্ষিত। মেঝ মেয়ে সামিনা আনোয়ারের সঙ্গে ফারুকের শুভ পরিনয় ঘটে ঢাকায়। মেয়ের ছবি ও বায়োডাটা কলকাতায় বড় হুজুর পাক ও ছোট হুজুর পাককে দেখান হয় ১৯৯৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমি ও আমার স্ত্রী উভয়েই হুজুর পাকের হুকুম নেওয়ার পরই বিয়ের দিন ধার্য্য করা হয় ঢাকায়। আমরা ছেলের বৌভাতের আয়োজন করি সোহাগ কমিউনিটি সেন্টারে। এবং যে বিহারী বাবুর্চি আব্দুল হক শিল্পীর বিয়েতে অতি চমৎকার রান্না করেছিল ঠিক সেই বাবুর্চিকেই আমরা রান্নার ভার দিই। এবারেও বরাবরের মত ৬০০ মেহমানের আয়োজন করা হয়। প্রতিবারের মত আমি উৎকৃষ্ট মানের নিমন্ত্রণপত্র এবারও ব্র্যাক প্রিন্টার্স থেকে ছাপাই। সরকারী নীতিমালা অনুযায়ীমাত্র ১০০ মেহমানের দাওয়াত করার ব্যবস্থা থাকায়, এই অতিরিক্ত ৫০০ মেহমানের জন্যে মাথা পিছু ২৫ টাকা হারে সরকারী তহবিলে অর্থ জমা দিতে হয়। নতুবা বেআইনি কাজের জন্য প্রতিটি মেহমানের মাথাপিছু ২৫০ টাকা জরিমানা দিতে বাধ্য। বিধায়, বাবুর্চির অনুরোধেই আমরা এই প্রকার কাজের জন্যে যথারীতি অর্থ পূর্বেই জমা দিই। তৎকালীন সময়ে সোহাগ কমিউনিটি সেন্টারই ছিল বেশ উচুমানের স্থান তুলনামূলক ভাবে। ফারুকের অফিস থেকে নির্দেশ ছিল বিয়ের কার্ডে যেন স্পষ্ট করে লেখা থাকে NO GIFT PLEASE এবং সেই কার্ডের নমুনাও তাদের কাছে বিদেশে পাঠান হয়েছিল। এতদ সত্ত্বেও যাঁরা GIFT এনেছিলেন, তাঁদের নিকট পরে তা প্যাকেট না খুলেই অতি বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে

www.pathagar.com

দিতে হয়েছিল। যেহেতু ফারুক তখন Swire & Maclaine কোম্পানীতে কাজ করত এবং বেশ উচ্চমানের বেতনভূক্ত অফিসার হিসাবে তাকে গন্য করা হতো, বলেই Walima Dinner এর কার্ড ঐ তাদের নির্দ্দেশমতই ছাপান হয়। পরিশেষে দেখা গেল আমরা যত মেহমান আশা করেছিলাম তার অনেক কম মেহমান উপস্থিত ছিলেন। দু'চারজন বিদেশী মেহমান বিয়ে উপলক্ষে এদেশে এসেছিলেন। প্রচুর খাবার ঐ কমিউনিটি সেন্টারেই বিলিবন্টন করে দেওয়া হয় অনিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মাঝে। আমার অনেক নিকট আত্মীয়ও এ বিয়েতে কেন আসেননি তা আমাদের নিকট আজও বোধগম্য নয়।

১৯৯৪ সালের মাঝামাঝি পবিত্র রমজান মাসে আমি আমার বন্ধু খান মকবুল আহমদের অনুরোধে মোহাম্মদ আব্দুর রউফ যিনি ফাজেল ওহামেয়াতুল হাদিস, করাচী কর্তৃক অনুদিত একটি বই। শাহাদাতে হোসায়েন ও খিলাফত ও মুলুকিয়াত বইটির একটি পান্ডুলিপিতে যতগুলি হাদিস আরবিতে লেখা আছে, সেগুলি আমাকে আরবীতে লিখে দেওয়ার জন্যে তিনি আমাকে খুবই অনুরোধ করেন এবং বলেন যে যদি আপনি আমার এই পান্ডুলিপিতে আরবী ভাষায় প্রত্যেকটি হাদিস লিখে দিতে পারেন তবে আমি আপনাকে আসল বইটিই দিয়ে দিব। উপরোক্ত শর্তে আমি রাজি হয়ে যাই আসল বইটি পাবার জন্যে। সেই মোতাবেক আমি ঐ পবিত্র রমজান মাসটি বেছে নিয়ে লিখতে আরম্ভ করি। আমার ড্রইং রুমে বসে এই লেখার কাজে আমি ব্যস্ত ছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল যেন কিছু লোকের পায়ের শব্দ দরজার ওপারে। আমি লেখা বন্ধ রেখে দরজা খুলে দেখি, আমার পিতাকে দুই তিনজন লোক ধরাধরি করে এই তিন তলার উপর উঠিয়ে এনেছেন। কী ব্যাপার তাঁরা বলেন, আপনার আব্বা রিকশা উল্টে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই আমরা তাঁকে তুলে নিয়ে এসেছি। নীচে রিকশা ওয়ালা দাঁড়িয়ে আছে টাকা দেওয়া দরকার। আমি আমার পিতাকে তাঁর রুমে তাঁদের সহযোগিতায় বিছানায় শুইয়ে রেখে নীচে রিকশার ভাড়া দিতে গিয়ে দেখি সে তার রিকশা নিয়ে পালিয়েছে। তেজগাঁও শিল্প এলাকার বড় রাস্তা থেকে আমাদের স্টাফ কোয়াটারের রাস্তায় মোড় নিয়ে ঢোকার সময় রিকশাটি উল্টে যায়। তখন শীতকাল আব্বা রীতিমত সুইটার ও কোট পরে ছিলেন। কিন্তু তবুও তাঁর ডান হাতের বাহুর হাড়টা ভেঙ্গে যায় এবং ডান পায়ের হিপ

www.pathagar.com

জয়েন্টটা ছুটে যায়। ফলে তিনি মোটেও দাঁড়াতে পারেন না। আমি এই দুর্ঘটনার সংবাদ ফারুককে টেলিফোনে জানালে সে কিছুক্ষণের মধ্যে তার মতিঝিলের অফিস থেকে তার মাইক্রোবাসটি নিয়ে আসে। সেদিন অফিসে তার ইফতার পার্টি ছিল। যা হোক আমার আহত পিতাকে আমি, ফারুক ও ড্রাইভার সুজন মিঞা বহু কষ্টে তিনতলা থেকে নামিয়ে সোজা শমরিতা হাসপাতলে নিয়ে যাই। ডাক্তার সঙ্গে সঙ্গে X-Ray করার নির্দেশ দেন কিন্তু ঐ বিভাগের লোকজন গড়িমসি করতে থাকে ইফতারের সময় সমাগত প্রায় দেখে। যাহোক, আমরা অনুরোধ করে X-Ray করানোর পর এবং আমরা সকলেই ওখানে ইফতার করে নিয়ে জানতে পারি সার্জেন বারী সাহেব তাঁকে তখনই ভর্তি করে নিয়ে I,C,U তে রাতটা তাঁকে রেখে বলেন, কাল সকালে তাঁকে বেড়ে দিব। আপনার আজ চলে যান।

আসলে আর মাত্র দু'দিন পর আমার পিতার ভারত যাওয়ার কথা। আমার ভাগনা নোমান জাহেদী আবুধাবী থেকে ঢাকা এসে তার নানাকে সঙ্গে নিয়ে বিমানে কলকাতা যাবে বলে তাঁর বিমানের টিকিটও কাটা হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ করে আব্বার একটা নতুন জুতা কেনার প্রবল বাসনা চাপে। আমি বলি, আপনি কলকাতা গেলেই তো সেখানে উত্তম জুতা কিনতে পারবেন। কিন্তু না, তাঁর ইচ্ছা এখানেই আজই কিনবেন। তাই তাঁকে একা না যেতে দিয়ে, আমি ছোট ছেলে ফাহিমকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে ফার্মগেটে পাঠিয়ে দিই। সেখানে তাঁর পছন্দ মত জুতা কেনার পর, ফাহিম জিজ্ঞাসা করে দাদা আপনি একা রিকশায় যেতে পারবেন না আমি সঙ্গে যাব? তিনি বলেন না আমি পারব। ফলে ফাহিম তাঁকে রিকশায় তুলে দিয়ে সে একটা সেলুনে চুল কাটাতে যায়। আমার পিতার বহু পূর্ব থেকেই জুতার প্রতি দারুন আগ্রহ থাকায় শুনেছি এক সময় তিনি ২২ জোড়া জুতা একসঙ্গে ব্যবহার করতেন। আমার শশুর জনাব সৈয়দ আলী হায়দার সাহেবেরও একই শখ ছিল। এই বিচিত্র অদ্ভুত শখটা উত্তরাধিকারসূত্রে আমার বড় ছেলে ফারুকও পেয়ে বসেছে। সে বিদেশে গেলেই সকলের জন্যে জুতা কিনবেই। মাপ ছাড়া কীভাবে সে এটা করে আমি আজও বুঝিনা। যা হোক আব্বার এই নতুন কেনা জুতা আর তাঁর পায়ে পরার সুযোগ হয়নি। বহু ডাক্তার ও বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও তিনি আর সুস্থ হয়ে চলা ফেরা করতে পারলেন না। তাঁর নাতি ঠিক দুদিন পরই আবুধাবি থেকে তার নানাকে ভারত নিয়ে

www.pathagar.com

যাওয়ার জন্য এসে তাঁর এই অবস্থা হাসপাতালে দেখে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যায়। কোন সার্জনই তাঁর পায়ের হিপ জয়েন্ট অপারেশন করতে রাজি হলনা। বরং তারা তাঁর ডান হাত অপারেশন করতে রাজী। আমার বন্ধু ড. সৈয়দ রেজা হোসেন তাঁর ডান হাত অপারেশন করতে দিতে নারাজ। সে বলে ওঠা এমনিতেই জোড়া লাগবে। অতএব অপারেশন করলে তাঁর হিপ জয়েন্টেই করতে হবে। কিন্তু ঢাকায় তেমন কোন সার্জন এটা করতে সাহস করল না। আসলে তাঁর হিপ জয়েন্টটা ডিস্ লোকেশন হয়ে যাওয়ায় এটা নিরাময়ের অসাধ্য পর্যায়ে চলে যায়। ফলে তিনি ক্রাচের উপর ভর করে মাত্র এ ঘর ও ঘর ছাড়া আর কখনও বাইরে বেরুতে পারেন নি। অথচ তাঁর স্বাস্থ্য দীর্ঘ ৮০ বছর বয়সেও বেশ অটুট ছিল। সুদীর্ঘ ৪ বছর রোগ শয্যায় পড়ে থাকার পর ১৯৯৮ সালে ৫ এপ্রিল নিউ ডি ও এইচ এস বাসায় ইন্তে কাল করে জান্নাতবাসী হন। রহিম মেটাল গোরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয় ৭ জিলহজ তারিখে।

www.pathagar.com

ত্রয়োবিংশ পর্ব

সৌদি আরব

সরকারী নাম	ঃ	আল-মামিয়াকা আল-আরাবিয়া
রাজধানীর নাম	ঃ	রিয়াদ
আয়তন	ঃ	২২,৪০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।
মুদ্রা	ঃ	সৌদী রিয়াল
ভাষা	ঃ	আরবী
মাথা পিছু গড় আয় (জিডিপি)	ঃ	৯,৬৩৫ ইউ.এস. ডলার।
গড় আয়ু	ঃ	৭০ বছর।

১৯৯৪ সালের ১১ নভেম্বর আমার LPR শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পবিত্র হজ্জ্ব পর্ব পালনের জন্যে উৎগ্রীব হয়ে পড়ি। কলকাতায় বড় হুজুর পাকের নিকট এ প্রসঙ্গে আমি পূর্বেই তাঁর অনুমতি নিয়ে রেখেছিলাম। অতএব, আমার ১২ মাসের বেতন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের থেকে তোলা কিছু টাকা নিয়ে আমার আব্বা যেহেতু পুরাপুরি অক্ষম তাঁর হুকুম নিয়ে আমার স্ত্রী সৈয়দা ফালাক আরা সহ আমার বড় চাচার মেজ মেয়ে মিসেস ডাঃ গোলাম সারওয়ার, আমার অফিসের কর্মচারী হাজী ইসলাম উদ্দীন ও তার স্ত্রীসহ এই মোট পাঁচজন ১৯৯৫ সালের ১৯ এপ্রিল সাউদিয়া এয়ার লাইন্স-এ রওনা দেওয়ার পূর্বে আমি BRI মসজিদে গোসল ও এহরাম পরে সেখানে দু'রাফাত নামাজ আদায়ের পর মসজিদের ইমাম সাহেবসহ কয়েকজন মুসল্লী আমাদের জন্য দোয়া খায়ের বাদ ওখান থেকেই বাড়ীতে আর না এসে, ফারুক তার মাকে এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনসহ দু'তিনটি গাড়ী আমদের সকলকে নিয়ে সোজা জিয়া বিমান বন্দরে যথাসময়ে উপস্থিত হই। আমাদের পবিত্র হজ্জে যাওয়ার জন্য ফারুক হংকং থেকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনে এনেছিল মাত্র ক'দিন পূর্বে। যেমন, ক্যামেরা, দু'টি ছাতা, আমার জন্যে স্যান্ডেল, টাকা রাখার জন্যে কোমরের বেলট ইত্যাদি যাবতীয় সবকিছু। বিশাল সাউদিয়া এয়ার লাইনসে বেশ প্রশস্ত জায়গা থাকায় আমরা কজন যোহরের নামাজ আদায় করে নিই। বিকেল প্রায় চারটার সময় জেদ্দা হজ্জ্ব টারমিনালে নামার পর আমাদের সকল বাংলাদেশী

www.pathagar.com

হাজীকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে একজন সৌদি অফিসার আমাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে প্রথমে আরবী ভাষায় এবং পরে ইংরেজী ভাষায় আমাদের কী কী করণীয় সে সম্বন্ধে একটা নীতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। এবং তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাদের সকলের প্রতি লক্ষ্য করে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, বোধকরি আপনি ইংরেজি জানেন? আমি হ্যাঁ সুচক সম্মতি জানালে আমাকে কাছে ডেকে আমার হাতে তাঁর হ্যান্ড মাইক্রোফোনটা দিয়ে বলেন ঃ আমি যা যা বলেছি তার সবটাই আপনি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে সকলকে বুঝিয়ে দিন। আমি তাঁর কথামত কাজ করি এবং ঠিক তার পরপরই আমাদের লাগেজ চেকিং শুরু হয়ে যায়। তারপর আমাদের বিভিন্ন কাউন্টারে গিয়ে আমাদের নির্দিষ্ট তারিখে ফিরে যাবার জন্য টিকিটটা কনফার্মড করে নিই। রাত প্রায় সাড়ে নয়টায় আমরা মক্কা শরীফের উদ্দেশ্যে একটা বাসে উঠি। একটা মাঝাড়ী বয়সের ছেলে আমাদের সকল যাত্রীর নিকট থেকে আমাদের পাসপোর্ট গুলি নিয়ে ড্রাইভারের নিকট জমা করে। পাসপোর্টের সংখ্যা অনুযায়ী আমাদের সকল যাত্রীর মাথাগুনে নেওয়ার পরই ড্রাইভার গাড়ী ছাড়ে। জেদ্দা থেকে মক্কা শরীফের যাত্রা প্রায় ঘন্টা দেড়েকের পথ। রাস্তা খুবই সুন্দর এবং পথের অনেকস্থান আলোয় ভর্তি। পথের পাশে যেসব হোটেল রয়েছে সেগুলিতেও প্রচুর আলোর মেলা। কোথাও কিন্তু ফ্লোরেসেন্ট টিউবলাইট ছাড়া অন্য কোন ফিলামেন্ট বালব জ্বলতে দেখিনি। পাশাপাশি বহু রাস্তার লেন রয়েছে যাতে মুখোমুখী কোন গাড়ীর সংঘর্ষ না বাঁধে। পথের পাশে মাঝে মধ্যে বেশ কটি ফিলিং স্টেশন চোখে পড়ার মত আলোয় আলোয় ভরা। আমরা বেশ বুঝতে পারলাম যে, একটা বেশ দরিদ্র দেশ থেকে আমরা অনেক অনেক বেশী একটা ধনীর দেশে ঢুঁকে পড়েছি। জেদ্দা এয়ারপোর্টের বিশাল বিশাল আকৃতির সুউচ্চ ছাতার মত বহু নিপুন প্রকৌশলীয় এমারত দেখেই আমরা অনেক মুগ্ধ হয়েছিলাম। আমাদের বাংলাদেশী প্রখ্যাত প্রকৌশলী জনাব এফ, আর, খান কর্তৃক এই জেদ্দা এয়ারপোর্টের নির্মাণ কৌশল গ্রহন করা হয়। তিনি আমেরিকায় টিউবুলার ডিজাইনের মাধ্যমে অতি সুউচ্চ ভবনের নকশা প্রনয়নের জন্যে সারা বিশ্বে দারুন ভাবে পরিচিত। যাই হোক এ ব্যাপারে এখানে আর বিস্তারিত কিছু লিখে আমার বইয়ে কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনা। কেননা ইতোপূর্বে আমার রচিত বই "মুসলিম বিশ্বের সফরনামা" লিখে এবং তাতে ১৮টি রঙ্গীন চিত্র এবং বেশ কিছু স্কেচ্ সম্বলিত একটি বেশ মূল্যবান পুস্তক বর্তমানে বাজারে চালু আছে। এখানে আমি কেবল সংক্ষেপে আমাদের পবিত্র হজ্জপর্ব সমাধানের একটা চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করব।

www.pathagar.com

মক্কা শরীফে রাত প্রায় ১১টার দিকে আমাদের এ,সি বাসটা যখন হাফ হায়ার এলাকায় উঠে আসে ঠিক তখনই খানেকা'বা শরীফের সুউচ্চ মিনার গুলি আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। আমরা সকলেই পথের ক্লান্তি মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠি এবং দোয়া ও দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকি। ঢাকায় আমার নেকস্ট ডোর নেইবার ছিলেন জনাব আব্দুল হক। তাঁর একজন ভাগনা জনাব শামসুল হক সাহেব দীর্ঘদিন সস্ত্রীক মক্কা শরীফে বাস করতেন। তিনিই আমাদের মক্কা শরীফে যাবতীয় ব্যবস্থা করবেন এই কথা ছিল। এবং তিনি রাত ১১ টা পর্যন্ত নির্দিষ্ট মোয়াল্লেমের ওখানে উপস্থিত থাকবেন বলে আমাকে জানিয়ে ছিলেন। আমরা তাঁকে তৎক্ষণাৎ না পেয়ে বিভিন্ন বাসা খোঁজাখুজি করতেই হঠাৎ তিনি এসেই আমাকে বলেন, মামা এই যে আমি এসে গেছি। তিনি নিজেই আমাদের জন্যে বাসা ঠিক করে রেখেছিলেন এবং সে রাতেই তিনি আমাদের জন্যে প্রচুর খাবার হোটেল থেকে নিজ ব্যয়ে কিনে খাওয়ান। আমরা পরদিন ভোরে ফজরের নামাজের আগেই ওমরা করার জন্যে সকলেই শামসুল হক সাহেবের এক বন্ধু হাজী জাহাঙ্গীর তাঁরসঙ্গে খানে কাবায় হাজির হই। এবং ফজরের নামাজান্তে আমরা সকলেই পবিত্র ওমরা পালন করে নিই। আমি এবং হাজী ইসলাম উদ্দীন ওমরা শেষে একটা ভাল সেলুনে গিয়ে মাথা ন্যাড়া করে নিই। উল্লেখ্য যে, আমরা সরকারী ও বেসরকারী কোন দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গেঁই যোগদান করে পবিত্র হজ্জে যাইনি। আমার ছেলে ফারুক আমাকে বলে, আব্বা আপনি তো শিক্ষিত লোক উপরন্তু বেশ কয়েকটি ভাষা জানেন। অতএব, আপনি নিজেই এই ছোট্ট পাঁচজনের একটি দল নিয়ে স্বচ্ছন্দে পবিত্র হজ্জ পর্ব সমাধা করতে পারবেন বলে আমার বিশ্বাস। বাস্তবিকই তার কথামত আমি তাই করেছিলাম এবং কোথাও কোন অসুবিধা বোধ করিনি। এরপর আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতার পক্ষ থেকে ওমরাহ্ পালন করি। তখনও হজ্জের বেশ দেরী দেখে প্রথমে মক্কা শরীফ থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা মিনা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে আসি এবং তার দু'একদিন পরই আমরা মদিনা শরীফে গিয়ে হুজুর আকদস (সাঃ) মসজিদে নব্বীতে লাগাতার ৪০ ওয়াক্ত নামাজ আমাদের আদায় করার সৌভাগ্য হয়েছিল অত্যন্ত সুন্দরভাবে। সুদীর্ঘ নয়দিন পর আমরা মদিনা শরীফ থেকে মক্কা শরীফের পথে মিকাত মসজিদে আমি এহরাম পরিধান করি আমার মায়ের পক্ষ থেকে ওমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে এবং মক্কা শরীফে পৌছার পরপরই ওমরাহ্ পালন করে নিই। এভাবে আমি আরও দু'একটা ওমরাহ্ পালন করতে চেয়েছিলাম। কিন্তুশামসুল হক সাহেব আমাকে বলেন, মামা আপনারা তো এখানে এসেছেন পবিত্র হজ্জ পালনের

www.pathagar.com

উদ্দেশ্যে। অতএব, বেশী বেশী ওমরাহ্ পালন করতে গিয়ে যদি আপনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং হজ্জের প্রধান ফরজ অকুফে আরাফা অর্থাৎ ৯ জিলহজ্জ্ আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করতে না পারেন, তবে তো আমরা আপনাকে হাজী বলব না। সুতরাং যাতে সুস্থ থেকে ভালমত হজ্জ্ব করতে পারেন এটাই আপনাদের সকলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ। কেননা, বছরের যে কোন সময়ে আপনি ওমরাহ্ করতে পারবেন। অথচ এই জিলহজ্জ মাসের ৭/৮ তারিখ থেকে ১২/১৩ তারিখের মধ্যেই কেবল মাত্র হজ্জব্রত পালনের একমাত্র নির্দিষ্ট সময়। আমি তাঁর এই মূল্যবান উপদেশ মেনে নিয়েছিলাম। আমি তাঁকে কথায় কথায় একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা বলুন তো দেখি সৌদী সরকার এবার আমাদের হাজী সাহেবানদের জন্যে কী করেছেন? হক সাহেব বলেন মামা এবার আপনাদের জন্যে সৌদি সরকার ৭,৫০০ কোটি ডলার হজ্জ্ বাজেট ধরেছে, মাগরিব থেকে অর্থ্যাৎ আফ্রিকা থেকে সাড়ে দশ হাজার A,C,BUS ড্রাইভার সহ ভাড়া করেছে। মিনা থেকে আরাফাতে যাওয়ার জন্যে মাত্র দু'টি রাস্তা ছিল, কিন্তু এবার ১২টি রাস্তা নতুন ভাবে তৈরী করা হয়েছে। বড় শয়তান, মেজ শয়তান এবং ছোট শয়তানকে মিনাতে পাথর মারার জন্যে বিশেষ ভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। উপরন্তু প্রতি বছর হাজী সাহেবানদের সংখ্যাধিক্যের জন্যে খানায়ে কাবা এবং মসজিদে নব্বীতে স্থান সংকুলানের জন্যে অনেক প্রশস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনি আরও জেনে আশ্চর্য হবেন যে, মসজিদে নববীতে প্রায় ছয় লক্ষ হাজী সাহেবানদের A,C 'র মধ্যে নামাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাস্তবিকই তাই, কেননা হাজী ইসলাম উদ্দীন মাত্র কয়েক বছর পূর্বে হজ্জ পর্ব সমাধা করে ঢাকায় ফিরে গেলে, তার সঙ্গে আমি কোলাকুলি করতে গেলে সে আমাকে বলে স্যার, আমি আপনার সঙ্গে আবার হজ্জে যাব। আমি বলি সে তো অনেক দেরী আছে। আর তাছাড়া একবার হজ্জ করা ফরজ, সুতরাং তুমি আবার যাবে কেন? সে বলে না আমার মন ভর নাই। তা ছাড়া আমি তেমন লেখাপড়া না জানায় ভালমত বোধ হয় সবকিছু সমাধা করতে পারিনি। আমি তাকে সান্তনা দিয়ে বলি, ঠিক আছে মহান আল্লাহ পাক আমাকে হজ্জে নিলে তুমি অবশ্যই যাবে। এবং ঠিক তাই, সে সস্ত্রীক আমার সঙ্গে হজ্জে গিয়ে আর কোন কিছুই চিনতে পারে না। বলে আমি তো এতো কিছু তখন দেখিনি। শামসুল হক সাহেব জিজ্ঞাসা করেন আপনি ক'বছর আগে এসেছিলেন? সে বলে ৭/৮ বছর পূর্বে হবে। হক সাহেব বলেন; এগুলিমাত্র ৬ মাস পূর্বে সম্পন্ন করা হয়েছে। অতএব, আপনি কীভাবে চিনবেন? আমি নিজে সেখানে গিয়ে যা বুঝতে পেরেছি তা হল, মহান আল্লাহ পাকের

www.pathagar.com

বিশেষ রহমত বা মেহেরবানী ছাড়া এই পবিত্র হজ্জ নসীব কখনও সম্ভব নয়। অর্থ এবং সুস্বাস্থ্য এই দুটি যদিও হজ্জের পূর্বশর্ত। কিন্তু তবুও বহু বিত্তবান এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এমন কি উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষেও হজ্জ পর্ব সমাধা করা সম্ভব হয়নি তাঁদের প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, এমন নজির মোটেই বিরল নয়। এ পৃথিবীতে তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। আমি পৃথিবীতে এ পর্যন্ত যতগুলি দেশ, এশিয়া ও ইউরোপ মহাদেশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছি তার মধ্যে একমাত্র মক্কা শরীফ ও মদিনা শরীফ এই দু'টি পবিত্র শহরকে আমার মনে হয়েছে কেবলমাত্র নামাজমুখী শহর। এছাড়া আর কোন প্রকারের চিত্ত বিনোদনের কোথাও কোন প্রকার প্রকরণ আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। এমনকি শিশুদের জন্যেও কোন প্রকার খেলার মাঠ বা আমোদ প্রমাদের ব্যবস্থা কিছু আছে কিনা আমি তা চেষ্টা করেও জানতে পারিনি। এই দু'টি পবিত্র শহরে কোথাও কোন অশ্লীল বা দৃষ্টিকটু কোন দৃশ্য আমার সন্ধানী দৃষ্টিতে পড়েনি। তাছাড়া পবিত্র মক্কা শহরের বাইরে বিশাল এলাকা জুড়ে চতুর্দিকে কোন অমুসলিমের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষেধ তা বিরাট আকারে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় স্পষ্ট ভাবে লিখিত সাইনবোর্ড লাগান আছে।

প্রচুর জনবহুল এই দুই পবিত্র শহরে কেবলমাত্র তিনটি প্রধান কাজ আমাদের চোখে পড়েছে। তা হচ্ছে প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাজের সময় আজানের পরপরই নামাজ আরম্ভ, খানায়ে কাবার নামাজের পরপরই তাওয়াফ বা প্রদক্ষিণ, উত্তম খাবার সর্বত্র পাওয়া যায় প্রয়োজন মত প্রয়োজনীয় ঘুমের ব্যবস্থা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের বহুল প্রচলন প্রায় সর্বক্ষণ বিরাজমান। এ ছাড়া শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে উত্তমরূপে তবে সে তুলনায় শিক্ষার্থীর অপ্রতুলতা উল্লেখ্যযোগ্য।

পবিত্র হজ্জের সময় আমরা প্রচন্ড ভীড়ের কারণে পবিত্র হাজরে আসওয়াদ বা পবিত্র কালো পাথরে চুম্বনদান করার সুযোগ লাভ করতে পারিনি। আমার স্ত্রী তাঁর পক্ষ থেকে মাত্র একটি ওমরাহ ও হজ্জ পর্ব সমাধা করতে পেরেছেন। যদিও তাঁর নিজের পিতামাতার জন্যে আরও দুটি ওমরাহ্ পালন করার প্রবল বাসনা ছিল কিন্তু তাঁর পায়ের ব্যাথার কারণে সেটা সম্ভব হয়নি। অবশ্য প্রথম দিনেই আমরা কাবা শরীফের দরজার উপর অর্থ্যাৎ মুলতাজীমে দুই হাত দ্বারা স্পর্শ করে আমাদের গোনাহ্ মাফের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলাম অথচ সামান্য মাত্র দু হাত দূরত্বের ব্যবধানের জন্যে পবিত্র হাজারে আসওয়াদ চুম্বন করা সম্ভব হয়নি। প্রচন্ড ভীড়ের মধ্যে যারাই ঐভাবে চুম্বনের চেষ্টা করেছেন তাঁরা প্রায় অধিকাংশই কম বেশী আহত হয়েছেন। তাছাড়া ধাক্কা ধাক্কি করে চুম্বন করা ধর্মীয় ভাবে নীতিবিরুদ্ধ কাজ।

www.pathagar.com

সেখানে কেবলমাত্র দুর থেকে দু'হাত উঠিয়ে দোয়া প্রার্থনা করাই যথেষ্ট। আমি হেরা পাহাড়ের গুহায় উঠতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার ষাট বছর বয়সে এরূপ বিপদ সঙ্কুল কাজে আমাকে বিরত রাখার নিষেধাজ্ঞা আমি মেনে নিই। উপরে উঠার তেমন কোন সিঁড়ি নেই, অথচ প্রায় খাড়া পাহাড়ের উপর উঠা মোটেই সহজ নয় বিশেষত বৃদ্ধব্যক্তিদের জন্যে। যা হোক আমরা সকলে মহান আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতে পবিত্র হজ্জ পর্বের মত একটি ফরজ এবাদত শেষে ঠিক পূন্য একমাস পর অর্থাৎ ১৯ মে ১৯৯৫ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করি, আলহামদোলিল্লাহ। কাবা শরীফের ভিতরে অর্থাৎ প্রকান্ড মসজিদের মধ্যে কোথাও কোন ছবি তোলার বিধান নেই বলে, এমনকি মসজিদে নব্বীর ভিতরেও কোন ছবি তোলার নিয়ম নেই বলে আমি তা থেকে বিরত থাকি। তবে বাইরে অনেক ছবি তুলেছিলাম। সংক্ষেপে এ পর্যন্ত আমাদের হজ্জ পর্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ করলাম। কেননা ১৯৯৬ সালের ১৪ আগস্ট আলগিলামী ট্যাভেলস্ এর মাধ্যমে ৩০ জন সহযাত্রী ৪০ দিনের জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান প্রধান মসজিদগুলিতে জুম্মার নামাজ আদায়, ইসলামের প্রধান ও পবিত্র স্থানসমূহ জিয়ারতের মাধ্যমে পবিত্র জেরুজালেম থেকে ইরাকের বাগদাদ শরীফে হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর (রহঃ) ওরস্ মোবারকে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ সম্বলিত আমার লিখিত পুস্তক 'মুসলিম বিশ্বে সফরনামা' তে পবিত্র হজ্জের ব্যাপারে যাবতীয় দোয়া কালাম সহ করণীয় সবকিছু উল্লেখ করা আছে।

সমস্ত ভারত ঘুরে দেখার একটা প্রবল বাসনা আমাকে পেয়ে বসে। অতএব ১৯৯৬ সালের প্রথম দিকে আমার বোনের সর্ব কনিষ্ঠ কন্যা নাসরিন সুলতানা ওরফে ইতির বিয়ে উপলক্ষে আমি বাংলাদেশ থেকে একাই যাত্রা করি। বর্দ্ধমান শহরে তার বিয়ের যাবতীয় ব্যবস্থা করা করা হয় অতি সুচারুভাবে। বরপক্ষ আসে হাওড়া জেলার শিবপুরের মোল্লাপাড়া থেকে। বরের নাম ফরিদুল ইসলাম মোল্লা একজন ভারতীয় রেল কর্মচারী। আমার ভাগনা নোমান জাহেদী তার বোনের এই শেষ বিয়েতে আবুধাবী থেকে এসে যথেষ্ট খরচপত্র করে। বিয়ের শেষ দিনে কনে ও বরযাত্রীদেরসহ আমিও কলকাতার পথে যাত্রা করি এবং বৌ-ভাতের অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে ভারত ভ্রমনের জন্যে প্রস্তুতি নিতে থাকি।

আমার এক খালাত ভাই মুন্নার পরামর্শ মত আমি কলকাতায় ফেয়ারলী প্লেস থেকে ১০০ ডলারের মাধ্যমে তিন সপ্তাহের জন্যে একটা Indrail Pass কিনে নিই। যেটি কেবলমাত্র বিদেশী নাগরিকদের জন্যে এই সুবিধা রয়েছে। আমি কোথায় কোথায় যাব এবং ক'দিন করে থাকব তার একটা ভ্রমন সূচী আমি সেখানে বুকিং

www.pathagar.com

অফিসারকে দিই। এবং তিনি প্রায় ২ ঘণ্টার মত সময় নিয়ে আমার ঐ ভ্রমন সুবিধা রিজার্ভেশন সহ ঐ সমস্ত স্থানের রেল স্টেশনে ই-মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দেন। আমাকে তিনি বলেন, আপনি মনে রাখবেন দীর্ঘ ২১ দিনের পর রাত ১২টা পর্যন্ত আপনার টিকিটের মেয়াদ। অতএব, আপনি অবশ্যই তার অতিরিক্ত ভ্রমন করবেন না। যখন যেখানে নামবেন, সে স্টেশনেই আপনার পরবর্তী যাত্রার টাইম টেবিলটা ঠিক করে নিবেন তাহলে আর কোন অসুবিধা হবে না। ভারতীয়রা এই সুবিধা তাদের রেল কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে আজও পায়নি। কেননা, এটা কেবলমাত্র বিদেশী নাগরিকদের জন্যেই এই সুবিধাটা রয়েছে। আমি ভ্রমন সুবিধার জন্যে ভারতের একপথ দিয়ে শুরু করে অন্য পথে ফিরে আসি অর্থাৎ রাউন্ড এবাউট ট্যুর যাকে বলে।

অতএব ১৯৯৬ সালের ১৩ মার্চ রাত সাড়ে আটটার মধ্যে আমি হাওড়া স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দিই যদিও আমার ট্রেন পুরী এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় ছিল রাত ১০টার দিকে। যেহেতু সেদিন ইডেনে খেলা ছিল ভারত বনাম শ্রীলংকা। সুতরাং আমার মেজমামা মেহবুব জাহেদী তখন ছিলেন হজ্জমন্ত্রী আমাকে তিনি বলেন ইডেনের খেলা শেষ হবার পূর্বেই বেরিয়ে পড়, নতুবা তুমি সময় মত হাওড়া স্টেশনে পৌঁছাতে পারবেনা। অতএব, আমি তাঁর কথামত একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া স্টেশনে বসে টেলিভিশনে পুরো খেলা দেখার সুযোগ পেলাম এবং ঐ খেলায় শ্রীলংকার জয় হয়। পুরী একপ্রেস ছাড়ল রাত ১০টার পর এবং পরদিন সকাল ১০টার দিকে পুরী পৌঁছাল। স্টেশনে নেমেই সামান্য কিছু নাস্তা করে নিলাম। তারপর একটা রিকশাওয়ালা কে ঠিক করলাম সমস্ত পুরী শহরটা এবং পুরী সমুদ্র সৈকতসহ ঘুরে দেখার জন্যে। পুরী ছোট শহর তবে বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর, সী বিচের দিকেই প্রথম গেলাম। সেখানে অনেক বড় বড় হোটেল সারিবদ্ধ ভাবে তৈরী করা হয়েছে। জগন্নাথের বিশাল মন্দির, তবে আমার মুখে দাড়ি থাকায় কয়েকজন পান্ডা আমার পিছন পিছন ঘুরেও কোন সুবিধা করতে পারলনা। কেননা মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করার কোন আগ্রহ আমার ছিলনা। সেখানে পাঁচতলা একটা লাইব্রেরী। উপর তলায় গিয়ে আমি কিছু ছবি তুলে নিই। পুরীতে কোন কোন মন্দিরে প্রবেশ দারের সম্মুখে লেখা আছে কেবলমাত্র হিন্দু ছাড়া অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ। এরপর আমি বাসযোগে ভূবনেশ্বরের পথে যাত্রা করি। বাসে এক ভদ্রলোক আমাকে জানালেন যে পুরী শহরের মধ্যে 80% Land is Occupied by the Hindu

www.pathagar.com

Temples and 20% land is left for the common people, অর্থাৎ ৮০ ভাগ ভূমিই হিন্দু মন্দিরগুলির দখলে এবং মাত্র ২০% ভাগ ভূমি সাধারণ মানুষের জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ঐদিনই দুপুরের মধ্যে ভুবনেশ্বরে পৌছে যাই। আমি দুপুরের খাবারের জন্যে ভাল হোটেল খুঁজতে গিয়ে চমৎকার উঁচুমানের রেস্টুরেন্ট পেয়ে যাই। যেটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পান্থনিবাস হোটেল। সেখানে নানা দেশীয় খাবারের সুন্দর ব্যবস্থা আছে দেখে আমি চাইনিজ খাবার পছন্দ করি। হাত মুখ ধুতে গিয়ে অজু করে নিই। এরপর নামাজ পড়ার জন্যে তাদের নিকট অনুমতি চাই, কিন্তু কেউই সে অনুমতি দিলনা। অথচ অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ দোতলা পর্যন্ত। আমি মাত্র ১০ মিনিটের জন্যে সময় চেয়েও নিরাশ হই। কিন্তু যেহেতু আমি অজু করেছিলাম, অতএব আমারও জিদ চেপেবসে যে, নামাজ না পড়ে আমি এখান থেকে যাবনা। শেষে, প্রাঙ্গনে চমৎকার ঘাসের উপর ছোট ছোট শাল গাছের ছায়ায় আমার প্রকান্ড তোয়ালেটা বিছিয়ে খুব আরামের সঙ্গে নামাজ পড়ে নিই। অবশ্য সে সময় বেশ গরম আবহাওয়া ছিল। চতুর্দিকে পাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা রয়েছে প্রাঙ্গন এবং একজন প্রহরী কেবল আমাকে লক্ষ্য করছিল। যা হোক, পরে আমি সেখানে বিখ্যাত সরকারী যাদুঘরে গিয়ে বেশ কিছু ভাল জিনিষ দেখার সুযোগ পাই। এরপর বিকেলের দিকে চলে যাই লিঙ্গরাজ মন্দির দেখতে। বহু প্রাচীন এই মন্দির অতি উচ্চতা বিশিষ্ট। পুরীতে সর্বমোট মন্দিরের সংখ্যা হল ১,২৫,০০০ এবং ভূবনেশ্বরে মন্দিরের সংখ্যা হল এক কম ১,০০০০০ ভূবনেশ্বর রেলস্টেশনের এক কোনায় আসর, মাগরিব ও এশার নামাজ পড়ে নিই।

রাত ১০টার দিকে করমন্ডল এক্সপ্রেস ধরে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে। ভারতের প্রধান চারটি বড় শহরের মধ্যে মাদ্রাজ একটি। দীর্ঘ যাত্রার জন্যে চুরির ভয়ে ভুবনেশ্বর রেলস্টেশন থেকে প্রায় এক কেজি ওজনের একটি লোহার চেন তালা চাবিসহ কিনে নিই যাতে লাগেজটা সিটের নীচে বেঁধে রাখা যায়। আমার রিজার্ভেশন সবসময়ই লোয়ার বার্থ নিয়েছিলাম যাতে ঘুমাতে এবং নামাজ পড়তে কোন অসুবিধা না হয়। ভারতের রেলকর্তৃপক্ষের যত ধরণের রেলগাড়ী আছে, তার মধ্যে Coromandal Express একটি সুপার ফাস্ট ট্রেন। যার গতি অতিদ্রুত এবং স্টপেজ অনেক কম। সেদিন ছিল শুক্রবার ১৫/০৩/১৯৯৬ সুতরাং ফজর থেকে মাগরিব পর্যন্ত ট্রেনেই নামাজ পড়তে বাধ্য হই। কলকাতা থেকে মাদ্রাজের দূরত্ব ১৭০০ কিঃমি। অতএব সারারাত এবং পরের দিন শেষে রাত সাড়ে সাতটায় আমি মাদ্রাজ পৌঁছাই, তাও

www.pathagar.com

কিন্তু ভূবনেশ্বর থেকে। মাদ্রাজেরও তিনটি রেল স্টেশন। আমি স্টেশন থেকে নিকটেই সিদ্দিক সারাই (SIDDEQUE SARAI) এ গিয়ে উঠেই দেখি দোতালায় এশার নামাজের বড় জামাত শুরু হয়েছে। আমি যেহেতু অজুতেই ছিলাম, অতএব সোজা গিয়েই নামাজের জামাতে শরীক হয়ে যাই। মনটা এমনিতেই খারাপ ছিল যেহেতু জুম্মার নামাজ পড়তে পারিনি। তাই এই এশার নামাজ পড়ার পর কিছুটা তৃপ্তি পেলাম তখন বাজে রাত ৮ টা। জনৈক চৌধুরী সাহেব ছিলেন জমিদার ও খুব ধনী ব্যক্তি। তিনিই মুসলমান পর্যটকদের জন্যে এই বিশাল কয়েকতলা বিল্ডিংটা ওয়াকফ করে দিয়ে যান বহুপূর্বে। সামান্য খরচার বিনিময়ে যে কোন মুসলিম তার পরিবারসহ পর্যন্ত থাকার ব্যবস্থা আছে। সেইরাতে কোন রূপ ভাড়া না পেলেও পরের দিন সকালেই আমি একটা একক কামরা পেয়ে যাই। ১৬/০৩/৯৬ শনিবার সকাল ৮টায় বাসযোগে মাদ্রাজ শহরের বাইরের যতগুলি সী বীচ আছে, ক্রোকোডাইল পার্ক, স্নেকপার্ক এবং আরও বহু কিছুদর্শনের পর রাত সাড়ে আটটায় ২৪৫ কিঃমি পথ ভ্রমন সম্পন্ন করি। পথিমধ্যে আমরা চারজনের একটি গ্রুপের মধ্যেই ভ্রমন করি। এদের মধ্যে একজন আফ্রিকান ইঞ্জিনিয়ার (নিগ্রো), ব্যাংগালোরের অধিবাসী এল,টি রামাচন্দ্র, একজন ক্যানাডিয়ান লেডি এবং আমি বাংলাদেশী। আমাদের সকলেই চমৎকার ইংরেজিতে কথাবার্তা বলায় কোন প্রকার অসুবিধা হয়নি, এই সুদীর্ঘ সময় বেশ আনন্দেই কেটেছে বলা চলে। তবে রামাচন্দ্র ছেলেটি তুলনামূলকভাবে আমাদের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়ায় সে আমাদের প্রতিটি কাজে খুবই সাহায্য করেছে। যেমন কোন রেস্টুরেন্টে বসে খাওয়ার সময় সেই সবকিছু আনা নেওয়া করেছে। আমি যোহরের নামাজ পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করায় সে আমাকে একটি হিন্দু পরিবারের নিকট নিয়ে গিয়ে আমার হাতে পায়ে পানি ঢেলে আমাকে অজু করতে সাহায্য করেছে স্বতস্ফূর্ত ভাবে। এভাবে সে আমার প্রিয়বন্ধু হয়ে যায়। ক্যানাডিয়ান লেডি একটা সানগ্লাস সী-বিচের ধারে কিনতে গিয়ে আমরা তাকে সাহায্য করি দরদাম করতে। পরিশেষে, রামাচন্দ্র যখন শুনল যে আমি ব্যাঙ্গালোর যাব, তখন সে আমাকে তার ঠিকানা লিখে দেয় যেন অবশ্যই আমি তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করি। পথে একটা বৃহৎ মন্দিরের ভিতর ঠাকুর দর্শনের জন্যে ইঞ্জিনিয়ার এবং ঐ লেডি একসঙ্গে ভিতরে চলে যায়। এবং পুরহিত ঠাকুর তাদের দুজনকে সম্ভবত স্বামী স্ত্রী ভেবে বেশ কিছু আচার আচরণ করে। আমি কেবল বাইরে দাঁড়িয়ে মজা দেখি। এক ভারতীয় দম্পতি তাদের ছোট বাচ্চাকে মেম সাহেবের কোলে হঠাৎ তুলে দিয়ে ওদের ছবি তুলে নেয়।

www.pathagar.com

১৭/৩/৯৬ রবিবার বেলা ২টা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা পর্যন্ত আমরা বাস যোগে মাদ্রাজ শহরের ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখি। প্রকৃতপক্ষে মাদ্রাজ শহরটা আমার বেশ সুন্দর, পরিস্কার ও পরিচ্ছন্ন মনে হয়েছে। রাস্তাগুলি সবই যেমন প্রশস্ত তেমনি চমৎকার। সিদ্দিক সারোয়ারের নিকটেই অতি চমৎকার মিউনিসিপ্যালিটি করপোরেশন। প্রায় সব বিল্ডিংই কমবেশী দেখতে বেশ সুন্দর। মধ্য মার্চ মাস কিন্তু তবুও চমৎকার আবহাওয়া। শহরের মধ্যেই প্রচুর দর্শনীয় মন্দির এবং নানা ফুলের সমাহার সম্বলিত বাগান। সাধারণ লোকজনের গায়ের রং ময়লা কিন্তু পোষাক পরে ধবধপে সাদা লুঙ্গী এবং তা অনেকেই হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে রাখে। পথে রিকশা বা অটো তেমন বেশী নেই। আবার ডাক দিলেও সহজে সাড়া দেয়না। নিঃসন্দেহে মাদ্রাজ বেশ বড় এবং প্রচুর ধনীব্যক্তির বাসস্থান ফলে, অনেক বিল্ডিং-ই নতুন এবং অত্যন্ত সুন্দর আর্কিটেকচারের স্পর্শ রয়েছে তাতে, যা বেশ মনমুগ্ধকর। ভারতের বিখ্যাত চিকিৎসা কেন্দ্র এখান থেকে কিছু দূরে ভেলোরে। ট্রেনে অথবা বাসে যাওয়া যায়। বাংলাদেশের বহুরুগী তাদের চোখ, কিডনী ও হার্ট অপারেশনের জন্যে একটা গ্রামের মত ক্যাম্প করে আছেন সেখানে। বর্তমানে অনেক ভারতীয়রা সেখানে চিকিৎসার সুবিধা নিয়ে থাকেন। আমি যেহেতু কোন রোগের চিকিৎসা করাতে যাইনি, তাই ভেলোর পর্যন্ত যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি। ঐ দিনই রাত ৭-৩৫ মিঃ মাদ্রাজ আলেপী এক্সপ্রেস (Madras Alleppe Express) ধরি ইরনাকুলাম শহরের উদ্দেশ্যে।

১৮/৩/১৯৯৬ সকাল ৯টায় আমি পৌছাই ইরনাকুলাম শহরে। সকাল বেলার নাস্তা করার জন্যে দেখি দূরে একটি দ্বীপের সাইন বোর্ডে খুব বড় করে লেখা আছে ইংরেজিতে BULGATTY PALACE HOTEL. মোটরলঞ্চে করে সেখানে যাই। অতি চমৎকার দৃশ্য। চতুর্দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত, এটি একটি দ্বীপই বটে। প্রায় এক একর জমির উপর তৈরী ঐ বাগান ও কাঠের দ্বিতল ভবন। আসলে এটি ছিল কোন রাজার বাসভবন। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই হোটেলেই বেলা দশটার দিকে নাস্তা করলাম। পাউরুটির টোস্ট, জেলি, মাখন এবং ২টি ডিম পোচ ও এক কাপ চা বার টাকা, সবমিলে ৪০/৫০ টাকার মত। অনেক ছবি তুললাম সেখানে। এরপর আমি চলে যাই কোচিন সিটি দেখতে। সেটাও বেশ দেখার মত চমৎকার এবং বেশ পরিস্কার ছোট্টশহর।

দুপুর ১:৫০ মিনিটে আমি কোচিন ত্যাগ করি ত্রিভান্দ্রাম শহরের উদ্দেশ্যে এবং রাত ৭.৩০ মিনিটে সেখানে বড় জুম্মা মসজিদে এশার নামাজ পড়ার পর নিকটবর্তী

www.pathagar.com

রেল স্টেশনের উপর তলায় ডরমাটোরিতে রাতের বিশ্রাম গ্রহন করি। অতি প্রত্যুষে উঠে প্রাতঃক্রিয়াদি ও গোসল ইত্যাদি শেষে ঐ জামে মসজিদেই ফজরের নামাজ আদায় করি। ত্রিভানদ্রাম শহর বেশ সুন্দর ও খুব বড় শহর। সমগ্র দাক্ষিনাত্যর মধ্যে সম্ভবত এই শহরের রাস্তা গুলি অত্যন্ত সুন্দর এবং বেশ উঁচু মানের। সকাল ৭টার দিকে আমি রেলস্টেশনে উপস্থিত হই এবং ভারতের সর্বনিম্নে অবস্থিত প্রখ্যাত ও বিখ্যাত কন্যাকুমারীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। যেটা দেখার বাসনা ছিল আমার বহুদিনের, ইতোপূর্বে সেখানকার বেশ কিছু সুন্দর ফটোগ্রাফ দেখার পর।

১৯/৩/১৯৯৬ সকাল দশটায় আমি কন্যাকুমারী রেলস্টেশনে পৌঁছে একটা বেবী ট্যাক্সী নিয়ে বলি আমাকে একটি ভাল হোটেল যেটা ভারত মহাসাগরের কাছেই অবস্থিত সেখানে নিয়ে চল। ড্রাইভার ঠিকই আমাকে একটি চমৎকার হোটেলে নিয়ে যায়। পাঁচতলা হোটেলের একটি একক কামরা ভাড়া নেই। দুপুরে উত্তম রূপে কিছু কাপড় ধুয়ে নেই এবং গোসল করি পুনরায়। বাইরে শান্তিনিকেতন হোটেলে মাছ ভাত খেয়ে হোটেলে ফিরে এসে একটু বিশ্রাম নেই। বিকেলে দিকে বেরিয়ে পড়ি ছোট্ট শহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখতে। কন্যাকুমারী নামের সঙ্গে যেন কোথাও অদ্ভুতভাবে একটা মিল আছে। ভারত মহাসাগরের মধ্যে একটু দূরে রয়েছে 'স্বামী বিবেকানন্দ রক'। এপার থেকে দেখতে একটা ছোট্ট দ্বীপের মত দেখায়। সেখানে যাবার জন্যে স্টীমার রয়েছে বহু দর্শনার্থী লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছে। আমিও টিকিট কেটে তাদের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ি। ওখানে গিয়ে দেখি বিশাল আকারের এক প্রকান্ড পাথরের মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি কামরা এবং সবখানেই কেবলমাত্র স্বামীজির কীর্তিকলাপ তুলে ধরা হয়েছে। একটি বিশাল হলরুমে স্বামীজির প্রকান্ড আকারের এক কালো পাথরের তৈরী প্রস্তর মূর্তি আপাদমস্তক দন্ডায়মান অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু ছবি তোলা নিষেধ বিধায় ঐ মূর্তিটি ছাড়া আরও বহু ছবি তুললাম। তাঁর লিখিত বহু বই ও উপদেশাবলী সেখানে বিক্রি হচ্ছে। আমিও কিছু কিনলাম। ঐ প্রকান্ড প্রস্তরখন্ডের উপর মহাসাগরে উত্তাল জলোচ্ছাস আছড়ে পড়ার দৃশ্য দেখার মত, অনেক ছবিও তুললাম। বহুলোকের দেখার ও চলাচলের সুবিধার জন্য দড়ি দ্বারা পথ ঘিরে দেওয়া আছে। প্রায় ঘন্টা দেড়েক সেখানে কাটিয়ে অবার স্টীমারে করে তীরে ফিরে আসি। ওখান থেকে শ্রীলংকা দেখা যায় না বটে, তবে জলযানে হয়ত ঐ একটাই পথ শ্রীলংকা যাবার। তীরে দেখি বেশ কিছু ভিউ কার্ড বিক্রি হচ্ছে। আমিও কিছু কিনলাম, যা আমার ক্যানন ক্যামেরায় তোলা অপেক্ষা অবশ্যই অনেক দামী ছবি হবে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের ছবি দেখে ধরা মুশকিল কোনটি কী?

www.pathagar.com

আমি অনেককেই পরীক্ষা করে সঠিক উত্তর পাইনি। ফটোগ্রাফি সম্বন্ধে বিপুল ধারণা না থাকলে, সঠিক উত্তর দেওয়া সত্যিই সুকঠিন ব্যাপার। সন্ধ্যার পর আবার পায়ে হেঁটে ছোট্ট শহরটাকে আরেকটা রূপে দেখতে পেলাম। আমি যে হোটেলে ছিলাম সেখানেও বেশ কিছু ছবি তুললাম। কমদামেও থাকা যায় এমনও অনেক হোটেল একটু ভিতরের দিকে আছে দেখলাম। রাতের খাবার পর হোটেলে ভালভাবে ঘুমিয়ে ফজরের নামাজ পড়ার পরপরই ছাদের উপর গিয়ে দেখি বহু দর্শনার্থী ক্যামেরা নিয়ে সূর্যোদয়ের ছবি তুলতে ব্যাস্ত তখনও কিন্তু কিছুটা অন্ধকার আছে। আমিও তুললাম ভারত মহাসাগরের বুকচিরে যে রক্তলাল সূর্য্যের উদীয়মান দৃশ্য, সে এক অদ্ভুত অনুভূতি যা কেবলমাত্র দেখার বস্তু, কোন ভাষাতেই বোধকরি বুঝিয়ে বলার নয়। আমি তো এক দুর্বল লেখক মাত্র আমার বাংলা ভাষাজ্ঞান বোধকরি তার চেয়েও অনেক বেশী দুর্বল। কন্যাকুমারী যেহেতু টারমির্ণাল রেলস্টেশন সে জন্যে সেখানে পূর্ব থেকেই ট্রেন দাঁড়িয়ে ছিল। ভোর সাড়ে ছটায় ট্রেন ছাড়ার পূর্বে রেলস্টেশনে একজন শিখসাধুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর বাড়ী পাঞ্জাবের অমৃতসরে। তিনি তৎকালীন ভারতীয় রেলমন্ত্রী জাফর শরীফের নিকট থেকে All India First Class A.C Rail Pass নিয়ে ভারত ঘুরেন। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ হয় আমার।

২১/০৩/১৯৯৬ ভোর সাড়ে ছটায় ব্যাঙ্গালোর রেলস্টেশনে পৌঁছেই দেখি চমৎকার বাহারী ফুলের এক প্রকান্ড বাগান। একটা বেবী ট্যক্সি ভাড়া চায় ৮০ রূপী অথচ আমাকে এল, টি রামাচন্দ্র বলেছিল তার বাসা 5th Cross এ যেতে মাত্র ১৫/২০ রূপীর বেশী নয়। আমি ট্যাফিক পুলিশের সাহায্য নিলে পুলিশ নিজে জোর করে মিটার ঘুরিয়ে চালু করে দেয় এবং আমাকে বলে ২০ রূপী দিবেন তাকে। বাস্তবিকই বেশীদূর নয় রামাচন্দ্রের বাড়ী। তার বাসায় গিয়ে দেখি সে নেই। প্রাতঃভ্রমনে বেরিয়েছে বলল তার এক আত্মীয়। আমি তার জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে একটু অপেক্ষা করতেই দেখি দূর থেকে সে আমাকে দেখেই ছুটে আসছে আমার দিকে। আমার সামান্য মালপত্র তার বাসায় রেখেই আমার জন্য তার এক বন্ধুর হোটেল ঠিক করে এল যাতে আমি আরামে থাকতে পারি। তারপর আমি ও সে একটা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ধোসা ও ইটলি পিঠা খেলাম। বেশ গরম গরম খাবার এবং ঐ খাবারেরই ওখানে প্রচুর প্রচলন রয়েছে। এরপর আমার এক ভাগনি কিসমতের ছেলের জন্যে কিছু ডলার দিয়েছিল তাকে দেবার জন্যে যে এখানে লেখাপড়া করতে এসেছে। তার নাম আসিফ সে তার যে বন্ধুর বাসায় থাকে সেখানে গিয়ে তাকে পেলাম না। এমন কি কেউ কিছু বলতেও পারে না তারা কোথায় গেছে। এই ছেলের

www.pathagar.com

জন্যে আমাকে অনেক ঝামেলা পোহাতে হল। তার কলেজ রয়েছে হসুরে যেটা ব্যাঙ্গালোর থেকে ৪০ কিঃমিঃ দূরে। প্রথমে কলেজে অধ্যক্ষকে টেলিফোন করি। তিনি বলেন এখন তো পরীক্ষা চলছে ১২টার পর আপনি তার দেখা পেতে পারেন। রামাচন্দ্র আমাকে সাহায্য না করলে আমার পক্ষে একা হসুরে যাওয়া হয়ত সম্ভব হত না। বাসে করে ঘন্টা দেড়েক লাগল হসুর যেতে। সেখানে গিয়ে তার এক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করে জানতে পারলাম, বাংলাদেশী ছেলেরা সেখানে প্রায় ৮০ ভাগই ঠিকমত লেখাপড়া করে না। কী তারা করে তাও তিনি বলতে পারলেন না। তবে আসিফকে সেখানে সকলেই লম্বু বলে জানে, সে বেশ লম্বা বলে তাকে ঐ নামেই বেশী ছেলেরা চিনে। আমার সম্পর্কে সে নাতি হয় জানতে পেরে অন্য দু'একজন বাঙ্গালী ছেলে সে যেখানে থাকে সেখানে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখি ঈশ্বরদী এবং রাজশাহীর দুই ছেলে বসে বসে গান শুনছে। আজকে যে পরীক্ষা তাই তারা জানেনা। আসিফ বাইরে কোথায় বেরিয়ে গেছে তাও তারা বলতে পারলনা। পরিশেষে আমি বুঝতে পারলাম ঐ অধ্যাপকের কথাই ঠিক। যা হোক যোহরের নামাজ পড়লাম একটা বড় মসজিদে। তারপর আসিফের ঐ বন্ধু ছেলেটি, রামাচন্দ্র ও আমি একটি হোটেলে দুপুরের খাবার খেলাম এবং আমিই তাদের খাওয়ালাম। আসিফের ঐ বন্ধুকে বলে আসলাম, তার সঙ্গে দেখা হলে আমি যে হোটেল আছি সেখানে এসে যেন টাকাটা নিয়ে যায়। বিকেলের দিকে আমি ও রামাচন্দ্র ব্যাঙ্গালোরে ফিরে আসি এবং বিখ্যাত লালবাগ বোটানিক্যাল গার্ডেন যার সীমানা প্রায় ২৪০ বর্গ কিঃমিঃ এবং এত প্রকান্ড মনোরম বাগান আমি ইতোপূর্বে কোথাও দেখিনি। অনেকেই আসে এখানে ছবি তোলার জন্যে। রামাচন্দ্র আমাকে সেখানে ঘুরতে ঘুরতে কিছু খাওয়ালো। পরে আমি আসরের নামাজ পড়ার কথা তাকে জানালে, সে নিকটেই একটা বড় মসজিদে আমাকে নিয়ে গিয়ে বাইরে অপেক্ষা করে। এরপর রাত্রি পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে অনেক সুন্দর সুন্দর বিল্ডিং দেখলাম। সারা ভারতের মধ্যে ব্যাঙ্গালোর যে অত্যন্ত চমৎকার শহর তাতে কোন সন্দেহ নাই। পথের ধারে চমৎকার লম্বা লম্বা রেনট্রি ও নানা রকমের ফুলের বাগান। রাস্তাগুলি প্রায় উঁচু নীচু বলে রিকশা নেই কোথাও। বেবী ট্যাক্সিই প্রধান বাহন, তবে অনেক উন্নতমানের সেগুলি। সমস্ত রাস্তাগুলি যেমন প্রশস্ত তেমনিই পরিস্কার এবং প্রায় একমুখী (One Way)। ছেলে মেয়েরা বেশীর ভাগই মোটরবাইক ব্যবহার করে এবং তারা নিঃসংকোচে পরস্পর মিলেমিশে ঘোরা ফিরা করে। সে রাতেই আমি রামাচন্দ্রকে বলি, আমি গো মাংস না খেয়ে আর থাকতে পারছি না। তুমি যেভাবে পার একটা তেমন হোটেল খুঁজে বের

www.pathagar.com

কর। সে বেচারা বেশ কষ্ট করে একটা ছোট হোটেল বের করে আমাকে দেখাল এবং নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে আমার খাওয়া দেখতে লাগল। আমি ঐ রাতে কেবল মাত্র তেলে ছাঁকা গরুর গোস্তের খুবই মুখ রোচক খাবার ছাড়া আর কিছুই খেলাম না। ২০/২২ রুপীর মত খরচ পড়ল। রামচন্দ্র দু'একবার আমার কাছে এসে দেখে গিয়েই আবার বাইরে রাস্তার দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে। ভদ্রলোক সেদিন আমার জন্যে কাজে গেলনা। পরের দিন শুক্রবার, আমি বললাম এই শহরের সবচেয়ে বড় প্রধান মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে চাই। রামাচন্দ্র বলল আমি কাল কাজে যাব অতএব আপনি একটা বেবীকে বললেই আপনাকে ঠিক মসজিদেই নিয়ে যাবে। পরের দিন ২২/৩/১৯৯৬ শুক্রবার আমি নামাজের জন্যে উত্তমরূপে তৈরী হয়ে একটা বেবী ট্যাক্সিতে শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদে হাজির হলাম। প্রকান্ড মসজিদের চতুর্দিকে বিশাল বিশাল রেনট্রি শোভা পাচ্ছে। আমি অনেকগুলি ছবি তুললাম মসজিদের। ইমাম সাহেব চমৎকার উর্দূভাষায় পবিত্র হজ্জ উপলক্ষে বক্তৃতা দিলেন। প্রকান্ড মসজিদের দেওয়ালে মার্বল পাথরের উপর পবিত্র কালাম মজিদের বহু আয়াত শরীফ অত্যন্ত চমৎকার ভাবে লেখা আছে। বহু মুসল্লী একসঙ্গে বিরাট জামাতে নামাজ আদায় করতে পারেন অত্যন্ত সুন্দরভাবে। মসজিদ থেকে বেরিয়ে নিকটস্থ একটা হোটেলে খাওয়ার সময় জনৈক তরুণ উকিল সাহেব জনাব এম, এ, খান বি,এ,এল,এল,বি আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ করলেন। তাঁর পুরো ঠিকানা আমার ডাইরীতে লিখে নিলাম। আমি তাঁর নিকট থেকে ব্যাঙ্গালের সংখ্যালগু মুসলিমদের সংখ্যা ও তাদের অবস্থা বিস্তারিতভাবে জেনে নিলাম। তাঁরও আমাদের বাংলাদেশ বেড়াতে আসার ইচ্ছা তিনি আমাকে জানালেন। মোট কথা ব্যাঙ্গোলোরকে Golden City of India ও বলা যেতে পারে। কেননা, আমি হুসুর যাওয়ার পথে বাসে এক ভদ্রলোক আমাদের সেখানে একটি সোনার খনি দেখাতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে খুবই অনুরোধ করেছিলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন ঐ সোনার খনির একজন কর্মকর্তা। কিন্তু আমার সময়ের অভাবে যেতে পারিনি বলে তাঁকে দুঃখ প্রকাশ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছি। এছাড়াও ব্যাঙ্গলোরে অনেক বড় বড় খেলার মাঠ ও স্টেডিয়াম আছে যা দেখার মত। ঐ দু'তিন দিনের মধ্যেই আমি যতখানি সম্ভব শহরটিকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম বন্ধু রামাচন্দ্রের সহায়তায়। নতুবা এটা আমার পক্ষে হয়ত সম্ভব হতনা।

শুক্রবার ২২/৩/১৯৯৬ তারিখে বিকেলের দিকে আমি মহীশুরের পথে যাত্রার উদ্দেশ্যে রামাচন্দ্রকে সঙ্গেঁ নিয়ে রেলস্টেশনে গেলাম। রামাচন্দ্রকে ৫০ রুপীর নোট

www.pathagar.com

দিয়ে বললাম এককাপ চা অথবা কফি নিয়ে এস আমি রেল গাড়ীতেই দাঁড়িয়ে রইলাম। ঠিক গাড়ী ছাড়ার পূর্ব মুহূর্তে সে আমাকে জানালা দিয়ে এককাপ কফি দিল আমি বাকী টাকা তাকে দিয়ে বললাম ওটা তোমার। পৃথিবীতে বহু বিচিত্র মানুষ আছে যেমন ভাল আছে, তেমনিই প্রচুর খারাপ মানুষও আছে। এই ভাল মানুষদের দলে অবশ্যই এল,টি, রামাচন্দ্র অন্যতম এক বিশেষ ব্যক্তি। আমি তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি আন্তরিক ভাবে। আমি যেহেতু অজুতেই ছিলাম, তাই আসরের নামাজ পড়ার জন্য সামান্য সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলাম। যখন কোন মতেই বসার মত জায়গা পাচ্ছিলাম না অথচ আসরের নামাজের সময়ও প্রায় যায় যায় অবস্থা, তখন দুজন ভদ্রলোককে অনুরোধ করি মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্যে আমাকে আমার প্রার্থনা করার সুযোগ দিতে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন ভদ্রলোক জানালার দিক থেকে উঠে দাড়ালেন এবং জানালার দিকটা ছিল পশ্চিম দিক আমি আমার তোয়ালেটা বিছিয়ে বসে বসে, নামাজ পড়েই উঠে দাঁড়িয়ে তাঁদের স্থানটা ছেড়েটিই। তাঁদের মধ্যে একজন বসলেন কিন্তু অন্য জন কিছুতেই বসলেন না বরং আমার নামাজ পড়া তাঁকে অনেক আকৃষ্ট করেছে বলে মত প্রকাশ করলেন। প্রায় রাত সাড়ে আটটার দিকে মহীশুর রেলস্টেশনে আমরা অনেকে নামলাম। ঐ ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথায় উঠবেন? আমি তাঁকে যখন বলি যে আমি একজন পর্যটক এবং এই শহরে প্রথম এসেছি। অতএব, কিছুই জানিনা তিনি এবং তাঁর এক কর্মকর্তা আমাকে সঙ্গে নিয়ে বলেন, কোন গাড়ীভাড়া দরকার নেই। চলুন হেঁটেই যাই। অল্পদূরে আমার এক বন্ধুর ভাল হোটেল আছে। আপনি সেখানে থাকতে পারবেন। আমি তাঁর পরামর্শ মত গিয়ে উঠলাম তাঁর বন্ধুর হোটেলে। তিনি নিজে আমার জন্যে হোটেল ম্যানেজারকে দিয়ে একটা সিংগেল রুম ঠিক করে নিজে পছন্দ করে আমাকে উঠালেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এরপর কোথায় যাবেন, আমি বলি হায়দ্রাবাদ এবং তারপর বোম্বে (বর্তমানে মুম্বাই)। তিনি আমাকে বলেন বোম্বে অনেক বড় শহর, অতএব আপনার কাছে ঐ শহরের কোন গাইড আছে কী? আমি বলি না। তিনি বলেন, আমি কাল সকালে আপনার জন্যে হোটেল ম্যানেজারের নিকট বোম্বের লেটেস্ট গাইডটা রেখে যাব। সুতরাং কাল সকালের বাসেই উটি (OOTY) চলে যাবেন। ওখান থেকে ফিরে এসেই আপনি বোম্বের গাইডটা পেয়ে যাবেন। তাছাড়া আপনি এসেছেন এমন সময়ে যে পরশু রবিবার মহারাজার সমস্ত প্যালেসটা একমাত্র বেরবারই মাত্র এক ঘন্টার জন্যে অর্থ্যাৎ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত আলোকসজ্জা বা Elumination করা হয়। অতএব, ওটাও দেখার

www.pathagar.com

সুযোগ পাচ্ছেন। ভদ্রলোকের নামটা এ মুহূর্তে আমার মনে নেই বলে অত্যন্ত অনুতাপ বোধ করছি। আমি সেই রাতেই নীচে একটা চমৎকার হোটেলে গিয়ে রাতের আহার শেষ করি। পরদিন ভোরেই ২৩/৩/১৯৯৬ আমি উটির উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। মহীশুর থেকে ১৬৭ কিঃমিঃ দূরে এবং মীন-সী-লেভেল (M,S,L) থেকে ৭০০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত এই উটি পাহাড়ী এলাকা। পথে এক হোটেলে আমরা সকলেই প্রাতঃরাশ সেরে নিই। অনেক আঁকা বাঁকা পথ পেরিয়ে বেলা প্রায় ১১টার দিকে আমরা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই। আমি শীত লাগতে পারে ভেবে সোয়েটার এবং পশমী চাঁদর সঙ্গে নিয়েছিলাম যদিও হোটেল ম্যানেজার আমাকে তা নেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়েছিল। দার্জিলিং পাহাড়ী শহর কিন্তু এই এলাকার সঙ্গে কোন মিল নেই। কেবলমাত্র দেখার মত একটা খুবই বড়বাগান আছে যার চতুর্দিকের বেড়ার গাছপালাগুলিকে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের আকৃতিতে ছেঁটে কেটে সৌন্দর্য বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। বাগানের ভিতরে একটা প্রকান্ড ভারতীয় মানচিত্র ঘাস ও রং দিযে অত্যন্ত চমৎকারভাবে রাখা হয়েছে। নিকটেই ছিল একটা লেক। আমরা অনেকেই দক্ষিণার বিনিময়ে লেকের উপর দিয়ে বেশ খানিকটা স্পীড বোটে ঘুরে বেড়ালাম। দুপুরের নামাজ পড়ার জন্যে আমি অজু করার সন্ধানে পানির খোঁজে গিয়ে দেখি ঐ বাগান বা পার্কের মধ্যে একস্থান থেকে অতিঅল্প পরিমাণে পানি আসছে তবে খুবই ঠান্ডা অনেকটা বরফ শীতল জল। ওখানেই সবুজ চমৎকার ঘাসের কার্পেটের উপর বেশ আরামের সঙ্গে গাছের ছায়ার নীচে যোহরের নামাজ আদায় করে নিই বেশ তৃপ্তির সঙ্গে। শীত মোটেই ছিল না বলে সোয়েটার বা চাদর কোনটাই ব্যবহার করতে হয়নি। পাহাড়ী এলাকার যে আবহাওয়া তার সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পেলাম না। যা পেয়েছিলাম দার্জিলিং এবং পাকিস্তানের মারী হিলে। অথচ এই তিনটি স্থানই ৭০০০ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট।

২৪/৩/১৯৯৬ তারিখে মহীশুর শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার পর একটু দূরে শ্রীরঙ্গপট্টমে টিপু সুলতানের বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখে মনটা খুবই বিষন্ন হয়ে গেল। গাইড দেখাল হেসে হেসে (অর্থ্যাৎ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ওহ্ দেখিয়ে টিপু সুলতান কা ভবন"। যেন বোমা মেরে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে মনে হল। নিকটেই টিপু সুলতানের কবরটা অতি অযত্নে পড়ে আছে এবং গরুও চরছে দেখলাম। একটু ভিতরে গিয়ে টিপু সুলতানের আর্ট গ্যালারী যেখানে টিপু সুলতানের প্রায় ৭ জন শিশু সন্তানের পোট্রেট যা পেন্সিল স্কেচ করা আছে ও একটি বিরাট কাঁচের ফ্রেমের মধ্যে আটকানো আছে। প্রতিটি শিশুর নাম লেখা আছে প্রতিটি ছবির নীচে। এবং পুরো

www.pathagar.com

আর্ট গ্যালারীটা অতীব অযত্নের মধ্যেই রাখা আছে তা বেশ বুঝা যায়। শহরের ভিতর মহীশুরের মহারাজার যে প্যালেস সেটা দেখার পর, আমার দেখা প্রায় ৪০/৫০টি রাজপ্রাসদের তুলনায় অনেক উত্তম বলেই আমার কাছে প্রতীয়মান হল। সেখানে বহু বিদেশী পর্যটক এসেছিলেন এবং তাঁদের অনেককেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম এমন রাজপ্রাসাদ আর কোথাও কোন দেশে তাঁরা দেখেছেন কিনা? তাঁদের সকলের নিকট থেকে ঐ একই উত্তর না, আর কোথাও দেখিনি। মজার ব্যাপার হল যে, পুরো প্যালেসে কোথাও কোন ফ্যান বা এসি না থাকা সত্ত্বেও প্যালেসের অভ্যন্তরে না শীত না গরম। কারণ হিসাবে জানতে পারলাম, ইংল্যান্ড, ইটালিয়ান স্টোন বা পাথর ব্যবহার করা হয়েছে সমস্ত মেঝেতে। অতি সুউচ্চ ছাদের উপর বিশেষ প্রকৌশলীয় কায়দায় আলো বাতাসের ব্যবস্থা রয়েছে। এটা আমি সেখানকার তত্ত্বাবধায়কের অনুমতি নিয়ে বিশেষভাবে দেখার সুযোগ নিয়েছিলাম। যেহেতু আমি দীর্ঘ ৩০ বছর স্থাপত্য কৌশল ও আর্কিটেকচার বিভাগের শিক্ষকতা করেছি। সকলকে সবস্থানে যাওয়ার তেমন অনুমতি নেই। মহারাজার প্রাসাদের বিশাল দেওয়ালগুলিতে এমন কতকগুলি অয়েল পেন্টিং করা হয়েছে যা অত্যন্ত জীবন্ত। ভারতের বহু বিখ্যাত চিত্রকরদের দ্বারা এগুলি অংকন করা হয়েছে। যেমন একদল যোদ্ধা তাদের ঘোড়ার উপর এমনভাবে বসে রয়েছে যেন এখনই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। প্রতিটি সৈনিকের মুখের মোচ থেকে বিশাল আকৃতির ঘোড়ার পায়ের খুর পর্যন্ত এমন নিখুঁত ও জীবন্ত যে মনে হয় একটু আগেই এগুলির অংকন শেষ করে চিত্রকরগণ বিশ্রামে গিয়েছেন। মহীশুর মহারাজের রুচির প্রশংসাযোগ্য কাজই বটে। বাস্তবিকই বিশ্বের যাবতীয় রাজ প্রাসাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের রূপ ধারণ করেছে এই মহীশূরে রাজপ্রাসাদ। এটি যেমন প্রকান্ড তেমনি উচ্চমানের অলংকারিত্যেরও দাবীদার প্রসাদের ছাদ থেকে দেওয়ালের অনেকখানি জুড়েই রয়েছে তৈল চিত্রের অসাধারণ যুদ্ধের ঘটনাবহুল সুদৃশ্যের ছবি।

সেদিনটি ছিল যেহেতু রবিবার এবং কেবলমাত্র সপ্তাহের ঐ একদিনের জন্যেই মহশুর মহারাজের রাজপ্রাসাদটি হাজার হাজার বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে দেখান হয় দর্শকদের মাত্র এক ঘন্টার জন্যে, অর্থ্যাৎ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। তাই আমার ইচ্ছা ছিল সেটা দেখার এবং ছবি তোলার। কিন্তু বেশীর ভাগ দর্শনার্থীর ইচ্ছা হল রাধা কৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবন দেখার। অতএব, আমাকেও তাদের সঙ্গী হতে হল। কাবেরী নদীর উপর দীর্ঘ বাঁধ পায়ে হেঁটে পার হয়ে যখন বিখ্যাত বৃন্দাবনের বাগানে গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন তার বিভিন্ন রং এর বাহারী ফুলের সমাহার ও

www.pathagar.com

সৌরভ ও নানা রকমের প্রকৌশলীয় কায়দায় নির্মাণ করা রং বেরং এর ফোয়ারা মন মাতান আবহাওয়া এবং বহু দর্শকের আবির্ভাব বাস্তবিকই অপূর্ব। আমি এক ফাঁকে আসরের নামাজ আদায় করে নেই বেশ নিরিবিলী একটি লম্বা বেঞ্চিতে যা কংক্রীটের তৈরী। অনেকেই ছবি তোলায় ব্যস্ত। আমিও কিছু ছবি তুললাম। বিকেলের কিছু নাস্তা ঐ স্থানের একটি দোকান থেকে সেরে নিলাম। দীর্ঘ প্রায় একমাইল লম্বা বৃন্দাবনের বাগান দেখতে দেখতে এগিয়ে চললাম। এক সময় মাগরিবের প্রার্থনাও শেষ করলাম এক ফাঁকে। তবুও বাগানের দৈর্ঘতা শেষ হয়না। এবার আমার পা দু'টি আর চলে না, অথচ আমাকে ফিরতে হবে এবং বাস ধরতে হবে নির্দিষ্ট সময়ে। কাজে কাজেই আমি এবার হাঁটা বাদ দিয়ে স্পীড বোটে উঠে পড়লাম যাতে তাড়াতাড়ি ফিরতে পারি। বাগানের মধ্যস্থান দিয়ে দীর্ঘ জলপথ এবং এখানেও সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত রং বেরং এর আলোর খেলা। বাস্তবিকই বৃন্দাবনের এ বাগান না দেখলে মহীশুর ভ্রমন যেন মিছে হয়ে যেত মনে হল। আমি আমার বাসযাত্রীদের মধ্যে বোধকরি সবচেয়ে বয়ঃবৃদ্ধছিলাম বলেই একটু বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও বহুবাসের বহরে আমার নির্দিষ্ট বাসের কন্ডাক্টর আমাকে ও চাচা, ও চাচা চিৎকার করে আমাকে তার বাসের কোলে তুলে নেয়। আমি তখন যথার্থই শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক মাত্র। কেবলমাত্র আমার জন্যেই তারা সকলেই অপেক্ষা করছিল। বৃন্দাবন দেখার সময় আমার একবার সাদ্দাদের বেহেস্তের কথাও মনে হয়েছিল যে, এটাই যদি এত মনোরম হয়ে থাকে, তবে সেটা নাজানি কত সুন্দর ছিল? কাবেরী নদীর জলের সল্পতা দেখে মনে হয়েছিল বোধকরি এ জন্যেই তামিল নাড়ুর জলের প্রয়োজন কত প্রকট। দীর্ঘপ্রায় ১৭ কিঃমিঃ পথ পেরিয়ে মহীশুরে আমার হোটেলে হাজির হই। রাতের খাওয়া সেরে দ্রুত বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ি। যেহেতু পরের দিন ভোর ৬-৪৫ মিঃ আমাকে পুনরায় ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন ধরতে হবে। হোটেলওয়ালা আমাকে ঐ ভদ্রলোকের দেওয়া বোম্বে গাইডটা ঠিকই দিয়েছিল।

আমি এই দীর্ঘযাত্রায় যখন যে শহরে গেছি সেখান থেকেই ঢাকায় আমার ছেলে মেয়েদের সঙ্গেঁ টেলিফোনে যোগাযোগ রেখেছিলাম। আমি ব্যাংগালোর থেকে ফোন করলে আমার বড় পুত্রবধু সীমা আমাকে বলে যে, আপনি বাবা মায়ের জন্যে অবশ্যই একটা ভাল উপহার নিয়ে আসবেন। মহীশুরে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের টুরিস্ট বাসটা গিয়ে থামল একটা বিরাট সিল্ক হাউসের সামনে। আমার পূর্ব হতেই জানা ছিল যে সমস্ত ভারতের মধ্যে মাইশোর সিল্ক খুবই প্রসিদ্ধ। অতএব, আমরা সকলযাত্রী নেমে পড়লাম দোকানে। সেলস্‌ম্যানরা আমাদেরকে নানা প্রকারের বর্ণাঢ্য

www.pathagar.com

সিল্কের শাড়ী দেখাতে শুরু করল। কিন্তু কেউ কিছু না কিনলেও আমি একটি চমৎকার সিল্কের শাড়ী আমার স্ত্রীর জন্যে কিনলাম। কিন্তু মূল্য এক কানাকড়িও ছাড়ল না দোকানী। ভারতের যতগুলি টুরিস্ট প্লেস বা দর্শনীয় স্থান আছে, প্রায় সব শহরেই এরকম টুরিস্ট বাসের সঙ্গে বড় বড় দোকানীদের সম্ভবত কমিশনের ব্যবস্থা আছে বলেই তারাও আমাদের সকল দর্শনার্থীদের অন্তত একবার সেখানে নিয়ে যাবেই। এছাড়াও মহীশুরে বহু প্রকারের ইমিটেশনের খুবই চমৎকার গয়না, চুড়ি, বালা ইত্যাদি প্রচুর পাওয়া যায় এমনকি ফেরীওয়ালাদের কাছেও। অতএব, আমি মহীশুর ছেড়ে আসার পূর্ব মহূর্তে মেয়েদের জন্যে বেশ কিছু গয়না কিনলাম। আমার সঙ্গে এবার ভারত ভ্রমনে প্রচুর টাকা পয়সা ছিল যা মানিব্যাগে না রেখে আমার কাঁধে ঝোলান শান্তি নিকেতনী ঝোলায় বান্ডিলগুলি সব সময় সঙ্গে রাখতাম। যেহেতু ইতোপূর্বে বহুবার পকেট মারের শিকার হয়েছি।

২৫/৩/১৯৯৬ ভোর ৬-৪৫ মিঃ ট্রেন যোগে মহীশুর ত্যাগ করি ব্যাঙ্গালোরের উদ্দেশ্যে। কেননা সেখান থেকেই বিকেল ৫টায় আমাকে হায়দ্রাবাদ এক্সপ্রেস ধরতে হবে। অতএব সমস্ত দিনটা কী করব? আমার লাগেজটা স্টেশনে লেফট লাগেজে জমা রেখে নিউজ পেপার পড়তে গিয়ে দেখি বিভিন্ন হলে নানা প্রকারের ছবি চলছে। তাই একটাতে গিয়ে ঢুঁকে পড়লাম। ছবি চলছিল Behind The Closedoor, ছবি দেখে মনে হল সেন্সার বোর্ড বলে কোন প্রতিষ্ঠান আদৌ আছে কিনা আমার সন্দেহ হল। এ ধরণের একটি ইংরেজী ছবি বহুপূর্বে পাবনা শহরের রূপকথা হলে চলার ফলে দীর্ঘ ৬ মাস হলটি বন্ধ করে দেয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে।

পরের দিন ২৬/৩/১৯৯৬ তারিখে সকাল সাড়ে নয়টায় হায়দ্রাবাদ রেলস্টেশনে উপস্থিত হই। কিন্তু হায়দ্রাবাদের সাইকেল রিকসা অত্যন্ত বাজে ধরণের। কেননা, ফুটবোর্ড থেকে বসার সিট এত নীচে যে মালপত্র নিয়ে সিটে বসে কোন আরাম নেই। যা হোক এক প্রবীণ রিকশাওয়ালাকে বলি, একটি ভাল হোটেলে নিয়ে চল। বেশীদূর যেতে হলনা, নিকটেই একটা মুসলিম হোটেল পেয়ে গেলাম। হোটেলওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাল একক কামরার চাবি আমার হাতে ধরিয়ে দিল। আমি প্রথমেই বাথরুমে গিয়ে উত্তমরূপে স্নান করে নিই। নিকটস্থ একটা বড় মসজিদে গিয়ে যোহরের নামাজ পড়ার পর ভাল খাবারের জন্যে একটা ভাল হোটেলে গিয়ে খেয়েনিলাম। খরচা পড়ল ৭০ রুপী কিন্তু আমার কাছে যেন একটু বেশী মনে হল। বিকেলের দিকে শহরটা ঘুরে দেখতে গিয়ে দেখি শহরে প্রচুর লোক, সে তুলনায় যানবাহনও প্রচুর। তবে অতিদ্রুত গাড়ী চালনায় তারা খুবই অভ্যস্ত মনে

www.pathagar.com

হল। হাঁটতে হাঁটতে একসময় দেখি শহরের কেন্দ্রস্থল চারমিনারের নিকট পৌছে গেছি। এটি একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান। চতুর্দিকে চারটি মিনারের নীচে চারটি প্রবেশ বা নির্গমনের পথ রয়েছে। অবশ্য যানবাহনের পথ আলাদা। কেবল মানুষের চলাচলের জন্যেই এরূপভাবে তৈরী করা হয়েছে। এই চার মিনারের নিকটেই রয়েছে অতি বিশাল এবং প্রখ্যাত মক্কী মসজিদ। মক্কা শরীফ থেকে কিছু পাথর আনিয়ে এর ভিত্তি প্রস্তুত করা হয় বলেই এই নাম দেওয়া হয়েছে। প্রায় লাখখানিক মুসল্লী বিশাল চত্বরে বড় জামাতে অংশ গ্রহন করতে পারেন। মদিনা শরীফের মসজিদে কুবার সঙ্গে এর বেশ খানিকটা মিল আছে মনে হল। মসজিদের মেহরাবের সম্মুখে একটা ছবি টাঙ্গানো আছে কিন্তু গেলাফ দিয়ে ঢাকা আছে। অথচ আসরের নামাজের শেষে দেখি কিছু বাচ্চাছেলে সেটিকে লাফ দিয়ে ছুয়ে চুমুখাচ্ছে ও সম্মান প্রদর্শন করছে। আমার কৌতুহল হল ওটা কী দেখার জন্যে। সুতরাং নামাজ শেষে আমিও উঠে গিয়ে দেখি আরবী ক্যালি গ্রাফিতে লেখা আছে "ইয়া গাউসুল আজম"। আমি ইমাম সাহেবের অনুমতি নিয়ে ঐ নাম পাকের দু'একটি স্ন্যাপ নিই আমার ক্যামেরায়। কিন্তু কী আশ্চর্য যে, পরে দেখি উঠেনি সেই ছবি। তাছাড়া আরও অনেক ছবি ঐ মসজিদের এবং বিভিন্ন স্থানের অনেক ছবি সবই সুন্দরভাবে উঠেছে। মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে সারিবদ্ধ ভাবে অনেকগুলি পাকা কবর, যার উপর রয়েছে পাকা ছাদের আচ্ছাদন। মক্কী মসজিদের পূর্বদিকে রাস্তার অপর পারেই রয়েছে মসজিদের মতই এক বিশাল ইমারত। অথচ সেটা মসজিদ নয় সেটা দাওয়াখানা। হায়দ্রাবাদ শহরের মধ্যে বহু পাকা ইমারতকে আমি মসজিদ মনে করছিলাম, কিন্তু সেগুলি মসজিদের আকৃতিতে গড়ে তোলা হয়েছে মার্কেট ইত্যাদি। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম নবাব ওসমান গনির আমলে এবং তাঁর ঐ রূপ পরিকল্পনার প্রেক্ষিতেই হায়দ্রাবাদ শহরের অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল। শহরের লোকসংখ্যা সে সময় প্রায় ৫৫ লাখ। তার মধ্যে মুসলিমের সংখ্যা আনুমানিক ৩৫ লক্ষ। শহরটি যথেষ্ট অপরিস্কার এবং নোংরা। প্রতিটি সাইনবোর্ড উর্দূতে লেখা। বহু হোটেলে বড় করে ইংরেজিতে লেখা আছে NO BEEF, অথচ আমি কাবাবের প্রতি অতি আকৃষ্ট। এক সময়ের ফাঁকে ঐ দিল্লীর জামে মসজিদের মধ্যে আলাপরত জনাব মোজাফফর সাহেবের খোঁজ নিতে গিয়ে বোকা বনে গেলাম। ঠিকানা বিহীন ঐ মোজাফফর ছাড়া বাজারে হাজারও মোজাফফর বর্তমান। অতএব ৮৮ সালের সেই মোজাফফরকে আমি কোথাও খুঁজে পেলাম না। একদিন হায়দ্রাবাদে আসরের সময় মসজিদে নামাজ পড়ার পর আমিই ইমাম সাহেব ও তার ২/৪ জন সঙ্গী সার্থীকে সঙ্গে নিয়ে একটি হোটেলে গমন করি।

www.pathagar.com

তাঁদেরকে চা-নাস্তা খাওয়াব বলে। কিন্তু তাঁরাই বরং আমাকে খাওয়ালেন। এক সময় ইমাম সাহেব আমার এতবড় ভারত সফরের কথাশুনে প্রশ্ন করেন, "আপ এত্তাবড়া টুর মে একেলা ঘুমতে হে'? "আমি উত্তর দিলামঃ ম্যায় দুনিয়া মে আয়ে হুঁ একেলা, যাওঁগাভী একেলা। শুনে তাঁর এক বন্ধু বলেন ইয়ে বাত বিলকুল সহি হ্যাঁয় কিউকে খোদা ভি একেলা হ্যাঁয়। আওর যো একেলা রাহ্তা হ্যাঁয় উস্‌কা সাত খোদা ভি জুড়যাতে হেঁ।

২৭/৩/১৯৯৬ তারিখে আমি গোলকুন্ডার বিখ্যাত কেল্লা দেখার জন্যে বেরিয়ে পড়ি বাসযোগে বেশ কিছু দূরে। সেদিন ছিল ৪২° তাপমাত্রা যা বিগত ৬০ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল। সেই প্রচন্ড গরমে ৪-৫ বোতল ঠান্ডা পানি পান করতে করতে সঙ্গে একজন গাইডকে ভাড়া করে নিয়ে ৪০০ থেকে ৫০০ বছরের পুরানো ভাঙ্গা কেল্লা দেখার জন্যে প্রচন্ড পরিশ্রম করলাম। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় ৪২০ ফুট উচুতে ৭২০টি সিঁড়ি পেরিয়ে সর্বোচ্চ কেল্লার উপরে উঠলাম। আমার গাইডের সহায়তায় আমার নিজেরও কিছু ছবি উঠালাম এরপর আমি দর্শন করি বিখ্যাত বিশাল বিশাল কুতুব শাহী কবর খানাগুলি সেগুলির প্রত্যেকটি এক একজনের জন্যে প্রকান্ড এলাকা জুড়ে তৈরী করা হয়েছে পাথরের সুউচ্চ প্রাসাদের মধ্যে মাত্র এক একজনের কবর খানা। বিশাল এলাকা জুড়ে এ রকম বহু নবাবের জন্যে আলাদাভাবে পৃথক পৃথক কবরস্থান যা না দেখলে বিশ্বাস করা মুশর্কিল। কোথাও কোন এক টুকরা ইটের চিহ্ন নাই। সব কিছুই পাথরের তৈরী যেমন সেনানিবাস ইত্যাদি। যোরের নামাজ পড়লাম ওখানেই একটা ছোট মসজিদে, তেমন কোন মুসল্লীর দেখা পেলাম না। সরোজিনী নাইডুর একটি বিখ্যাত ইংরেজী কবিতা একস্থানে পাথরের উপর খোদাই করে লেখা আছে যার সারমর্ম হল, "ও রাজাধিরাজ মহারাজ তোমরা এখন কেমন আছ? তোমাদের প্রচন্ড দাপটে কম্পমান তোমাদের সেবক ও সেবিকাদের পায়ের আওয়াজ কী তোমরা এখন শুনতে পাও? তোমাদের প্রচন্ড প্রতাপের কথা কী এখনও তোমাদের স্মরণ হয়? ইত্যাদি কথা সম্বলিত একটি দীর্ঘ ইংরেজী কবিতা লেখা রয়েছে একটা পাথরের ফলকে। সমস্ত এলাকা ঘুরে ঘুরে দেখতে সারাটা দুপুর পেরিয়ে গেল। আমার গাইড আমাকে বিদায় দেওয়ার সময় কেবল আমাকে উর্দূ ভাষায় বলল, আপকে পাস আগর পানির না রাহ্তা তো আপ আজ মর যাতে ইঁহা, আমি তাকে চুক্তি মোতাবেক ৪৫ রুপী দিয়ে বিদায় করি।

www.pathagar.com

কলকাতায় যখন আমার পীর ভাই অধ্যাপক ড. আব্দুস সোবহান শুনলেন যে আমি হায়দ্রাবাদ যাব, তখন তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, আপনি সালার জং, মিউজিয়ামটা অবশ্যই দেখে আসবেন। আমি তাঁর কথামত ঐ দিনই গোলকুন্ডা ভ্রমন শেষে বিকেলের দিকে যাই সালার জং জাদুঘর দেখার জন্যে যেটা তৈরী করেছিলেন কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি মীর নবাব ইউসুফ আলী সালারজং। ৪ তলা বিশিষ্ট বিশাল প্রসাদের মধ্যে বিশ্বের বহু দেশ থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন অতি দুর্লভ এবং অত্যাশ্চর্য দ্রব্যসামগ্রী যা বর্তমানে অত্যন্ত দুস্প্রাপ্যও বটে। কী নেই সেখানে? অতি মূল্যবান মূর্তি, পোট্রেটস, পেন্টিংস, পোরসিলেন ও গ্লাসের তৈরী ঘর সাজানোর দ্রব্য সামগ্রী। বহু প্রকারের ঘড়ি, হাজার রকমের দেওয়াল ঘড়ি থেকে হাত ঘড়ি পর্যন্ত বাদ যায়নি কোনটি যা সংগ্রহ করা হয়েছে পৃথিবীর বহু দেশ থেকে। ভারতীয়, ইটালীয়, চাইনিজ, জাপানীজ, ফ্রেঞ্চ, আমেরিকান প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী সাজানো আছে প্রতিটি বড় বড় হল ঘরে। বাস্তবিকই সারা ভারতে এমন বিরল সংগ্রহ আর কোথাও নেই। মাত্র একক ব্যক্তি হিসাবে মীর নবাব ইউসুফ আলী সালারজং যা করেছেন তাতে তাঁর রুচিবোধ ও বিশাল সম্পদের প্রশংসা না করে উপায় নেই। এ প্রসঙ্গে হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা যেতে পারে। বৃটিশ ভারতে একমাত্র হায়দ্রাবাদই বৃটিশের কর্তৃত্ব মেনে নেয়নি। তাদের মুদ্রা এবং সেনা বাহিনী সবকিছুই ছিল একবারেই স্বতন্ত্র, অথচ ১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের পরও নিজাম বাহাদুর তাঁর নিজস্ব আইন কানুন সবই ঠিক রেখেছিলেন। মাত্র ২২,০০০ সেনাবাহিনীর দ্বারা দেশের নিরাপত্তা ও সীমান্ত রেখা ঠিকমত রক্ষা করেছিলেন। ভারত পাকিস্তান তার অংশের প্রাপ্য অর্থ দিতে অস্বীকার করায় মহাত্মা গান্ধী অনশনে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। পাকিস্তানের এহেন অচলাবস্থায় অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছিলেন নিজাম বাহাদুর। পাকিস্তানের জনক কায়েদে আজম মোহম্মদ আলী জিন্নাহর ইন্তেকালের মাত্র দু'দিন পরই ভারত তার আড়াই লক্ষ সেনাবাহিনী হায়দ্রাবাদে প্রবেশ করিয়ে তা দখল করে নেয়। এটাই হল ভারতের কুখ্যাত চানক্য নীতি, জোর যার মুলুক তার। এমনি ভাবেই ভারত তার অখন্ড ভারত নীতির স্বপ্ন দেখে আসছে তার হিন্দু মৌলবাদের ধারাবাহিকতার লেজুড় বৃত্তির মাধ্যমে।

www.pathagar.com

চতুর্বিংশ পর্ব

২৮/৩/১৯৯৬ তারিখে রাত ৯টায় আমি হায়দ্রারাবাদ ত্যাগ করি বোম্বে এক্সপ্রেসের মাধ্যমে এবং তার পরের দিন বেলা সাড়ে তিনটায় বোম্বে ভিক্টোরিয়া টারমিনাল (V,T) রেলস্টেশনে অবতরণ করি। পথে আসতে অনেকগুলি টানেলের ভিতর দিয়ে ট্রেনটাকে আসতে হয়েছে দেখলাম এবং ভারতের বিশালত্বের মাত্রা বেশ খানিকটা উপলব্ধি করলাম। সম্ভবত বোম্বে ভারতের সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল শহর।. এখানেও তিনটি রেলস্টেশন রয়েছে। প্রথমেই দাদর এরপরই ভি,টি এবং শেষে রয়েছে চার্চগেট রেলস্টেশন। আমি প্রথমেই পায়ে হেঁটে কাশ্মীর হোটেলে যায়। কিন্তু সেখানে কোন রুম খালি না থাকায় আমি পাঞ্জাব হোটেলে গিয়ে উঠি। কিন্তু সেখানে এক প্রবীণ মুসলিম ম্যানেজার আমাকে রুম পছন্দ করার জন্যে পাঠাবার পূর্ব মুহূর্তে আমি হঠাৎ বলে ফেলি যে আমার বাংলাদেশী পাসপোর্ট রয়েছে। বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেন তাহলে এখানে কোন স্থান নেই। আপনি বরং নিউ বেঙ্গল হোটেলে আশ্রয় নিন। কেননা বিদেশীদের বেলায় পুলিশ অযথা আমাদের সঙ্গে ঝামেলা করে। অতএব, আপনি নিউ বেঙ্গল হোটেলে গেলে তার সম্মুখেই রয়েছে পুলিশ কমিশনারের অফিস। সুতরাং ওরা সব বিদেশীদের আশ্রয় দেয়। আমি তখন অত্যন্ত, শ্রান্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় হেঁটে হেঁটে নিউ বেঙ্গল হোটেলে গিয়ে উঠলাম। এরকম ঘটনা ঘটেছিল পাকিস্তানের লাহোরে এবং মারী হিলে। সেখানেও তারা আইডেনটিটি কার্ড ছাড়া কিছুতেই বিদেশীদের রাখতে চায়না। এমনকি সঙ্গে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট থাকলেও তারা পরওয়া করেনা। পাকিস্তানে ১৮ বছর বয়সের পর প্রত্যেকেরই আইডেনটিটি কার্ড রয়েছে। আমি মনে করি বাংলাদেশেও এমনটি হওয়া প্রয়োজন। নতুবা এই দুর্নীতির দেশে সন্ত্রাসীদের আটকানো যথেষ্ট অসুবিধা আছে। হোটেলে উঠেই আমি আমার পাসপোর্ট এবং টাকা পয়সা সব কাউন্টারেই জমা রেখে দিই।

পরের দিন শুক্রবার আমি যথারীতি গোসল ইত্যাদি সেরে নিকটবর্তী চমৎকার জুম্মা মসজিদে গিয়ে জুম্মার নামাজ আদায় করি। সৈয়দ আব্দুল্লাহ শাহ্ কাদেরী (রহঃ) নামে ঐ মসজিদ সংলগ্ন মাযার রয়েছে পেদরু বাবার। আমি পাঁচওয়াক্তই ঐ মসজিদেই নামাজ পড়ি। সেদিন বিকেলের দিকে আমার Indrail Pass টা

www.pathagar.com

কনফার্মেশনের জন্যে বার বার ছুটাছুটি করতে হয়েছে দু'টি রেলস্টেশনে, একবার চার্চগেট আর একবার ভি,টি রেলস্টেশনে। এরা বলে ওখানে যান, আর ওরা বলে ওখানে যান। যার ফলে শুক্রবারটা এভাবেই কাঠল। পরের দিন শনিবার আমি সমস্ত বোম্বে শহরটা ঘুরে দেখার জন্য কাউন্টারে গিয়ে বলি। তাঁরা বলেন আপনি ১০০ রূপী দিয়ে টুরিস্ট বাসে ঘুরতে পারেন। আমি বলি সারাদিনের ভ্রমনে আমার নামাজের সময় বাস দাঁড়াবে কিনা? তাঁরা বলেন, না বাস দাঁড়াবে না। আমি বলি তবে আমার বাসের দরকার নাই। তখন তাঁরা আমাকে একটা প্রাইভেট ট্যাক্সি ভাড়া করার জন্যে পরামর্শ দেন এবং এর জন্যে ৭০০ রুপী দিতে হবে ৯ ঘন্টা ভ্রমনের জন্যে। আমি সেই মত রাজি হয়ে যাই। দুপুরের খাওয়া ও যোহরের নামাজের পর ঠিক বেলা একটায় ট্যাক্সিতে উঠে বসি। প্রথমেই ড্রাইভারকে বলি হযরত হাজী আলী শাহের মাযার শরীফে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আরব সাগরের ভিতর এই বিখ্যাত মাযার শরীফের অবস্থান অনেকটা সমুদ্রের মাঝে লাইট হাউসের মত। বোম্বের বিখ্যাত মেরীন ড্রাইভের নিকট গাড়ী থেকে নেমে দেখি আরব সাগরের উপর প্রায় ৬/৭ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পাকা কংক্রীটের বাঁধ দেওয়া পথ প্রায় অর্ধ কিঃমিঃ পর্যন্ত বর্তমান। আমার সৌভাগ্য যে সে সময় ভাটির টানে জুতা পায়ে শুকনা পথেই মাযার শরীফ পর্যন্ত হাজির হয়ে যাই। জোয়ারের সময় কিন্তু অনেকেই পানির উপর দিয়েই হেঁটে যান। অত্যন্ত চমৎকার সুসজ্জিত মাযার শরীফ। আমি বেশ কতগুলি ছবি উঠালাম বিভিন্ন কোন থেকে। মাযার শরীফের ভিতরে প্রবেশ করে ফাতেহা পাঠ করে যিয়ারত সম্পন্ন করি। অবশ্য মহিলাদের জন্য মাযার শরীফের ভিতরে প্রবেশ নিষেধ। তাঁরা বাইরে প্রকান্ড জানালার নিকট দাঁড়িয়ে জিয়ারত করতে পারেন। বোম্বের মেরীন ড্রাইভ একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান, আর সেখান থেকেই আরব সাগরের ভিতর এই পবিত্র মাযারের দৃশ্যপট অতীব মনোরম।

এরপর আমি ড্রাইভারকে বলি চলো সোজা পালিহিল। উদ্দেশ্য ভারতের বিখ্যাত অভিনেতা দিলীপ কুমার তথা ইউসুফ খানের সঙ্গে একটু সাক্ষাৎ করা। যেহেতু তিনি কিছু দিন পূর্বে ঢাকায় এসেছিলেন বিশেষ আমন্ত্রণে। এবং বেশ চমৎকার বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন বলেই তার সঙ্গে আমার দেখা করার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তিনি সে সময় বাড়ীর ভিতর টি,ভি সিরিয়ালে ব্যস্ত থাকায় আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন নি। তাঁর স্ত্রী বাইরের কোন পুরুষের সঙ্গে দেখা করেন না জানলাম। কাছাকাছি দিলীপ কুমারের দু'টি বাড়ী। একটি বাড়ী বেশ উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত এবং সেটা ছাড়িয়ে একটু সম্মুখের দিকে এগুলেই বেশ অনেক নীচে

www.pathagar.com

ডানদিকে আর একটি একতলা বাড়ী অনেক প্রশস্ত উঠান। দিলীপ কুমারের মহিলা সেক্রেটারীর সঙ্গে কয়েকবার চেষ্টা করেও ফোনে ধরা গেলনা। ওখানেই বেশ উঁচু জায়গায় দেখা গেল প্রখ্যাত অভিনেতা সুনীল দত্তের বিশাল বাড়ীর গেট খোলা ছিল এবং দুটি গাড়ী ভিতরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার ড্রাইভারের খুবই আগ্রহ ছিল ভিতরে আমাকে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু আমি বুঝলাম কিছুদিন পূর্বেই তাঁর ছেলে সঞ্জয় দত্ত জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছে। অতএব, এ মুহূর্তে তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না করাই উত্তম। আসলে পালি হিলের দিকেই বেশীর ভাগ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের আবাসস্থল। আমি আর বিলম্ব না করে ড্রাইবারকে বলি চলো অমিতাভের বাড়ীতে যাই। সেখানে গিযে দেখি তার বিশাল বাড়ীর সম্মুখে অনেক প্রহরী। তাদেরকে আমার উদ্দেশ্যের কথা বলতেই তারা জানাল বচ্চনজী এখন আমেরিকায় অবস্থান করছেন। সেখান থেকে কিছদূর গিয়েই দেখি বোম্বের 'ল' কলেজ তারই ঠিক উল্টাদিকে দেখি বিগ্‌বির বিশাল অফিস দেখার মত। এরপর আমি চালক সালামকে বলি চলো বিখ্যাত জুহু বীচের দিকে এবং সেখানে দেখি উঠের পীঠে চাপা যায়। আমি ইতোপূর্বে হাতিঘোড়া এবং উড়ো জাহাজ সবগুলিতেই চেপেছি কেবলমাত্র বাকী ছিল এই মরুভূমির জাহাজ উট। সুতরাং আমার শখ হল এটাই বা বাকী থাকে কেন, দেখিইনা কেমন লাগে উঠের পিঠে চাপতে? উঠলাম মাত্র ১০ রুপীর বিনিময়ে এবং কিছুটা দূরে ঘুরে ফিরে নামবার পূর্বে উটওয়ালাকে আমার ক্যামেরা দিয়ে বলি তোল দেখি একটা ছবি। সে ঠিকমতই চমৎকার ছবি তুলেছে। তবে উঠের পীঠে বসে খুব একটা আরাম পেলাম না। কেননা উঠটা চলার সঙ্গে সঙ্গে আরওহীকেও সমান তালে আগে পিছে দুলতে হয় বুঝতে পারলাম। তবে জুহু বীচটা দেখে বেশ ভাল লাগল। অনেকটা আমাদের কক্সবাজার সী বীচের সঙ্গে যেন বেশ খানিকটা মিল রয়েছে। এরপর আমি ও চালক সালাম কিছুটা ঠান্ডা পান করি এবং বিখ্যাত বান্দ্রা এলাকার চমৎকার রাস্তার পাশে একটি সুন্দর মসজিদের ছবি তুলি। মস্ত বান্দ্রা এলাকার রাস্তা গুলি যেমন প্রশস্ত তেমনি পরিস্কার। অতঃপর আমি প্রখ্যাত সান্তাক্রুজ এলাকা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাই। পালি হিলের চেয়ে অনেক সুন্দর এবং মনোরম এই এলাকা। এরপর বোম্বাইয়ের রেসকোর্সের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমি ঘোড়দৌড় দেখার ও ছবি তোলা জন্যে নেমে যাই। সম্ভবত এই ঘোড়দৌড় মাঠই ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও সুন্দর। আমি বেশ কিছু ছবি তুলি ছুটন্ত ঘোড়াদের দৌড় প্রতিযোগিতার। যেহেতু জন্তু জানোয়ারের মধ্যে ঘোড়া আমার সবচেয়ে প্রিয়। ইতোমধ্যে আসরের নামাজ পড়ার জন্যে স্যার ফিরোজ শাহ মেহতার অতি চমৎকার বাগানের ভিতর

www.pathagar.com

একস্থানে নামাজ পড়ি। এটার ঠিক উলটাদিকেই রয়েছে প্রখ্যাত কমলা নেহরু পার্কসহ বোম্বাইয়ের ঝুলন্ত বাগান। ড্রাইভার গাড়ী পার্কিং এর নিয়ম ঠিকমত না মানায় পুলিশকে ১০ রুপী আমার পক্ষ থেকে দিতে হয়। বিহারী ড্রাইভার সালাম বোম্বাইয়ের সবই চেনে তবুও তার ভুলবশত এই অর্থদন্ড আমাকে দিতে হল। এরপর বোম্বাইয়ের বিখ্যাত ও প্রকান্ড নেহরু একুরিয়াম দেখতে যাই সেটা আরব সাগরের ঠিক উল্টা দিকে অবস্থিত। এক একটা বিশাল হল ঘরের মধ্যে সামুদ্রিক প্রকান্ড মাছ, হাঙ্গর প্রভৃতি মোটা কাঁচের দেওয়ালের মধ্যে ঘুরাফিরা করছে যা দেখতে খুবই ভাল লাগল। ইতোমধ্যে মাগরিবের নামাজের সময় হয়ে যাওয়ায় আমি ধারে কাছে কোন মসজিদ না পেয়ে আরব সাগরের বিশাল চওড়া বাঁধের উপরে নামাজ আদায় করি বটে, তবে সাগরের বিশাল জলরাশির প্রচন্ড ঢেউয়ের ধাক্কা বাঁধের প্রাচীরে সশব্দে আছড়ে পড়ছিল। এরপরই বোম্বাইয়ের এসিয়াটিক লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি কিছুক্ষণ পূর্বেই সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। এতবড় একটা লাইব্রেরী দেখার সুযোগ পেলাম না বলে মনটা খারাপ হয়ে গেল। যা হোক সন্ধ্যার পর মেরীন ড্রাইভের উপর যে আলোর মালা যা দেখতে অনেকটা একটা নেকলেসের মত দেখায় তার বেশ কিছু ছবি তুললাম যা বেশ দেখার মত। কমলা নেহরু পার্কের সম্মুখের দিকে যে ফেন্সিং বা বেড়া রয়েছে তার উপর নানা রং-বেরং এর জন্তু জানোয়ারের ছুটন্ত অবস্থায় প্রতিকৃতি রয়েছে যেমন হরিণ, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি। এগুলি বাচ্চাছেলেমেয়েদের জন্যে বেশ উপভোগের বস্তু বটে। Hanging Garden বা ঝুলন্ত বাগান ঐ আলোর মালা যা দেখতে অনেকটা নেকলেসের মত দেখায় তাও বেশ মনোরম দৃশ্য বটে।

এরপর আমি চলে যাই সোজা বিখ্যাত ইন্ডিয়া গেট দেখতে যেটা আরব সাগরের তীর ঘেসে উঠানো হয়েছে। সেখানে বহু মোটরলঞ্চ এবং স্পীড বোট রয়েছে ভ্রমন করার জন্যে। বিশাল আকৃতির ইন্ডিয়া গেটের সম্মুখেই রাস্তার অপর পারে রয়েছে অত্যন্ত চমৎকার প্রখ্যাত হোটেল তাজমহল। যেখানে মিঃ মোহম্মদ আলী জিন্নাহ সময় সময় অবস্থান করতেন। এশার নামাজ পড়ার জন্যে বিখ্যাত জাকারিয়া মসজিদে হাজির হয়েছিলাম কিন্তু সেখানে গাড়ী পার্কিং এর কোন সুবিধা না পাওয়ায় নিকটস্থ মিনার মসজিদে নামাজ আদায় করি। নামাজের পর আমি হোটেলে গিয়ে আমার লাগেজসহ আবার ঐ গাড়ীতেই বোম্বাই (বর্তমানে মুম্বাই) ভি,টি, রেলস্টেশনে গিয়ে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিই তখন রাত ১০টা বাজে। ট্যাক্সিওয়ালা কিছু বকশিস না নিয়ে আর ছাড়ল না আমাকে। ইতোপূর্বে আমি প্রথমেই বোম্বাইএ যেটা

www.pathagar.com

দর্শন করি সেটা হল হাজী ক্যাম্প, সেটা আমার হোটেলের বেশ নিকটেই ছিল। বহু পূর্বের তৈরী করা বিশাল আকৃতির এই হাজী ক্যাম্প। আমার মেজ মামা জনাব মেহবুব জাহেদী সম্প্রতি হজ্জ্ব মন্ত্রী হিসাবে কলকাতায় পার্ক সার্কাসে যে আধুনিক আকৃতিতে প্রকান্ড হজ্জ্ব ভবন তৈরী করেছেন সেটাও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। বোম্বাই এ একদিন প্রত্যুষে দেখি এক ঝাড়ুদারনীকে রাস্তা পরিস্কার করার সময়। মজার ব্যাপার যে সে মহিলা দেখতে যেমন চমৎকার তেমনই পরেছে একটা বেশ সুন্দর শাড়ী। ঐ অবস্থায় তাকে না দেখলে বিশ্বাস করা মুস্কিল যে সে একজন সুইপার। বিকেলের দিকে অনেকেই কুকুর নিয়ে বেড়াতে আসে। এমতাবস্থায় আমি এমন একজোড়া কুকুর দেখলাম তা যেমন অতিকায় বৃহৎ তেমনি তাদের মাথাটা একেবারে বাঘের মাথার মত দেখতে। ইতোপূর্বে এমনটি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়েনা।

বহুপূর্বে একটি সিনেমার গান শুনেছিলাম ঃ-

"আয় দিল মুশাকিল জিনা ইঁহা
যরা হট্‌কে যরা বাঁচকে ইয়ে হ্যায়
বোম্বে মেরী জাঁ"

হঠাৎ করে গানটির কথা আমার মনে পড়ায় ঐ গানের ক্যাসেটটা বহু দোকানে খোজাখুঁজি করলাম, কিন্তু পেলাম না। কারণ হিসেবে জানতে পারলাম, হিন্দু মৌলবাদী সরকার বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বোম্বাই হয়েছে মুম্বাই দেবীর নামে মুম্বাই। ঠিক যেমনটা মাদ্রাজ্য হয়েছে বর্তমানে চেন্নাই। অথচ আমার কাছে কিন্তু আগের নামগুলিই ছিল বেশী প্রিয়। অতএব ঐ বোম্বে নামে গানের ক্যাসেট বাজার থেকে উধাও।

www.pathagar.com

পঞ্চবিংশ পর্ব

০১/০৪/১৯৯৬ তারিখে ভোর সাড়ে চারটায় লাখনৌ রেলস্টেশনে নেমেই দেখি হঠাৎ বেশ শীত শীত ভাব। তখনও কিছুটা অন্ধকার আছে। আমি তাড়াতাড়ি একটা সুইটার গায়ে চাপিয়ে নেই। মসজিদের কথা জিজ্ঞেস করতেই কে যেন একজন বললেন রেল লাইনটার ওপারে মসজিদ। আমি গিয়ে দেখি ঠিক তাই। বিশাল আকারের হাউজের গরম পানিতে অজু করতে বেশ ভালই লাগল। মসজিদের ভিতর গিয়ে ফজরের সুন্নত পড়ার পর ফরজ নামাজ জামাতের সঙ্গেই আদায় করি। মসজিদ সংলগ্ন রয়েছে একটি বিখ্যাত মাযার শরীফ। এটা হল পীর খাম্মান বাবার রওজা মোবারক। ফজরের নামাজান্তে আমি কিছুটা কালাম মজিদ তেলাওয়াত করি। পরে পীর সাহেবের মাযার যিয়ারত করি। অনেক মুসল্লীকেই দেখলাম মাযার যিয়ারত করতে। একজন মুসল্লীকে দেখলাম এমনভাবে কবরের উপর দু'হাত দিয়ে দাবাচ্ছে যেন কোন ঘুমন্ত মানুষের পা যেভাবে দাবায়। মাযার শরীফের মাথার দিকের জালের উপর বহু কাগজের টুকরা আটকানো রয়েছে। জানতে পারলাম বিভিন্ন লোকের মনবাসনা ছোট্ট কাগজে লিখে ওখানে আটকে দেয়। আমি লাখনৌ শহরটা ঘোড়ার গাড়ীতে দেখার বাসনা প্রকাশ করলে মসজিদের মুসল্লীগন আমাকে বরং রিকশাতে ভ্রমন করার পরামর্শ দেন। কেননা রাস্তার অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। একজন মুসল্লী রিকশাওয়ালা ফজরের নামাজ আদায় করে ঐ মসজিদেই ছিলেন। অতএব তাঁকেই আমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে তাঁরা পরামর্শ দেন। আমি তাই করি। প্রথমে তাকে বলি একটা ভাল হোটেলে প্রথমে যাওয়া দরকার। রিকশাওয়ালা রেলস্টেশন থেকে নিকটেই একটা হোটেল নাম খুশবু সেখানেই উঠি। মালপত্র রেখেই সকালের নাস্তা করার জন্যে আমরা দু'জনেই একটা ভাল হোটেলে যাই। আমি রুটি আর কলেজির অর্ডার দিই আমার জন্যে, কিন্তু রিকশা ওয়ালা রুটি এবং পাঁয়চা বা নেহারীর ভক্ত বলে সেটাও আমি অর্ডার দিই দোকানের ছেলেটা ছোট পায়া নিয়ে আসায় রিকশাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠে!" কিয়া বড়া পায়া নেহী হ্যায়? মেরে লিয়ে বড়া পায়া লাও।" তার বলার কায়দা দেখে আমার মনে হল সেই যেন

www.pathagar.com

আমাকে খাওয়াচ্ছে। যাহোক হোটেলের দাম মিটানোর পর আমি পুনরায় খুশবু হোটেলে গিয়ে গরম পানিসহ উত্তমরূপে গোসল করে ফেলি। প্রায় বেলা ১০টা নাগাদ আমরা ঘুরতে বেরুলাম। লাখনৌ এবং হায়দ্রাবাদ এ দুটিই ভারতের মুসলিম প্রধান শহর হওয়ায় সম্ভবত রাজনৈতিকভাবেই অবহেলিত। রাস্তা বিশেষ সুবিদা নয়। কম প্রশস্ত এবং আবর্জনাপূর্ণ। তবুও সমস্ত শহরটা দেখার আগ্রহ হওয়ায় রিকশাওয়ালার সঙ্গে ঘন্টায় ১০ রুপী চুক্তিতে যাত্রা শুরু করলাম। শহরের লোক সংখ্যার যথেষ্ট আধিক্য লক্ষনীয়। প্রথমেই বড় ইমাম বাড়া এবং ছোট ইমাম বাড়া শরীফগুলি প্রাণ ভরে দর্শন করি। শীয়া সম্প্রদায়ের প্রচুর প্রতিপত্তি ঐ এলাকায়। ভুলভুলাইয়াতে উঠার জন্যে কিছু গাইড আমার পিছু নিয়েছিল। কিন্তু আমি উঠিনি। ভুলভুলাইয়ার বিশেষত হল গাইড ছাড়া কেউ ঠিকমত উপর থেকে নীচে নেমে আসতে পারেনা। তাছাড়া আমার সময়ের অভাবে আমি অন্যদিকে যত সুন্দর এলাকা দেখা যায় সেটাই ছিল আমার লক্ষ্য। ঐ সমস্ত এলাকা বেশ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কিছু ভাল এবং সুন্দর মসজিদের ছবি তুললাম। একটা মিউজিয়ামে গিয়ে নবাবদের বহু প্রকারের ছবি দেখলাম। দুপুরের খাবারও ঐ এলাকায় একটা হোটেলে খেলাম। লাখনৌ রীতিমত মুসলিম খাবারের জন্যে বেশ প্রসিদ্ধ বলে আমার মনে হল। এই প্রথম সমস্ত ভারত ভ্রমনের মধ্যে উত্তম খাবারের সন্ধান পেলাম। আমার পিতার জন্যে আতর মজমুয়া কিনেছিলাম হায়দ্রাবাদ থেকে। আর বাকী ভাল দামী আতর হুজুর পাকের জন্যে লাখনৌতে কিনলাম। আমাদের অনেকের জন্যেই আতর কিনেছিলাম। কিসমিশ্ পিসতা বাদাম ইত্যাদি মেওয়া জাতীয় বেশ কিছু খাবার কিনেছিলাম এই শহর থেকেই।

এই লাখনৌ শহরে আমার আসার আর একটা উদ্দেশ্য ছিল যে, আমার এক নানা অর্থাৎ আমার মায়ের এক মামা সৈয়দ শাহ আব্দুল হাফিজ সাহেব চিকিৎসা করাতে এই শহরেই এসেছিলেন যে কোন বড় হাকিমের কাছে। তার দুই স্ত্রীসহ তিনি ছিলেন বীরভূমের খুষ্টিগিরি গ্রামের হজরত সৈয়দ শাহ আব্দুল্লাহ কিরমানীর (রহঃ) বংশধর এবং পীর সাহেব। তাঁর ছিল হাঁপানী রোগ। তিনি অতিবড় জমিদার ছিলেন। বিশাল ওয়াকফ সম্পত্তির মোতাওয়াল্লী ছিলেন। আমার মাকে তিনি খুবই স্নেহ করতেন বলে তাঁর কাছে আমাদের প্রায়ই যেয়ে থাকতে হত। তাঁর অধিনে এক

www.pathagar.com

ডজনেরও বেশী চাকর চাকরানী খেদমতগার হিসাবে সবসময় নিয়োজিত থাকত। নানাজান আমাকে চটপটি শাহ নামে ডাকতে ভালবাসতেন। কেননা আমি পায়ে চটি জুতা পরে খুবই সশব্দে ছুটাছুটি করতাম। নানাজানকে কোন দিন কোন গরুর গাড়ীতে উঠতে দেখিনি। অথচ সে আমলে গাঁয়ে গ্রামের সব রাস্তাই ছিল কাদা মাটির পথ। এমতাবস্থায় তিনি তিন প্রকারের বাহন ব্যবহার করতেন একটি ছিল পাল্‌কী, একটি ছিল দুইঘোড়ার এক্কাগাড়ী, আর একটি ছিল কাল মরিস মাইনর কার। তখন বোধকরি কলকাতা ছাড়া অন্য কোথাও মটরকার কাউকে ব্যবহার করতে দেখিনি। যা হোক নানাজান এই লাখনৌ শহরে ইন্তেকাল করেন। তাঁর লাশ মোবারক তাঁর দুই স্ত্রী জনাবা মহসেনা খাতুন এবং জনাবা হাবিবা খাতুন তাঁদের নায়েব মুন্সীদের সহায়তায় একটি বড় বাস রিজার্ভ করে সোজা লাখনৌ থেকে বীরভূমের খুষ্টিগিরি গ্রামের প্রায় ১০০০ কিঃমিঃ পথ বেয়ে নিয়ে আসেন সম্ভবত ১৯৪০ সালে যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। নানাজানের লাশ দেখার পর আমার পিতা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সমস্ত পশ্চিম বঙ্গের যত আত্মীয় স্বজন ছিলেন সকলেই এই ঘটনার পর খুষ্টিগিরিতে জমায়েত হন। আমার মা, আমি ও আমার বোন সকলেই এ সংবাদ পাওয়ার পরপরই মাড়গ্রাম থেকে খুষ্টিগিরিতে হাজির হয়ে যাই। দীর্ঘদিন সেখানে থাকার পর আমরা মাড়গ্রামে ফিরে আসি। বর্তমানে খুস্টিগিরিতে মসজিদের প্রধান গেটে প্রবেশ করলেই প্রায় ৩০ ফুট দূরে নানজানের রওজা মোবারক দেখা যাবে।

এরপর আমি লাখনৌ শহরে প্রখ্যাত মহীয়সী মুসলিম বীরাঙ্গনা নারী বেগম হসরত মহলের প্রাসাদ সমুহের ধ্বংসাবশেষ দেখার জন্যে যাই। সেখানকার কিছু যুবক আমাকে সেদিকে যেতে দেখে ঠাট্টা করে বলে, কিয়া দেখিয়েগা ওঁহা যা কর, গোলা! সিরফ্‌ সেওয়ায়ে গোলা আউর কুছ নেহী।" কোন গাইড ছিলনা সেখানে। কিন্তু তবুও যেসব বড় বড় সাইন বোর্ড ইংরেজী ও হিন্দিতে লেখা আছে তা পড়ে দেখে আমি হতবাক হয়ে যাই। বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে এই মহীয়সী নারী তাঁর সৈন্যসামন্ত নিয়ে যে প্রচন্ড বিক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন তার পুরাপুরি বিবরণ দিয়েছেন জনৈক ইংরেজ কমান্ডার। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে ঐ বীরাঙ্গনা নারীর সাহসিকতায় তাঁর সেনা দলের তুলনায় অনেক বেশী ইংরেজ সেনানিহত

www.pathagar.com

হয়েছে এবং আহত হয়েছে প্রচুর। সমস্ত প্রাসাদগুলি ইংরেজ সেনাদের কামানের গোলাতে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। কী প্রচন্ড আকারের যুদ্ধ হয়েছিল এটা আমি সেখানে গিয়ে না দেখলে কখনও বুঝতে পারতাম না। ভারতে কেবলমাত্র একজন বীরাঙ্গনা নারীর নামই কেবল আমরা জানতাম। তিনি ছিলেন ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই এবং বহু পূর্বে পাঠান যুগে ছিলেন বিখ্যাত বীরাঙ্গনা নারী সুলতানা রিজিয়া। নিঃসন্দেহে এই তিনজন নারীই ভারতের গৌরব। বিকেল পাঁচটায় আমি রিকশাওয়ালাকে ৭০ রুপী ভাড়া চুকিয়ে রেলস্টেশন উপস্থিত হই। বিহারের রওশনগঞ্জের হযরত সৈয়দ শাহ রওশন আলী আল কাদেরী (রহঃ) মাযার শরীফ যিয়ারতের উদ্দেশ্যে। আমি ২/৪/১৯৯৬ তারিখে কিসানগঞ্জ রেলস্টেশনে সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় নেমেই মাগরিব নামাজ আদায় করি ঐ প্ল্যাট ফরমেই। যদিও ঐদিন রাত্রি ১২টা পর্যন্ত আমি ঐ ট্রেনেই ভ্রমন করতে পারতাম। যা হোক ডালকোলার উদ্দেশ্যে বাসে করে সেখানে যাই। রাতে সেখানে মসজিদে এশার নামাজ পড়ার পর মসজিদের ইমাম সাহেব আমার পরিচয় জেনে আমাকে বলেন, এস্থানটা খুবই খারাপ আপনার মত ব্যক্তির থাকার মত কোন হোটেল এখানে নেই। অতএব, আপনি আমার এই মসজিদের কামরাতেই রাতটা থাকুন। ভোরে উঠে ফজরের নামাজের পর মোয়াজ্জেম সাহেব ও আমি একটি হোটেলে সকালের নাস্তা করে নেই এবং তিনি আমাকে একটি বাসে তুলে দিয়ে যান পুর্নিয়া যাওয়ার জন্যে। রাজধামঘাট থেকে একটি ঘোড়া গাড়ী যোগে রওশনগঞ্জে বেলা ১২-৩০ মিঃ হাজির হই।

রওশনগঞ্জে পৌছার পর সেখানে বড় হুজুর পাক ও ছোট হুজুর পাককে একসঙ্গে পেয়ে আনন্দে আমার পথের সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে গেলাম। জনাব মহফুজ আলী চৌধুরী তথা শাহ্ সাহেব চাচাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বড় হুজুর পাক বিশাল আকারের মসজিদ ও মাযারের জন্যে এবং তাঁর নবনির্মিত খানকা পাকের উদ্দেশ্যে বেশ প্রকান্ড আকারের একটা প্রকৌশলীয় প্রোজেক্টের পরিকল্পনার জন্যে বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলেন। ইঞ্জিনীয়ার গৌতম বাবুও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি প্রথমেই গোসল সেরে নিয়ে মাজার পাকে হাজির হই। যোহরের নামাজও ওখানেই সেরে নিই। এরপর দরবার পাকের হুকুমে লঙ্গরখানায় বেশ তৃপ্তির সঙ্গে দুপুরের আহার শেষ করার পর আমার ডাক পড়ে বড় হুজুর পাকের নিকট।

www.pathagar.com

(দীর্ঘক্ষণ হুজুর পাকের সান্নিধ্যে থাকার পর আমি তাঁদের জন্যে যে আতর গুলি লাখনৌ থেকে কিনেছিলাম সেগুলি বড় হুজুর পাকের খাদেম এ্যাডভোকেট আসিফ সাহেবের নিকট হস্তান্তর করি এবং ইতোপূর্বে তাঁর নিকট যথারীতি নজরপাক ও নিয়াজ পাকের জন্যে ভারতীয় মুদ্রায় অর্থকড়ি জমা দিই। পরিশেষে বড় হুজুর পাকের হুকুম মোতাবেক বিকেলের দিকে রওশনগঞ্জ পাক থেকে বিদায় গ্রহন করি। পুর্ণিয়ার এক হোটেলে রাত্রি বাস করে পরের দিন কিসানগঞ্জের রেল স্টেশন থেকে ১৭৬ রুপীর বিনিময়ে রামপুরহাটে উপস্থিত হই। বিশাল ফারাক্কা ব্যারেজের উপর দিয়ে আসার সময় দিনের বেলায় ভালকরে ব্যারেজটা দেখার সুযোগ পাই। ব্যারেজের উভয় পার্শ্বে পানির উচ্চতার ভিন্নরূপ লক্ষ্য করে বুঝতে পারি যে, বাংলাদেশের মরন ফাঁদ ও ভারতের ফারাক্কার বাঁধের কী গভীর সম্পর্ক লুকিয়ে আছে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠবিংশ পর্ব

সুইডেন

সরকারী নাম	ঃ সুইডেন
রাজধানীর নাম	ঃ স্টকহম
আয়তন	ঃ ৪,৪৯,৯৬৪ বর্গ কিলোমিটার।
মুদ্রা	ঃ সুইডিস ক্রোনা
ভাষা	ঃ সুইডিস
মাথা পিছু গড় আয় (জিডিপি)	ঃ ২৫,৭১০ ইউ.এস. ডলার।
গড় আয়ু	ঃ ৭৯ বছর।

বাস্তবিক পক্ষে ১৯৯৬ সালটি ছিল আমার জন্যে সফরের সর্বোত্তম সময়। কেননা, এই বছরের শুরুতে আমি ভারতের একপ্রান্ত থেকে শুরু করে অন্য প্রান্তে শেষ করেছি একটা বড় ধরনের ভ্রমন যার বিস্তারিত বিবরণ এর ঠিক আগের পর্বে আমি সমাপ্ত করেছি। আর এবার এই বছরেরই শেষের দিকে অর্থাৎ ১৪ আগস্ট থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ এই মোট ৪০ দিনের সফরটি ছিল মধ্য প্রাচ্যের প্রধান ও পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারত। এই বিষয়ের উপর আমি ইতোপূর্বে মুসলিম বিশ্বের সফরনামা নামের একটি সুন্দর তথ্যবহুল বই ১৮টি রঙ্গীন চিত্রসহ নিজ খরচায় প্রকাশ করেছি। অতএব, এখানে আর ঐ বিষয়ের উপর কিছু লিখে এই বইয়ের কলেরব বৃদ্ধি করার প্রয়োজন বোধ করছিনা বরং আমি আমার সুপ্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের অনুরোধ করব ঐ বইটি সংগ্রহ করে পড়ার জন্যে। ভারতে মল্লিক ব্রাদার্সও বইটি প্রকাশ করেছে বিশেষত ভারতীয়দের জন্য।

১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি ফারুক হাতিরপুলের ড. আবদুল্লাহ আল মুতি সরফুদ্দীনের বাসা ছেড়ে দিয়ে আমাকেসহ নিউ ডিওএইসএস বাসা পছন্দ করে। জনাব হাজী আবুল হোসেন সাহেব ৩১নং রোডে চমৎকার একটি বাড়ীর মালিক।

www.pathagar.com

তাঁর চারতলা আমরা বাপবেটা পছন্দকরি। সম্পূর্ণ আধুনিক পদ্ধতিতে তৈরী এবং আমরাই প্রথম ভাড়াটিয়া হিসাবে সেখানে উঠে যাই। আমার পিতার ইতোপূর্বে তিন তিনবার হার্নিয়া অপারেশন করা হয়েছে। প্রথমে ঢাকায় পরে পাবনা সদর হাসপাতালে এবং আবার পরে ঢাকায় এবং সেই সঙ্গে তাঁর হাইড্রোসিল ও অপারেশন করা হয়। এতকিছুর পরেও তিনি কিন্তু চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সর্বশেষ দুর্ঘটনাজনিত অক্ষমতার ফলে তিনি একেবারেই সয্যাশায়ী হয়ে পড়েন যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি ১৯৯৮ সালে ৫ এপ্রিল এ বাসাতেই ৮৪ বছর বয়সে মহান আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দিয়ে ৭ জিলহজ্জ সকাল ৯.৩০টায় জান্নাতবাসি হন। আমার পিতার ইন্তেকালের পূর্বে আমি গলব্লাডারের পাথর সমস্যায় দীর্ঘদিন অর্থাৎ ১৯৯৪ সাল থেকে নানারকমের চিকিৎসার পরও বাংলাদেশে ডাক্তার সাহেবদের চিকিৎসা বিভ্রান্তির শিকারে পরিনত হই। শেষে আমার ভাগনা নোমান জাহেদীকে সঙ্গে নিয়ে তড়িঘড়ি বাংলাদেশ বিমানে কলকাতায় গিয়ে এক সপ্তাহের মধ্যেই বিখ্যাত সার্জন ডাঃ সৈয়দ আব্দুল মোমেনকে দিয়ে তাঁর নিজস্ব ক্লিনিকে গলব্লাডার কেটে বাদ দেওয়া হয়। অথচ বাংলাদেশে কোন সার্জন ছয় সপ্তাহের পূর্বে অপারেশন করা যাবে না বলে রায় দিয়েছিলেন। বাংলাদেশী ডাক্তার সাহেবদের অনেক বড় বড় বিদেশী ডিগ্রী থাকা সত্ত্বেও কেন যে তাঁরা এত অপারগ হন এটা আজও আমার বোধগম্য নয়। যা হোক আমি ভারতে চিকিৎসার মাস দেড়েক পর ফিরে আসি এবং সে সময় ভারতে আমার বোন ও তার মেয়েরা এবং জামাইরা যা করেছে তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আমি তাদের ছোট করতে চাইনা। বরং তাদের সকলের জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করি। "জাযাক আল্লাহো খায়ের ফিদ্দারায়েন" আমীন!! আমার মেজমামা জনাবা মেহবুব জাহেদী তখন ছিলেন ধর্মমন্ত্রী। তিনিই আমাকে সঙ্গে করে তাঁর পাশে দু' পাঁচটি বাড়ী পরেই ডাঃ এস,এ মোমেনের বাড়ী, সেখানে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর ছোট ছেলে মনসুর জাহেদীর বিয়ের কার্ডটাও তাঁকে দেন। অবশ্য আমার অপারেশনের পরেও মামা আমাকে ডাক্তারের দিলকুশা ক্লিনিকেও একবার দেখাতে গেছিলেন তাঁর চরম ব্যস্ততার মধ্যেও। তিনি আমাকে যথার্থই যথেষ্ট ভালবাসেন আমি তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি।

www.pathagar.com

আমি ঢাকায় সুস্থ হয়ে বিকেলের ফ্লাইটে ফিরে আসার কিছুক্ষণ পরই আমার ছেলে ফারুক বলে আব্বা কিছুক্ষন পূর্বে দারুল এহসান অ্যারাবিক ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ফোন এসেছিল আপনি নাকি সেখানে আরবী কোর্স করার জন্যে তাঁদের সঙ্গে ইতিপূর্বে যোগাযোগ করেছিলেন? আজই সেটা শুরু হতে যাচ্ছে। আমি তখন কাল বিলম্ব না করে তাঁদের ভর্তি ফি নিয়ে গিয়ে সেখানে আরবী কোর্সে যোগদান করি। দীর্ঘ তিন মাসের এই কোর্স আমি মহান আল্লাহ পাকের ফজলে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হই। এটা একটা সংক্ষিপ্ত কোর্স হলেও আমার জন্যে অনেক উপকারে লাগে। বাগদাদ শরীফ থেকে হযরত বড়পীর আব্দুল কাদের জীলানীর (রঃ) দরবার পাকের নব নিযুক্ত মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদা নশীন বংশধর হযরত সৈয়দশাহ আবদুর রহমান আলজিলী আল বাগদাদী সাহেব কেবলা ঢাকায় আমাদের বাংলাদেশ আঞ্জুমান ই-ক্বাদেরীরায় তশরীফ নিয়ে আসেন এবং তার আরবী বক্তৃতার তরজমা করার দায়িত্ব পড়ে আমার মত অধমের উপর। তিনি যদিও অতি উচ্চ শিক্ষিত বিলেত এবং মিশর থেকে আইনের উচ্চতম ডিগ্রী তাঁর আছে। তিনি চমৎকার ইংরেজি ভাষায়ও অতি উত্তম বক্তৃতা করতে পারেন। কিন্তু আমাদের খানকা শরীফের মসজিদে তাঁকে আমি বার বার আরবী বক্তৃতা করতে শুনেছি। একদিন জুম্মার নামাজও ঐ মসজিদেই আমরা তাঁর ইমামতিতে আদায় করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। মহান আল্লাহ পাক কবুল করুন আমীন!! তাঁর বক্তৃতার শেষে আমি তাঁকে আমাদের সকল পীরভাইদের জন্যে দোয়া করতে অনুরোধ করায় তিনি অতিদীর্ঘ এক মোনাজাত করেন যা পুরা কালাম মজিদের সমস্ত দোয়াগুলিই অন্তর্ভূক্ত ছিল। আলহামদোলিল্লাহ। প্রসঙ্গঁত ভাবে এখানে উল্লেখ করা যায় যে ঐ দারুল এহসান অ্যারাবিক ইউনিভার্সিটিতে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলী যথা জনাব আবুল কাসেম সাহেব, জনাব আবু বকর সিদ্দীক সাহেব প্রমুখ শিক্ষকবৃন্দ সকলেই মক্কাশরীফের উম্মুল কোরা এবং মদিনা শরীফের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী প্রাপ্ত হয়েই আমাদের শিক্ষকতা করতেন আরবী থেকে আরবী ভাষায়। অন্য কোন ভাষা তাঁরা শিক্ষকতার সময় ব্যবহার করতেন না। ফলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমাদের মধ্যে অনেকেই আরবী ভাষায় বেশ কিছুটা দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হন। মহাখালীর এই নিউ ডি ও এইচ এস বাসায় যেহেতু আমরা চার তলায় অবস্থান করতাম অথচ কোন

www.pathagar.com

লিফটের ব্যবস্থা না থাকায় আমরা ১৯নং রোডে একটা দোতলা বাসায় উঠে যাই। ঐ বাসায় থাকতে থাকতেই ২০০০ সালে আমার ছেলে ফারুক চাকুরী থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহন করে এবং তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেই একটা বাইং হাউস চালু করে। বেশ কজন অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করে বড় ড্রইং রুমে ভালই ব্যবসা করতে থাকে।

১৯৯৯ সালের মে মাসের দিকে আমার ছোট মেয়ে শাহীন সুইডেন থেকে আমার এবং ওর মায়ের জন্যে সুইডিস ভিসার ব্যাপারে যাবতীয় কাগজপত্র পাঠিয়ে দেয়। এতে প্রথম বারের মত ইউরোপ যাওয়ার সুযোগ পাই। সুইডিস ভিসার ফরম পূরণ করা যে কত কষ্টকর তা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। স্থানীয় সুইডিস এমব্যাসী দারুণ কড়া। সাধারণত মে মাস থেকেই ইউরোপে সামার (গরমকাল) শুরু হয়ে যায় এবং মাত্র ৩/৪ মাস পর্যন্ত তা বর্তমান থাকে বাকী ৮ মাস বিশেষত সুইডেনে প্রচন্ডশীত এবং সেই শীত কাল আমাদের এশিয়া মহাদেশের মত অত ভদ্র নয়। এব্যাপারে যা হোক পরে আলোচনা করব বিস্তারিতভাবে। আমাদের এয়ার টিকিট করা হয়েছিল জেমস ফিনলে ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে। কেননা ফারুক ঐ এজেন্টের মাধ্যমেই বেশীর ভাগ বিদেশ ভ্রমন করে থাকে অতএব আমরাও কোন এক বিকেলের দিকে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে গিয়ে বৃটিশ এয়ার ওয়েজের মাধ্যমে দিল্লী পর্যন্ত যাই। সেখানে রাত ৮টার মধ্যেই ইন্দিরা গান্ধী বিমান বন্দরে পৌছার পর আমাদের কানেকটিং ফ্লাইট ছিল কেএলএম অর্থাৎ ডাচ এয়ার লাইনস্। কিন্তু সেই প্লেনটি প্রায় তিনঘন্টা বিলম্বে আসে দিল্লীতে। আমরা অবশ্য ইতোমধ্যে বিমানের দেওয়া কুপনে উপর তলায় রেস্টুরেন্টে ভালমত রাতের ডিনার সেরে নিই। এরপর দীর্ঘসময় কাটানোর জন্যে আমি আমার মেহবুব মামা এম,পি সাহেবের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। দিল্লী এয়ার পোর্টে ঘুরে ঘুরে বহু কিছুই দেখলাম। বিশেষত মদের দোকানে যে সমস্ত দেশী বিদেশী মালের বেচা কেনা তা বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য।

রাত আড়াইটার দিকে আমাদের নির্ধারিত প্লেন কেএলএম এর ভিতর স্থান পায় এবং সেটা পরের দিন আমস্টার্ডামে সকাল ৮ টার সময় পৌছায়। সেখানে প্রাতঃক্রিয়াদি সেরে পরের ফ্লাইট পেতে পেতে প্রায় দুপুর বেলা। এই দীর্ঘসময়

www.pathagar.com

সমস্ত টারমিনালটা ঘুরে দেখা এবং ছবি তোলা এবং মাঝে মধ্যে এটা ওটা কিনে খাওয়া ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। তবে তাদের টার্মিনাল ভবনটা প্রায় ১ কিঃমিঃ দীর্ঘ এবং নানা প্রকারের রকমারী চটকদার ও চমৎকার সুসজ্জিত দোকানপাট দেখতে দেখতে অনেক সময় পার হয়ে গেল। রানওয়ের বাইরে দূরে বহু গাড়ী এক সঙ্গে কার পাকিং এ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি একটু অবাক হয়েছি যে এদের গাড়ীর সংখ্যা না জানি কত? এয়ারপোর্ট থেকে শহরটা অনেক দূরে যা দেখা যায় না। পরিশেষে আমরা একটা অপেক্ষাকৃত ছোট প্লেনে মাত্র ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই গোথেনবার্গ এয়ারপোর্টে যখন পৌছালাম তখন বিকেল চারটা আমার মেয়ে জামাই রুমী এবং তাদের একমাত্র মেয়ে মোনামী সকলেই আমাদের জন্যে আকুল ভাবে অপেক্ষায় ছিল এয়ারপোর্টে তারা আমাদের দেখে এবং আমরা তাদের দেখে যুগপৎ আনন্দ ও আবেগের জোয়ারে ভেসে যাওয়ার মত অবস্থা। আমার ছোট জামাই রুমী চমৎকার শক্তিশালী স্বাস্থের অধিকারী হওয়ায় সে একাই সব লাগেজ ট্রলীতে নিয়ে বাইরে পার্ক করা তার নিজের গাড়ীতে উঠিয়ে তুলে নেয়। আমি ও আমার স্ত্রী তাদের ছোট ৪/৫ বছরের ফুটফুটে অত্যন্ত সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে ব্যস্ত। অবশ্য এই মেয়ে ১৯৯৬ সালে ট্রলীতে বসে যখন ঢাকায় প্রথম আসে তখন আমরা হাতিরপুলে মৃতি সাহেবের বাসায় ছিলাম। ওরা তখন প্রায় মাস দুই ছিল। গোথেনবার্গ এয়ারপোর্ট থেকে মূল শহরটা প্রায় ৩৫ কিঃমিঃ দূর পুরো রাস্তাটা চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যে দেখতে দেখতে গেলাম। অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাস্তাঘাট এবং মাঝেমাঝে সারিবদ্ধ পাথরের পাহাড়। অথচ সেই পাথর ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে চমৎকার সুউচ্চ বৃক্ষাদি ও গাছপালা যা আমাদের গরম প্রধান দেশে জন্মায় না। আমার কিছু ভাবান্তর সৃষ্টি হল এই ভেবে যে পাথরের ভিতর থেকে কী ভাবে এত গাছপালা জন্মাতে পারে? পরে অবশ্য বুঝেছিলাম এ রহস্য সেটা হল যে শীত প্রধান দেশ হলেও সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এমন কি শীতের মৌসুমেও। ফলে এতবৃক্ষরাজির জমজমাট সমারোহ। আমদের দেশে যেখানে মাত্র ৮% বৃক্ষ রয়েছে। অথচ সত্যিকার অর্থে প্রয়োজন ৩৩% জনসংখ্যা অনুপাতে। Inter dependent of plant and animal Kingdom. হিসাব মত ঐ সংখ্যা হওয়া উচিৎ। আমাদের জনসংখ্যা এতবেশী এতছোট এলাকায় যা পৃথিবীর আর কোথাও

www.pathagar.com

নেই। অথচ ইউরোপের এলাকার বিশালতার তুলনায় লোক সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই সারাপথে আমরা কোন জনমানব বা পশু প্রাণীর কোথাও রাস্তার পাশে পায়ে হেঁটে চলাচল করতে দেখিনি। যা দু'চারটি মানুষ দেখেছি তাও ফুটপাতের উপর শহরের ভিতরে।

পরিশেষে আমরা তাদের নতুন কেনা একটা ফ্ল্যাট বাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। যেটা শহরের মধ্যেই একটা আবাসিক এলাকা নাম হল আক্কাস গাটা (Akkas Gata)। আমার মেয়ের ফ্ল্যাটটা দোতলা, বিল্ডিং নং ৪৮। প্রতিটি বিল্ডিং একই ধরণের দীর্ঘতা বিশিষ্ট এবং তিন তলা পর্যন্ত। অথচ একটা বিল্ডিং থেকে অন্যটার দূরত্ব ১০০-১৫০ ফুটের নীচে নয়। এ রকম প্রতি দুটি বিল্ডিং এর মাঝে রয়েছে চমৎকার শিশুদের পার্ক। নানা প্রকারের খেলনা দোলনার ব্যবস্থা রয়েছে। শিশুদের জন্যে যত প্রকারের সুযোগ সুবিধা থাকতে পারে তা সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র রয়েছে সুইডেন। কেননা সুইডেন প্রথমত ওয়েল ফেয়ার স্টেট। অর্থাৎ মানুষ থেকে শুরু করে যাবতীয় পশু পাখীদের সুযোগ সুবিধার জন্যে তারা মুক্তহস্ত উদার প্রাণ। আমি যেহেতু ভ্রমন বিলাসী মানুষ সুতরাং চতুর্দিকে যতখানি যেদিকে যাওয়া যায় আমি ঘুরতে বাকী রাখিনি। আমার সুপ্রিয় মেয়ে জামাই আমার মন মগজের খবর পেয়ে তারা তাদের সাধ্যমত যতদূর পেরেছে আমাদের নিয়ে তারা ঘুরেছে। সুইডেন ছাড়াও দু তিনটি দেশে এ সম্পর্কে পরে দীর্ঘ আলোচনায় আসা যাবে। এখন আমার মেয়ের ফ্ল্যাটটি ছোট হলেও তারা আমাদের জন্যে তাদের নিজেদের বেডরুমটি ছেড়ে দিয়ে অন্য একটি বেডরুমে তারা স্থান নেয়। ড্রয়িং রুমটি সুন্দর এবং তার সঙ্গেই রয়েছে এক চিলতে বেলকনি। এছাড়া আর কোন বারান্দা বা বেলকনি নেই কোথাও। শীত প্রধান দেশের ঘরবাড়ী আমাদের মত ট্রাপিক্যাল বা গ্রীষ্ম প্রধান দেশের মত মোটেও নয়। একটি মাত্র টয়লেট বা বাথরুম বেশ বড় বাথটাবসহ। কিচেন এবং ডাইনিং একত্র প্রতিটি বৃহৎ জানালায় দু তিনটি করে মোটা কাঁচের স্তর রয়েছে। এবং প্রতিটি রুমেই রয়েছে রুম হিটার। মেঝেগুলি প্রায় দামী কাঠের ঠান্ডা বা শীতকে ঠেকানোর জন্যে যত প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া যায় সবই আছে। আমরা আমাদের দেশে হিংস্রবাঘ বা বিষাক্ত সাপ ছাড়া আর তেমন কিছুকে যেমন ভয় করিনা, ইউরোপে তারা এরচেয়েও বেশী ভয়পায় শীতের হিমেল হাওয়াকে। বিশেষ

www.pathagar.com

ভাবে সুইডেনের উত্তরাঞ্চলে তেমন কোন লোক বসতি নেই বললেই চলে স্ক্যানডেনেভিয়ান দেশগুলির মধ্যে সুইডেনই বৃহত্তম এবং লম্বাটে। যেমন উত্তর থেকে সোজা দক্ষিণ দিকে নেমে গেছে। সুইডেনের প্রধান চারটি শহরের মধ্যে গেথেনবার্গ (Goteborg) হল দ্বিতীয় প্রধান শিল্প শহর হিসেবে খ্যাত। সুইডেনের মূল অর্থনীতি নির্ভর করছে এই শহরটির উপর দুটো বিখ্যাত মোটর গাড়ী প্রস্তুত করে এই শহর তারমধ্যে একটি হল ভলভো (Volvo) এবং অন্যটি হল সাব (SAAB)–আমি অনেক চেষ্টা করেও এদের প্রস্তুত প্রনালী দেখার সুযোগ পাইনি। আরও আছে এদের যুদ্ধাস্ত্র তৈরীর বিশাল বিশাল কারখানা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কোন পক্ষে যোগ না দিয়ে এরা কেবল উভয় পক্ষকে যুদ্ধাস্ত্র বিক্রি করেই এতবড় ধনী দেশে পরিনত হয়েছে। অথচ দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বে এরা এত দরিদ্র ছিল যে গমের আটার সঙ্গে কাঠের ভূষী মিশিয়ে খেতে বাধ্য হত। এর তৃতীয় প্রধান শহর হল উপসালা (Uppsala)। এখানকার এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯১৩ সালে। সুইডেনের সর্বদক্ষিণে চতুর্থ প্রধান শহরটির নাম মালমো। (Malmo) এই চারটি প্রধান শহরই মোটামুটি সুইডেনের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এখানে বাংলাদেশী যে কজন ভদ্রলোক বসবাস করেন তাঁদের প্রায় সকল পরিবারের সঙ্গেই আমার মেয়ে জামাইয়ের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় আমিও আমার স্ত্রী প্রায়ই তাঁদের দাওয়াত গ্রহন এবং আমাদের পক্ষ থেকে অধিকাংশ সময়ই নিমন্ত্রণ রক্ষা করা হত। ফলে যেন অনেকটা একই পরিবারের সদস্য হিসাবেগণ্য আমরা সকলেই। এই হৃদতা আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। আমার জামাইয়ের সেজ ভাই তথা আমাদের ভাগনা বেলাল, গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. বাবুল আনাম, মেজব মনসুর আহমদ, ডাঃ সেন এবং ঢাকার নিকটস্থ সকলেই ছিলেন বেশ অন্তরঙ্গ। আমি ঢাকা থেকে সুইডেন যাত্রার পূর্বে সুইডিস এমব্যাসী থেকে তাদের দেওয়া কাগজপত্র পড়ে সেখানকার অধিবাসীদের চরিত্র, রুচি আচার ব্যবহার ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপারে বেশ কিছুটা ওয়াকেফহাল হয়েছিলাম। যেমন সেখানে কেউ কাউকে নিমন্ত্রণ করলে এবং তা অপর পক্ষ থেকে গ্রহনযোগ্য হলে ঠিক নির্দিষ্ট দিনে এবং সঠিক সময়ে অবশ্যই তাদের আসতে হবে। জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকী ইত্যাদি অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের দেওয়া উপহার সামগ্রী যথারীতি খাওয়া দাওয়ার পর

www.pathagar.com

সকলের সম্মুখেই তাঁদের প্রদত্ত উপহারগুলি খুলে সকলকেই দেখান হয়। যেটা আমদের এখানে কখনই করা হয় না বা সম্ভব নয়। আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের নিমন্ত্রণ রক্ষার পরদিন অবশ্যই হোস্টদেরকে টেলিফোন করে জানতে হবে যে গতকাল তোমাদের খাবার গুলি বেশ ভাল ছিল এবং আমাদের কোন অসুবিধা হয় নি। অতএব তোমাদের অনেক ধন্যবাদ। এখানে এই চমৎকার সুইডিস কালচারটি আমাদের প্রবাসী বাঙ্গালী সমাজেও অবাধে প্রচলন আছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি সুন্দর শিক্ষা আবার অপরদিকে সুইডিসদের নীতি হল তাদের কোন কাজের সমালোচনা করা যাবে না তা যতই খারাপ হোক অর্থাৎ তাদের সবকাজই প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। নতুবা তাকে সুইডেন থেকে প্রস্থান করতে হবে।

www.pathagar.com

সপ্তবিংশ পর্ব

সুইডেনের প্রতিটি শহরেই প্রচুর দেখার এবং আনন্দ করার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষ করে শিশুদের জন্যে এবং ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেককেই শিশুর পর্যায়ে গণ্য করা হয়। শিশু মায়ের পেটে আসার সময় থেকেই তাদের জন্যে সরকার সর্বপ্রকারের খরচাদি বহন করতে থাকে ১৮ বছর পর্যন্ত ফলে কোন শিশুকেই তার পিতামাতা বা কোন শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর কোন প্রকারের শাসন করার এখতিয়ার নেই বরং শিশুদের প্রথম দিনেই স্কুলে ৯৯৯ এই টেলিফোন নম্বরটি শিশুদের দেওয়া হয় যাতে সে প্রয়োজনে পুলিশের নিকট প্রতিবাদ জানাতে পারে। ফলে সুইডেনকে বলা হয় এটা প্রথমেই শিশুদের দেশ। এরপর মহিলাদের স্থান এবং তারপর কুকুরের অগ্রাধিকার সর্বশেষে পুরুষের স্থান নির্দ্ধারণ করা আছে সরকার থেকেই। ফলে প্রায় অধিকাংশ শিশুই হয় বেয়াড়া, অবশ্য আমাদের বিবেচনায়। ছেলে মেয়েরা পিতা মাতা থেকে শুরু করে শিক্ষকদের নাম পর্যন্ত ধরে ডাকে। এমনকি শিক্ষককে প্রহারও করতে পারে। অথচ তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যাবে না। আমার জানা মতে কোন কোন শিক্ষককে চিকিৎসার জন্যে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতেও শুনেছি। কিন্তু তবুও ঐ সব শিশুদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ গ্রহনযোগ্য নয়। 'Spare the rod and spoil the child' নীতিটা বোধকরি তাদের মজ্জাগত নীতির মধ্যেই গন্য। সুইডেন অবাধ যৌনাচারের দেশ (Sex Free Country) হিসেবে পরিচিত। ফলে সেখানে অবাধে পর্ণছবি ও পুস্তক অবাধে দোকনে বিক্রি হয়। অনেক শিশুই তাদের পিতার নাম স্কুলে শিক্ষদের নিকট বলতে পারে না। এমনকি অনেক মাতাও বোধকরি সঠিক পিতার নাম বলতে অপারগ। এবং এটা তাদের নিকট কোন লজ্জা শরমের ব্যাপার নয় মোটেই। আমি স্কুলের ছেলে মেয়েদের পর্যন্ত অবসর সময়ে পর্ণপুস্তক পড়তে লক্ষ্য করেছি। স্কুলের শিক্ষায় পাশ-ফেল কোন ব্যাপারই নয়।

দোকান বাজারে বা কোন শপিং মলে কোথাও কাউকে উচ্চস্বরে কথা বলতে শুনিনি। আমাদের বাঙ্গালীদের মত অযথা কোন কৌতুহল কাউকে কখনও প্রকাশ করতে দেখিনি। বড় বড় ডিপার্টমেন্টাল শপে সবকিছুই পাওয়া যায়। ইচ্ছামত পছন্দমাফিক প্রত্যেকেই ঘুরে ঘুরে সব কিছু প্রয়োজন মত নিতে পারে এবং বের

www.pathagar.com

হওয়ার সময় মূল্য চুকিয়ে দিতে হয়। সুইডিস ভাষা তাদের একমাত্র প্রধান ভাষা হলেও তারা অনেকেই ইংরেজি ভাষা জানে। গোথেনবার্গ শহরের কোরটাডালা এলাকায় বেশ উচু পাহাড়ের উপর একটি নিজস্ব ভিলাতে থাকেন মেজর মনসুর সাহেব তাঁর স্ত্রী বীনা এবং তাঁদের দু মেয়েসহ। তাঁদের বড় মেয়ের নাম রিমা এবং ছোট মেয়ের নাম জেনিফার। আমাদের ছোট জামাই রুমীর পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সকলেই অতিশয় ভদ্র ও মার্জিত ব্যক্তিত্বের অধিকারী। ফলে যেহেতু আমরা রুমীর শশুর শাশুড়ী তথা খালা ও খালু (পূর্ব সম্পর্কে) বিধায় তারা সকলেই আমাদেরকেও ঐ একই খালামা ও খালুজান সম্বোধনেই অভ্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া আমরা বয়সেও তাঁদের অনেকের চেয়ে বয়ঃজৈষ্ঠ ছিলাম।

বাবা জীবন মনসুর সাহেবের দোতলা ভিলাটা আমাদের নিকট সবচেয়ে সুন্দর লেগেছে সর্বদিক থেকে। একটা উঁচু টিলার উপর অবস্থিত বলেই শুধু নয় বরং অত্যন্ত পরিপাটি ভাবে সাজানো গোছানো একটি চমৎকার পরিবেশ লক্ষ্য করেছি সব সময়। তাঁরা প্রায়ই আমাদের নিমন্ত্রণ করতেন। আমরা অনেক সময় কখনও কখনও তা গ্রহণ করতে অপারগ হয়েছি বলে দুঃখ। শাহীনের বাসা আক্কাস গাটা থেকে তা বেশ একটু দূরে হলেও কোরটাডালা পর্যন্ত মোটর কারে যেতে বেশ ভালই লাগত। কেননা, যাত্রাপথ ছিল কখনও টানেলের ভিতর দিয়ে, আবার কখনও বা ছিল ফ্লাই ওভারের উপর দিয়ে। তাছাড়া পথের উভয় পার্শ্বেই দেখতে বেশ চমৎকার চকচকে ঝকঝকে মনোরম পরিবেশ। তাঁদের ভিলার সঙ্গেই রয়েছে সম্মুখে ও পিছনে সুন্দর লন। পিছনের লনে রয়েছে নানা প্রকার ফল ও ফুলের সমাহার। গ্রীষ্মকালে ঐ পিছনের লনেই তৈরী করা হত বারবিকিউ। অর্থাৎ মুরগীর রোষ্টসহ রুটি বা পরটা ইত্যাদি নানা প্রকার সুস্বাদু গরম গরম খাবার যা সেখানে চেয়ার টেবিলে বসেই খাওয়ার এক মজাই আলাদা, অপূর্ব বিশেষত আমাদের নিকট। এরকম ঠিক একইভাবে ড. বাবুল আনাম তাঁর ভিলার প্রকান্ড লনে এধরণের বারবিকিউ খাবারের আয়োজনে আমাদের আপায়িত করেছেন কয়েকবার। বেচারা বাবুল আনাম তাঁর অসুস্থ শরীর নিয়েও আমাদের বার বার দাওয়াত করতেন। তাঁর একটি পা সম্ভবত পোলিওর কারনে শুকিয়ে যেতে থাকে ক্রমাগত ভাবে। অথচ তিনি একটা ক্রাচের সাহায্যে কোন কাজ করতেই অবহেলা করতেন না। গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন পদার্থ বিদ্যার একজন দক্ষ শিক্ষক তাঁর গুণবতী স্ত্রী বীনা তিনিও ছিলেন বেশ উচ্চশিক্ষিতা। তাঁরা সুইডিস ভাসায় এরূপ পারদর্শী ছিলেন যে সে ভাষায় নানা প্রকার মূল্যবান বই পুস্তক রচনা করেছেন। এমনকি তাঁদের একমাত্র ছোট ছেলে বুদ্ধ

www.pathagar.com

সে পর্যন্ত সুইডিস ভাষায় বই লিখে পুরস্কার পেয়েছে একাধিকবার। অবশ্য সে আমাদের সঙ্গে তেমন কোন বাংলা বা ইংরেজিতে কথা বলতে বেশ অপারগ ছিল লক্ষ্য করেছি। তবে তাঁর একমাত্র মেয়ে পিকুও ছাত্রী হিসাবে বেশভাল সে আমাদের সঙ্গে ভাঙ্গা বাংলা এবং ইংরেজিতে কথা বলতে পারত। বাবুল সাহেবের ভিলাও দোতলা এবং প্রচুর ফল ও ফুলের গাছ রয়েছে। ড. বাবুলকে আমি একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম আমি যদি এই সুইডিস ভাষাটা শিখতে চাই তবে কতদিন লাগতে পারে? তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন বিশ দিন অথবা বিশ বছর। আমি তো অবাক! সেটা কী রকম? তিনি আমাকে বলেন, আপনি খালুজান চেষ্টা করেই দেখেন। তিনি আমাকে বইপত্র এমন কি ক্যাসেট পর্যন্ত পাঠিয়ে দেন এবং শিখতে গিয়ে তাঁর কথার যথার্থতা বুঝতে পারলাম। শেষে আমার মেয়ে শাহীন আমাকে বলল আব্বা এটা শিখতে গিয়ে আপনার ইংরেজি ভাষাটাও গোলমাল হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভবনা আছে বিশেষত আপনার এই বয়সে। অতএব এটা আপনার কষ্ট করে শিখার কোন প্রয়োজন নেই।

ডাঃ সেন এবং তাঁর স্ত্রী তাঁরা প্রায়ই আমার মেয়ের বাসায় দাওয়াত গ্রহণ করতে খুবই ভালবাসতেন। যদি ডাঃ সেনের বয়স এখন প্রায় ৮০ বছর। তিনি খুবই স্বল্প ভাষী লোক কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন তার সম্পূর্ণ উল্টো। তাঁদের কোন নিজস্ব গাড়ী না থাকলেও সরকার তাঁদের এবং ড. বাবুল আনামকে প্রয়োজনমত ট্যাক্সিকার ব্যবহারের একটা সীমিত সুযোগ দিয়ে থাকে। কেননা তাঁরা দুজনই ছিলেন শারীরিক ভাবে অক্ষম ব্যক্তি সেই হিসাবে সুইডিস সরকার এরকম বহু লোককেই নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকে। ডাঃ সেন, তাঁর স্ত্রী আমাদের এবং ড. বাবুল আনামের পরিবারকে একদিন দুপুরের দিকে বেশ চমৎকারভাবে ইলিশ মাছসহ নানা প্রকারের অনেক সুখাদ্য খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন। আমি ও আমার স্ত্রী কোকা কোলার পরিবর্তে সবসময় স্প্রাইট খেতে পছন্দ করি বলে মিসেস সেন সে ব্যবস্থাও রেখেছিলেন।

বাবা জীবন রিপন ও তার স্ত্রী সুমী এবং তাদের একটি বছর দুয়েকের মেয়েও প্রায়ই শাহীনের বাসায় নিমন্ত্রণে আসত। উল্লেখ্য যে, সুইডেনে সাধারণতঃ পূর্বনির্ধারিত নিমন্ত্রণ ছাড়া কেউ কার বাসা বেড়াতে যায় না। উপরন্তু এক একজনের বাসা বিভিন্ন এলাকায় অনেক দূরে হওয়ায় গাড়ী বা বাস ছাড়া যাওয়া দারুণ অসুবিধা। রিপন অনেক পরে সুইডেনে আসে বলে তাদের সুযোগ সুবিধা অপেক্ষাকৃত কিছুটা কম।তবুও তাদের বাসায় আমরা বার দুই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই। তারাও যথেষ্ট আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের আপ্যায়ন করে। আমি রিপনকে

www.pathagar.com

বলেছিলাম, দেখতো তোমার ভলভো কোম্পানীতে গিয়ে আমি গাড়ী তৈরীর প্রক্রিয়া দেখে আসতে পারি কিনা? সে বেচারা অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেনি। কেননা ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের পর আর কোন বিদেশীকে তারা সেখানে ঢুকতে দেয় না। বর্তমানে অনেক কড়াকড়ি নিয়ম করেছে বিশ্বের সর্বত্র বিশেষত এ জাতীয় কোম্পানী গুলিতে। ওদের ফ্ল্যাটটি একটি খুবই উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত হওয়ায় বহুদুর পর্যন্ত গোথেনবার্গের অনেকখানি দেখা যায়। অত্যন্ত চমৎকার দৃশ্যপট লক্ষ্য করা যায় চারিদিকে। আসলে পাহাড়িয়া এলাকার সঙ্গে সমতল এলাকার এখানেই বিরাট পার্থক্য। এটা একমাত্র সরেজমিনে না দেখা পর্যন্ত উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। রুমীর সেজ ভাই সৈয়দ মুস্তাক ইলাহীকে সেখানে অনেকেই চেনে। কেননা দীর্ঘদিন ধরে তারা সেখানে বসবাস করছে। তাদের নিজস্ব ভিলা আছে দোতলা। রুমী পরে গিয়ে সেখানেই উঠে। তার এই ভাই বেলালের চেষ্টাতেই রুমী সুইডেন যেতে সমর্থ হয় অনেক চেষ্টা তদবিরের পর। বেলালের তিনটি চমৎকার সুন্দরী মেয়ে আছে। আমরা এখান থেকে যাওয়ার পর বেলাল ওর বাসায় আমাদের নিয়ে যায়। নিজেদের ভিলা যাদের সেখানে রয়েছে তাদের প্রত্যেকেরই এলাকা নিজেদেরই পরিস্কার করতে হয়। যেমন প্রতি সপ্তাহে লনের ঘাসকাটা নিজেদের বিদ্যুৎ প্রয়োজন মত চালু রাখা। ইত্যাদি যাবতীয় কাজই তাদের উপর নীচে বার বার যাওয়া আসার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। এটা আমার মেয়ে করতে মোটেই রাজি নয় বলে, তারা একটি বাড়ীর ফ্ল্যাট কিনেছে। অথচ রুমীর কিন্তু একটি ভিলা নেওয়ার খুবই ইচ্ছা লক্ষ্য করেছি। সে নিজে অবশ্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে পারে এবং সবকাজই সে শিখে রেখেছে। যেহেতু সেখানে কোন কর্মচারীকে ডেকে বাড়ীর ছোট খাট কাজ করানো অত্যন্ত ব্যয় বহুল। তার নিজের গাড়ীর সমস্ত কাজ সে নিজেই বেশ চমৎকারভাবে করতে পারে। আমরা তার এখানে যাওয়ায় সে এতই আনন্দিত যে আমাদের কী দেখাবে আর কী না দেখাবে তা নিয়ে প্রায়ই ব্যস্ত থাকত। সমস্ত গোসেনবার্গ শহরে সেখানে যতকিছু দর্শনীয় স্থান আছে সবই সে আমাদের গাড়ীতে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখিয়েছে। কোন কিছুই বাকী রাখেনি। খাবারের সময় হলেই ম্যাকডোনালস্ অথবা কোন চাইনিজ রেস্টুরেন্টে নিয়ে গিয়ে আমাদের বহুবার খাইয়েছে। আদতেই সে একজন শুধু স্পোর্টসম্যানই নয় বরং তার চেয়েও অনেক বড় যেটা হল, স্পোর্টসম্যান স্পিরিটের অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। এটা খুবই বিরল গুন যা অনেক অনেক বড় বড় খেলোয়াড়ের মধ্যেও দেখা যায় না।

www.pathagar.com

সে আমাদের ভিসা ছাড়াই অনেক কায়দা কৌশল করে ৩০০ কিঃমিঃ দূরে নরওয়ের রাজধানী অসলো (OSLO) তে নিয়ে যায় বেড়াতে। সকাল ৯ টায় বেরিয়ে রাত ১১ টার মধ্যেই ফিরে আসি। নরওয়ের জন সংখ্যা ৪.৪ মিলিয়ন। সীমানা ৩,২৩,৭৫৮ বর্গ কিঃমিঃ মূদ্রার নামঃ নরওয়েজিয়ান ক্রোন (Norwegian Krone)। ভাষাঃ নরওয়েজিয়ান। জিডিপি মাথা পিছু ৩৪,৫১০ ইউএসডলার মানুষের গড় আয়ুঃ ৭৮ বছর। আমরা একপথ দিয়ে গিয়ে অন্যপথ হয়ে ঘুরে আসি। অথচ ভিসা বা পাসপোর্টের কোন ঝামেলা কোথাও লক্ষ্য করলাম না। অত্যন্ত চমৎকার শহর অসলো। সেখানে প্রায় ১৬টি মসজিদ আছে। এই শহর থেকেই নোবেল শান্তি পুরস্কার দেওয়া হয়। কেননা কমিটি থেকে সিদ্ধান্ত মোতাবেক সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয় সুইডেনের রাজধানী স্টকহমের নোবেল হাউস থেকে। রাজধানী অসলোর অবস্থানও অনেকটা দক্ষিণে তবে। গোথেনবার্গ থেকে ৩০০ কিঃমিঃ উত্তরে একদম পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্র অথচ ভিসা পাসপোর্টের কোন ঝামেলা নেই। আমরা অসলোতে দুপুরে একটি পাকিস্তানী হোটেলে চমৎকারভাবে খাওয়া দাওয়া করলাম অত্যন্ত তৃপ্তির সঙ্গে। মনে হল অনেক মুসলমান বিশেষত পাকিস্তানীরা সেখানে বসবাস করছেন। তাদের অনেকগুলি শপিং মলও আমরা ঘুরে দেখলাম যেমনটা সুইডেনের গোথেনবার্গে দেখেছি। শহরের নিকটেই বিশাল সমুদ্রে বন্দর এবং রেলস্টেশন। এখানকার পানি ড্রিসটিল ওয়াটারের মতই পরিশুদ্ধ। ফিরে আসার পথে বেশ কয়েকটি শিল্প শহর লক্ষ্য করলাম গোথেনবার্গ থেকে রুমী আমাদের নিয়ে যায় ত্রোলহাসান। এই শহরটাও বেশ ১৫০ কিঃমিঃ দূরে। এখনকার চমৎকার পাহাড়ী দৃশ্যাবলী ও নদী বেশ দেখার মত। তবে একটা মসজিদ এখানকার অমুসলিম অধিবাসীরা পুড়িয়ে ফেলার পরে সেখানে বসবাসকারী মুসলিম ও পাকিস্তানিরা অনেক সুন্দর করে আবার একটি দোতলা মসজিদ তৈরী করেছে। আমি এর ভিতর আসরের নামাজ পড়তে চেয়েছিলাম কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করার তেমন কোন পথ কুঁজে পেলামনা। ফলে বাইরেই পড়ে নিলাম। এই মসজিদের অনেক ছবিও তুললাম। প্রায় প্রতিস্থানে যাওয়ার পূর্বে শাহীন তার ভিডিও ক্যামেরা, ষ্টিল ক্যামেরা এবং আমি আমার ক্যামেরা সব সময়ই সঙ্গে রাখতাম। ফলে প্রচুর দর্শনীয় ছবি উঠাতে আমাদের কোন অসুবিধা ছিলনা। গোথেনবার্গে একটা বিশাল রোজগার্ডেন দেখলাম। তিন হাজারের উপর বিভিন্ন প্রকারের গোলাপ ফুল অনেকেরই চমৎকার সুগন্ধ রয়েছে। একটি প্রকান্ড কাঁচের ও প্লাস্টিকের তৈরী হলের ভিতর রয়েছে পৃথিবীর বহু প্রজাতির গাছপালা এবং সেখানে

www.pathagar.com

রয়েছে বহু প্রকারের প্রজাতি যা বাস্তবিকই দেখার মত। এই শহরে রয়েছে অতিবিশাল আকারের লিসাবেরী অর্থাৎ নানা প্রকারের খোলাধুলা আমোদ প্রমোদ ও ইলেকট্রনিকস যানবাহন যার গতি অত্যন্ত দ্রুত। আমরা কয়েকটিতে চেপে দেখলাম। অবশ্য বর্তমানে ঢাকায় এরই কিছু ছিটে ফোটা ফ্যান্টাসী কিংডম নামে তৈরী করা হয়েছে শুনেছি আশুলিয়ায়। শিশুদের আমোদ প্রমোদের কোন অন্তনেই সুইডেনে। তবে উলঙ্গ স্ত্রী পুরুষের প্রচুর পাথরের স্ট্যাচু রয়েছে সর্বত্র। এর মধ্যে নাকি অতি উচ্চাঙ্গের সৌন্দর্য নিহিত আছে। যা আমরা মোটেই বুঝিনা ফলে আমাদের নিকট বড়ই দৃষ্টিকটু লেগেছে। এটা সমস্ত ইউরোপের নাকি একটি বিশিষ্ট শৈল্পিক কালচার, যারমধ্যে রয়েছে প্রচুর গোপন সৌন্দর্য। শুধু তাই নয় পথে বা বাজারে প্রায়ই অসংলগ্ন অবস্থায় তাদের একে অপরকে চুম্বন করতে দেখা কোন ব্যাপারই নয় এটাও তাদের ইউরোপীয় কালচার। গোথেনবার্গ শহরের অনেকখানি এলাকা লেকের মাধ্যমে বিস্তারিত। এই বিস্তীর্ণ জলপথে আমি ও রুমী একদিন ভ্রমন করলাম। একটি সুন্দরী মেয়ে ইংরেজি ও সুইডিস ভাষায় ধারা বর্ণনা দিয়ে যাচ্ছিল সর্বক্ষণ। অনেকগুলি পুলের নীচে দিয়ে আমাদের বোট এগিয়ে যাচ্ছিল। ফলে কখনও কখনও মাথনীচু করেও আমদের বসে থাকতে হয়েছে। প্রায় দেড় দু ঘন্টা জলপথ ভ্রমন বেশ ভালই লাগল।

শাহীনের কলেজের এক পাকিস্তানী বান্ধবী রুবীনা গোথেনবার্গ থেকে অনেক দূরে একটি পাহাড়ী এলাকায় থাকতেন। তাঁরা মাঝে মাঝে টেলিফোন করে শাহীনের এখানে বেড়াতে আসতেন। দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করে খাওয়া দাওয়ার পর তাঁরা চলে যেতেন। ভদ্রলোক অত্যন্ত ধনী ব্যক্তি ছিলেন একসময়। কিন্তু বর্তমানে প্রায় অনেকটা নিঃস্বঅবস্থায় রয়েছেন। বয়স্ক ভদ্রলোক অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত। তাঁরাও একদিন আমাদের বারবীকিউ খাওয়ার জন্যে দাওয়াত করেন এবং প্রচুর পরিমাণে খাবারের আয়োজন করেন। তাঁদের তিন মেয়ে ও এক ছেলে মুন্না সকলেই বেশ লম্বা আকৃতির এবং তারা সকলেই বেশ খানেওয়ালাও বটে। ভদ্রলোক আমি ও রুমী এই তিনজনে তাঁদের বিশাল পাহাড়ী জংলী এলাকার অনেকখানি ঘুরে ফিরে দেখে আসলাম। পুরো এলাকা অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর ও দর্শনীয়। ঐ এলাকার নাম এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছেনা বলে দুঃখিত।

এবার সুইডেনের রাজধানী খোদ স্টকহমে যাওয়ার জন্যে রুমীর কজন বন্ধু সেখান থেকে বার বার আমাদের টেলিফোন করতে থাকে। বিশেষত রুমীর দু বন্ধু যাদের বাড়ী ময়মনসিংহ তাদের মধ্যে নিপা এবং মন্টুর প্রবল আগ্রহের ফলে ৬০০

www.pathagar.com

কিঃমিঃ দীর্ঘ পথপাড়ী দিয়ে পৌঁছালাম সেখানে। পথে অবশ্য বার দুয়েক আমাদের খাওয়া দাওয়া করতে হয়েছে। সঙ্গে যথেষ্ট খাবার নেওয়া হত। ইউরোপের সমস্ত রাস্তায় রোড সিগন্যাল অত্যন্ত চমৎকার। যেমন কতদূরে আছে রেস্টুরেন্ট, টয়লেট অথবা রেস্টহাউস ইত্যাদি নানা প্রকারের সিগন্যাল রয়েছে মাত্র কয়েক কিঃমিঃ পর পর। ফলে দীর্ঘ যাত্রাপথে যেমন কার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করার কোন সুযোগ নেই তেমনি তার কোন প্রয়োজনও নেই। যা আমাদের দেশে কোথাও কল্পনা করতে পারিনা। পরিশেষে বিকেলের দিকে নোবেল হাউসের কাছাকাছি গিয়ে আমরা যখন পোঁছাই তখন মন্টু ও তার রাশিয়ান বৌ পাউলিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। যেহেতু মোবাইলের মাধ্যমে পথে বেশ কয়েকবার তার সঙ্গে রুমী যোগাযোগ করেছিল। মন্টু বেশ স্বাস্থ্যবান ও কালো হলেও তার রশিয়ান বউটি ছোটখাট বটে তবে বেশ চমৎকার। আমরা মন্টুর সাহায্যে কিছুটা এদিক ও দিক ঘুরে ফিরে বাসায় হাজির হই। অবশ্য আমাদের ইচ্ছা ছিল মাত্র একটা রাত নিপার বাসায় কাটিয়েই পর দিন ফিরে যাওয়া। কিন্তু ওরা আমাদের পেয়ে এতখুশী যে, তারা আমাদের জন্যে নানা রকমের প্রোগ্রাম তৈরী করে রেখেছিল। পরদিন সকালে কারপাকিংএ বহুগাড়ীর মধ্যে দেখা গেল রুমীর গাড়ীর চারটি চাকারই কভার প্লেটগুলি চুরি হয়ে গেছে। যা হোক তার পরদিন নিপা মন্টু মিলে প্রধান বাংলাদেশী গায়ক জনাব জাহাঙ্গীর সাহেবকে নিয়ে এসে নিপার বাসায় নানারকম বাদ্যযন্ত্রসহ জনাব জাহাঙ্গীর ভাই, মন্টু ও নিপা সকলেই চমৎকার আধুনিক বাংলা ও উর্দূ গান গেয়ে আমাদের সকলকে মোহিত করেন। ওদিকে মন্টুর স্ত্রী পাউলিয়া সর্বক্ষন দীর্ঘ সময় পিয়ানো বাজিয়ে প্রতিটি গানের সুরমিলিয়ে চমৎকার আনন্দ দিয়েছে আমাদের। মন্টু ও বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে বাংলাদেশী কৌতুকপ্রিয় লোক সংঙ্গীত শুনিয়েছে অনেকক্ষন। নিপাতো রীতিমত দাঁড়িয়ে পপ সংঙ্গীতের ঢঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর গান শুনাল। রাত ১০ টা পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানের জন্যে প্রতিবেশীদের নিকট থেকে নিপা পূর্বেই অনুমতি নিয়ে রেখেছিল। নিপার সুন্দরী বৌ অতি চমৎকার সব বাংলাদেশী খাবার আমাদের জন্যে প্রস্তুতকরে রাখত। জাহাঙ্গীর সাহেব আমার স্ত্রীকে আপা এবং আমাকে সব সময় দুলাভাই ডাকে সম্বোধন করতেন। অত্যন্ত সদালাপী ও খোশ মেজাজী মানুষ তিনি। তৃতীয় দিন আমি রুমীর এইসব বন্ধুদের রাতের ডিনারের জন্যে নিমন্ত্রণ করি এবং তারাই ঠিক করে কোথায় কোন রেস্টুরেন্টে খেতে যাবে। বাংলাদেশী এক রেস্টুরেন্টে চমৎকার সুস্বাদু খাবার খেয়ে আমাদের সকলেরই খুবই ভাল লাগল। আমরা জনা ১২ মত উপস্থিত ছিলাম।

www.pathagar.com

পরের দিন জাহাঙ্গীর সাহেব তাঁর অনেক দূরের বাসায় আমাদের দাওয়াত করেন সকলকেই এবং আবার সেখানেও গানের জমজমাট আসর। পথে যাওয়ার সময় আমি ও আমার স্ত্রী, পাউলিয়া এবং আমার নাতনি মোনামী ছিলাম মন্টুর গাড়ীতে। কিন্তু এমন জোর বৃষ্টি নামল যে, কিছুই দেখা যায় না। সম্মুখে রয়েছে রুমীর গাড়ী তাও দেখা যায় না। মন্টু আমাকে বলল খালুজান আমি এই শহরে দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর আছি কিন্তু কোনদিন এমন বৃষ্টি আমরা কেউ দেখিনি। মন্টু খুবই দক্ষ গাড়ীচালক। পাউলিয়ার সঙ্গে মোনামী সুইডিস ভাষায় কথা বলে চমৎকার। কিন্তু আমার স্ত্রী ও পাউলিয়া কেবল পরস্পরের প্রতি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই বলার অবকাশ ছিলনা। রাজধানী স্টকহম অত্যন্ত বড় শহর। ৪৭ টি দ্বীপকে নিয়ে এই বিশাল শহরের চতুর্দিকে রয়েছে প্রচুর লেক। তারমধ্যেও নানা প্রকারের বর্ণাঢ্য ফোয়ারা। দেখার মত বহু কিছুই রয়েছে শহরের বহুস্থানে। বিশেষত নোবেল হাউসের সম্মুখে সাগরের মত বিশাল লেকের উপর অনেক ফোয়ারা। নোবেল হাউসে আমরা ঢুকলেও উপর তলায় যাওয়ার তেমন অনুমতি নেই। তবুও আমার কৌতুহল বশতঃ কেবল এক ঝলক চোখ বুলিয়ে এসেছি। বিশাল আকৃতির প্রাসাদের বাইরে রক্ষিত আছে যেন স্বর্ণমন্ডিত শায়িত অবস্থায় আলফ্রেড বার্ণাড নোবেলের প্রতিকৃতি। সুইডেনে কোথাও কোন বাড়ীঘর আমাদের দেশের মত রং বেরঙ্গের নয়। মন্টু একদিন বিকেলে আমাদের নিয়ে গেল একটি সর্বোচ্চ টাওয়ারের উপর যেটার উপরিভাগটা ধীরে ধীরে ঘুরছে। অতএব একস্থানে দাঁড়িয়ে থেকেই সম্পূর্ণ শহরটা দেখা যায়। আমি মন্টুকে জিজ্ঞাসা করি বাবা তোমাদের এখানকার কোটিপতিদের আবাসগুলি কোথায়? সে আমাকে দেখায় যে ঐ দূরে যে কতকগুলি বস্তির মত বাড়ীঘর দেখতে পাচ্ছেন ঐ গুলিই হচ্ছে এখানকার কোটি পতিদের আবাসস্থল। সমস্ত সুইডেনে আমরা ধনী-দরিদ্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ধারন করতে পারিনি। স্টকহমে রাস্তার উপরে যেমন রয়েছে ট্রাম, বাস নানা প্রকার যানবাহন। তেমনি মাটির নীচেও রয়েছে মেট্রোট্রেন ইত্যাদি। অপরাধীদের শাস্তি হিসাবে জেল জরিমানা আছে কিন্তু কোন মৃত্যুদন্ড নেই। আরও মজার ব্যাপার যে জেলে যাদের পাঠানো হয় তাদেরকে তার চাবীটাও দেওয়া হয় ঘুরে ফিরে বেড়াবার জন্যে। তবে ভয়ংকর অপরাধীকে বলা হয় তোমাকেও চাবীটা দিলাম বটে তবে ১০ কিঃমিঃ এর বেশী তুমি যাবে না। কেননা তোমার হাটুতে আমরা একটা ইলেক্ট্রনিক বেল্ট পরিয়ে দিয়েছি যার সংকেতে আমরা তোমাকে ধরে ফেলব এবং তুমি অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। এবং প্রত্যেক কয়েদিকেই বলে দেওয়া হয় যেন রাতে তাকে

www.pathagar.com

জেলখানায় পাওয়া যায়। এমন নিয়ম ও সুযোগ সুবিধা পৃথিবীর আর কোনদেশে আছে কিনা আমি জানিনা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্ট সকলেই সাধারণ লোকের মত চলাচল করেন এমনকি তাদের ঘাড়ে টোকামেরে যে কোন ব্যক্তি প্রশ্নও করতে পারেন। জনৈক প্রধানমন্ত্রী একটি নতুন চকলেটের দোকানে গিয়ে মাত্র একটা চকলেট মুখে দিয়ে পরীক্ষা করে দেখছিলেন। কিন্তু তিনি বিক্রেতার অনুমতি না নিয়ে চকলেট মুখে দেওয়ার অপরাধে তাঁর মন্ত্রীত্ব হারাতে হয়। এমন ধরণের বহু ঘটনা স্টকহমে গিয়ে জানতে পারলাম। বাংলাদেশী ম্যাগাজিন ২০০০-এ সুইডেনেই পড়ে জানতে পারলাম একটি অতি অদ্ভূত এবং অপূর্ব অভিনব ঘটনা। সেটা আমার সুপ্রিয় পাঠকদের জানানোর লোভটা আমি দমন করতে পারলাম না বলে জানাচ্ছি যে, ফরিদপুরের টুঙ্গী পাড়ার অধিবাসী জনাব জয় রহমান বর্তমানে স্টকহমে প্রবাসী বাঙ্গালী হিসাবে বাস করছেন দীর্ঘদিন। তিনি জনৈক বৃদ্ধা মহিলার সেবা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। এবং সরকার থেকে বেতন ইত্যাদি পেতেন কিন্তু হঠাৎ করে একদিন ঐ বৃদ্ধা মহিলার খুনের দায়ে তাঁকে দীর্ঘ ৮ বছর জেল খাটতে হয়। তিনি জনৈকা সুইডিস মহিলাকে বিয়ে করেছিলেন এবং ছেলে মেয়েরাও বেশ অবস্থাসম্পন্ন। তিনি খুন করেননি ঐ বৃদ্ধাকে এটা প্রমাণ করার জন্যে তিনি জেলের বাইরে বন্ধু বান্ধুবান্ধবদের চিঠি লিখে এবং উকিল নিয়োগ করে শেষমেশ জিতে যান। এবং সুইডিস সরকার তাদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁকে প্রচুর টাকা প্রায় ১৫ কোটি টাকা দিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চায়। কিন্তু তিনি একবাক্যে জবাব দেন যে, আমি ফকির মিসকিন, নই এমন কি দরিদ্রও নই যে আমি টাকার লোভে আমার দীর্ঘ আট বছরের জেলদন্ড ভুলে যাব। আমার ব্যাংক একাউন্টেও প্রচুর টাকা আছে। আমার স্ত্রী ও ছেলেরা সকলেই প্রচুর টাকার অধিকারী অতএব, আমার কোন টাকার প্রয়োজন নেই। আমি একজন প্রবাসী বাংলাদেশী মনে করে সরকার আমাকে দরিদ্র ভেবেই হয়ত এতবড় শাস্তিটা দিয়েছে। কিন্তু টাকার পরিবর্তে আমি চাই সুইডিস সরকারকে, বিচারক মন্ডলীকে এবং সমস্ত সুইডিস জনগণকে আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থণা করতে হবে নতুবা আমি অন্যকোন প্রলোভনের ধার ধারিনা এবং যে এডভোকেট তার পক্ষ নিয়ে লড়েছিলেন তিনি বর্তমানে একজন মন্ত্রী। পরিশেষে তার কথামত সুইডিস সরকার ক্ষমা প্রার্থণা করার পরও তাঁকে তারা ১৫ কোটি টাকা নেওয়ার জন্য বহু সাধ্য সাধনা করে এবং তার ঐ এডভোকেট সাহেবও তার নিকট কোন টাকা পয়সা নিতে রাজী হননি। তবুও তিনি তাকে এককোটি টাকা নিতে বাধ্য করেন। জনাব জয় রহমান বাকী টাকা নিজের বা তাঁর পরিবারের জন্যে কোন কিছু

www.pathagar.com

গ্রহন না করে তার জন্মভূমি ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ায় একটি ট্রাস্টি বোর্ডের মাধ্যমে জনকল্যাণ মূলক কাজের জন্যে তার সম্পূর্ণ অর্থ দান করেন। সাবাস বাঙ্গালী জয় রহমান।

দীর্ঘ চারদিন স্টকহমে রুমীর বন্ধুরা আমাদের অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে সম্ভব যাবতীয় আনন্দের মধ্যে ধরে রেখেছিল। স্টকহমে বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাতের এবং পায়ের মেটালিকছাপ সংগ্রহ করে একস্থানে দর্শনার্থীদের জন্যে রেখেছেন। সেখানে প্রথমেই বিশ্ববিখ্যাত বক্সার বা মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর হাতের ছাপ রয়েছে। তেমনি কালো মানিক পেলের পায়ের ছাপ, ম্যারাডোনার পায়ের ছাপ, ইত্যাদি বেশ কিছু ছাপ রয়েছে দেখলাম। রুমী কিছু ইলিশ মাছ কিনল দুটি দোকান থেকে প্রচুর দাম দিয়ে। তবে সব মাছ ভাল ছিলনা। আমরা বহু ছবি তুলেছি বিভিন্ন স্থানে। পরিশেষে আমরা আবার দীর্ঘ ৬০০ কিঃমিঃ পথ গাড়ী দিয়ে ফিরে এলাম গোথেনবার্গের আক্কাস গাটায় শাহীনের বাসায়।

গোথেনবার্গ একটা অডিটোরিয়ামের কোন একটা কালচারাল শোতে প্রচুর লোকের সমাগম হয়েছিল বেশ কযেক বছর আগে। কিন্তু সেখানে হঠাৎ আগুন ধরে যাওয়ায় অনেক লোক হতাহত হয়। তাদের মধ্যে বেশ কিছু ইরানী ছেলে মেয়ে মারা যায়। কোরটা ডালায় মনসুর সাহেব রুমী ও আমি সেই পাহাড়ের নীচে বিশাল গোরস্তান দেখে এলাম। খৃষ্টান ও মুসলিমের এক্ স্থানে তাদের দাফন করা হয়েছে। তবে সারিবদ্ধ ভাবে তাদের এমন ভাবে কবর দেওয়া হয়েছে যেটার মধ্যদিয়ে পাকা পথের ডানে ও বামে প্রত্যেকের ছবি ও পরিচিতি ফলক লাগান আছে অত্যন্ত সুন্দরভাবে। আমি প্রায়ই বিকেলের দিকে গোথেনবার্গে প্রচুর গোরস্থান দেখতে যেতাম এবং সেখানে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে তাদের সুদৃশ্য বাগানের মত নানা ফুলের সমারোহ দেখতে খুবই ভাল লাগত। যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি মোহনীয় পরিবেশের ব্যবস্থা রয়েছে যা সত্যিই দেখার মত।

www.pathagar.com

অষ্টবিংশ পর্ব

ডেনমার্ক

রাজধানীর নাম	ঃ	কোপেনহেগেন (Copenhagen
জনসংখ্যা	ঃ	৫.৩ মিলিয়ন
আয়তন	ঃ	৪৩,০৯৪ বর্গ কিঃমিঃ
মুদ্রার নাম	ঃ	ডেনিশ - ক্রোন (Danish Krone)
ভাষা	ঃ	ডেনিশ
মাথাপিছু গড় আয় (জিডিপি)	ঃ	৩২,১০০ ইউ,এস,ডলার
গড় আয়ু	ঃ	৭৫ বছর

এরপর রুমীর হঠাৎ খেয়াল হল, চলুন সব একবার ডেনমার্ক থেকে ঘুরে আসি। আমি বললাম আমাদের তো সেখানকার কোন ভিসা নেই। তবুও সে বলল পাসপোর্ট গুলি আমরা সকলেই সঙ্গে রাখব তারপর দেখি কী হয়? অতএব একশুভ সকালে আমরা রওনা হয়ে গেলাম।সঙ্গে বরাবরের মত প্রচুর খাবার নেওয়া হল। আমরা পাঁচ জনই আর্থাৎ আমি, আমার স্ত্রী, রুমী, শাহীন ও তাদের মেয়ে মোনামী সকলেরই পাসপোর্ট সঙ্গে নিয়ে রওনা দিলাম। গোথেনবার্গ থেকে সোজা হাল্মস্ট্যান্ড (Halmstad) একটি বড় শহর সুইডেনের এবং বেশ দেখার মত চমৎকার। সেখান থেকে আরও বেশ কিছুদূরে হেলসিংবোর্গ (Helsing Borg) সমুদ্র বন্দর শহর। এখানে এসে পানির জাহাজে গাড়ীসহ উঠে পড়ি। জাহাজে প্রচন্ড বাতাসের জন্যে বাইরে দাঁড়ানো যায়না। তবুও ছবি তোলার খাতিরে আমাকে কয়েকবার বাতাসের ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। সামান্য কিছু দূরে ডেনমার্কের স্থলভূমি দেখা যায়।

বেশ কয়েকটি ছোট বড় দ্বীপ নিয়ে ডেনমার্ক। প্রচুর ব্যবসা বানিজ্যের দেশ। শীপ, বিল্ডিং এবং গরুর দুধের জমজমাট ব্যবসা বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত। ফলে তাদের পয়সাও প্রচুর।

কোপেনহেগেন শহরে আমার জামাই রুমী কখনও আসেনি বলে পথ ঘাট তেমন চেনেনা। ফলে সে তার গাড়ীটা একস্থানে পার্ক করে রেখে, অন্য একটি মার্সিডিজ বেঞ্চ গাড়ী ভাড়া করে ড্রাইভারকে বলে তুমি আমাদের পুরো শহরটা ঘুরিয়ে দেখাও। ড্রাইভার ছিল সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের একছাত্র। সে ঠিক রুমীর কথামত ডেনমার্কের রাজার প্রাসাদের সম্মুখ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখি লন্ডনের বাকিংহাম প্যালেসের গার্ডদের মতই বেশ উঁচু কাল টুপি পরে প্রাসাদের চতুরদিক পাহারা

www.pathagar.com

দিচ্ছে। প্যালেসের সীমানার মধ্যে প্রকান্ড উঠান রয়েছে। কোপেনহেগেনের রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত এবং নয়নাভিরাম দৃশ্য জুড়ে রয়েছে দীর্ঘ লেকের সারি ও বাগান। ঐ সমস্ত লেকের পাশেই গড়ে উঠেছে সুউচ্চ প্রাসাদ। যে দিকেই যাই সেদিকই নজরকাড়া দৃশ্য বর্তমান রয়েছে। শেষে আমরা সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখলাম সেই বিখ্যাত স্ট্যাচু বা মূর্তি। সমূদ্রের মধ্যেই রয়েছে একটা প্রকান্ড পাথর, তার উপর একটি উলঙ্গ নারী হাঁটু মুড়ে বসে রয়েছে এক অপূর্ব ভঙ্গিতে। শোনা যায় যে এই নারী মূর্তির মাথাটা একবার হঠাৎ চুরি হয়ে গিয়েছিল। আবার সেই ব্রঞ্জের তৈরী মূর্তির মাথা যথাস্থানে রক্ষিত হয়েছে। আমরা বেশ কটি ছবি তুললাম। ড্রাইভারকে দিয়ে ঐ সমুদ্র তীরেই আমাদের সকলের দু একটা গ্রুপ ছবি উঠালাম। মাত্র কয়েক ঘন্টায় আমদের যাত্রা সমাপ্ত করে সন্ধ্যার ঠিক পূর্বেই কোপেনহেগেন ত্যাগ করলাম সুইডেনের উদ্দেশ্যে। এবার মজার ব্যাপার হল যে, শীপ থেকে গাড়ী বের করে একটু আসার পরই একমহিলা পুলিশ আমাদের গাড়ী থামিয়ে বলল, পাসপোর্ট দেখি। আমাদের পাঁচ জনেরই পাসপোর্ট দেখল এবং আমার পাসপোর্ট সবার শেষে দেখার পরে আমাকে বলল, তুমি তো পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরেছ দেখছি এখনও তোমার বইতে অনেক শূন্যপাতা রয়েছে। অতএব, তুমি আরও বহুদেশ ঘুরতে পার। এটা অবশ্য সুইডেন এলাকার মধ্যেই এই চেকিং। আমি একটু অবাক হয়ে রুমীকে পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এটা কেমন হল? যখন গেলাম তখন কোন চেকিং করল না, অথচ ফেরার পর চেকিং কেন? রুমী আমাকে বলে, খালু এটা সুইডেন এখান থেকে বের হয়ে যাওয়া যত সহজ, কিন্তু সুইডেনে সহজে যাতে কেউ প্রবেশ করতে না পারে তারই প্রমাণ। কেননা, অনেক বিদেশী এই কাছাকাছি ডেনমার্ক হয়েই সুইডেনে প্রবেশ করার চেষ্টা করে বলেই তারা আমাদের ফিরার পথে চেকিং করল এবং আমাদের পাসপোর্টগুলি সঙ্গে না থাকলে খুবই ঝামেলায় পড়তে হত।

আমি ঢাকা থেকেই বেশ কিছু ডলার নিয়ে গেছিলাম ভ্রমনের উদ্দেশ্যেই। কিন্তু ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভিসা না থাকায় তা আর সম্ভব হল না বলে কিছুটা মনক্ষুন্ন ছিলাম। হঠাৎ করে অষ্ট্রিয়া থেকে বেড়াতে এলেন মনসুর সাহেবের এক ভগ্নিপতি নোমান সাহেব। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে অনেক দেশের কথা জানতে চাইলাম। তিনি আমাকে বললেন, খালুজান! আপনি এ পর্যায়ে যতখানি ঘুরেছেন, সমস্ত ইউরোপই এই একই রকমের কোন পার্থক্য পাবেন না। অতএব, আপনি আর কোথাও যাওয়ার কোন সুযোগ যদি না পান, তবে দয়াকরে মনে কোন কষ্ট নিবেন না। কেননা আমরা প্রায়ই সমস্ত ইউরোপের সবটাই বার বার ঘুরে দেখেছি। "তাঁর এই মহা সান্তনা বাক্যই সেবার আমার জন্য যথেষ্ট মনে করেছিলাম। আমদের ভিসা ছিল মাত্র দু মাসের কিন্তু তবুও আমার মেয়ে জামাই আরও তিন মাসের ভিসার

www.pathagar.com

ব্যবস্থা করেছিল। ফলে দীর্ঘ পাঁচ মাস সেবার সুইডেনে থেকে শীতের পূর্বেই অর্থাৎ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহেই আমরা দেশে ফিরে আসি সুইডেন এয়ারপোর্ট আমাদের মালপত্র বেশী হয়ে যাওয়ায় রুমীকে অনেক টাকা দন্ড দিতে হয় আমাদের ফেরার পথে আমস্টার্ডাম থেকে সোজা চলে যাই ওমানের রাজধানী মস্কট বিমান বন্দরে অবতরণ করি ভোর ৪টার দিকে। সেখানে নেমেই আমাদের জন্যে প্রাতঃরাশের জন্যে কুপন দেওয়া হয়। আমি ফজরের নামাজ পড়ার জন্যে সেখানেই চমৎকার গরম পানিতে অজুর ব্যবস্থা দেখে সেটা সেরে ফেলি এবং পাশেই পুরুষ ও মহিলাদের আলাদাভাবে নামাজ পড়ার জন্যে পাশাপাশি দুটি হলে সুন্দর ব্যবস্থা। আমি প্রথমে প্রবেশ করে কাউকে না পেয়ে সুন্নত পড়ে নিই এবং ফরজ নামাজ পড়তে যাওযার পূর্ব মুহূর্তেই দেখি স্থানীয় একজন আরবী মুসল্লি আমাকে ইমামতি করার জন্যে অনুরোধ করেন। কিন্তু আমি তাঁকে সবিনয়ে বলিয়ে আনা মুসাফির। তারপরই তিনিই ইমামতি করেন। আমি একামত দেওয়ার পর তিনি নীরবে আল্লাহু আকরব বলার পর তাহরীমা না বেঁধে তার হাতদুটি ঝুলিয়ে রাখেন। কোন সরব কেরাত পাঠও আমি শুনতে পেলাম না। এভাবেই দু রাকাত নামাজ পড়া শেষ হল। আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি একা পড়লেই বোধ হয় ভাল হত।

যা হোক এরপর আমরা নীচে গিয়ে রেস্টুরেন্টে আমাদের খাবার কুপন দেওয়ার পর আমাদের উত্তমরূপে নাস্তার ব্যবস্থা করা হয়। আমাদের ফ্লাইট এবার গালফ এয়ার ওয়েজ এবং সেটা ঢাকার উদ্দেশ্যে ছাড়বে প্রায় বেলা ১১ টায়। এত দীর্ঘ সময় আমরা ঘুরে ফিরে চারদিকে দেখতে শুরু করলাম। আমার স্ত্রী কিছু কেনাকাটা করলেন। এয়ারপোর্টের রানওয়ে এত বিশাল আকৃতির যে একসঙ্গে বহু প্লেন নামতে পারে। চতুর্দিক কেবল মরুভূমিরমত বৃক্ষ শূন্য এলাকা। প্লেনে উঠার পর দেখি সামান্য কয়েকজন যাত্রী এবং তারা সকলেই প্রবাসী বাঙ্গালী হিসাবে ওমানে কর্মরত ছিল। বহু সিট খালী ফলে অনেকেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে। আমার পাশে একটি লোক বার বার বসার আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি তাকে বসতে দিই। সে কিছুক্ষণ পরে আমকে একটি অতি ছোট্ট আকারের কোরআন মজিদ চেন কভারে আবৃত অবস্থায় উপহার দিয়ে বলে, আপনাকে দেখতে অনেকটা আমার আব্বার মত মনে হয়, দয়া করে এটা রাখেন। তখন আমরা আকাশে ৩৫,০০০ ফুট উপরে রয়েছি অথচ প্রথম দিকে আমি লোকটিকে অপছন্দ করছিলাম এবং তাকে বলেছিলম, যে আপনি ধুমপান করতে চাইলে পিছনে গিয়ে বসুন। কিন্তু তিনি বলেন, না আমি ধূমপান করিনা বলতেই আমি তাকে আমার পাশে বসতে দিয়েছিলাম। আসলে এই লোকের দেওয়া উপহার এবং সুইডেন থেকে চলে আসার পূর্বে প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবার থেকে শাহীনের বাসায় এসে আমাদের নানা প্রকার মূল্যবান উপহার দেওয়া

www.pathagar.com

সেখানকার প্রথানুযায়ী হয়েছিল। যা আমরা সঙ্গে সবগুলি আনতে পারিনি। কেননা কতকগুলি উপহার ছিল প্রায় দু আড়াই কেজি ওজনের অত্যন্ত মূল্যবান কৃষ্টাল বোল-অতি চমৎকার দেখতে। মালের সীমিত ওজনের বিমান ভাড়ার স্বার্থে আমরা সেগুলি শাহীনের বেটিকে দিয়ে আসি। কিন্তু তবুও প্রচুর পয়সা দিতে হয়। বিমান বন্দরে এখন আমি এই পবিত্র কালাম মজিদ টা উপহার পেয়ে হতবাক হয়ে যাই যে এর মধ্যে কী রহস্য আছে সেটা আল্লাহপাক ছাড়া কেউ বলতে পারেনা। আমি গোথেনবার্গে মাস খানেক থাকার পরই একদিন হঠাৎ সকলের সম্মুখেই বলে ফেলি যে, আমার মনে হয় এই শহরে যদি কেউ একবার থাকার সুযোগ পায় তবে সে বা তারা আর পৃথিবীর কোথাও যেতে চাইবেনা। আমার এই মন্তব্যটা শুনার সঙ্গে সঙ্গে ড. বাবুল আনাম এবং মনসুর সাহেব বলে উঠেন খালুজান, আপনার এই মত একেবারেই সত্যি। কেননা একটি বাঙ্গালী পরিবার এখানে এসে দীর্ঘ দিন বসবাস করার পর হঠাৎ করে তারা সবকিছু বিক্রি করে দিয়ে সুইডেন ছেড়ে চলে যায়। এবং পৃথিবীর বহুস্থানে তারা ঘোরাঘুরি শেষে আবার এখানেই ফিরে এসে বলে নাহ্। আমাদের অন্য কোথাও ভাল লাগল না। অতএব, আমরা যতদিন বাঁচব এখানেই থাকব। সুইডেনে বৃক্ষের অবস্থান ৩৮% অথচ সে তুলনায় লোকসংখ্যা অনেক কম। আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল যে, ইউরোপের তথা বিশেষত গোথেনবার্গের সৌন্দর্য বহুভাবেই প্রশংসনীয়। কী নাই সেখানে? আমি ঘুরে ঘুরে দেখে বেশ গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছি যে এদেশটা হচ্ছে ফুলের দেশ, ফলের দেশ, চমৎকার রাস্তার উভয় পার্শ্বের সুন্দর দৃশ্যাবলীর দেশ। অত্যন্ত পুষ্টিকর রুচি-সম্মত খাবারের দেশ। আবাসিক এলাকার ধারে কাছেই দোকানপাঠ স্কুল, ব্যাংক, হাসাপাতাল, পোস্ট অফিস সব কিছুই বর্তমান। উপরন্ত স্থানীয় অধিবাসীরা অত্যন্ত ভদ্র ও মার্জিত। যানবাহনের জন্যে রয়েছে প্রচুর বাস ও ট্রাক। এই শহরে মেট্রো নাই কোথাও। আবহাওয়া অতি উত্তম।

www.pathagar.com

উনত্রিংশ পর্ব

২০০১ সালের মাঝামাঝি আমি আবার ভারতে যাই। এবার যাওয়ার পূর্বে ভারতের উত্তরাঞ্চলে ভ্রমন করার প্রবল আগ্রহ ছিল বলে আইডিইবি থেকে নেপাল , ভূটান ইত্যাদি স্থানের কর্মকর্তাদের নিকট দেখা সাক্ষাৎ করে যাতে আমার ভ্রমন সহজ ও সুন্দর হয় সেভাবেই আমার নিকট আইডিইবির সদস্য পরিচিতিসহ কিছু চিঠিপত্র আমাকে দেওয়া হয়। আমি সেজন্যে নেপালের ভিসা নেওয়ার জন্যে বেশ কিছু ডলার খরচা করি ভিসা ফি হিসাবে। ঢাকায় ভারতীয় এমব্যাসী প্রথমেই আমার নেপালের ভিসা দেখে আমাকে মাত্র সিংগল এন্ট্রি ভিসা প্রদান করে। আমি তাদের আবার বুঝিয়ে মাল্টিপল এন্ট্রি ভিসা গ্রহণ করি।

যা হোক, কলকতায় আমার মামার বাসায় সম্ভবত রঞ্জন বাবু আমার টেলিফোন পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। কেননা তিনিও পশ্চিম বাংলার আইডির একজন কেন্দ্রীয় সদস্য। তিনি আমাকে প্রথমে শিলিগুড়িতে যে ইঞ্জিনীয়ার রয়েছেন তাঁর নামধামসহ টেলিফোন নম্বর দিয়ে দেন যাতে আমি দার্জিলিং ভ্রমন করতে পারি তাঁর সাহচর্য্যে এবং হাওড়া স্টেশনে আরও একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আমার সঙ্গে এসে দেখা করেন। তিনিও বেশ চমৎকার লোক আমার পরিচিতি পেয়ে তিনিও খুবখুশি। আমরা দুজনে একসঙ্গে চা-পান করে হাওড়া রেলস্টেশনে আমার গাড়ী ছাড়ার পূর্ব মূহূর্ত পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে অনেক গল্প করেন। এসব কিছুই আমাদের আইডিইবির মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছিল। আমি সোজা শিলিগুলিতে প্রভাতকালেই পৌছে যাই। এবং একটি হোটেল থেকে শিলিগুড়ির ঐ পদস্থ ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোককে টেলিফোন করার কিছুক্ষণ পরই তিনি আমার সঙ্গে দেখা করেন। তবে ভদ্রলোক অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করে আমাকে বলেন যে আপনি এমন সময়ে এখানে এসেছেন যে আমাদের একটা খুব জরুরী কনফারেন্সে আমরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত। বিধায় আপনাকে গাড়ী দিয়ে বা কাউকে আপনার সঙ্গে থাকার জন্য সাহায্য করতে পারছিনা। বলেই সঙ্গে করে আমাকে নিয়ে গিয়ে দার্জিলিং বাসস্ট্যান্ডে নামিয়ে দেন। আমি একটি জীপে এবার অন্যপথে দার্জিলিং এ উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই কার্সিয়াংটা এক ঝলক দেখে নিলাম। তবে এবারের পথযাত্রাটা ছিল বেশ

www.pathagar.com

বিপদজনক হয়ত সর্টকাট পথে দ্রুত যাওয়ার জন্যেই ড্রাইভার ঐ পথটা বেছে নিয়েছিল মনে হয়। বেশ চড়াই উত্তরাই অথচ সংকীর্ণ পথে আমাদের যাত্রাটা মোটেই নিরাপদ ছিলনা।

যাইহোক, এবার কিন্তু দার্জিলিংকে আর আগের মত অতসুন্দর মনোরম মোটেই মনে হল না, যেমনটা লেগেছিল সুদীর্ঘ ২৫ বছর পূর্বে। ইতোমধ্যে প্রচুর লোকসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় সমস্ত পাহাড় জুড়েই বাড়ী ঘরের স্তুপাকার অবস্থা। অনেক চায়ের বাগান হয়েছে নিশ্চিহ্ন। আমি আগের মতই এবারও আঞ্জুমানে ইসলামিয়াতেই উঠেছিলাম। মসজিদ সংলগ্ন বলেই বোধকরি আমার এই পছন্দের সঙ্গত কারণ। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নাতি সিদ্ধার্থ শংকর রায় তৎকালীন মূখ্যমন্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানটি একসময় উদ্বোধন করেছিলেন। এবার সেই ফলকটা লাগান হয়েছে দেখলাম। আমি চমৎকার এই মসজিদটির অনেক ছবি তুলেছি। আবহাওয়া তখন মোটেই সুবিধা ছিলনা। এসময় কিন্তু টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখার কোন অবকাশ নাই। যেহেতু কেবলই মেঘ বৃষ্টির দাপট অতএব, আমি উপরে গোল চত্বরে উঠে একটি কাশ্মীরি দোকান থেকে কিছু চা কিনে এবং আসেপাশের কিছু ছবি তুলেই দু দিন পরই সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। চমৎকার সুন্দর শহর এই গ্যাংটক। ছোট হলেও অনেকটা ছবির মত দেখতে। আমি এক কলকাতাবাসী একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের হোটেলে উঠি। তাঁদের পরামর্শমত একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে গ্যাংটকের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নিই। ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে সিকিমের রাজপ্রসাদ দেখানোর সময় পথে যেতে হঠাৎ করে দুজন সুটপরা ভদ্রলোকের পিছনে অকস্মাৎ গাড়ীর ব্রেক কষে। ফলে ঐ দুজন ভদ্রলোক চমকে উঠেন এবং সেখানে যেসব সেন্ট্রি ছিল তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তারা সঙ্গে সঙ্গে চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স, ব্লু-বুক কেড়ে নেয়। আসলে অতদূর পর্যন্ত গাড়ী নিয়ে যাওয়ারই অনুমতি নেই। আর ঐ দুজন ভদ্রলোক ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের চীফ জাস্টিস এবং অন্যজন ছিলেন এটর্নি জেনারেল। আমি তাকে বললাম আমার যাওয়ার ব্যবস্থা কর। আমি তো তোমার জন্য অপেক্ষা করতে পারিনা। সে বলল, আপনি নিকটেই একটি ছোট্ট অথচ চমৎকার ফুলের বাগান আছে এটা ঘুরে দেখে আসেন, এরপর দেখি আমি কী করতে পারি। আমি ৫ রূপীর বিনিময়ে পার্কে ঘোরাফেরা করে ফিরে আসলে সেই চালক আমার জন্যে অন্য একটি গাড়ীর ব্যবস্থা করে আমাকে হোটেলে পাঠিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বলে, ওকে আপনার টাকা দেওয়ার দরকার নেই। আমি আপনার নিকট হোটেলে দেখা করে পয়সা নেব। আমি হোটেলে গিয়ে দু এক ঘন্টার

www.pathagar.com

মধ্যেই দেখি সে ফিরে এসেছে তার গাড়ী নিয়ে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করা সে বলে আমি ভদ্রলোকদের হাতে পায়ে ধরে মাফ চেয়ে নিয়ে নিয়েছি আমার অজ্ঞতার কারনে। এবং তারা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে পূর্ব চুক্তিমোতাবেক ৩৫০ রূপী দিয়ে দিই। সেই রাতটা হোটেলে কাটিয়ে আমি পরদিন ভোরে একটি মাইক্রোবাসযোগে সিকিম ত্যাগ করি ভূটানের উদ্দেশ্যে। চালকের পাশেই আমি আসন গ্রহণ করি এবং ভূটানের প্রথম শহর ফুয়েন্ট সোলিং এ প্রবেশ করি। একটি প্রধান ফটক ভারত ও ভূটানের সীমারেখা টেনে রেখেছে। ভূটানের পাহাড়ী সুদৃশ্য এবং পাশেই একটি ছোট্ট নদীতে প্রচুর নুড়ি পাথর দেখে বেশ ভাল লাগল। বাস নদীর ওপারে গিয়ে থামায়। আমি আবার নদীরসেতু পার হয়ে শহরের মূল ভূখন্ডে ফিরে এসে একটা ভাল হোটেলে উঠি। হোটেলটি নদীর ধারেই বেশ চমৎকার পরিবেশ চতুর্দিকে। আমি পরে শহরের মধ্যে একটি চমৎকার হোটেলে রাতের ডিনার করি। আমার প্রিয় চাইনিজ খাই ৭২ রুপীর বিনিময়ে। অবশ্য ইতোপূর্বে আমি ঐ হোটেল থেকেই টেলিফোনে আলাপ করি ভূটানের রাজধানী থিম্পুতে। সেখানকার আইডিই কর্মকর্তার সাথে। আমার পরিচয় দিতেই তিনি আমাকে তার ওখানে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান। আমি পরের দিন ভোরে রওনা দিব তাকে জানিয়ে দেই। বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চমৎকার ফুয়েন্টসোলিং শহরের নানা রকমের নয়নাভিরাম দৃশ্য রাস্তাটি বেশ মনমুগ্ধকর। আমি অনেক ছবি তুললাম। প্রতিটি বাড়ী এবং দোকানের আর্কিটেকচারাল ভিউ বৌদ্ধ প্যাগোডার মধ্যে সামঞ্জস্য রয়েছে। ছোট বড় বহু দোকান পাট রয়েছে যেখানে বেশীর ভাগই চীনাদের তৈরীদ্রব্য সামগ্রী সম্ভারে ভরপুর। অনেক ভাল ভাল জামা কাপড় বেড শীট রয়েছে। আমার পুত্রবধু সীমা আমাকে কিছু ভারতীয় মুদ্রা দিয়েছিল তার জন্যে যেন একটা ভাল বেড কভার কিনে নিয়ে আসি। তবে কলকাতা থেকে নয় বরং দিল্লী থেকে। অতএব, আমি কোন কিছু না কিনেই শহরটাভাল করে ঘুরে ফিরেই হোটেলে ফিরে যাই। পরদিন ভোরে আমি ৮৫ রূপীর বিনিময়ে বাসের টিকিট কিনি রাজধানী থিম্পুর উদ্দেশ্যে। প্রায় দীর্ঘ ৭ ঘন্টার পাহাড়ী পথের যাত্রা ভালই লাগবে ভেবেছিলাম কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই একটি পুলিশ চেক পোস্টের নিকট কিছু লোক নেমে পড়ল। আমার পাশেই ছিলেন এক মহিলা। তিনিও নামার পর ভাবলাম তাহলে আমার নামার দরকার। সেখানে নেমে পুলিশ চেক পোস্টে গিয়ে আমার বাংলাদেশী পাসপোর্ট দেখে অফিসার আমাকে থিম্পু যাওযার অনুমতি দিতে অপারগ হলেন। কেননা ভারতীয় কর্তাব্যক্তিদের অনুমতি ছাড়া আমি যেতে পারবনা। আমি তাঁকে বহু

www.pathagar.com

বুঝাবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। তিনিও আমাকে সোজা আইনের পথেই যাওয়ার অনুমতি ব্যতীত কোন উপায় নেই বুঝালেন। আমি তার উপরওয়ালার সঙ্গে দেখা করেও অনুমতি পেতে ব্যর্থ হলাম। আমার জন্যেই ঐ বাসটিও দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করল। পরিশেষে আমি আমার মালপত্র নামিয়ে বাসটি ছেড়ে দিই। থিম্পু যাওয়ার জন্যে যে অনুমতি লাগবে তার জন্যে আবার সম্ভব সব স্থানেই বার বার ঘোরাঘুরি করেও কিছুই করতে পারলাম না। শেষে আমার ঐ হোটেল থেকেই পুনরায় থিম্পুতে টেলিফোন করে আমার অবস্থান তাঁদের জানাই। তাঁরা ৪/৫ দিনের পূর্বে কোন সাহায্য করতে অপারগতা প্রকাশ করলে আমি ফুয়েন্টসোলিং ত্যাগ করতে বাধ্য হই। অথচ মজার ব্যাপার হল এই যে, আমি যদি ভারতীয় হিসাবে নিজেকে পরিচয় দিতাম তাহলে কোন ঝামেলা হতনা। উপরন্তু আমার ভারতীয় হিসাবে জন্মগত অধিকার তো আছেই কিন্তু আমি সৎপথে এবং সৎ উদ্দেশ্যে থেকে আইনের ফাঁকে পা ফেলতে চাইনি বলেই আমার আর থিম্পু যাওয়া হলনা। অথচ ভারতীয় মুদ্রা এবং ভূটানী মুদ্রায় কোন পার্থক্য নেই। আমি ফিরে এলাম শিলিগুড়িতে। সেখান থেকে সোজা নেপালের উদ্দেশ্যে একটা টাটাসুমো গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী আমাকে একটা নদীর উপর দীর্ঘ ব্রীজ পার হয়েই নেপালের বডার কাঁকরভিটাতে পৌছে দেয়। আমি আশেপাশের চমৎকার দৃশ্যবলী দেখেই বুঝতে পারলাম ভারতীয় সীমানার বাইরে এসেগেছি। কাঁকর ভিটা থেকে নেপালের রাজধানী কাটমান্ডু প্রায় ১৭ ঘন্টার বাসযাত্রা। এতদীর্ঘ বাসযাত্রা আমার পছন্দ নয় ভেবেই ঠিক করেছিলাম ওখান থেকেই বিমানে কাটমন্ডু চলে যাব। আমি বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই কুলীবেশী একছেলে এসে আমার মালপত্র নেওয়ার জন্যে ব্যস্ত। আমি তাকে জিজ্ঞসা করি এখানে চেক পোস্টটা কোথায়? আমার কাছে পাসপোর্ট আছে। সে তখন আমাকে জিজ্ঞসা করে আপনি ওপার থেকে চেক করিয়ে এসেছেন তো? আমি বলি নাতো! সে তখন একটা রিক্সা করে দিয়ে আমাকে বলে এটা নিয়ে গিয়ে আপনি ভারতীয় সীমান্ত রানীগঞ্জ থেকে প্রবেশানুমতির সীল পাসপোর্টে লাগিয়ে এই রিকশাটাতেই আবার ফিরে আসেন। রিক্সার ভাড়া মাত্র ১০ রুপী। আমি ঠিক তাই করি বটে, তবে রানীগঞ্জের চেকপোস্ট পুলিশ আমাকে কোনমতেই এই সীমান্ত দিয়ে নেপাল যেতে দেবেনা। যেহেতু রানীগঞ্জ সামান্তের কথা উল্লেক করা নাই বলে। আমি তাকে আমার আগের ভিসাটা দেখালাম কিন্তু সেটা যেহেতু ঢাকায় ভারতীয় ভিসা অফিস ক্যান্সেল করে দিয়ে পুনরায় মলিটিপস্ ভিসা দেওয়ার সময় রানীগঞ্জ সীমান্তে কাঁকরভিটা হয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল না। বরং আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেন যে

www.pathagar.com

আপনি বাগড়োগরা এয়ারপোর্ট হয়ে বিমানে কাটমন্ডু চলে যান আমি তাঁর কথামত রিক্সাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে শিলিগুড়ির বিমান অফিস থেকে খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে আজ পর্যন্ত বাগড়োগরা বিমানবন্দর চালুই হয়নি। অথচ এতকিছুর ঝামেলার মোটেই প্রয়োজন ছিল না যদি আমি ভারতীয় হিসাবে চলে যেতাম নেপালে। অবশ্য মাস দুয়েক পূর্বেই নেপালের রাজকীয় পরিবারের সকল সদস্যকেই খুন হয়ে যেতে হয় অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে। আমি এরকম রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে নেপাল যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিতে বাধ্য হই। আসলে আমার উদ্দেশ্য ছিল দুজন নেপালী বন্ধু আমর সঙ্গে ঢাকায় পড়াশুনা করত। তাদের একজন হল রাজ পরিবারের দিলীপ কুমার থাপা এবং অন্যজন ছিল প্রদীপ কুমার। এদরে সঙ্গে আমার সম্পর্ক বেশ ভাল ছিল। কেননা আমি তখন ছিলাম ছাত্র সংসদের ভি,পি। তা ছাড়াও সেখানকার আইডিই নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এর সপ্তাহ খানেক পর আমি একটা দীর্ঘ ভ্রমনের পরিকল্পনা করি। সেটা হল উত্তর ভারতের দিল্লী থেকে কুলু মানালী হয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে যাওয়া। দিল্লীতে আমার মামা মেহবুব জাহেদীর এম,পি,হাউসে একটি রাত থেকেই পরদিন বিকেলে বাসে প্রায় ৪৫০ রুপীর টিকিট কিনে যাত্রা শুরু করি। সমস্ত রাত যাওয়ার সময় লক্ষ্য করি একদিকে চলে গেছে চন্ডীগড়ের পথ। অন্য আর একদিকে কিছু দূর গিয়ে লক্ষ্য করি অমৃতসরের রাস্তা। যাত্রাপথে আমার সঙ্গে মাত্র দুটি বই ছিল। একটির নাম Muslims of Nepal লেখিকা মিস শামিমা সিদ্দিকা তিনি ত্রিভূবন ইউনিভার্সিটি কাটমান্ডু থেকে মাস্টার্স করেন এবং নেপালের দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘিষ্ট মুসলমান জনগোষ্টির ব্যাপারে ৩৬০ পৃষ্ঠার উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন। এ ধরণের বই ইংরেজি ও নেপালী ভাষায় প্রথম প্রকাশিত বই। বহুছবি সম্বলিত বিশেষত মসজিদ ও বহু প্রকারের নেপালে বসবাসকারী মুসলিম সমাজের উপর ব্যাপকভাবে তাদের জীবন ও জীবিকার উপর বিস্তারিত গবেষণামূলক আলোচনা করেছেন এই লেখিকা। এ বই পড়ার পরেই আমার নেপাল ভ্রমনের আগ্রহ আরও অনেক তীব্র হয়ে যায়।

দ্বিতীয় বইটি ছিল Amritsar (Mrs Gandhis' last Battle) লেখকদ্বয় হচ্ছেন প্রখ্যাত সাংবাদিক Mark Tully & Satish Jacob. এঁরা দুজন দীর্ঘ ২৫০ পৃষ্ঠাজুড়ে মিসেস গান্ধীর হত্যাকান্ড থেকে শুরু করে শিখদের প্রচন্ড বিক্ষোভ Golden Temple ধ্বংস এবং অপারেশন ব্লু ষ্টার সবকিছুই অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আলোচনা করেছেন বেশ নির্ভরযোগ্য সূত্রের মাধ্যম। বইটি আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত পড়ার সময় গোগ্রাসে গিলতে থাকি। বিশেষত তাঁদের লেখার টেকনিকের অভিনবত্ব

www.pathagar.com

আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছে। তাছাড়া বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ ঘটনা প্রকাশের সাহসিকতার প্রশংসা না করে উপায় নেই। সেইহেতু অমৃতসরে ভ্রমন করতে যাওয়ারও আমার অসীম আগ্রহ ছিল। দিল্লী থেকে প্রায় ৫০০ কিঃমিঃ দূরে পূর্ব পাঞ্জাবের শেষ সীমান্তে অবস্থিত অমৃতসর। শিখ সম্প্রদায়ের তীর্থস্থান। বিশেষত স্বর্ণ মন্দিরটা আমার দেখার ও ছবি তোলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কিন্তু পরে জানতে পারলাম যে স্বর্ণমন্দিরের কোন ছবি তুলতে দেওয়া নাকি হয় না। এটা জানার পর আমার কিছুটা আগ্রহ কমে যায় ফলে আমি হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত কুলু ও মানালী শহরে যাওয়ার টিকিট কেটে নিই। যাত্রাপথে রাতের খাবার হোটেলে সেরে নিই। পরের দিন প্রায় দুপুরের দিকে কুলু পার হয়েই মানালী শহরে যাত্রা শেষ। জুন মাস কিন্তু বেশ শীত বিরাজ করছিল বলে পুলওভার পরতে হয়েছে সর্বক্ষণ। সেখানে সকলেই শীতবস্ত্র পরে আছে। আবার মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড়ী এলাকায় অবস্থিত আকাশচুম্বি গাছের সমারোহ। পাশেই একটা ছোট্ট নদীতে প্রচুর পাথর রয়েছে সেখানে অনেকেই ছবি তুলছে দেখে আমিও কিছু ছবি তুললাম। একটু উপরে একটি প্রকান্ড পার্কের ভিতর রয়েছে সুন্দর বাগান। তবে অসময় বলে ফুলের তেমন দেখা মেলেনি। পার্কের ভিতর নীচে রয়েছে একটি ছোট্ট লেক। চতুর্দিকে বাঁধান লেকের ভিতর প্যাডেলের সাহায্যে চালানো যায় কিছু নৌকা। অন্তত দুজন ছাড়া নৌকা চালান যায় না। আমি তেমন কোন সঙ্গী সাথী না পেয়ে একটি পরিবারের একটি ছেলেকে সঙ্গে তুলে নিই এবং তার পুরো ভাড়াও আমিই বহন করি। ছেলেটি তার বাবা মায়ের অনুমতি নিয়ে আমার সঙ্গে নৌকা চালনায় যোগ দেয়। দু তিনটি চক্কর দিয়ে আমরা নেমে পড়লে ছেলেটি আবার তার বাবা মায়ের সঙ্গে নৌকা ভ্রমন করে। অনেক সময় সেখানে পার করলাম, ছবিও তুললাম অনেক। এটা দ্বিতীয় দিনের ঘটনা। দুপুরে যে হোটেলে থেকে খেলাম আমার খাওয়া পছন্দ হল না। রাতের বেলা দেখি বাজারের ভিতর বেশ চমৎকার গরমগরম কাবাব ও মুরগী ভাজছে। সেগুলি খেয়ে বেশ খানিকটা তৃপ্তি পেলাম। ভাল এবং মুখরোচক খাবার না হলে আমার বেশ অসুবিধা হয়। অতএব তৃতীয় দিন আমি দুপুরের খাবারের জন্যে উত্তম একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করলাম। দোতলার উপর বেশ চমৎকার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। আমি খাবারের মেনু দেখে চাইনিজের অর্ডার দেই। বিশেষ তেমন কেউ খদ্দের ছিলনা। বলতে গেলে আমি একাই এবং ম্যানেজার ছেলেটি ছিল। খাবারের স্বাদ আমার নিকট এতই তৃপ্তদায়ক ছিল যে, আমি বাবুর্চিকে ডেকে পাঠাই এবং তার তৈরী খাবারের প্রশংসা করি। মূলতঃ আমি একজন ভোজনরসিক

www.pathagar.com

মানুষ বলেই যেন আমার আবেগ কিছুটা প্রকাশ করলাম সেখানে। ম্যানেজারকে দিয়ে আমার ক্যামেরায় কিছু ছবিও উঠালাম এবং আমি নিজেও কিছু ছবি তুললাম। এরপরই আমার হোটেলে গিয়ে দেখি একটা শিখ পরিবারের ছেলে মেয়েরা আমার পাশের কামরায় এসে উঠেছে। আমি হোটেল বয়কে দিয়ে আমার বাসের টিকিটটা আনিয়েছিলাম জম্মু যাওয়ার উদ্দেশ্যে। দুপুরের একটু পরেই আমার বাস যাত্রা শুরু করে। আবার কুলুশহরের ভিতর দিয়েই পার হলাম। রাস্তা খুব একটা ভাল নয়, প্রশস্তও নয় তেমন। রাতে পথে ডিনারের জন্য গাড়ী থামল একটা বড় হোটেলের সম্মুখে। আমার খাওয়ার তেমন আগ্রহ ছিলনা হয়ত প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু সকলেই যখন নেমে গেল খাওয়ার জন্যে তখন আমি কিছুটা এদিক ওদিক করে হঠাৎ একসময় হোটেলে ঢুকেই পড়লাম। জিজ্ঞাসাবাদ এবং খাবারের মেনু দেখে তেমন পছন্দ হলনা। অথচ আগামী কাল দুপুর নাগাদ বাসটা পৌছাবে জম্মুতে। এসব পাঁচ সাত চিন্তা করতে করতে একসময় খাবারের কিছু অর্ডার দিলাম। কিন্তু আমার খাবারে তেমন রুচি না থাকায় কিছুটা খেয়েই উঠে পড়ি। পথে চলতে চলতে বেশ দু'চার বার বমি করলাম। সকালের দিক পাঠানকোট হয়ে গাড়ীতে যাওয়ার সময় এক নজর ভাল করে দেখে নিলাম। কেননা এটি একটি ভারতীয় সামরিক ঘাঁটি হিসেবে বিখ্যাত স্থান। এখান থেকে সোজা লং ড্রাইভের পর জম্মু। সেখানে নেমেই আমি সরকারী মালিকানাধীন একটি দোতলা বিশাল হোটেলে উঠে পড়ি। একটি মেয়ে আমাকে আমার রুমে পৌছে দিয়ে আসে। বেশ বড় হল রুম, টিভি, এয়ারকুলার, এটাচ্‌ট বাথরুম এবং একটি বারান্দা সবই বেশ উত্তম। আমি প্রথমেই বাথরুমে গিয়ে কিছু কাপড় ধুয়ে ফেলি এবং উত্তমরূপে গোসলটা সেরে নিই। যোহরের নামাজে দাঁড়াতেই আবার বমি আসে। বিছানায় একটু বিশ্রাম নিয়ে কলিং বেল দিতেই ঐ মেয়েটি আসে আমি তাকে আমার শরীরের অবস্থা জানিয়ে বলি আমার কোন ঔষধ খাওয়া দরকার। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাকে দুটি ট্যাবলেট দিয়ে বলে, দুপুরের খাওয়ার পর খাবেন। এবং তাকে খাওয়ার অর্ডার দেওয়ার পরই নামাজে দাঁড়াই। বিকেলে ঘুম থেকে উঠে বাইরে ঔষুধের দোকনে গিয়ে আবার কিছু ঔষুধ কিনে খাই। আগামীকাল জম্মু শহরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখব বলে সন্ধ্যা পর্যন্ত চতুর্দিকে একনজর দেখে যা বুঝলাম তাতে আমার মনে হল এটা একটা শিখ সম্প্রদায় প্রভাবিত শহর। প্রচুর লোকসংখ্যা এবং বহু সুন্দর সুন্দর ভবন রয়েছে প্রায় সর্বত্র। অনেক দোকান পাট ও ব্যবসা বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রও বটে।

www.pathagar.com

পরদিন সকালে আমি জম্মুর রাজভবন ও জাদুঘর দেখার জন্যে বের হলাম। আমার হোটেল থেকে বেশ অনেক দূরে অবস্থিত মহারাজা গুলাব সিংহের রাজ প্রাসাদ। সেটি বর্তমানে জম্মু জাদুঘরে পরিণত হয়েছে। ২৪-০৬-০১ সালে এই বিশাল প্রাসাদের সম্মুখের লনে যে উঁচু বেদীর উপর মহারাজা গুলার সিংহের ঘোড়ার উপর খোলা তলোয়ার হাতে রক্ষিত প্রকান্ড প্রস্তর মূর্তির ছবি তুলি আমি। জাদুঘরের অডিটোরিয়ামে রক্ষিত আছে রাজা কিরন সিংহ ও তাঁর রানীর পূর্ণ অবয়বের ফটোগ্রাফ। ১০০ কেজি ওজনের সম্পূর্ণ সোনার তৈরী প্রকান্ড সিংহাসন একটি কাঁচের ঘরে রক্ষিত আছে। অবশ্য চুর্তদিকে লোহার মজবুত বেড়ার ভিতর। আমি এটার ছবি হয়ত উঠবেনা মনে করে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। একজন সেন্ট্রি আমাকে ওটারও ছবি তোলার জন্যে আহবান জানায়। এ ভাবে প্রচুর ছবি তুলি আমি সমস্ত জাদুঘরের ভিতরে ও বাইরে। একটি কামরায় দেখি ভারতের জনৈক বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা পন্ডিত জওহারলাল নেহরুর পূর্ণ অবয়বের একটি স্কেচ। এমনভাবে ছবিটি আঁকা হয়েছে যে, যেদিক থেকেই দেখিনা কেন মনে হচ্ছে যে তিনি আমার দিকেই এগিয়ে আসছেন। বিশাল এলাকা নিয়ে এই রাজ প্রসাদ তৈরী হয়েছিল। চতুর্দিক অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন এবং অতি মনোরম দৃশ্যাবলী বিরাজমান। প্রধান রাস্তা থেকে অনেক খানি হেঁটে যেতে হয় এই জাদু ঘরে। সমস্ত দিন জম্মুর দর্শনীয় প্রায় সব কিছুই দেখার পর এবং বহু ছবি তোলার পর আমার নির্ধারিত জম্মু ডেভেলাপমেন্ট অথরিটি (JDA) হোটেলে ফিরে আসি। জম্মু অনেক উন্নত শহর তাতে কোন সন্দেহ নেই এবং এটা সর্বোতোভাবেই যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ তাতে কোন বির্তক থাকা উচিৎ নয়। আগামীকাল সকালেই আমি কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা হব। তবে এখান থেকে অমৃতসর বেশ নিকটেই ছিল। কিন্তু যেহেতু আমি প্রথমেই শ্রীনগর যাব ঠিক করেছি, অতএব যাত্রাসূচীর কোন পরিবর্তন করলাম না।

পরদিন সকাল ৮টা থেকে ৯ টার মধ্যেই একমাত্র বাস বা টাটা সুমো ছাড়া অন্য কোন ভাবেই যখন সাধারণ যাত্রীর সেখানে যাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই, তখন আমি টাটাসুমো অর্থাৎ ছোট গাড়ীতে ৭/৮ জন মত যাত্রীসহ শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি প্রায় ৩৫০ রুপী খরচের বিনিময়ে। ৩০০ কিঃমিঃ পাহাড়ী পথ আঁকা বাঁকা ভাবে সংকীর্ণ রাস্তা যার একদিকে সুউচ্চ পাহাড় এবং অন্যাদিকে তেমনি গভীর খাদ। সমস্ত পথটাই বেশ বিপদজনক তা ভালভাবেই বুঝা যায়। কেননা পথে যেতে অনেক বিপদজনক সংকেত লাগান রয়েছে। অনেক স্থানে বেশ সার্পটার্ন রয়েছে, যেখানে

www.pathagar.com

ধীর গতিতে গাড়ী না চালালেই বিপদ। পথের পাশে কোন কোন স্থানে কিছু গাড়ী এমনভাবে দুর্ঘটনা কবলিত অবস্থার থাকতে দেখেছি যে, রাস্তা থেকে গড়িয়ে গভীর খাতে পড়ে গিয়ে তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া খুবই দুষ্কর। একটা গাড়ী সম্মুখের গাড়ীকে ওভার টেক করারও বেশ অসুবিধা। পাহাড়ী ধসে রাস্তা যে কোন সময় বন্ধ হয়ে যাওযার সম্ভাবনাও প্রচুর। একবার বন্ধ হয়ে গেলে নির্ঘাত ৩/৪ ঘন্টা উভয় দিকের সমস্ত যানবাহন আটকে থাকতে বাধ্য। যতক্ষণ পর্যন্ত না সেনাবাহিনীর লোক এসে সেটা পরিস্কার করছে। পাহাড়ের বহুস্থানে জাল দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে যাতে হটাৎ করে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে না পড়ে। পাহাড়ী পথে যাত্রা যতখানি সুন্দর ততোধিক কিন্তু অনিরাপদ। লক্ষ্য করলাম পথের ধারে অনেক বানর। যাত্রীরা কেউ কেউ কোন খাবার যেমন পাঁউরটি, কলা, বিস্কুট ইত্যাদি ছুড়ে ফেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে তা তারা উঠিয়ে খেয়ে ফেলে। আমার সবচেয়ে বিস্ময়কর ভাবে দুঃখ লাগল যে, এই ৩০০ কিঃমিঃ পথ ভারতীয় সেনারা কী কষ্ট করেই না পাহারা দিচ্ছে? রৌদ্র বা বৃষ্টিবাদলেও তাদের কোথাও আশ্রয় নেওয়ার ব্যবস্থা নেই। এমনকি পথের ধারে চায়ের দোকানও অত্যন্ত অপ্রতুল। অথচ মাত্র ৪০/৫০ ফুট পরপর তারা ঠাঁই দাঁড়িয়ে পাহারা দেওয়া ছাড়া আর কোন কাজ নেই। পাহাড়ের উপর থেকে কোন আক্রমন করা হলে তাদের কিছুই করার নেই তাৎক্ষণিক ভাবে। গভীর খাদের উপারে বেশ কিছু পাহাড়ের গায়ে ঘর বেধেছে পাহাড়ী উপজাতী। তাদের ছাগল, মুরগী ইত্যাদি গৃহ পালিত পশুগুলি নিয়ে তারা কোন পথে উঠানামা করে তাও সহজে ধরা যায় না। পাহাড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অনেক পাহাড়ী বৃক্ষ যেন মাথা উচু করে আকাশ ছুতে চায়। নাম না জানা এরকম বহু বৃক্ষ লক্ষ্য করেছি আমরা।

প্রায় মধ্যপথে সেই বিখ্যাত জওহারলাল নেহরু টানেলের বেশ কিছু পূর্বেই আমাদের সকল যাত্রীকেই গাড়ী থেকে নামতে হয়। প্রায় অর্ধ কিঃমিঃ পথ দৌড়ে গিয়ে গাড়ীটাকে টানেলের এপাশে ধরতে হয়। ততক্ষণে গাড়ী চেকিং এর কাজ শেষ। যাত্রীদের মধ্যে আমিই ছিলাম বয়বৃদ্ধ। ফলে আমার জন্যে অনেকেই একটু দুঃখ বোধ করল এই বলে যে, চাচ্চা আপকো ভি দৌড়না পড়েগা, যাহোক টানেলটা প্রায় ২ কিঃমিঃ মত দীর্ঘ এবং পাশাপাশি ওয়ানওয়ে রাস্তা হওয়ায় মুখোমুখী সংঘর্ষের কোন সম্ভবনা নেই। গাড়ীতে চেপেই আমরা টানেল পার হলাম এবং ওপারে গিয়েই আবার গাড়ী চেকিং। একমাত্র আমিই ছিলাম বাংলাদেশী পাসপোর্ট ধারী ব্যক্তি। আমার পাসপোর্টটা একটু উল্টেপাল্টে দেখেই আমাকে ফেরত দেওয়া হয়। আবার যাত্রাশুরু এবং পথে কিছু কিছু কাশ্মীরী মুসলমান আমাকে তাঁদের বাড়ীতে নিয়ে

www.pathagar.com

দাওয়াত খাওয়ানোর জন্যে বেশ কিছুটা অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আমি সময়াভাবে তাঁদের নিমন্ত্রণ সবিনয়ে এড়াতে বাধ্য হয়েছি। রাত ৮ টা থেকে ৯ টার মধ্যেই শ্রীনগর শহরে গিয়ে গাড়ী থামল। আমি গাড়ী থেকে নামতেই দেখি একভদ্রলোক আমাকে তাঁর ঠিকানায় নিয়ে যাওয়ার জন্যে খুবই ব্যাকুল। আমি বললাম ভাই আমি এই শহরের মধ্যেই কোন হোটেলে গিয়ে উঠতে চাই। কিন্তু তিনি বার বার আমাকে তাঁর সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার জন্যে যত ব্যস্ত এবং স্থানীয় কিছু লোকজনও আমাকে তাঁর সঙ্গে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করায় আমি তার সঙ্গেই চলতে লাগলাম। তাঁর নাম বললেন মুহম্মদ ইয়াসীন। তিনি আমার ব্যাগটা তাঁর কাধে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে এতই পীড়াপিড়ী করতে লাগলেন যে, শেষে আমি দিতে বাধ্য হলাম। রাতের অন্ধকারে তেমন কিছুই বুঝা যায় না।

www.pathagar.com

ত্রিংশ পর্ব

চলতে চলতে একেবারে ঝিলাম নদীর তীরে এসে তার নিজস্ব নৌকাযোগে আমাকে ওপারে নদীর উপর তাঁর 'শাহীন প্যালেস হোটেল' বোটের উপর আমাকে উঠালেন।এগুলিকে বলা হয় বোট হাউস। ঝিলাম নদীর উপর এরুপ বহু বোট হাউস যে রয়েছে তা ইলেক্ট্রিক বাতি দেখে বুঝতে পারলাম। এসব নৌকাগুলি বৃহৎ আকারের ও একই স্থানে রয়েছে বহুবছর বংশ পরম্পরায় অনেকটা স্থাবর সম্পত্তির মত। বর্তমান মালিক ইয়াসীনের দাদাজান এটার মালিক ছিলেন। নৌকার ভিতরে বেশ কয়েকটি কামরা রয়েছে। আমাকে ভিন্ন একটি কামরা বাথরুম সংলগ্ন ঘরে উঠতে হল। ঘরের মধ্যে বেশ বড় চৌকির উপর বিছানা করা রয়েছে। এককোনায় চেবিলের উপর রযেছে একটি টেবিল ফ্যান। রাতে আমাকে ভাত, ডিম ভাজা, আলু তরকারী দেওয়া হয়েছিল। বুঝলাম ভদ্র লোকের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। পরদিন সকালেই গোসলটা সেরে নিই। কেননা সারারাত ফ্যানটা চালিয়ে রাখতে হয়েছিল। জুন মাসের শেষের দিক বলেই হয়ত তেমন শীত লাগছিল না। আমি বোটের বাইরে গিয়ে দেখি বেশীর ভাগ মালিকই তাদের পরিবার পরিজনসহ নদীর পাড়ে রাস্তার ধারে কোনমতে গরীবানা হাল থাকতে অভ্যস্ত। ইয়াসীন সাহেবের এক ছেলের নাম ফাইয়াজ। সে স্কুলে পড়ে উঁচু ক্লাসে। চমৎকার দেখতে ছেলেটি। সকালের নাস্তা করলামবাইরে গিয়ে একটা হোটেলে। প্রতিটি রাস্তা পাকা ও পরিস্কার। প্রায়ই রাস্তার পার্শ্বে ফুটপাত রয়েছে। আমি টুরিস্ট বুরোতে গিয়ে আমার ভ্রমনের একটা ছক তৈরী করে ফেলি। সমস্ত কাশ্মীর সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির ব্যাপারে যাবতীয় কাগজপত্র, বই, লিফলেট ম্যাগাজিন ইত্যাদি ওখান থেকেই পেয়ে যাই। পরের দিন আমি ইয়াসীন সাহেবের এক পরিচিত বেবী ট্যাক্সীওয়ালাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি শ্রীনগরের দর্শনীয় স্থানগুলি দেখার জন্যে। প্রথমেই যাওয়ার পথে বিখ্যাত ডাললেকের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। একটা ছোট খাট সমুদ্রের মত প্রায় এর এলাকা এবং শহরের দিকের অংশের উপর প্রচুর হাউস বোট রিয়েছে রকমারী আকারের যেমন ঝিলাম

www.pathagar.com

নদী রয়েছে বহু হাউস বোর্ড। দেশ বিদেশের বহু দর্শনার্থী এই সমস্ত বোটে সাময়িকভাবে আশ্রয় গ্রহন করেন। পথে যেতে যেতে প্রায় একটি লেখার উপর চোখ পড়ত। তাতে লেখা আছে Save the Dal-Lake অর্থাৎ ডাল লেককে রক্ষা করুন। লেকের উপর বেশ কিছু লোককে দেখলাম যারা ভাসমান শ্যাওলা কচুরীপানা ইত্যাদি পরিস্কার করছিল। লেকের মাঝে মাঝে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের ফোয়ারা যা বেশ দর্শনীয় ও মুগ্ধকর বটে। আমি ছবি তুললাম। ডাল লেকের পূর্বপ্রান্তে রয়েছে তিনটি বিখ্যাত বাগান। প্রথমেই চলে যাই বোটানিকাল গার্ডেন দেখতে। সেখানে কিছু বাহারী ফুলের গাছ আছে ও পরিচর্যার জন্য রয়েছে মালী। এই বাগানটা ছাড়িয়ে আবার প্রধান রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে রযেছে প্রকান্ড নিশাত গার্ডেন। এখানেও রয়েছে প্রায় ৪০/৫০ জন মালী রক্ষনা বেক্ষনের জন্য। এটা যেহেতু ঋতুরাজ বসন্তের সময় নয় বলে অনেক গাছেই তেমন বাহারী ফুলের সমারোহ অনুপস্থিত। তবুও আমি বাগানের মালীদের সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে অনেক কিছু জানলাম। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি যুক্ত ফুলের গাছ কোনটি? তারা আমাকে দেখাল কাঁঠাল গাছের মত একটা বড় গাছ, যার উপরে ফুটে রয়েছে পদ্ম ফুলের মত সাদা একটি ফুল। সেটি কষ্ট করে গাছের উপর থেকে পেড়ে আমাকে তারা দিল। আমি শুঙ্গে দেখলাম সত্যিই অপুর্ব সুন্দর ঘ্রান রয়েছে সেটির। আমাকে তারা ফুলটি দিয়েই দিল। পুরো বাগান জুড়ে রয়েছে বিশাল এলাকা আমি ফুলটা শুকিয়ে তার বিচিগুলি বাংলাদেশে ফুলের টবে পুঁতেছিলাম কিন্তু হয়নি।

এরপর একটু দূরে যে ফুলের প্রকান্ড বাগান রয়েছে তার নাম শালিমার গার্ডেন। সম্ভবত মোঘল বাদশাদের তৈরী। অতি দীর্ঘ এবং এটিই শ্রীনগরের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ফূলের বাগান। এখানেও প্রায় ৬০/৭০ জন মালী কাজ করে। নিশাত গার্ডেনে যেমন অনেক দূর থেকে ঝর্ণা ধারার মাধ্যমে পানি আসে। এখানেও সে রকম অনেক ফোয়ারার ব্যবস্থা যে এককালে ছিল তার প্রমাণ রয়েছে। বাদশা ও বেগমজাদীরা এই সব ফোয়ারার মধ্যে সুউচ্চ বেদীর উপর বিশ্রামের ব্যবস্থা বেশ ভাল মতই যে ছিল, তা এখনও দেখলে অনুমান করা যায়। আমি পুরো বাগান এলাকা ঘুরে ঘুরে অনেক ছবি তুললাম। পরপর এই তিনটি বাগান দেখতে আমর দীর্ঘ সময় পার হয়ে যায়।

www.pathagar.com

এত গেল ডাল লেকের পূর্ব সীমানার কথা এবার আমার যাবার পালা বিশেষ দর্শনীয় অতিপবিত্র স্থান হযরত বাল মসজিদ। যেটি একবারে ডাল লেকের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ডাল লেকের পূর্ব ও উত্তর সীমানার দীর্ঘ কয়েক কিঃমিঃ এলাকা পার হয়ে যাওযার সময়ই পবিত্র মসজিদের একটি মাত্র মিনার ও একটি মাত্র ডোম বা গম্বুজ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তার ডান দিকে কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেবল মাত্র সাইন বোর্ডটা নজরে পড়ল। ঠিক এরই বাম দিকে ডাললেক সংলগ্ন অনেক নীচে রয়েছে শেরে কাশ্মীর শেখ আব্দুল্লাহ্‌র কবর। সাদা ধপধপে বোধকরি মার্বল পাথর দ্বারা তৈরী। আমার ট্যাক্সিটা তার সামনে থামতেই সেন্ট্রিরা পাহারারত অবস্থায় যারা সেখানে সর্বক্ষণ রয়েছে তারা গাড়ীটাকে আরও একটু দূরে রাখতে বলে। আমি পূর্বেই নেমে পড়েছিলাম কবরের কিছু ছবি তুলব মনে করে। কিন্তু তারা আমাকে নীচে কবরের নিকট পর্যন্ত যেতে না দিয়ে বলে আপ ইঁহাসে তসবির উঠা সাকতে হেঁ! শেষে আমি তাই করি। এরপর আর মাত্র কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে হযরত বাল মসজিদের নিকট গাড়ী থেকে নেমে যাই। সেখানে অনেক দোকানপাট, হোটেল ইত্যাদি রয়েছে। সর্বপ্রথম লক্ষ্য করি মসজিদ চত্বরের উত্তর দিকে বহু কবুতর দানাপানি খাচ্ছে। মসজিদ পাকের ভিতরে প্রবেশের পূর্বে অজু করে নিয়ে ক্যামেরা বাইরে জমা রেখে ভিতরে প্রবেশ করতেই পুলিশ অফিসার আমাকে তল্লাশী করে। আমি তাঁদের প্রশ্ন করি তাঁরা মুসলিম কিনা? তাঁরা সকলেই মুসলিম বলে স্বীকার করেন। মসজিদের মুলকেন্দ্রে গিয়ে মেহরাবের পাশেই দু'রাকাত নামাজ আদায় করি যেহেতু যোহরের নামাজের তখন অনেক দেরী। মসজিদের দক্ষিণ প্রান্তের দিকের কাজ চলছিল যাতে উত্তর প্রান্তের মতই বহু মুসল্লীর অবস্থানের জন্য স্থান সংকুলান হয়। মসজিদের পুর্ব প্রান্ত ডাললেকের সঙ্গে এমন ভাবে এসে মিশেছে, যেন মনে হয় ডাল লেকের ভিতর থেকেই মসজিদটা উপরে উঠে এসেছে অতএব পূর্ব প্রান্তেও বহু মুসল্লী সবুজ ঘাসের উপর স্বচ্ছন্দে নামাজ আদায় করতে পারেন। আমি লক্ষ্য করেছি বাগদাদ শরীফে বড়পীর হযরত গওসপাকের মসজিদের অভ্যন্তরে কোন পিলার যেমন নেই, অথচ তিন দিকের ব্যালকনিতে অনেকেই নামাজ পড়তে পারেন। ঠিক এক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যবস্থা লক্ষ্য করেছি। বহু মুসল্লি একত্রে নামাজ আদায় করার ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। ক্যামেরা

www.pathagar.com

দিয়ে মসজিদের বাইরে থেকেই বহু ছবি তুললাম। তবে পবিত্র হযরত বাল যেটি বছরের মাত্র একটা বিশেষ দিন ছাড়া আর কখনও অন্য সময় প্রদর্শন করান হয় না, জানতে পেরে আমিও সেটি দেখার জন্যে কমিটির কর্তা ব্যক্তিদের নিকট কোন আবেদন রাখিনি। মনের দুঃখ মনেই চেপে রাখি। যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে এসেছিলাম সেই একই পথে ফিরে চললাম জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের ভাষায়ঃ

মুসাফির মোছরে আঁখি জল
ফিরে চল আপনারে নিয়া
আপনি ফুটেছিল ফুল
আপনি গিয়াছে ঝরিয়া।
রে পাগল একি দূরাশার জলে।
তুই বাঁধলি বাসা
মেটেনা হেথায় পিয়াসা
হেথা নাই তৃষ্ণা দরিয়া।

(উপরোক্ত এই বিখ্যাত নজরুল গীতির পঙতিগুলি যথাযথ ভাবে যোগাড় করতে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। পরিশেষে আমার ছোট মামী নিলুফার তাসমিনা আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন, আমি তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।)

পরের দিন কাশ্মীরের দর্শনীয় স্থান গুলমার্গ যাওয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রিম বাসের বুকিং করে ফেলি। শ্রীনগর থেকে দু আড়াই ঘন্টার যাত্রাপথ। গুলমার্গ সাধারণত বিভিন্ন পাহাড়ী ফুলের জন্যে বিখ্যাত এবং ক্রমাগত উঁচু পাহাড়ে উঠার ও একটি শিবমন্দিরের জন্যে প্রসিদ্ধ। কিন্তু যেহেতু এটা ফুল ফোটার ঋতু ছিলনা, সেহেতু তেমন ফুলের সমারোহ দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। তবে পাহাড়ী রাস্তার উভয় পার্শ্বে নানা প্রকার শীতপ্রধান এলাকার বিশালাকৃতির সুদীর্ঘ গাছগুলি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। যা সাধারণত আমাদের গ্রীষ্ম প্রধান সমতল এলাকায় সচরাচর তেমন দেখা যায় না। গুলমার্গে গিয়ে বাস থেকে নেমেই দেখি বহু ভ্রমন পিয়াসী দেশী বিদেশী ব্যক্তির উপস্থিতি। কেউ কেউ সপরিবারে এসেছেন বেড়াতে।লক্ষ্য করলাম প্রচুর ঘোড়া যার মালিকেরা অনেকের পিছনেই ঘুর ঘুর করছে। আমরা প্রথমে একটা শিব মন্দিরের নিকট গিয়ে দেখি ঐ পথ দিয়েই সু উচ্চ দুগর্ম পাহাড়ে

www.pathagar.com

যাত্রা করতে হবে। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে আর ঘোড়ায় চড়ার কোন শখ ছিলনা। কিন্তু একজন ঘোড়ার মালিক কিছুতেই আমার পিছু ছাড়লনা। সে আমাকে বার বার বুঝাতে লাগল যে চাচ্চা আপ পায়দল মে পাহাড় কা উপর নেহী যা সাকতেহেঁ। দেখিয়ে সব কোয়ী ঘোড়াপর সাওয়ার হোকে যাতেহেঁ। আপ তো বুড়হা আদমী হ্যায় না? আপকো জরুর ঘোড়া চাহিয়ে, ঘোড়াটা ছিল সাদা রঙ্গের এবং মাঝাড়ী আকারের। আমি শেষে কিছু দরদাম করে উঠে পড়লাম। কিন্তু একটা ছোট বাচ্চা ছেলেকে দিল সঙ্গে যে, ঘোড়া ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আমাকে ঘোড়ার মালিক এও বলে দিল খানেকা ওয়াক্ত উস্ বাচ্চাকো ভি আপ খিলাইয়েগা, ঠিক আছে যাত্রা শুরু হল পাহাড়ের উপরের দিকে। কোন কোন ঘোড়ায় স্বামী স্ত্রী ও বাচ্চা হয়েছে। আমি প্রায় শেষের দিকেই ছিলাম।

খুবই আবাক হলাম দেখে যে, ঘোড়া কত পটু হয় পাথরের ছোট বড় টুকরার উপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলতে এবং সাবলীল গতিতে পাহাড়ের মত উঁচুস্থানে উঠতে সক্ষম। এটা আমার অভিজ্ঞতার বাইরে ছিল। এমনকি আমি নিজে পায়ে হেঁটে এই পাথর ভেঙ্গে উপরে অব্যশই কোন মতেই উঠতে যে পারতাম না তা পরে বুঝতে পারলাম। তবে ঐ ছোট্ট বাচ্চা ছেলেটি আমাকে বার বার নিষেধ করছিল যেন আমি ঘোড়া বেশী জোরে না ছুটাই। আমি তার কথামতই চললাম। আমি পাহাড়ের অনেক উপরে গিয়ে দেখি বেশ কিছুটা সমতল ভূমি। দুপুরের খাওয়ার জন্যে দু একটা হোটেল রয়েছে। অনেকেই সেখানে তাদের আহার পর্বসেরে নিচ্ছে। আমি ও ছেলেটি খেয়ে নিলাম ভাত ও রুটি। আরও অবাক হলাম যে মাত্র কয়েক মাস পূর্বে গুজরাটের দাঙ্গার পরও বেশ কিছু দর্শনার্থী এসেছে এরূপ ভ্রমন বিলাসে সেখান থেকে। কোন কোন দল আরও উপরের দিকে অন্যপথে বরফের সন্ধানে চলে যায়। আমার ছেলেটি আমাকে বলে আপ আগার রোপওয়ে (Ropeway) মে নীচে যাইয়েগা তো হাম ঘোড়া লেকর নীচে উতারতাহুঁ। আমি তাকে যাওয়ার অনুমতি দিই। আমি রোপওয়েতে চেপে পাহাড়ের উপর থেকে নীচের দিকে নামার সময় বেশ কিছু ছবি তুললাম। ৫০ রূপীর বিনিময়ে রোপওয়েতে ঘুরা হয়ে গেল। নীচে গিয়ে দেখি শ্রীনগরের স্কুলের চমৎকার পোষাকে সুন্দর সুন্দর ছেলে মেয়েরা বেড়াতে এসেছে এই সুন্দর আবহাওয়ায়। আমি তাদেরও বেশ কিছু ছবি তুলি। পরিশেষে

www.pathagar.com

আবার ঘোড়ায় উঠতে গিয়ে ঘোড়ার জিনে আমার বাম হাতের মধ্যমার আঙ্গুল কিছুটা ছিঁড়ে য়ায়।

ওখানকার দু'তিনজন যুবক আমার আঙ্গুল দিয়ে রক্ত পড়তে দেখে খুবই বিচলিত বোধ করতে থাকে। আমি আমার পকেট থেকে রুমালটা বের করতেই তারা সেটি দিয়ে বেশ ভাল ভাবে বেঁধে দেয় যাতে রক্তটা বেরুতে না পারে। পরে আমি আবার ঘোড়ায় চড়ে অর্ধ কিঃমিঃ পথ পেরিয়ে বাসস্ট্যান্ড গিয়ে আমার নির্ধারিত বাসে উঠি। বাসের ভিতর দুজন বিদেশী যুবক যুবতীকে বসে থাকতে দেখে আমি তাদের সঙ্গে তাদের দেশীয় কালচার ও কৃষ্টি সম্পর্কে বেশ কিছু জেনে নিই। সম্ভবত ইউরোপের কোন একটা দেশ থেকে তারাও আমার মতই দেশ ভ্রমনের এসেছে এবং ভাল ইংরেজি জানে।

আমি শ্রীনগরের বাস থেকে নেমেই সঙ্গে সঙ্গে একটি বেবী টেক্সীতে উঠে বেবী ওয়ালাকে বলি একজন ভাল ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে চল। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের রাস্তার পাশেই একজন ডাক্তারের চেম্বার আমাকে দেখিয়ে দেয় এবং আমি তাকে ভাড়া মিটিয়ে ছেড়ে দেই। ডাক্তার আমার রুমালট খোলার পর আমার ক্ষতস্থানটা দেখে আমার মুখ পানে চেয়ে বলেন (This is very bad, I am very sad and it may be fatal too.) ডাক্তার নিজেই আমকে একটা (A.T.S) ইন্জেকশন পুশ করেন। তাঁর কম্পউন্ডার থাকা সত্ত্বেও তিনি তার কোন সাহায্য না নিয়ে আমার আঙুলের মাথার দিকটার অংশ কিছুটা কেটে বাদ দিয়ে বলেন এটাতো আর জোড়া লাগবেনা। অতএব কেটে ফেলা উত্তম এরপর চমৎকার করে তিনি ড্রেসিং করে দেন, কিছু ঔষুধ খাইয়েও দেন। পরে প্রেসক্রিপশনটা আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন আপনি কীভাবে আমার কাছে এলেন? আমি দিলাম সঠিক উত্তর। আমার পরিচয় জানতে পেরে আমাকে বললেন এটাতে যেন সহজে পানি না লাগে এবং কালই জম্মুতে গিয়ে আবার ড্রেসিং করিয়ে নিবেন। প্রতিদিন একবার করে ড্রেসিং করতে হবে। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি কত লাগবে? তিনি ক্যাটাগরীক্যালি একটা বিল দিয়ে বলেন ১৩০ রূপি। আমি অবাক হয়ে দেখি কত অল্পতে তিনি আমার চিকিৎসা করলেন। সম্ভবত ডাক্তারের নাম ছিল Dr. Shawkat Khan, M.B.B.S.।

www.pathagar.com

শ্রীনগরে আমি যে ২/৩ দিন ছিলাম, এতেই আমি শহরবাসীর অবস্থা, রাজনৈতিক উৎপীড়ন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের করুণ অবস্থা উপলব্ধি করে নিই। সন্ধ্যার পর পরই সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। ১২/১৪ বছর ধরে কোন সিনেমা হল চালু নেই। আমি শহরে সন্ধ্যার পর কাবাব খাওয়ার উদ্দেশ্যে ফাইয়াজ ছেলেটিসহ আরও একজন অতিথিকে (কাশ্মীরি) সঙ্গে নিয়ে ঝিলাম নদীর অপর পারে গিয়ে কোথাও গরুর গোস্তের কোন চিহ্ন দেখলাম না। তাদের চেনাজানা বেশ কয়েকটি দোকান ঘুরেও কোন কিছুরই কাবাব জাতীয় কিছুই না পেয়ে অবশেষে রাস্তার ধারে ফেরীওয়ালার নিকট কিছু ভূনাগোস্ত ও পরটা তাদের খাওয়ালাম, নিজেও খেলাম। দু'দিনই সন্ধ্যার পর এই একই অবস্থা লক্ষ্য করালাম । উপরন্ত সমস্ত শহরেই Black out এর অবস্থা। লোকজন তেমন রাস্তায় কোথাও দেখলাম না। শুনলাম প্রতিদিন রাতেই ৩০/৩৫ জন লোককে শহীদ হতে হচ্ছে। তবে আমি কোন গোলাগুলির আওয়াজ শুনতে পাইনি।

চলে আসার দিন সকালে ইয়াসীন সাহেব আমাকে তার নৌকাযোগে পার করে দেন এবং আমি তাঁকে ৫০০ রূপী দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন। বাসস্ট্যান্ডের কাছাকাছি এসে দেখি, কিছুদূর পরপর সেনাবাহিনীর জোয়ানরা পাহারারত এবং তাদের কারো কারো কাছে রয়েছে কালো রঙ্গের Sniper dog অর্থ্যাৎ যে কুকুরগুলি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং অপরাধীদের সনাক্ত করতে অভ্যাস্থ। আরও অবাক হলাম যে, সমস্ত শহরে কোথাও হিন্দি সাইনবোর্ড দৃষ্টি গোচর হলনা বরং উর্দূ এবং ইংরেজিতে সর্বত্র সাইনবোর্ড লেখা রয়েছে। এমন কি ভারতীয় চক্রমার্কা তিন রঙ্গের পতাকাটাও আমার দৃষ্টিতে পড়েনি। আমি স্থানীয় অধিবাসীদর জিজ্ঞাসা করে জানতে চেয়েছিলাম শ্রীনগরে আসার প্রধান রাস্তা কোনটি? তারা আমাকে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন রাউয়াল পিন্ডি থেকে শ্রীনগর পর্যন্ত যে রাস্তা রয়েছে বহুকাল ধরে সেটিই প্রধান রাস্তা। আমি পুনরায় তাদের জিজ্ঞাসা করি, তাহলে আমি জম্মু থেকে যে পাহাড়ী পথ ধরে নেহরু টানেলের ভিতর দিয়ে এই ৩০০ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে এলাম, এই দুর্গম পথের বয়স কত? তারা ঠিক আগের মতই তড়ি গড়ি উত্তর দেন মাত্র ৬০/৬৫ বছর পূর্বে এটা তৈরী করা হয়েছে। আমি তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান যে করুণ চিত্র অবলোকন করলাম তাতে অব্যক্ত বেদনাবোধ ছাড়া আর

www.pathagar.com

কিছুই প্রকাশ করতে পারলাম না। তবুও আমি তাদের যে জেহাদী মনোভাব লক্ষ্য করেছি সেটা কখনই ফিলিস্তিনীদের সমকক্ষ নয় মোটেই, সেটাও তাদের জানাতে বাধ্য হয়েছি। দেশ বিভাগের পর তারা যে প্রচন্ড প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়েছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমি এক প্যাকেট কাজু বাদাম কিনে নিলাম পথে যেতে যেতে খাওয়া হবে মনেকরে। দাম নিল ৩৫ রূপী। কাশ্মীরি ছেলে মেয়েরা সাধারণত সকলেই গৌরবর্ণ খাড়ানাক, টানা চোখ এবং দীর্ঘাঙ্গী হয়ে থাকে। কিছু সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারী ছাড়া বাকী জনসাধারণ প্রায় সকলেই মুসলিম এবং দরিদ্র। হোটেলের খাওয়া দাওয়া আমার তেমন পছন্দ না হওয়ায় আমি বেশীর ভাগ সময়েই ফলমূল খেয়েই তৃপ্তি পেতাম। তখন ছিল সুমিষ্ট আমের সময়। অতএব দু'এক কেজি আম খেয়েই আমি আনন্দ পেতাম। জম্মুতে যখন এসে পৌছালাম তখন প্রায় বেলা তিনটা। আমি আর কোন হোটেলে না উঠে আমার সামান্য মালপত্রসহ একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া ও নামাজ শেষ করে নিই। এরপর একটা গাড়ীতে উঠে সোজা জম্মুরেল স্টেশনে গিয়ে দিল্লির জন্যে রিজারভেশনসহ টিকিট কিনে ফেলি। এর ঠিক দুদিন পূর্বেই এই রেলস্টেশনের নিকট একটা বোমা ফাটে এবং কিছু লোক হতাহত হয়। ফলে, আমাকে বুকিং অফিস পর্যন্ত আমার মালপত্র নিয়ে যেতে দেওয়া হলনা। বরং বাইরে অরক্ষিত অবস্থায় ফেলে রেখেই ভিতরে গিয়ে টিকিট সংগ্রহ করি। ট্রেন ছাড়বে সেই রাত প্রায় ১০ টার দিকে। আমি এই দীর্ঘ সময় জম্মু রেলস্টেশনের ধারে কাছেই ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দিই। স্টেশনে ঢুকতেই দেখি বিশাল আকৃতির একটি অয়েল পেন্টিং যেটাতে অত্যন্ত চমৎকারভাবে আকা আছে আমাদের প্রিয়তম নবীপাক হযরত মুহম্মদ (স:) এর একটিমাত্র পবিত্র মাথার কেশ। একটি অদৃশ্য মানুষের কেবল মাত্র একটি হাত সেটা ধরে ঝুলিয়ে রেখেছে। এই পবিত্র মাথার কেশটিই রয়েছে শ্রীনগরের হজরতবাল মসজিদের কর্তৃপক্ষের নিকট অত্যন্ত সযতনে সুরক্ষিত আছে বহুবছর পূর্ব থেকে। শোনা যায় যে, জনৈক আশেকে রসুল এই পবিত্র কেশ মোবারকটি মদিনা শরীক থেকে বহন করে নিয়ে আসেন এবং এটি কোন একজন মোঘল বাদশার নিকট দিল্লিতে যথেষ্ট পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সুরক্ষিত অবস্থায় থাকে। এর অনেক পরে এটা জনৈক কাশ্মীরি বুজুর্গের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এবং এই

www.pathagar.com

পবিত্র কেশ মোবারকটিকে কেন্দ্র করেই কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের ডাল লেকের পশ্চিম প্রান্তে এই পবিত্র হজরতবাল মসজিদটি তৈরী করা হয়। যার স্থাপত্য কৌশলের বিশেষত্ব হল একটি মাত্র গুম্বুজ এবং একটি মাত্র সুউচ্চ মিনার।

আমি রাতের খাবার রেলস্টেশনের উপর তলায় একটি চমৎকার রেস্টুরেন্টে শেষ করি। পরে প্ল্যাটফরমে এসে দেখি প্রচুর যাত্রী জমায়েত হয়েছে এবং বেশীর ভাগই শিখ সম্প্রদায়ভূক্ত। আমার নির্ধারিত বগীটির সম্মুখে আমার নাম ও সিট নং দেখে উঠে পড়ি। অত্যন্ত ক্লান্ত থাকার ফলে আমি সহজেই ঘুমিয়ে পড়ি। পরের দিন সকালে দিল্লিতে পৌছে আমার মামার এম,পি হাউসে মালপত্র রেখে আমি নীচে এম, পি হোটেলে খাওয়ার জন্যে আসি। সেখানে আমার পূর্ব পরিচিত ক্যাপ্টেন সিং এর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তাকে নিয়েই আমি নাস্তা করি। তিনি আমার হাতের আঙ্গুলে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে একটু বিচলিত হন। যেহেতু আমি জম্মুতে ডাক্তারের নির্দেশ মোতাবেক কোন ড্রেসিং করানোর সুযোগ পাইনি বলতেই তিনি আমাকে দয়া করে পরামর্শ দেন যে আপনি এক্ষুণি এই নিকটস্থ ডাঃ রামমোহন লোহিয়া হাসপাতালে গিয়ে ড্রেসিং করে নিন। হাটা পথ দুরত্বের মধ্যেই বিশাল এলাকা নিয়ে হাসপাতাল। সেখানে তারা প্রথমে একাজ করতে না চাইলে আমিও নাছোড় বান্দার মত আমার প্রেসক্রিপশনসহ তাদের বারবার অনুরোধ করে সাহায্য কামনা করি। শেষে এক মহিলা নার্স তিনিই আমাকে চমৎকারভাবে ওষুধ পত্র লাগিয়ে ড্রেসিং করে দেন। আমার যেহেতু ডায়াবেটিস রোগ আছে সেইহেতু আমিও এটা অবহেলা করতে পারিনা। এই আঘাতের জন্যে আমি চন্ডিগড় ও অমৃতসর সফর বাতিল করতে বাধ্য হই। সন্ধ্যার পর আমি আমার পুত্রবধূ সীমার জন্যে একটা ভাল বেড কভারের খোঁজে বের হতে গিয়েই আবার ক্যাপ্টেন সিং এর সম্মুখে পড়ি। তিনি জিজ্ঞাসা করেন আমার উদ্দেশ্য কী? তিনি তখন আমাকে জানান যে এখন তো সব দোকান পাট বন্ধ। কোথাও কিছু পাবেন না। কেননা ,দিল্লিতে বেশ কিছুদিন ধরে সন্ধ্যার পর পরই সবকিছুই বন্ধ হয়ে যায়। অথচ ১৯৮৮ সালে আমি যখন প্রথম দিল্লি যাই তখনটা কিন্তু এমন ছিলনা।

যা হোক তার পরদিন আমি কলকাতা হয়ে সোজা বর্দ্ধমানে আমার ভাগনা নোমান জাহেদীর বাসায় উঠি এবং সেখানে আর একবার একটা নার্সিং হোম থেকে

www.pathagar.com

ড্রেসিং করিয়ে নিই। আঙ্গুলের এই ব্যাণ্ডেজটার জন্যে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। তবে যেহেতু আমি পূর্বেই ইউরোপ ভ্রমন করেছিলাম তাই, বোধকরি ভারতের সৌন্দর্য্যের বিপুল প্রচারণা সত্ত্বেও আমার নিকট তেমন আর্কষণীয় কিছু মনে হয়নি। যদিও একটা কথা আছে যা নাই ভারতে তা নাই ভুবনে তবে এটা কথার কথা বৈ কিছুনয় বলেই আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। নিঃসন্দেহে ভারত খুব বড় দেশ এবং তেমনই প্রচুর লোক সংখ্যার ফলেই বোধকরি এর হতশ্রী রূপ প্রায় সর্বত্র বিরাজমান।

তুলনামূলক ভাবে সমস্ত ইউরোপে লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম বলেই বোধকরি তাদের চাকচিক্য বাজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামজিক অবস্থার উন্নতির ফলেই সর্বদিকেই উন্নতির ছাপ রয়েছে চোখের পড়ার মত। বর্তমান বিশ্বে চীনদেশে সর্বাধিক লোক সংখ্যা হওয়া সত্ত্বেও তা অনেক বেশি আকর্ষণীয় এবং উন্নত বহুদিক দিয়ে। তাদের ভৌগলিক সীমারেখাও অনেক বৃহৎ। আমি নিজে এ পর্যন্ত যদিও চীন দেশে যাওয়ার কোন সুযোগ করে উঠতে পারিনি, তবে আমার দু'ছেলেই সেদেশ ভ্রমন করে এসেছে এবং চমৎকার দৃশ্যাবলীর ছবি তুলে এনেছে। সবার উপরে সে দেশের শিক্ষিতের হারও ভারতের তুলনায় অনেক বেশী।

www.pathagar.com

একত্রিশ পর্ব

২০০১ সালে আমার বড় ছেলে ফারুক একটা বায়িং হাউস চালু করে সম্পূর্ণ এককভাবে নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে। এই ক'বছরে বর্তমানে অর্থাৎ ২০০৫ সালে সেটির পরিধি বৃদ্ধি পেয়ে বেশ বড় আকার ধারণ করেছে। অতি সম্প্রতি বায়িং হাউসের সঙ্গে যোগ করতে হয়েছে তার নিজস্ব গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী। যেহেতু দেশ বিদেশের অর্ডার সাপ্লাইয়ের উপর সময়মত মাল রপ্তানী করা অতীব জরুরী। সেই হেতু মহাখালীর এয়ারপোর্ট রোডের পাশেই তৃতীয় ও চতুর্থ তলা ভাড়া নিয়েছে। যার ফ্লোর এরিয়া ৩০০০+৩০০০= ৬০০০ বিশিষ্ট মোট বর্গফুট। তৃতীয় তলায় ৫৪টি সিউয়িং ম্যাশিন যা জাপান এবং চায়না থেকে আমদানী করা হয়েছে এবং সেখানেই চলছে পুরোদমে ফ্যাক্টরী। চতুর্থ তলায় রয়েছে তার বায়িং হাউস। প্রতি বছরে বহুবার তাকে এশিয়া ও ইউরোপ মাহদেশের বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করে অর্ডার সংগ্রহ করার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় বলে বিশেষত আমি তার কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিনা। বর্তমানে প্রায় দেড় শতাধিক কর্মচারী কর্মকর্তা ও শ্রমিক তাদের অধীনে রয়েছে। এবং তুলনামূলকভাবে অন্যান্য কম্পোনীর অপেক্ষা সে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা সহকারেই তাদের নিয়োগ করেছে বুঝতে পারি।

মোদ্দা কথা হল, আমি আমার পিতৃকূলে মাতৃকূলে কখনই কাউকে এরূপ ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে দেখিনি। হয়ত সে সময় এসবের তেমন কোন প্রয়োজনও ছিলনা। বর্তমানে যুগের পরিবর্তনে চাহিদা মোতাবেক বোধকরি এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমার লেখাপড়া বা শিক্ষাদীক্ষা অন্য ধরনের । ফলে এ ধরণের ব্যবসা বাণিজ্যের আমি মাথামুন্ডু বাস্তবিকই তেমন কিছুই বুঝিনা। তাছাড়া আমার এই বৃদ্ধ বয়সে এর কোন অবকাশও আর নেই। একটা সময় ছিল, যখন যা দেখতাম শুনতাম পড়তাম ও বুঝতাম তা আর সহজে ভুলতাম না। বর্তমানে আমার বহুবিধ রোগের মধ্যে বোধহয় প্রধান রোগ ধরেছে স্মৃতিহীনতা। কিছুই মনে রাখতে পারছিনা। কানেও কম শুনছি এবং সম্প্রতি চোখেও ছানিপড়তে শুরু করেছে।

www.pathagar.com

সম্ভবত এটাকেই অচল অবস্থা বলা যেতে পারে। এখন প্রতীক্ষা মাত্র মহান আলাহ্ পাকের ডাক আসলেই চলে যেতে হবে।

২০০২ সালে আমার ছোট ছেলে চৌধুরী হাসানুর রহমান ওরফে ফাহিম চৌধুরীর বিয়ের ব্যাপারে আমরা একটু নড়ে চড়ে উঠলাম। ছেলের পছন্দ মোতাবেক মেয়ে না পেলে সে সহজে বিয়েতে মত দিতে অপারগতা জানাতে পারে, তাও আমাদের জানিয়ে রাখল। নিউ ডিওএইএস এ ইতোমধ্যে আমার প্রচুর অবসর প্রাপ্ত আর্মি অফিসার বন্ধু বান্ধবে পরিমত হয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ ঘটকালীর কাজে বেশ পারদর্শী আছেন বুঝতে পেরে আমি মসজিদে গিয়ে তাদের দু'চারজনকে একটু অনুরোধ করি। ছেলের বায়োডাটা ও ছবি তাঁদের দাবীমত যোগান দিই। তারাও অত্যন্ত আন্তরিকভাবে চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু ছেলেটি আমার একটু বেশী দীর্ঘাকায় (৬"-২") হওয়ায় তার প্রথম দাবী মেয়েটি পরিমিত উচ্চতা অবশ্যই থাকতে হবে। দ্বিতীয় দাবী হল, মেয়ের নাকটি অবশ্যই খাড়া হতে হবে যেহেতু তার নিজের নাকটিও খাড়া, তৃতীয় দাবী হল গাত্রবর্ণটি উজ্জ্বল হতে হবে ইত্যাদি। আমার তখন একটা জোক মনে পড়ে গেল। একলোক একটি গাভী কিনতে চান। কিন্তু গাভীটি হতে হবে তার শর্ত মোতাবেক। যেমন খাবে কম, লাদবে বেশী, দুধ দেবে পাঁচ কেজি অথচ দামে সস্তা। এরকম গরু একমাত্র কামধেনু ছাড়া সম্ভব কিনা অমি জানিনা। কিন্তু ছেলের এই রূপ পছন্দের প্রতি বাড়ীর সকলেই একমত। ও নাকি তেমন বেশী কিছু দাবি করেনি।

এমতাবস্থায় হটাৎ করে আমার ছোট মেয়ে শাহীন তার দ্বিতীয় সন্তানের প্রথম জন্মদিন পালনার্থে তার মা ও আমাকে তাদের দেশে দেখতে চায়। সে নিজেই আমাদের দুজনের টিকিটের ব্যবস্থা করে ফেলে। এবার আমরা ভিসা পেলাম 'সেনজেন স্টেটসের' অর্থাৎ ইউরোপের ১৫টি দেশের ভিসা একসঙ্গেই পেলাম সুইডেন এ্যমব্যাসী থেকে। কেবলমাত্র সুইজারল্যান্ড ভিসা দিতে চেয়েও নানা টালবাহানা করে আর দিলনা। ২০০১ সালে ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর অনেক দেশেই এরূপ আচরণ করতে শুরু করেছিল। ফলে ইংল্যান্ডের ভিসাও আর নেওয়া হলনা, আমার মুখে দাড়ি, মাথায় টুপীর কারণে কিনা জানিনা। এবারও মে মাসের মাঝামাঝি ২০০২ সালে ইউরোপে যাত্রা শুরু। বোধকরি এই সময়টা সেখানে

www.pathagar.com

যাওয়ার উত্তম সময়, যেহেতু সম্মুখে সামার অর্থাৎ গ্রীষ্মকাল। তবে এবার অন্য রুটে যাওয়ার জন্য থাই ইন্টারন্যাশনাল এ বুকিং করা হল। আমার বড় ছেলে ফারুক টিকিটের অর্ধাংশ শেয়ার করতে চেয়েছিল কিন্তু শাহীন রাজি হয়নি। প্রতিটি টিকিটে ভাড়া পড়ল প্রায় ৬৮০০০ টাকা। ঢাকা জিয়া বিমান বন্দরে আমাদের মালপত্র কিছু বেশী হওয়ার জন্যে প্রায় ২০০০ টাকা দণ্ড দিলাম আমি। আমার স্ত্রীর জন্যে হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল।

আমরা বেলা দেড়টার মধ্যেই টেক অফ এর সুযোগ পাই। এবার যাত্রা শুরু হল সম্পূর্ণ উল্টোদিকে অর্থাৎ আমাদের গন্তব্যের ঠিকানা যদিও সুদূর পশ্চিমের উত্তর গোলার্দ্ধে। কিন্তু আমরা যাত্রা করলাম পূর্বদিকে প্রথমে থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। রাজধানী ব্যাংককে বিকেলের দিকে এয়ার ক্র্যাফট থেকে নামতেই দেখি আমার স্ত্রীর জন্যে হুইল চেয়ার নিয়ে এক যুবক তৈরী। সে বেশ চটপটে এবং ভাল ইংরেজি জানে মনে হল। সে আমাদের টারমিনালের মুল ভবনে পৌছে দিয়েই বলল তোমাদের রাত ১২ টায় ফ্লাইট। অতএব, আমি ঠিক সময়েই এসে যাব। যেহেতু ব্যাংকক থেকে আমাদের এক নাগাড়ে দীর্ঘযাত্রা প্রায় ১২/১৪ ঘন্টা পর সুইডেনের আরলান্ডা এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ননস্টপ জার্নি। সেজন্যে ফারুক আমাকে বলেছিল যে, আব্বা আপনারা দুজনেই ব্যাংকক এয়ারপোর্টে Foot Massage করিয়ে নিবেন। আমি ৫০ ডলার ভাঙ্গিয়ে পেলাম প্রায় ১৫০০ বাথ। এক ঘন্টার জন্যে মাথা পিছু ৬০০ বাথ হিসেবে লাগল ১২০০ বাথ। সেখানে অনেকেই দেখলাম ফুট ম্যাসেজের জন্য চেয়ারে বসে আরামের সঙ্গে ম্যাসেজ করাচ্ছেন। দু'জন মহিলা এসে আমাদের জুতো, মোজা সব খুলে ফেলে গরম পানির বড় গামলা ও নানা প্রকার উপকরণ ব্যবহার করে বিশেষ কৌশলে পাদুটি ম্যাসেজ করতে শুরু করল। তখন বেশ আরাম পাচ্ছিলাম ঠিকই। কিন্তু পরে আর সে ভাব বেশী দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। মেয়েটি আমার ঘাড় ও পীঠের কিছু অংশ ও ম্যাসেজ করেছিল। অনেককে দেখলাম টিপসও দিচ্ছে বুঝলাম তারা প্রায়ই এই ধরনের আরামের প্রত্যাশী হয়েই এখানে আসে।

পরে আমরা রেস্টুরেন্টে গিয়ে ডিনার খেয়েনিলাম। ১৯৯৫ সালের পবিত্র হজ্ব পালনের পর আমাদের সৌদিয়া বিমান ঢাকায় অত্যধিক বৃষ্টির কারনে নামতে না পেরে সোজা ব্যাংকক এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করে। তখন এই টারমিনাল ভবন ছিল প্রায়

www.pathagar.com

১ কিঃমিঃ দীর্ঘ কিন্তু তেমন কোন দোকান পাট ছিলনা। এখন পুরো টারমিনাল ভবনটি রকমারি স্টলেভর্তি। সুইডেনের আরলান্ডা বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে রাত ১২ টার পর থাই ইন্টারন্যাশনাল বিমানে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম চীনদেশের উপর দিয়ে আমরা যাচ্ছি। আমি বিমানে কখনই ঘুমাইনা, বরং টিভি পর্দায় যা দেখানো হয় তাই দেখতে থাকি। বিশাল মানচিত্রের ছবির উপর আমাদের অবস্থান কোথায় তাও মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখানো হয়। এটি আমার নিকট সবচেয়ে আকর্ষণীয় দৃশ্য। এর বেশ কিছুপর দেখি রাশিয়ার উপর দিয়ে যাচ্ছি। মস্কো আর কত দূর সে দূরত্বও জানিয়ে দেওয়া হয়। বিমানের ছোট প্রতিচ্ছবি ঐ বিশাল ম্যাপের মধ্যে চিহ্নিত করা হয়। এভাবে দেখতে দেখতে হটাৎ এক সময় দেখি আমাদের বিমান ইউরোপের জার্মানীর উপর দিয়ে যাচ্ছে আবার বেশ কিছুক্ষন পর দেখান হয় আরলান্ডা পৌছাতে আর কতদূর। এই রূপে সারারাত ঐ সব ছবি দেখতে দেখতে পরদিন সকালে আরলান্ডা বিমান বন্দরে পৌছলাম। আমার স্ত্রীর জন্যে যে হুইল চেয়ার নিয়ে মেয়েটি অপেক্ষা করছিল, তাকে আমরা প্রথমে লক্ষ্য করিনি। ফলে টেলিফোন করে তাকে খবর পাঠালে সে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ে। সে আসাতে আমাদের বেশ সুবিধায় হল। আমার হাতের বোঝাটাও তার হুইল চেয়ারে উঠিয়ে নিল এবং নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে আমাদের পাসপোর্টগুলি জমা দিল। এই বিমান বন্দর অতি সুবৃহৎ আকারের হওয়ায় আমার স্ত্রীর পক্ষে হাটা চলা বেশ অসুবিধা ছিল,সন্দেহ নাই। মেয়েটির নাম অ্যান, অত্যন্ত চমৎকার মহিলা। আমি তাকে বলি, আমার মেয়েকে গোথেনবার্গে একটা টেলিফোন করা দরকার। সে সঙ্গে সঙ্গেই আমার নিকট কিছু ডলার নিয়ে ভাঙ্গিয়ে সুইডিস ক্রোনার করে তা দিয়ে টেলিফোন লাগিয়ে আমর হাতে ফোনের রিসিভারটা ধরিয়ে দেয়। আমি ও আমার স্ত্রী দুজনেই কথা বলে নিই এবং গোথেনবার্গে কখন ল্যান্ড করব তাও জানিয়ে দিই। অ্যান তার ডিউটি অন্য একটি মেয়েকে হান্ডওভার করার পূর্বেই আমদের কিছু ছবি তুলে দেয় আমার ক্যামেরায়। আমিও তার কিছু ছবি তুলি।

আমরা ঢাকা এয়ার পোর্ট থেকে সমস্ত মালপত্র গোথেনবার্গের জন্যে বুক করেছিলাম। যেমন ইতিপূর্বে সুইডেনে প্রথম আসার সময় করেছিলাম। এবারও আমি তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু এই মেয়েটি দিনা আমাকে বলল, মনে রেখ এটা

www.pathagar.com

আরলান্ডা এয়ারপোর্ট। এখানে তোমার সমস্ত মাল পত্র আবার ওজন করা হবে এবং তোমাকে ঘোষণা দিতে হবে যে তোমার নিকট কোন অবৈধ জিনিষ নেই। ফলে সে এমন সুঠাম দেহের অধিকারীনি যে একাই দুটো হুইল চেয়ারে উপবিষ্টা দু'জন মহিলাকে একসঙ্গে ঠেলে নিয়ে চলল। দিনা আমাদের সবমালপত্র নিজেই বেল্ট থেকে নামিয়ে অন্য টলিতে তুলে ওজন করিয়ে তার পর আবার বুকিং দিল গোথেন বার্গের জন্যে। এবং আমাকে জানাল যে বিশ্বের একমাত্র এই আরলান্ডা পোর্টেই এই প্রকারের বিধি বিধান রয়েছে। অথচ এখান থেকে সুইডেনের রাজধানী স্টকহম মাত্র ৪০ কিমি দূরে অবস্থিত। আমাদের যেহেতু আরলান্ডা এয়ার পোর্টে দীর্ঘ সময় থাকতে হয়েছিল তাই সেখানে আমাদের নতুন নাতির জন্য কী কেনা যায় তা নিয়ে অনেক দোকান ঘুরে একটা বাদ্যবাজনা ওয়ালা খেলনা কিনলাম ৯৯ ক্রোনার দিয়ে। আর মোনামীর জন্য কিনলাম এক বক্স মাটনটফি। সেটারও মূল্য হিসেব করলে আমাদের বাংলাদেশী মুদ্রায় অনেক বেশী। বলা বাহুল্য সে সময় এক ক্রোনারের মূল্য বাংলাদেশী মুদ্রায় আট টাকার সমান। আমরা এ পর্যন্ত যত দেশে ঘুরেছি তার মধ্যে বাংলাদেশী মুদ্রার মান সর্বনিম্নে বললে অত্যুক্তি হবেনা।

ঠিক বিকেল ৫ টার মধ্যেই আমরা গোথেনবার্গ এয়ারপোর্টে পৌছেই দেখি রুমী আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। খুব তাড়াতাড়ি মালপত্র একটি ট্রলিতে উঠিয়ে নিয়েই বাইরে পার্কিং তার নতুন কেনা বড় সাদা গাড়ীতে উঠিয়ে নেয়। শাহীন তার ছেলেকে কোলে নিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল মোনামী সহ। আমরা তার মাত্র কয়েক মাসের ফুটফুটে ছেলেটাকে নিয়ে কিছুক্ষণ আদর করলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই বাবাজান রুমী গাড়ী ছেড়ে দিল তার বাসার উদ্দেশ্যে। এবারও চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যেই আমরা দীর্ঘ ৩৫ কিমি পথ পেরিয়ে তার বাড়ীর নিকট যখন পৌছালাম তখনও সন্ধ্যা হতে অনেক বাকী। সুইডেনের সময় বড় মজার ব্যাপার। গ্রীষ্মকালে এত দীর্ঘ দিন যে সকাল ৮টায় যেমন সূর্য দেখা যায় তেমনি রাত ৮ টাতেও সূর্য দেখা যায়। অর্থাৎ ১৮/১৯ ঘন্টা মত দীর্ঘ হয় দিন। পক্ষান্তরে রাত্রির দীর্ঘতা হয় মাত্র ৫/৬ ঘন্টা মাত্র। অবশ্য পৃথিবীর প্রায় উত্তর গোলার্ধে এর অবস্থান জনিত কারণেই এমনটা হয়। ফজরের নামাজ পড়ার পর দেখি সূর্য কেবল মাত্র উকি ঝুকি মারছে। কিন্তু রক্তাভ লাল আভা কাটিয়ে সাদা ঝক ঝকে হতে বেশ দীর্ঘ সময়

www.pathagar.com

পার হয়ে যায়। দুপুরের নামাজ যদিও ২টা থেকে ৩টার ভিতর পড়া যায়। কিন্তু আসরের নামাজ পড়তে হয় রাত ৮টায়। মাগরিবের নামাজ আমরা সেখানে পড়েছি রাত ১০-৩০ মিনিটে এবং এশার নামাজের সময় হয় রাত ১১-৪৫ মিনিটে। এই রাত বলছি বটে তবে আকাশে সূর্য থাকা পর্যন্ত দিন বলাই ভাল। ইংরেজিতে এএম আর পিএম ব্যবহারের মাধ্যমেই সময়ের প্রকার ভেদ বুঝে নিতে হবে।

এবার সুইডেন যাওয়ার কদিন পরই আমি ইউরোপের যে সব দেশের ভিসা পেয়েছিলাম সে গুলিতে কীভাবে কম খরচায় যাওয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করি। অবশ্য আমি আমার যাবতীয় ডলার সবগুলিই আমার মেয়ের নিকট জমা রাখি যাতে প্রয়োজনবোধে সেখান থেকে খরচ করতে পারি। প্রথমেই আমরা চেষ্টা করি রেলের মাধ্যমে দীর্ঘ সফরসূচী তৈরী করে কনসেশন পাওয়া যায় কিনা? কিন্তু রেলকর্তৃপক্ষ যখন দেখল যে আমার কোন সুইডিস নাগরিকত্ব নেই, তখন তারা বলল, অন্ততঃ ছয় মাস অপেক্ষা করার পর আমরা দেখব কনসেশন দেওয়া যায় কিনা। আমাদের ভিসা ছিল মাত্র মাস ছয়েকের। বিধায় ও চিন্তা বাদ দিয়ে অন্যভাবে দেশ ভ্রমনের সুযোগ সুবিধা খুঁজতে থাকি। ইতোমধ্যে আমার জামাই রুমী তাঁর নতুন গাড়িতে গোথেনবার্গ থেকে প্রায়ই এদিক ওদিক গিয়ে আমাদের নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এবার থ্রোল হাসানে গিয়ে এক নুতন বাঙ্গালী পরিবারের নিকট আমাদের নিয়ে যাওয়া হল, পূর্ব নিমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে। তারাও অতি চমৎকার ভদ্র পরিবার। যেমন ইতিপূর্বে আমরা ড. বাবুল আনাম, মেজর মনসুর এবং ডাঃ সেনকে পেয়েছিলাম। এই পরিবারের কর্তাব্যক্তি ইউনুস সাহেব। তাঁরা সেখানে একটি ভিলাতে থাকেন। অর্থাৎ নীচে ড্রইং ডাইনিং এবং উপরে দুতিনটি বেড় রুম রয়েছে। উপরে ও নীচে মিলে একটি করে টয়লেট রয়েছে মোট দুটি। আমাদের সঙ্গে এবার মেজর মনসুরের পরিবারও ছিলেন।

গোথেনবার্গ থেকে প্রায় দেড়শ কিমি দুরে এই শহর। ইউনুস সাহের দীর্ঘ দিন ধরে এখানে বসবাস করছেন। তার স্ত্রীও দুই ছেলে বর্তমান রয়েছে এবং বড় ছেলে ডাক্তারী পড়ছে। ইউনুস সাহেবের পরিবারও ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশ ঘুরেছেন তাদের ভ্রমনের অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট রয়েছে। ওখানে কারো বাসা বা বাড়ীতে কোন কাজের লোক রাখার নিয়ম নেই বা সম্ভব নয় বলেই অতিথীরাও তাদের গৃহস্থালী

www.pathagar.com

কাজে চট করে হাত বাড়িয়ে দেন খোলামনে আনন্দচিত্তে। মনুসর পরিবারও এখানে এসেই কাজে নেমে গেলেন। ইতোমধ্যে ইউনুস সাহেব তার গাড়ী বের করে আমাকে ও রুমীকে সঙ্গে নিয়ে বেশ লংড্রাইভে দেখালেন পূর্ব ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম হ্রদ যা দেখতে একটা সাগরের মতই মনে হল এপার থেকে ওপার কেবল পানি আর পানি এছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হলনা। একটি হ্রদ যে এতবড় হতে পারে তা বাস্তবিকই না দেখলে বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমি বেশ কিছু ছবি তুললাম ঐ এলাকার নানা আঙ্গিকে। ইউনুস সাহেবও আমাকে খালুজান সম্বোধনে একাত্মতার স্বাদ বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বেশ শিক্ষিত ও বহুদর্শী ব্যক্তি হিসেবে আমার নিকট প্রতীয়মান হল। অত্যন্ত মিশুক ও সাদালাপী মানুষ।

এই শহরেই একস্থানে বছরে মাত্র একবার কৃত্রিম জল প্রপাত দেখানো হয় তখন বহুদূর থেকে অনেক লোক এসে এটা দেখে ছবি তুলে ও ভিডিও করে বেশ আনন্দ পান। এমন এক সময় ইউনুস সাহেব আমদের পুনরায় আমন্ত্রণ করেন এই কৃত্রিম জলপ্রপাত দেখার জন্যে। আমরা তার দাওয়াত গ্রহণ করে সেখানে গিয়ে দেখি বহু লোকের সমাগম ঘটেছে সকলেই নিজেদের সুবিধামত জায়গা বেছে নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় ক্যামেরা ফিট করে রেখেছেন। আমরাও একটা ব্রীজের উপর দাঁড়িয়ে চমৎকারভাবে জল প্রপাত ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জলস্রোতের ছবি উঠালাম। ভিডিও করল রুমী। সেই উত্তাল জলস্রোত ছোট বড় নানা আকারের পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের সেই ব্রীজের নীচে দিয়ে গিয়ে দু'পশে সুউচ্চ পাহাড়ের মধ্যদিয়ে আপন গতিতে একটা নদীর মত বয়ে গেল। প্রায় ঘন্টা খানিকের মত এই প্রকার জলধারা পর পর তিনটি গেটের ভিতর থেকে ছেড়ে দেওয়া হয় প্রবল বেগে। কিন্তু আশ্চর্য হলাম যে, এত বিশাল জলরাশি কোথায় কেমন ভাবে আটকে রাখা হয়েছিল তা বুঝতে পারলাম না আমি। বিকেল বেলার চমৎকার আবহাওয়ায় এই দৃশ্য দেখে আমরা অভিভূত হয়েছিলাম বৈকি।

অন্য একস্থানে গিয়ে খুবই মজার একদৃশ্য দেখলাম। অনেক নীচ থেকে ছোট ছোট জলযান কেমন করে কৌশলের মাধ্যমে একেবারে প্রায় ১০০ ফুট উপরে আমাদের হাতের নাগালের মধ্যে তুলে আনা হচ্ছে। মাত্র দুতিন জন ছেলে মেয়ে বা পরিনত বয়সের পুরুষ ও মহিলা এ কাজটা অনায়াসে এ অসাধ্য সাধন করছে।

www.pathagar.com

আসলে এ কৌশল টা হল পরপর কয়েকটি গেট বন্ধ করে দিয়ে ঐ জল রাশিকে উপরে তুলে আনা হয় এবং একাজটা করতে বেশ সময়ের দরকার হয়। এভাবে বিশাল জলরাশিকে ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়ে এনে সব ছোট বড় জল যান গুলিকে বামদিক থেকে ডান দিকে পার করে দেওয়াহয়। এটা আবশ্য কোন খেলা নয়। বহুদূর দেশ থেকে যে নৌযান গুলি এখানে আসতে চাই তাদের ক্ষেত্রেই কেবল এটি করা হয়। এবং এটি করতে যে প্রচুর খরচা হয় তাও লক্ষ্য করার মত। উভয় দিকের জল রাশির উচ্চতা এক নয় বলেই এই বিশেষ কৌশলে বিশাল আকৃতির লোহার গেটগুলি কখন খোলা কখন বন্ধ রেখেই এই প্রক্রিয়া চালু রাখতে হয়েছে সুইডিস সরকারকে ওখানে বেশ কতকগুলি ব্রীজের গেট বিদ্যুতের সাহায্যে বন্ধ বা খোলা রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ কোন কোন ব্রীজ মধ্যখান থেকেই দুভাগ হয়ে যায় তখন গাড়ী চলাচল বন্ধ। আবার একত্র হয়ে গেলেই গাড়ী চলাচল করতে পারে এটা দেখতেও বেশ মজার ব্যাপার। ইউনুস সাহেবের বাড়ীতে প্রচুর উপাদেয় খানাখাদ্য খেয়ে তবেই আমাদের ছুটি। সমস্ত ইউরোপে রাত ও দিনের কোন পার্থক্য নেই। দিনের বেলাতেও প্রতিটি গাড়ীর বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হয় রাতের মতই। কেননা, যেকোন সময়ে কুয়সাচ্ছন্ন হতে পারে যে কোন এলাকা। ফলে দুর্ঘটনা ঘটতে মোটেই বিলম্ব হয়না। তাছাড়া সেখানকার রাস্তা এতই ভাল যে ১৫০-১৮০ কিমি পর্যন্ত বেগে গাড়ী চালান সম্ভব। অবশ্য রাস্তার অনেক স্থানে স্পীড লিমিট লাগিয়ে রাখা আছে। পথে সুদীর্ঘ যাত্রায় কোথাও কোন মানুষ বা পশুকে আমি দেখিনি রাস্তার উপর বা পাশে চলাচল করেছে।

আমি প্রতিটি জুম্মার নামাজ পড়ার জন্যে অনেক দূরে বাক্কা প্লনে BACKAPLAN যেতাম এবং তুর্কীদের ভাড়া করা একটা বিল্ডিং এ বেশ বড় জামাতের সঙ্গে নামাজ আদায় করতাম। প্রথম প্রথম আমাকে রুমী নিয়ে যেত। পরে আমি একাই বাসে করে যেতাম। সুইডিস শব্দ বা নামের উচ্চারণ বড়ই বিদঘুটে যা সহজে মনে রাখা যায়না। অথচ ইংরেজি অক্ষরের সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে। এদিকে আমাদের ভিসার মেয়াদ প্রায় শেষ অথচ এবার আমি ইউরোপের কটি দেশ দেখার উদ্দেশ্যেই এসেছি। অতএব পুনরায় ভিসা বাড়ানোর জন্যে আমি ও শাহীন বেরুলাম ভিসা অফিসের সন্ধানে। অনেক খোজাখুঁজির পর সন্ধান মিলন। আমি ও শাহীন

www.pathagar.com

একটি ট্রাম লাইনের ধারে অপেক্ষা করছিলাম। হঠাৎ এক বৃদ্ধামহিলা লাঠি হাতে ট্রাম লাইনের উপর পড়ে যান এবং নিজেই কষ্টকরে আবার উঠে দাঁড়ান। নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিল ৪/৫জন যুবতী তাদের মধ্যে একজন এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করল, পড়ে গেলেন? বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। বুড়ো হয়ে গেছিতো, তাই। সঙ্গে সঙ্গেই যুবতী মেয়েটি বলল, এটা কোন ব্যাপার নয়, যে কেউ পড়ে যেতে পারে। তারা সুইডিস ভাষায় কথা বলছিল বলে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি। কিন্তু শাহীন আমাকে ওদের কথাবার্তা বুঝিয়ে বলল। আমি শাহীনকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, বুড়িটাকে ঐ মেয়েরা যে কেউ উঠাতে তো সাহায্য করতে পারত। তা করলনা কেন? শাহীন বলল, এখানে সহজে কেউ কারো সাহায্য নিতে চায়না। আর সাহায্য কেউ কামনা করলে, অবশ্যই তাকে সাহায্য দান করা হয়।

যা হোক এবার কিন্তু ভিসা বাড়াতে আমাদের দুজনের জন্য ২০০০ ক্রোনার ফি দিতে হল শাহীনকে। অথচ ইতি পূর্বে এ ধরণের কোন ফি লাগেনি। কাউন্টারে তাদের জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে, বহু বিদেশী বিশেষত আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ থেকে সুইডেনে এসে আর কোথাও যেতে চায়না। অতএব, তাদের ভরণপোষণ বাবদ যে বিশাল অংকের অর্থ সুইডিস সরকারকে বহন করতে হচ্ছে, সে বাবদই সামান্য কিছু টোকেন মানি এভাবেই সম্প্রতি নেওয়া শুরু হয়েছে।

আমার নাতনী মোনামীর স্কুলটা মাত্র ২০০ ফুটের মধ্যেই রয়েছে। আমরা তার স্কুলে যাওয়া ও আসা প্রায়ই লক্ষ্য করতাম ঘরের জানালা থেকে। স্কুলের সঙ্গেই রয়েছে খেলার মাঠ। আমি কৌতুহল বশত" তার স্কুল দেখার জন্যে তার সঙ্গেই স্কুলে গেলাম। স্কুলে প্রবেশ করেই তাদের শীতবস্ত্র খুলে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। বেশীর ভাগ শিক্ষকই মহিলা, প্রাথমিকভাবে নিম্ন শ্রেণীতে তেমন লেখাপড়ার কোন চাপ নেই বললেই চলে। প্রধানত ছবি বাকা ও স্পেলিং বা বানান শিক্ষা ও সামান্য অংক বিদ্যা ছাড়া বাকীটা সবই খেলার, গোসল করা ও খাওয়ার মহোৎসব। বিল্ডিং এর ভিতরেও প্রচুর খেলার আয়েজন এবং বড় বড় হলের মধ্যে নানা প্রকারের জিমন্যাস্টিকের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশাল কিচেনে দুপুরের খাবারের নানা প্রকার উপাদেয় পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা আছে। আমার নাতনী তেমন কিছুই খায়না বা খেতে চায়না বলে স্কুল কর্তৃপক্ষ কয়েকবার অভিয়োগ পাঠিয়েছে। ফলে, তার স্বাস্থ্য

www.pathagar.com

খুবই হালকা পাতলা ধরণের কিন্তু তার খেলাধুলায় যথেষ্ট এনার্জি আছে। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গেঁ সঙ্গেঁই তাদের লেখাপড়া মানসম্পন্ন আকারের সিলেবাস তৈরী করা হয়। তবে স্কুলে পাশ বা ফেল তেমন কোন ব্যাপার নয়। দেখতে দেখতে প্রায় পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল অথচ আমার টুরের কোন ব্যবস্থা করতে পারছিনা বলে আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমার মেয়ে এটা লক্ষ্য করছিল বেশ তীক্ষ্ণভাবে। একদিন আমি জুম্মার নামাজ পড়তে গেছি বাক্কা প্লনে। মসজিদে বিশেষ দোয়ার সময় আমি আমার ভ্রমনের ব্যাপারে হাত উঠিয়ে প্রার্থনা করি। নামাজ শেষ হতেই নীচে নেমে এসে দেখি রুমী আমাকে নিতে এসেছে। আমার কাছে একটা মোবাইল ফোন দিয়ে রেখেছিল শাহীন। রাস্তায় যেতে যতেই দেখি ফোন এসেছে এবং আমার মেয়ে বলল, আব্বা আমি আপনার জন্যে প্যারিস ভ্রমনের বুকিং দিয়ে দিলাম কিছুক্ষন পূর্বে। অতএব আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসেন। আজ বিকেল চারটার মধ্যেই ওদের অফিসে গিয়ে পেমেন্ট করতে হবে। ঠিক তাই করা হল, বাসরুটে ২৪ ঘন্টার যাত্রা গোথেনবার্গ টু প্যারিস। প্রথমে সেফেলবাস আমাকে নিয়ে যাবে ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন। সেখান থেকে অন্য বাস সানিটুরস। তখনই অন্যযাত্রীসহ সমস্ত রাত্রি যাত্রাশেষে পরের দিন প্যারিস পৌছাবে বেলা ১০ টা ৩০মিনিটে। এভাবে যাত্রার দিন তারিখ ঠিক হয়ে গেল এবং কেবল আমিই একা যাব। যেহেতু আমার স্ত্রী তেমন হাঁটতে পারবেন না বলে তিনি যাবেন না। আমার প্যারিস যাত্রার পূর্বের দিন মেজর মনসুর সাহেব সস্ত্রীক আসলেন আমার যাত্রার আয়োজন দেখতে। তারা ইতোপূর্বে প্যারিসসহ ইউরোপের বহুদেশ ভ্রমন করেছেন। বিধায় আমাকেও তাদেঁর সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু টিপস দিলেন। মাত্র দিন তিনেকের ভ্রমন প্যারিসে। অতএব প্রয়োজন মত সামান্য জামা কাপড় ও সু ছাড়াও একজোড়া চপ্পল নিতে হল। রুমীর চমৎকার একটা ট্রলিব্যাগের মধ্যেই সবকিছু নিলাম । আমার ক্যামেরা, বাইনোকুলার ইত্যাদি নিয়ে এক শুভ দিনে বাবাজান রুমী তার গাড়ীতে গোথেনবার্গ রেলষ্টেশন সংলগ্ন বাস ষ্ট্যান্ডে আমাকে তুলে দিয়ে এল। ঠিক ১০ টা ৪মিনিটেই বাস ছাড়ল। ইউরোপীয়নদের সময় জ্ঞান খুবই টন টনে। কিন্তু বাস ৫/৭ মিনিট চলার পরই এক মহিলা তার মোবাইলে ড্রাইভারকে জানাল যে, সে বাসে উঠতে পারেনি অথচ তার লাগেজ রয়ে গেছে বাসে। সম্ভবত

www.pathagar.com

এটি এক তুর্কীমহিলা। ড্রাইভার একটু হাসল এবং তার পরই গাড়ীটা ঘুরিয়ে অন্য পথে ফিরে আসল বাস ষ্ট্যান্ডে। এরা সব ডেনমার্কের যাত্রী। একমাত্র আমিই ছিলাম প্যারিসের যাত্রী। আমি ড্রাইভারের ঠিক পেছনের সিটে বসেছিলাম। কোপেনহেগেন শহরে প্রবেশ করার সময় আমি লক্ষ্য করলাম ৫ মিনিট বিলম্বে যাচ্ছি আমরা। আমি চালককে মনে করিয়ে দিই ব্যাপরটা। সে বলল, আমি ঠিক সময়েই যাচ্ছি। সত্যিই দেখি একটি নির্দিষ্ট স্থানে সানিটুরস বাসটি কেবল মাত্র আমার জন্যেই অপেক্ষা করছে। এই গাড়ীর চালকের পোষাক-আশাক দেখে পাকিস্তানের বিমান পি আই এ এর ক্যাপ্টেনদের কথা মনে পড়েছিল। সে আমার কাগজ পত্র মিলিয়ে নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ছেড়েছিল। তার পর শুরুহল ডেনমার্কের আরও অনেক যাত্রী স্থানে স্থানে গিয়ে তাদের উঠিয়ে নেওয়া। ডেনমার্ক অর্থনৈতিকভাবে সুইডেনের চেয়েও বোধ করি বেশ উন্নত। ফলে সেখানকার অধিবাসিরা যথেষ্ট ভ্রমনলিপ্সু বলে আমার মনে হয়েছে।

কোপেনহেগেনে একটি সমৃদ্ধ সমূদ্র বন্দর ও বিমান বন্দর আছে এখান থেকে পৃথিবীর সর্বত্র যাওয়া যায়। যৌনমুক্ত (Sex Free) দেশ হিসেবেও এর সমধিক পরিচিতি আছে। জাহাজ তৈরী এবং ডায়েরী ফার্মের জন্যেও এর বিশ্বজোড়া খ্যতি আছে। বাসের সব যাত্রীদের লক্ষ্য করে বুঝতে পারলাম এরা সুইডিশদের মত অতটা চুপচাপ থাকতে ভালবাসেনা বরং আমাদের গ্রামের মুখরা মেয়েদের মত এরাও বিশ্রম্ভালাপ করতে বেশ পটু। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হল যে, সকল বয়সের পুরুষ ও নারী গাড়ী ভর্তি। আমি তারা স্বামী স্ত্রী কিনা জিজ্ঞাসা করায় প্রায় প্রত্যেকেই স্বচ্ছন্দ ভাবেই স্বীকার করেছে যে তারা একে অপরের বয় ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড। একমাত্র বুড়ো বুড়ি ছাড়া স্বামী বা স্ত্রীসহ কেউ তেমন ভ্রমন করেনা। ধর্মের কোন বালাই তাদের মধ্যে অদৌ বর্তমান আছে কিনা সন্দেহ। অতএব খাও, পর এবং ফুর্তিকর Eat, Drink & Marry এটাই তাদের প্রধান ধর্ম। অবশ্য অত্যন্ত পরিশ্রমী ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় তারা কোন কাজকেই অবহেলা বা অবজ্ঞা করেনা। এ পৃথিবীর রুপ রস, সৌন্দর্য সবটুকুই যেন তাদেরই প্রাপ্য।

পথে একস্থানে গাড়ী থেকে নেমে আমরা সকলেই একটি ভাল রেস্টুরেন্টে গিয়ে রাতের ডিনার খেয়ে নিই । আমার স্বভাবসিদ্ধ কৌতুহল বশত: আমি তাদের নিকট

www.pathagar.com

স্থানের নাম, নদীর নাম, ইত্যাদি জানতে চেয়েছি। কিন্তু তারা কেউ কোন জবাব দিতে পারেটি একমাত্র গাড়ীর চালক ছাড়া। রাতে মুবার জন্যে চালক ও তার সহযোগী মিলে সমস্ত গাড়ীর সিটগুলিকে বেডেরন্যায় করে ফেলে অল্প সময়ের মধ্যেই। এবং ট্রেনের থ্রী টায়ারের মত তিন থাকে জোড়ায় জোড়ায় শুবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে কোন বেড বরাদ্দ নেই দেখে আমি অবাক হলাম। চালক আমাকে জানাল যে, তোমার শুবার জন্যে কোন বুকিং ফি দেওয়া হয়নি। আমি তখন আমার নগদ ১০০ ক্রোনার দিয়ে বলি দয়া করে আমার জন্যে একটু ব্যবস্থা করো। চালক বলল দেখি কী করতে পারি তোমার জন্যে। পরিশেষে সীটের নীচে আমার স্থান হল। আমি তড়িঘড়ি শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু কিছুক্ষণ পর চালক আমাকে জানাল, আরও দুজনের স্থানের অভাব। অতএব তোমাকে ডাবলিং করতে হবে। আমি এই জিনিষটা অত্যন্ত অপছন্দ করি বলে, আমি চালককে অনুরোধ করে বলি, দেখ আমি বৃদ্ধ মানুষ। দয়াকরে আমাকে একটু একা শুতে দাও। যেহেতু গাড়ীর যাত্রীদের বেশীর ভাগই মহিলা। সেই ভয়ে আমার এই আকুতি। অবশ্য চালক আমার অনুরোধ রক্ষা করেছিল। তাকে অশেষ ধন্যাবাদ জানাই।

পথে যেতে যেতে প্রায় বৃষ্টি লক্ষ্য করলাম। একসময় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ক্লান্ত ভাবে। ভোরের দিকে আবার একস্থানে গাড়ী থামিয়ে সমস্ত যাত্রীদের প্রাতঃ ক্রিয়াদি সম্পন্ন এবং ব্রেকফাস্ট করার পর আবার দেখি যে গাড়ীতে আগের মতই সকলেরই বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পথে একস্থানে চালক আমাদের প্রত্যেককে একটি করে কুপন দিয়েছিল। যা দিয়ে আমরা শীপের ভিতর কেবল মাত্র দামী সিগারেট কমদামে পেতে পারি। আমি তো ধুমপায়ী নই লক্ষ্য করে এক বৃদ্ধ দম্পত্তি আমাকে অনুরোধ করে বললেন, তুমি সিগারেট খাওনা দেখছি। অতএব তোমার কুপনটা আমাদের দিতে পার। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ওটা দিয়ে দিই। মজার ব্যাপার হল যে, ঐ কুপন শীপের ভিতর নির্দিষ্ট দোকান থেকে কেবলই মাত্র দামী সিগারেট ছাড়া অন্য কিছুই কেনা যাবেনা এবং সেটা কমদামে পাওয়া যাবে।

www.pathagar.com

দ্বাত্রিশ পর্ব

ফ্রান্স

রাজধানীর নাম	ঃ	প্যারিস (Paris)
জনসংখ্যা	ঃ	৫৬.২ মিলিয়ন
স্থল ভাগের সীমানা	ঃ	৫,৫১,৫০০বর্গ কিঃমিঃ
মুদ্রার নাম	ঃ	ফ্রেঞ্চ ফ্রাঁঙ্ক (French)
ভাষা	ঃ	ফ্রেঞ্চ
জিডিপি (মাথাপিছু)	ঃ	২০,২০০ ইউ,এস,ডলার
গড় আয়ু	ঃ	৭৭ বছর

প্যারিসে প্রবেশ করার উপকণ্ঠে দেখি গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। তখন সকাল ৯টা বাজে। আরও ঘন্টা দেড়েক পর অর্থাৎ ঠিক ১০ টা-৩০ মিনিটে প্যারিসের মূলভূখন্ডে মৌলিণ Moulin-Rouge তে গিয়ে বাসটা থামল। গাড়ী থামার সঙ্গে সঙ্গেই একজন টুরিস্ট গাইড প্রথমে ডেনিশ এবং পরে ইংরেজিতে আমাদেরকে তার সঙ্গে গিয়ে নির্ধারিত হোটেলে উঠার জন্যে আবেদন জানাল। আমরা তাকে অনুসরন করে হোটেলে উঠলাম দুভাগে দুটি হোটেলে, বেশ কাছাকাছি গাইড আমাদের সকলকে জানিয়ে গেল যে, সে বিকেল ৪টার সময় এসে আমাদের সকলকে নিয়ে প্যারিসের প্রধান কতকগুলি স্থান দেখাবে। অতএব, আমরা যেন সেইমত তৈরী হয়ে থাকি। হোটেলে কেবলমাত্র ব্রেকফাস্ট ছাড়া অন্য কোন খাবার দেওয়া হয়না। আমি একটা সিংগল রুম পেয়ে সেখানে উত্তমরূপে গোসল সেরে নিলাম এবং নিকটস্থ একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার খেলাম। বিকেলে ঠিক ৪টার সময় গাইড এসে আমাদের প্রত্যেকের নিকট থেকে ৩৭.৫০ ইউরো নিল, আমাদের প্যারিস ভ্রমনের এবং সন্ধ্যার পূর্বেই একটি হোটেলে নিজেদের পছন্দমত খাবার খাওয়ার জন্যে। গাইডের নিজের দেশ হচ্ছে ডেনমার্ক। কেবলমাত্র আমার জন্যেই তাকে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করতে হচ্ছিল। সে আমাদের প্রথমেই নিয়ে গেল মেট্রো ট্রেনে করে নটারডাম ক্যাথেড্রাল দেখাতে। মাত্র ১.৩০ ইউরো ভাড়া। পথে যেতে যেতে চীফ জাস্টিসের সরকারী ভবন। বিশাল এলাকা নিয়ে ভবনের মাথায় ফ্রান্সের জাতীয় পতাকা উড়ছে পত্ পত্ করে। এরই কাছাকাছি পুলিশের হেডকোয়াটার। এভাবে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের কিছু

www.pathagar.com

কিছু বর্ণনা দিয়ে প্রকান্ড চত্ত্বরের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে বিখ্যাত নটারডাম ক্যাথেড্রাল। অতি সুউচ্চ একতলা ভবন, যার মাথার উপর বাবা হজরত আদম (আঃ) এর মূর্তি থেকে হজরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত প্রধান প্রধান নবীদের মূর্তি পাশাপাশি সাজান আছে। অনেক ছবি তুললাম। গাইড এইসময় আমাকে বলল যে তুমি ভিতরে গিয়ে দেখবে গভীর নিরবতা। সেখানে অনেক বসার আসন আছে। অতএব, তুমি যদি এস্থানে বসে মনে মনে তোমার কোন মনোবাসনার জন্যে কামনা কর তো তা ফলতে পারে। আমি তখন তাকে বলি তুমিও চল আমার সঙ্গে। সে বলে আমাদের প্রবেশ করার কোন অনুমতি নেই একমাত্র টুরিস্ট ছাড়া। কিছু কিছু ইরাকী ছেলে মেয়েও ছিল আমাদের সঙ্গে। সাদ্দামের ভয়ে তারা দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে। আমি ভিতরে প্রবেশ করে দেখি কোন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানও নেই। শত সহস্র মোমবাতি ছাড়া অন্য কোন আলোর ব্যবস্থা নেই কোথাও। কেবল মাত্র পায়ে চলার শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। অতি উচেচ বিভিন্ন রং বেরঙ্গের বিশাল আকৃতির কাঁচ লাগান আছে। ভিতরে অতিপ্রশান্ত স্থান। আমি গাইডের কথামত একটি স্থানে গিয়ে বসে রইলাম নীরবে। ভাবছি কী কামনা করব? আমার নিজের জন্যে তেমন কিছুই চাওয়ার নেই। হঠাৎ আমার ছোট ছেলে ফাহিমের জন্যে তার মনমত একটা সুন্দরী বধু কামনা করা যেতে পারে হয়ত। ব্যস, এরপরই আমি চর্তুদিক ঘুরে ফিরে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ভিতরে এবং বাইরে প্রচুর ছবি তুললাম। গাইড আমাদের জন্যে একটি গাছের বেদীতে বসে অপেক্ষা করছিল। এরপর আরও কিছুদূর গিয়ে একটি গাছ দেখাল যার বয়স পুরো ৪০০ বছর। গাছের নীচে লেখা রয়েছে ১৬০২ সাল। আমরা গেছি তখন ২০০২ সাল। গাছটা খুব বেশী বড় নয়। কেবল কান্ডটা ছাড়া অতি সামান্য কিছু পত্র পল্লব রয়েছে মাত্র। সেটাকেই অতি যত্ন সহকারে রক্ষা করা হয়েছে। এর নিকটেই ছিল সেক্সপিয়ারের বুকস্টল। কেবলমাত্র তাঁর লেখা ছাড়া আর কোন লেখকের বই সেখানে নেই।

এভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমরা একটা গলিপথের ধারে একটা বহু পুরানো বিল্ডিং এ পৌছালাম। গাইড প্রথমেই তার তৈরী করা একটা মেনু আমাকে দেখিয়ে বলে তুমিই পছন্দ কর কোনটা খাবে। আমি তাকে পাল্টা প্রশ্ন করি তোমার পছন্দ গুলি আমাকে দেখাও। আমি দেখে বুঝতে পারলাম যে, সেখানে মদ বা পর্ক জাতীয় কোন খাবার নেই। তখন আমি তাকে বলি যে তোমার পছন্দই আমার পছন্দ। আমরা প্রায় ৪০ জনের মত এই দলে ছিলাম। খাবারের অর্ডারের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই একে একে সব খাবার উপস্থিত করা হল। আমি বসলাম গাইডের মুখোমুখি উদ্দেশ্য সে যেভাবে খায় ঐভাবেই আমাকেও খেতে হবে। প্রথমে ছিল মিকস্ট সালাত একপ্লেট ভর্তি। সেখানে শসা, গাজর কফিপাতা, লেটুস পাতা

www.pathagar.com

টমেটো ইত্যাদি যাবতীয় সবজি কাঁচা তাজা অবস্থায় কাঁটা চামচের সাহায্যে খেয়ে ফেললাম। বেশ ভালই লাগল খেতে দেখেছি। এর পর অন্যান্য খাবার খেয়ে রীতিমত রাতের ডিনার হয়ে গেলে পুরোদমে। অনেকক্ষনণ ধরে খাওয়া পর্ব চলতে থাকে। বুঝতে পারলাম এমন একটি ছোট হোটেলে এর চেয়ে উত্তম খাবার এবং সস্তায় আর কোথাও বোধকরি সম্ভব নয়। গাইডের এটা পূর্ব পরিকল্পিত হোটেলও বটে। অতি পুরানো বিল্ডিং-এ এই হোটেল।

এবার আমাদের যাত্রা শুরু হবে নৌকা ভ্রমনে রাতের প্যারিসের সৌন্দর্য (Paris by night) দেখা। তখন রাত প্রায় ৮টা। দেড় ঘন্টা জুড়ে ৩৬টি ব্রীজের নীচে দিয়ে নৌকা পথে আইফেল টাওয়ার পর্যন্ত গমন।

নৌকা ভ্রমনের সময় একটি মেয়ে লেকের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত উল্লেখ্যযোগ্য দর্শনীয় স্থানগুলির বর্ণনা দিচ্ছিল দুটি ভাষাতে। একটি ফরাসী ভাষা এবং অন্যটি ইংরেজিতে। ধারা বর্ণনা শুনতে বেশ ভাল লাগছিল। আবহাওয়াটাও বেশ চমৎকার ছিল। একটু শীত শীত ভাব, অনেকের গায়ে জ্যাকেট ছিল। মোটর বোট থেকে সার্চ লাইট ফেলে ঐ সমস্ত দর্শনীয় স্থান গুলিকে আরও ফুটিয়ে তুলেছিল। বোটে ছাদের উপর অনেক চেয়ার ছিল বসার জন্যে। আমি প্রায় সর্বক্ষণ গাইডের কাছাকাছি থেকে মাঝে মধ্যে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় প্রশ্ন করে জেনে নিয়ে আমার কৌতুহল মিটানোর চেষ্টায় ছিলাম। বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. অ্যালবার্ট আইনস্টাইন তাঁর একটি বিখ্যাত উক্তি ছিল, The important thing is never to stop questioning. অর্থাৎ গুরত্বপূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে কখন প্রশ্ন করা বন্ধ করবেন না। হয়ত বিংশ শতাব্দীর সেরা মানুষ হিসেবে তাঁর এই মন্তব্যটা আমার মধ্যে প্রায়ই কাজ করত বিশেষত ভ্রমনের সময়। প্যারিসের প্রধান দর্শনীয় স্থান আইফেল টাওয়ার পর্যন্ত মোটর বোট আমদের নিয়ে গিয়ে ফিরে আসে আবার ঐ ৩৬টি ব্রীজের নীচে দিয়ে। গাইড আমাদের হোটেলে পৌঁছে দেবার সময় আমি তাকে ব্যক্তিগত কিছু প্রশ্ন করেছিলাম। যেমন প্যারিসে তার আসল পেশাটা কী? সে বলল, আমি নাচের মাস্টার এবং প্রতি সপ্তাহে না হলেও মাসে ২/৩টি প্রোগ্রাম থাকে টুরিস্টাদের নিয়ে প্যারিস দেখানো। এতে সে যা পায় তা খুব একটা বেশী নয় বুঝলাম। মাঝ বয়সী মানুষ এবং বেশ উৎফুল্ল প্রকৃতির লোক। সে বলল আজই তোমাদের সঙ্গে আমার প্রোগাম শেষ। অতএব, আগামী কাল থেকে তোমরা নিজেরাই এই শহরের যাবতীয় দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে ফিরে দেখে নিবে।

রাতে খাওয়ার তেমন কোন গরজ ছিলনা বলে, আমি আমার রুমে নামাজ পড়ে শুয়ে পড়ি। টিভি,ফোন সবই আছে রুমের মধ্যে। আমার মেয়ে শাহীন আমাকে অনুরোধ করেছিল যে, আপনি যখনই যে হোটেলে উঠবেন সেই হোটেলের

www.pathagar.com

টেলিফোন নম্বরটা আমাদের জানাবেন। যাতে আমরা আপনার খোঁজ খবর নিতে পারি সুতরাং আমি শাহীনকে রাতে শোয়ার পূর্বেই কোন নম্বরটা জানিয়ে এবং ঐ দিনের কিছু বর্ণনাও শুনিয়ে দিই। শাহীন তার পর দিন রাতে সুইডেন থেকে ফোন করে আমার খোঁজ রাখত। মাত্র দুটি রাত এবং তিনটি দিন ছিলাম প্যারিসে। সেখানে থাকার সময় প্যারিসের বহু ঘরবাড়ী দেখে আমার কলকাতার কথা খুবই মনে পড়ত। সে আমলে যে সব স্থাপত্য প্রকৌশলীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল কলকতায় এখানেও তার বহু মিল লক্ষ্য করেছি। তবে প্যারিসের রাস্তা গুলি অত্যন্ত দীর্ঘ এবং সোজা। পূর্ণ পরিকল্পিত শহর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

পরের দিন সকালে হোটেলে ব্রেকফাস্ট সেরেই বেরিয়ে পড়লাম। আমি যেহেতু কিছুই চিনিনা, উপরন্তু আমার কোন সঙ্গী সাথীও নেই ভেবে ডেনিশ দু'জন ভদ্রলোকের পিছু নিলাম। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর বুঝলাম আমাকে তাদের সাথে নেওয়ার তেমন ইচ্ছা নেই। পুনরায় অনেক দূর হেঁটে গিয়ে আবার ফিরে এলাম আমার হোটেলে। সেখানকার মেয়েটি আমাকে ফরাসী ভাষায় টুরইফেল যাকে ইংরেজিতে আমরা বলি আইফেল টাওয়ার যাওয়ার জন্যে বাসের কথা বলে। আমি বাসে গিয়েই ১.৩০ ইউরো ভাড়া মিটিয়ে চালককে বলি আমাকে আইফেল টাওয়ারের নিকট নামিয়ে দিলেই চলবে। সে ঠিক স্থানে আমাকে নামিয়ে দেয় এবং বলে সামনের বিল্ডিংটার পরই তুমি টাওয়ার দেখতে পাবে। আমি সেভাবেই এগিয়ে গিয়ে দেখি প্যারিসের প্রধান সিম্বল আইফেল টাওয়ার (Eiffel Tower) ১৮৮৯ সালে ওয়াল্ড ফেয়ারের সময় তৈরী করা হয় এই টাওয়ার। সর্বমোট ১০৫০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই টাওয়ার তৈরী করতে ১৫,০০০ খন্ড লোহার টুকরা ব্যবহার করা হয়েছে। এর মোট ওজন ৭,০০০ টন মাত্র। তিনটি ধাপে এটা নির্মাণ করা হয়। প্রথম ধাপটির উচ্চতা ১৮৭ ফুট, দ্বিতীয়টি উচ্চতা ৩৭৭ ফুট এবং তৃতীয়টির উচ্চতা ৮৯৯ ফুট। প্রতিটি ফ্লোরেই বার এবং রেস্টুরেন্ট রয়েছে। টাওয়ারের উপর থেকে ৪৫ মাইল পর্যন্ত দেখা যেতে পারে। আমি সেখানে গিয়ে দেখি প্রচুর লোক এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। যেমন ইংল্যান্ড, ব্রাজিল, ইন্ডিয়া, পকিস্তান। দীর্ঘ লাইনের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়াতেই আমাকে একটি মেয়ে ভিতর থেকে আঙ্গুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে দু'টি না একটি। আমি একটি বলায় সে একটি টিকিট আমাকে ধরিয়ে দেয়। আমি দ্বিতীয় ধাপে লিফটে উঠার পর বুঝতে পারি যে, তৃতীয় ধাপের জন্যে আর একটি টিকিট লাগে। যা হোক সেখানে টিকিট কিনে তবেই তৃতীয ধাপে সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠলাম। তখন কিন্তু উঠার সময় সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠেছিল। সেখানে দেখলাম ভিতরে একজন ডাক্তার বসে কারো কারো হার্ট এবং পালস্ দেখছেন। আমার সঙ্গে ক্যামেরা ও বাইনোকুলার ছিল।

www.pathagar.com

কিন্তু খালি চোখেই অনেক কিছু দেখতে ভাল লাগছিল। ক্যামেরার ফিল্মটা হঠাৎ করে জড়িয়ে যাওয়ায় সেখান থেকে কোন ছবি তুলতে পারিনি। বহু লোক একসঙ্গে দাঁড়াবার বা ঘুরাফিরা করার জন্যে অনেক প্রশস্ত স্থান রয়েছে উপরে অথচ নীচের থেকে তা বুঝার কোন উপায় নেই। রাতের বেলা আকাশের বহু দৃশ্য দেখার জন্যে অনেক দূরবীন ফিট করা আছে।

আপাদমস্তক সোনালী রঙ্গের পলিথিন জাতীয় কভারে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে আছে ভিখারী। সম্মুখে রাখা আছে একটি পাত্র। সে নারী না পুরুষ কিছুই বুঝার উপায় নেই বাইরে থেকে। কেউ কিছু দিলে সে বো করে বা সম্মুখে ঝুঁকে অভিবাদন জানায়। ছোট ছেলে মেয়েরা সময় সময় তাকে পেটের কাছাকাছি অল্পমৃদু খোঁচা দেয় হাত দিয়ে। তবু সে নিশ্চল ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে প্রচন্ড রৌদ্রের মধ্যে ঘন্টার পর ঘন্টা। আমি তার ঐ অবস্থায় ছবি তুলেছি এবং কিছু পয়সা দিয়ে যখন বো করল তখনও আবার ছবি তুলি। সে নিজে ভেতর থেকে সব দেখতে পায় বুঝা গেল। আমি এমন ধরণের ভিখারী ইউরোপের অন্য কোন স্থানে দেখিনি। ফ্রান্সের পছন্দীয় রং মনে হয় সোনালী এবং সবুজ। এই দুটি রং বহুস্থানে লক্ষ্যনীয়ভাবে আমার চোখে ধরা পড়েছে। একটি মরক্কোবাসী ছেলে মেয়ের দোকান থেকে একটি বই All Paris কিনলাম ৯ ডলারে এবং আইফেল টাওয়ারের হুবুহু প্রতিকৃতি কিনলাম তিনটি তিন রকমের। দুটি সোনালী এবং একটি কাল স্টীলের তৈরী। আমার ভ্রমনের সময় ইউরো এবং ডলার সমান মূল্যমানের ছিল।

এবার দুপুরের খাওয়ার জন্যে পথের ধারে প্রচুর খাবারের দোকান যা বাইরে ফুটপাতের উপর পর্যন্ত বিশাল ছাতার নীচে টেবিল চেয়ার বসে খাওয়া যায়। আমিও একটা স্থানে দাঁড়িয়ে একজন ওয়েটারকে ইশারায় ডাক দিলাম। সে আমার কাছাকাছি না এসেই কী প্রয়োজন জানতে চাইল। আমি মাত্র কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করছিলাম, হারাম হালাল খাবারের কথা। সে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, O you have no choice বলেই যে চলে গেল আর আসেনা। আমি তাকে আর একবার তার দৃষ্টি আকর্ষন করতেই সে বলে উঠল, I have no time. আমি তখন বুঝলাম এখানে আমার খাওয়া হবে না। আমি আর একটি দোকানের বাইরে ছাতার নীচে টেবিলের সম্মুখে বসে এক ওয়েটারকে ডেকে অর্ডার দিলাম ফ্রায়েড চিকেন, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং স্প্রাইট। খাওয়া শেষে সে দুটো বিল দিল আমাকে একটা বিল ৯ ডলার এবং অন্যাটা ৫ ডলার। মোট ১৪ ডলার মিটিয়ে দিয়ে আবার একটা জাদুঘর ওরসে (orsay Museum) দেখার জন্যে চললাম। হেঁটে হেঁটেই বেশী ঘুরেছি প্যারিসে। পথে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, যে বইটি আমি কিনেছিলাম ৯ ডলার

www.pathagar.com

দিয়ে সেই প্যাকেটটি নেই। মনটা খারাপ হয়ে গেল। ঐ জাদুঘরে ঘুরতে ঘুরতে দেখি সেখানেও একটি লাইব্রেরীতে বই বিক্রি হচ্ছে। আমি আবার ঐ বইটি কেনার জন্যে ঢুকলাম সেখানে। এক ভদ্রলোককে বইটির নাম বলতেই তিনি একটি মেয়েকে ডেকে বললেন দেখতো ইনি কী চান? মেয়েটি আমাকে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল। আমি বললাম (All paris) বইটি আমি চাই। সে বুঝতে না পেরে আমাকে বলে তুমি বানান করে বলদেখি। আমি বানান করা সত্ত্বেও সে বুঝতে না পেরে আমাকে বলে লিখে দাও। আমি লিখলাম সে সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে বলে উঠল, "ওহ্ অল্ পারিস"। তখনই সে ছুটে গিয়েই বইটি এনে আমার হাতে দিল। বুঝলাম সামান্য উচ্চারণে তারতম্যের কত বিভ্রান্তি। আমরা ইংরেজিতে প্যারিস বললেও তারা বলে পারিস। এবার কিন্তু তারা দাম নিল ১০ ডলার নিউ ইংলিশ এডিশন বলে। এখানে বহু ভাষায় একই বই ছাপা হয় প্রচুর এবং বিক্রিও হয় সেই মত।

এবার হোটেলে ফেরার পথে হঠাৎ করে এক মাওলানা সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর দেশ মরক্কো। দেখতে এবং পোশাক পরিচ্ছদে হুবহু আমার নানাজান সৈয়দ শাহ আব্দুল গুলি আলকেরমানী আল চিশতী আল নিজামীর মত। তিনি আরবীতেই বেশী কথা বলছিলেন এবং সামান্য ইংরেজি। তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ আলাপ করলাম স্থানীয় মুসলিমদের ব্যাপারে মসজিদ প্রসঙ্গে। ইচ্ছা ছিল তাঁর সঙ্গে গিয়ে নিকটস্থ কোন মসজিদে যোহরের নামাজ পড়ব কিন্তু তখনও নামাজের বহুদেরী। তাছাড়া মসজিদও অনেক দূরে। আমাদের দেশের মত কোন মসজিদ নয় এমন কি বাইরে থেকে কোন আজানের ডাক শুনারও উপায় নেই। ফলে তাঁকে মেট্রোতে যাওয়ার জন্যে আমি ছেড়ে দিলাম।

পরের দিন ১১ সেপ্টেম্বর ২০০২ সকালে হোটেল থেকে বের হলাম। চৌরাস্তায় এসেই দেখি ফুটপাতের উপর বড় আকারের কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো ছবি ওসামা বিন লাদেনের। অনেকগুলি ছবি একই ধরণে লাগান রয়েছে যাতে সকলের দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট করা যায়। হোটেলে থেকেই একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকায় প্রথমেই হেড লাইনে ছিল "Why bloody Blair becoming a pet dog of bloody Bush?" এই পত্রিকাটি বৃটেন থেকে বেরিয়েছে এবং এটি তাদেরই প্রশ্ন। আমার যতদূর মনে পড়ে সম্ভবত ঐ রকম ক্যাপসনেই লেখাটা ছিল। বাইরে এসে পুলিশী তৎপরতা এবং তাদের সংখ্যাধিক্ষ্য নজরে পড়ার মত। তবুও আমি আমার আজ শেষ দিনের জন্যে ভ্রমনসূচী মোতাবেক এগিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মাটির নীচে মেট্রো ট্রেনের টিকিট কাটলাম। প্লাটফরমে গিয়ে দেখি ৩/৪জন যুবককে আটকে রেখেছে পুলিশ। আমি আজ এলিসি প্রসাদে প্রবেশের জন্যে

www.pathagar.com

সেখানে গিয়ে দেখি চর্তুদিকে বহু প্রহরী ও পুলিশ। আমার উদ্দেশ্য তাদের জানাতেই তারা আমাকে জানায় যে বছরে মাত্র একদিন অর্থাৎ ২২ সেপ্টেম্বর ছাড়া অন্য কোনদিন কোন দর্শনার্থীকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। কেন হয় না? আমার প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর তারা কেউ দিতে পারে নি।

আমি এবার বহুদূরে অবিস্থত লুভার (Louvre) মিউজিয়ামের উদ্দেশ্যে হাঁটা দিলাম। পথে যেতে যেতে ছোট বড় বেশ কিছু দর্শনীয় বস্তুও দেখলাম। ইউরোপিয় সমাজে প্রচুর প্রস্তর মূর্তি, বিভিন্ন আঙ্গিকে নারী ও পুরুষের উলঙ্গ প্রতিকৃতি অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপন করাটাতে যে কী বাহাদূরী ও মাহাত্ম লুকিয়ে আছে, তা আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির বোধগম্য হয় নি। গোপন বস্তুকে প্রকাশ্যে দর্শনীয় ভাবে তুলে ধরা হয়েছে এমনভাবে যাতে যৌনতা বা যৌন প্রক্রিয়াদির লীলা খেলা যুবক ও যুবতীদের প্রচন্ডভাবে তাদের সুপ্ত অনুভূতিকে জাগ্রত করতে পারে। আমার মুসলিম মানষে এগুলি আনন্দের পরিবর্তে নিরানন্দ বিরক্তিকর এবং অত্যন্ত দৃষ্টিকুট হিসেবে ধরা পড়েছে। যদিও বলা হয় 'আর্ট ফর আর্ট সেক' তবে আমার বলার বোধকরি কোন অবকাশ নেই। সৃষ্টি সুখের উল্লাসে যে সমস্ত স্থপতি বা শিল্পী ও চিত্রকর এগুলি প্রাণপাত পরিশ্রমের মাধ্যমে তাঁদের কারিশমা ফুটিয়ে তুলে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছেন, তাঁদের জন্যে আমার অনুকম্পা ব্যতীত আর কিছু নেই।

এভাবে ভাবতে ভাবতে লুভার জাদুঘরে উপস্থিত হলাম। বিশাল এলাকা নিয়ে সম্ভবত বিশ্বের সর্ববৃহৎ জাদুঘর এটি। অনেক চিত্রশিল্পী পথের দু'পাশে বড় বড় ক্যানভাসে বা আর্ট পেপারে ছবি আঁকতে ব্যস্ত লক্ষ্য করেছি। আবহাওয়া বেশ ভাল ছিল অর্থাৎ প্রচন্ড রৌদ্র উজ্জ্বল দিন। দক্ষিণার বিনিময়ে প্রবেশ করলাম জাদুঘরে। কলকাতায় যে জাদুঘর রয়েছে চৌরঙ্গীতে যেটা আমি ছোটবেলা থেকে বহুবার গেছি দেখতে এবং তাতে শিক্ষার যে বহু ভূবন ছড়িয়ে আছে তার সঙ্গে এই লুভার জাদুঘরের কোন মিল নেই কোথাও। এটি মূলত বিশ্বের বিখ্যাত চিত্রকরদের হাতে আঁকা বিশাল আকারের দেয়াল সিলিং প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন বহু বর্ণের ও বহু ঢঙ্গের তৈলচিত্র সর্ব্বস্য জাদুঘর ব্যতীত কিছু নয়। এই সমস্ত শিল্পীদের মধ্যে যেমন লিও নার্দো দ্য ভিঞ্চি, মাইকেল এ্যানজেলো, পাবলো পিকাসো প্রমুখ আরও বহু শিল্পীর আঁকা ছবি রয়েছে অত্যন্ত তরতাজা অবস্থায় এটিই আমার কাছে বড় হয়েছে ধরা পড়েছে। এতবছর পরেও এই সমস্ত শিল্পের কোন ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটেনি এতটুকু। ছবিগুলি প্রকান্ড হলেও বিশাল আকৃতির দেয়ালের দৈর্ঘ প্রস্ত জুড়ে সেই যুগের রাজা বাদশাদের বিচারকার্য, যুদ্ধের প্রতিহিংসায় শতশত মানুষের আত্মাহুতি, হযরত ঈশার জন্মক্ষণ, নারী ও পুরুষের মিলন মধুর পরিবেশ ইত্যাকার ছবি সৃষ্টি করতে

www.pathagar.com

যে কত সময় ধৈর্য এবং অর্থ ব্যয় হয়েছে তা আমার কল্পনাতীত। আমি হযরত ঈশার সদ্যজাত শিশুর পাশে দাঁড়িয়ে একটি আমার ছবি তোলার জন্যে একজনকে অনুরোধকরি। কিন্তু তিনিও সেটা ঠিকমত উঠাতে পারেন নি। একস্থানে লেখা আছে লাল অক্ষরে উপরের দেওয়ালে La Religion ET LA Science, La Trade E T La Commerce অর্থাৎ ধর্ম এবং বিজ্ঞান শিল্প এবং বানিজ্য ছবির জগতে লিওনার্দোদ্যভিঞ্চির আকা মোনালিসা খ্যাত ছবির পাশের দাঁড়িয়ে আর একটা ছবি আমার উঠানোর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সেখানে বহু লোকের শতশত ক্যামেরা ক্লিক্‌-ক্লিকের মাঝে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। শুনলাম কিছু দিন পূর্বে সেটা হঠাৎ চুরি হয়ে গিয়েছিল। পুনরায় সেটি উদ্ধার করে সম্মুখে ষ্টীলের বার দিয়ে বর্তমানে ঘিরে রাখা হয়েছে। যাতে লোকে একেবারে নিকটে যেতে না পারে। অবশ্য অনেকগুলি ভাস্করমূর্তি অত্যন্ত দামী সাদৃশ্য সাদা এবং কালো মার্বল পাথরের তৈরী শক্তিমান পুরুষ ও নারীর নানা ঢঙ্গে তৈরী করা হয়েছে। ঐতিহাসিক বহু প্রসিদ্ধ ঘটনার বিবরণী সমৃদ্ধ ঘটনা প্রবাহ তুলে ধরা হয়েছে বিশেষত ঘরের সিলিং এর উপর আঁকা দেব দেবী ও পরীদের ভাসমান ছবি যে কী প্রক্রিয়াতে অত সুন্দর ও নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হয়েছে তা আমার নিকট সহজবোধ্য হয়নি। প্রায় পুরো সাড়ে তিন ঘন্টা ঘুরে ঘুরে দেখতে সময় লেগেছে আমার। এরপর আমি নীচে গ্রাউন্ড ফ্লোরে কিছু সুগন্ধি তবে এ্যালকোহল মুক্ত সেন্ট কিনতে উদ্দত হলাম। বড় একটা দোকানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই আমাকে তারা পাল্টা প্রশ্ন করে মেল অর ফিমেল? আমি বলি মেল তারা অনেক খুঁজেও এটা পেলনা। এবার আমি বলি দেখি ফিমেল। একটি ছেলে সেটি অল্প খুঁজেই বের করল। আমাকে একটি কাগজের স্ট্রিপে সামান্য স্প্রে করেই আমার হাতে দিল। দেখলাম মন্দনা বেশ ভালই। আমি মূল্য জিজ্ঞাসা করতেই বলল ৪৬ ডলার। সঙ্গে সঙ্গে আমার বাংলাদেশের মুদ্রামনের হিসেবে দেখি প্রায় ৩০০০ টাকা অতএব ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঐ ছোট্ট শিশির সেন্ট কিনতে আমি রাজি হতে পারলাম না। তাছাড়া আমি বরাবরই আতরের ভক্ত। অতএব আমার নিকট অর্থ থাকা সত্ত্বেও আমার মন সাই দিলনা। তবে সেই কাগজের স্ট্রিপটা সুইডেনে আসার পরও দীর্ঘ দিন একই রকম ভাবে সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। তখন অবশ্য না কেনার দুঃখটা আজও মাঝে মধ্যে মনোবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আমি এখন বেশ ক্লান্ত। কিন্তু তবুও বহু জিনিষ দেখার বাকী এবং আজই সন্ধ্যার সময় প্যারিস ত্যাগের পালা। আমার অক্লান্ত দর্শনেচ্ছু ভাব আমাকে এবার নিয়ে চলল আর্চ অব ট্রায়াম্ফ এর (ARCH of Triumph) দিকে। এটিই সমস্ত প্যারিসের মূল কেন্দ্র। ১৮০৬ সালে সম্রাট নেপোলিয়নের আদেশেই এটি মহান

www.pathagar.com

সেনাবাহিনী চিহ্ন হিসেবে তৈরী করার কাজ শেষ হয় ১৮৩৬ সালে। ১৬৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এবং ১৪৭ ফুট প্রস্থ প্রকান্ড আকারের চতুর্দিকে সুউচ্চ আর্চ বা খিলানের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। এর ঠিক মধ্যস্থলের ভূমিতে ২৪ ঘন্টা অগ্নি জলন্ত আকারে বর্তমান। কেউ কেউ ফুলের তোড়া, মালা ইত্যাদি এই আগুনের চার পাশে রেখেছে। অনেকটা পূণ্যব্যক্তিদের মাযারে যেভাবে সম্মান দেখানো হয় সেরকমটি প্রায়। আমি টিকিট কেটে এর উপর উঠার জন্যে তৈরী হলাম। শুনলাম ৪৭টি সিঁড়ি টপকে উপরে যেতে হবে ঘুরে ঘুরে। আমি লিফটের খোঁজে গিয়ে দেখি বন্ধ কেউ নেই। আমি সেখানকার পুলিশ অফিসারকে বলি আমার মত বৃদ্ধের পক্ষে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠা সম্ভব নয়। অতএব, লিফটের সাহায্য একান্ত দরকার। অফিসার বলল একটু অপেক্ষা কর চালক এসে পড়বে। ঐ অবসরে যুদ্ধে যত ছোট বড় সৈন্য নিহত হয়েছে তাদের নাম সমস্ত দেওয়াল গুলিতে উৎকীর্ণ করা আছে। এমন কি যুদ্ধের কামান্ডার ও সৈন্য বাহিনীর প্রধান ব্যক্তিদের নামের নীচে আন্ডারলাইন করা আছে। অবশেষে একটি কুঁচকুঁচে কালো মেয়ে এল এবং কেবল আমাকেই লিফটের ভিতর তুলে নিল। আমি তার দেশের নাম জিজ্ঞাসা করতেই বলল সোমালিয়া। আমি তখন তাকে বলি তোমার দেশই তো এবার ফ্রান্সকে প্রথম হারালো ফুটবলে। সে একটু হাসল।

এবার উপরে উঠে দেখি এলাহী কারবার যা নীচে থেকে কিছুই বুঝার উপায় নেই। রেস্টুরেন্ট দোকান সবই রয়েছে উপরে। আমি একেবারে খোলা ছাদে উঠে পড়ি। সেখানে থেকে চমৎকার ভাবে দেখা যায় যে ১২টি রাস্তা বারদিকে সোজাভাবে চলে গিয়েছে অন্তহীন অবস্থায়। আমি ঘুরে ঘুরে অনেক ছবি তুলনাম। আইফেল টাওয়ারকে মনে হচ্ছে যেন ঐ তো এতকাছে দাঁড়িয়ে আছে। চতুর্দিকে এখানেও অনেক দূরবীন লাগান আছে হয়ত রাতের আকাশ দেখার জন্যে। তবে আমি খালি চোখেও বেশ ভালই দেখলাম বহুদূর পর্যন্ত। শেষে ওখানেই একটি দোকানে একটি মেয়ে আমার ছবি তুলে দিল। আবার নীচে নামার সময় ঐ সোমালিয়ার কালো মেয়েটি একমাত্র আমাকে ছাড়া আর কাউকে লিফটে উঠতে দিলনা। সম্ভবত আমার মুখে মাথায় পাকা চুলদাড়ি দেখে আমার বয়সটা সে আন্দাজ করতে পেরেছে। নীচে নেমেই সাবওয়েতে এখানে এসেছিলাম, সেভাবেই আবার ফিরে গেলাম। এবার সোজা চাইনিজ একটি হোটেলে দুপুরের খাওয়া শেষ করে আমার হোটেলের রুমে ফিরে যাই। হোটেল চেক আউটের পর আমার পাস পোর্টটি হোটেলের নীচে আন্ডার গ্রাউন্ডের ভিতর থেকে ডিউটিরত মেয়েটি এনেদিল। আমি মাত্রপত্র মেয়েটির নিকট রেখে ঐখানেই সোফাতে একটু লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম।

www.pathagar.com

প্যারিসে একটু ইচ্ছা ছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী ড. মরিস বুকাইলীর সঙ্গে দেখা করা। যেহেতু তাঁর লিখিত বিখ্যাত বই দি বাইবেল দি কোরআন এন্ড সায়েন্স বইটি আমি অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু এসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে দেখা করতে গেলে অগ্রিম এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া দেখা করা যায় না। শোভনীয় ও নয়। আর একটি ইচ্ছা ছিল পাবনার রূপছায়া ষ্টুডিওর মালিক হিমাংশুদার বড় ছেলে পার্থ প্রতিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা। যে বর্তমানে বহু সময় ধরে প্যারিসে মুখাভিনয় করে নাম করেছে প্রচুর। কিন্তু তার কোন টেলিফোন নম্বর আমার কাছে না থাকায় তা আর সম্ভব হয়নি। হয়ত চেষ্টা করলে আমি তার নম্বরটা জোগাড় করতে পারতাম। কিন্তু তাহলে এই অল্প সময়ে আমার আর প্যারিস দর্শন বা ভ্রমন সম্ভব হতনা। সময়াভাবে বহুদূরে ভার্সাইল দূর্গে যেমন যাওয়া হলনা। তেমনিই নেপোলিয়নের কবর এবং মহামতি হ্যানিমানের সমাধিস্থল পর্যন্ত পৌছাতে না পারার দুঃখটা আজও রয়ে গেল আমার মনের মধ্যে।

ঠিক সন্ধ্যায় একটু পূর্বে আমাদের দলবলসহ বাস স্ট্যান্ডে হাজির হলাম প্যারিস ত্যাগের জন্যে। পরের দিন বিকেল বেলা আমি গোথেনবার্গে রেলস্টেশন থেকে একটু হেটেই আক্কাস গাটার বাস ধরে চলে আসি। আমি দূর থেকেই লক্ষ্য করলাম, আমার স্ত্রী, মেয়ে শাহীন এবং আমার নাতনী মোনামী সকলেই আমার গন্তব্য পথের পানে চেয়ে রয়েছে তাদের ছোট্ট ব্যালকনি থেকে। কেননা তারা পূর্ব থেকেই আমার ফিরে আসার নির্দিষ্ট সময় সূচীটা জানত। উপরোক্ত এটা ইউরোপের সময়সূচী আমাদের মত হতভাগা ইন্দোপাক বাংলার কোন বেয়াড়া বেহায়া সময় সূচী নয়। আমি তাদের লক্ষ্য করেই রাস্তার পাশে বেঞ্চিতে একটু বসলাম, আমি বিদ্রোহী পথ ক্লান্ত। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্যারিসে সকলে ইংরেজি জানেনা। যারা জানেনা তারা কেবল দুই বাহু ঝাঁকিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে আমার কথা বুঝে না এবং যারা জানে তারা এত ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধ প্রকাশ করে যে, আমাকে ঠিকানায় পৌছে দিতে পারলে বেশী খুশি হয়।

ফেরার পথে আবার কোপেন হেগেনে আমাকে দীর্ঘ সময় সেফেল বাসের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। যেটা আমাকে গোথেনবার্গ নিয়ে যাবে। হঠাৎ এক পাকিস্তানী ভদ্রলোক তাঁর ছেলেসহ আমার সঙ্গে পরিচয় করেন। তিনি বহু বছর ধরে এখানে বসবাস করছেন পরিবার পরিজনদের নিয়ে। আমি কথায় কথায় হঠাৎ তাঁকে জিজ্ঞসা করি আপনি নিয়মিত জুম্মার নামাজ পড়েন তো? তিনি উত্তর দেন মাঝে মাঝে। তিনি ভাল ইংরেজি না জানায় আমি তাকে সারা পথ প্রায় ৪ ঘন্টা কেবল মাত্র জুম্মার নামাজের মরতবা গুরুত্ব ফজিলত, শানেনজুল ইত্যাদি উর্দূ ভাষায় শুনাতে থাকি এবং তিনি অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে আমার এই ধর্মীয় বক্তৃতা বা ওয়াজ শুনতে থাকেন গভীর আগ্রহে। মাঝে মাঝে তিনি আমাকে তার গিন্নির হাতে

www.pathagar.com

তৈরী মাছের রুটি খেতে দেন। ইতোপূর্বে এ ধরণের চমৎকার খাবার বোধহয় খাইনি। এই দীর্ঘ সময় কেমন ভাবে যে কেটে গেল, আমি মোটেও টের পায়নি। হাঠাৎ দেখি গোথেনবার্গে পৌছে গেছি। তিনি যাবেন মালমো আরও দূরে। গোথেনবার্গে ড. বাবুল আনাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। আমার তাই শখ হয়েছিল ও দেশের কোন উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে গিয়ে তাদের লেখা পড়ার পরিবেশ, পাঠাগার ইত্যাদি সরেজমিনে দেখার। এটা জানতে পেরে ড. বাবুল আমাকে বলেন, "খালুজান আমি নিজে এসে আপনাকে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাব একদিন এবং তারপূর্বে আপনাকে ফোনে জানিয়ে দেব আপনি তৈরী থাকবেন।

বাস্তবিক তিনি হঠাৎ একদিন ফোন করে আমাকে জানান যে, আগামীকাল সকালে তিনি নিজে এসে আমাকে নিয়ে যাবেন। আমিও সেইমতই তৈরী ছিলাম। তাঁর সেই গোথেনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় রাস্তা থেকে একটু উচু টিলার উপর অবস্থিত। চমৎকার নিরিবিলি স্থান। আমরা প্রথমেই বিশাল পাঠাগারে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সব র‍্যাকগুলি থরে থরে সাজান বইপত্র দেখি। চতুর্দিকে অত্যন্ত পরিস্কার ঝকঝকে চকচকে এবং নীরব শান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে। সুইডেনের জাতীয় ভাষাতেই অধিকাংশ বই। যা আমার পড়া সাধ্যের বাইরে। কোন কোন হলে বসে অল্প সংখ্যাক ছেলে মেয়েরা কম্পিউটারের সাহায্যে পড়াশুনা করছে, নোট করছে ইত্যাদি। ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা টয়লেটের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। সেটা ছেলেমেয়ে একসঙ্গে ব্যবহার করতে পারে মনে হল। আমি ড. বাবুলকে জিজ্ঞাসা করলাম মেয়েদের জন্যে পৃথক কোন টয়লেটের ব্যবস্থা নেই? তিনি বলেন হ্যাঁ আছে একটা অন্যদিকে। এরপর ড. বাবুল ও তাঁর স্ত্রী একত্রে একটা ইসলামী ধর্ম শিক্ষার বই সুইডিস ভাষায় তৈরী করছিলেন। সে ব্যাপারে অনেক আলোচনা করলাম এবং বইয়ের মধ্যে যে সমস্ত বিষয় আরবী ভাষায় লেখা আছে, তার কোন কোন স্থানে আমি সামান্য পরিবর্তন ও সংশোধনে অংশগ্রহন করি। এরপর বই বের হওয়ার পর দেখি আমাকেও একটি কপি তাঁরা উপহার দিয়েছেন। আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করি যে, ঐ বইয়ের সহলেখক হিসেবে তাঁরা আমারও নাম উল্লেখ করেছেন সেখানে। অবশ্য আমি এতটা কখনই আশা করিনি। বরং এত সামান্য কাজের জন্যে এতবড় পুরস্কার। আমাকে অলক্ষ্যে যেন একটু লজ্জিতই করেছেন মনে হল। আসলে ড. বাবুল ও তাঁর স্ত্রী সত্যিকার অর্থেই তাঁরা বেশ প্রান খোলা ও উদার মনের মানুষ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ড. বাবুলের ছোট ভাই ও ছোট বোন তাঁরাও পিএইচডি করেছেন খুবই সুনামের সঙ্গে এবং বর্তমানে তাঁরা সিঙ্গাপুরে কর্মরত রয়েছেন।

ফারুক তার ব্যবসার কাজে লন্ডন এসেছিল। তাই এবার আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে পুনরায় সুইডেনে এসেছিল মাত্র ৩/৪ দিনের মধ্যে। তাকে পেয়ে

www.pathagar.com

আমরা সকলেই খুবই খুশী হই। রুমী তার উদ্দেশ্যে একজন ভারতীয় শিখের রেস্টুরেন্টে আমাদের সকলকে খুব ভাল খাওয়াল। রুমীর এই শিখ ভদ্রলোকের রেস্টুরেন্টটা বেশ পছন্দ বলে ইতোপূর্বেও সে আমাদের ২/৩ বার সেখানে খাইয়েছে। ইতোমধ্যে আমার ও রুমীর দুটি বিমানের টিকিট কিনেছিল রুমী ইটালীতে রোম যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু রুমীর অসুখের জন্যে দীর্ঘদিন ছুটিতে থাকার পরে তার অফিস ইটালীতে যাওয়ার জন্যে আর কোন ছুটি দিলনা। শেষে তার টিকিট ফেরত দিয়ে কেবল আমার টিকিটটা রেখে দেই। রুমী অবশ্য আমার টিকিটের মূল্যটা নিতে রাজি না হলেও আমি তাকে জোর করে নিতেবাধ্য করি। ফারুকের আসার দু'দিন পরই আমার যাত্রা শুরু। তাই রুমী ও ফারুক দুজনেই আমাকে বিমান বন্দরে তুলে দিয়ে আসে। ফারুক আবার কিছু ডলার আমার হাতে গুঁজে দেয় এবং বলে আপনার সেখানে ৮/১০ দিনের জন্যে অনেক অর্থের প্রয়োজন। বিশ্বের বহুদেশ তার বারবার ঘুরাঘুরির ফলে, তার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে বিশেষত খরচাপত্রের ব্যাপারে অবশ্য সে নিজে প্রচুর কেনাকাটা করে যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত।

www.pathagar.com

ত্রয়োত্রিংশ পর্ব

ইটালী

রাজধানীর নাম	ঃ	রোম (Rome)
জনসংখ্যা	ঃ	৫৭.৪ মিলিয়ন
স্থলভাগের সীমানা	ঃ	৩০১,৩২৩ বর্গ কি: মি:
মূদ্রা	ঃ	ইটালীয়ান লিরা (বর্তমানে ইউরো)
ভাষা	ঃ	ইটালীয়ান
মাথা পিছু জিডিপি	ঃ	১৯,৮৮০ ইউ,এস,ডলার
গড় আয়ু	ঃ	৭৮ বছর

দুপুরের কিছু পর আমার বিমান ছাড়ল ইটালির রাজধানী রোমের উদ্দেশ্যে। প্লেনের ভিতরে দেখি একটি সিটও খালি নেই সব ভর্তি হয়ে গেল। আমার সিটটা পড়েছিল বাঁ দিকে জানালার পাশে। আমার ডান দিকে দুটি সিটেই দু যুবতী। বেশীর ভাগ যাত্রীই লক্ষ্য করলাম মহিলা। ভেনিসের (venice) উপর দিয়ে যাওয়ার সময় বিমানের ক্যাপ্টেন ইটালীর ভাষায় ধারা বিবরণী দিচ্ছিল যা আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার ঠিক পাশের মেয়েটিকে বললাম, তুমি আমাকে ইংরেজিতে বল ক্যাপ্টেন যা বলছে। সে তখন চমৎকারভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলতে লাগল যে, আমরা এই সুন্দর বিকেল বেলা ভেনিসের উপর দিয়ে যাচ্ছি। এই সুন্দর ও বিখ্যাত শহরটি আমাদের দেখার জন্যে পাইলট বিমানটাকে অনেক নীচে নামিয়ে ধীরগতিতে হেলে দুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের দেখতে অনুরোধ করছে। আমি যেহেতু জানালার ঠিক পাশেই ছিলাম অতএব, আমাদের দেখতে বেশ সুন্দর লাগছিল। বিশ্বের বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক ও নাট্যকার উইলিয়াম সেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অব ভেনিস পড়েছিলাম সেই ছাত্রাবস্থায় সেই ভেনিসের ঠিক মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছি আর দেখছি লেকসিটি ভেনিস। পানির শহর যেন কিন্তু তখনও সূর্য আলো দিচ্ছিল অল্পক্ষণের জন্যে এরপরই রাতের রাতি জ্বলে উঠে সব কিছু আরও চমৎকার, রাস্তায় প্রচুর গাড়ী ছুটছে। প্লেনের উভয় দিকে জানালার পাশের যাত্রীদের দেখার সুবিধার জন্যে পাইলট প্লেটটিকে একবার বামদিকে আবাব ডানদিকে ঝুঁকিয়ে ভালমত দেখার

www.pathagar.com

সুবিধা করে দিয়েছিল পাইলটকে আমি জানাই অনেক ধন্যবাদ। এভাবেই ছবির মত সুন্দর ভেনিস দেখলাম দীর্ঘক্ষণ।

প্রায় রাত ৮ টার পর পৌঁছালাম রোম বিমান বন্দরে। আমাদের পাসপোর্ট ও চেকিং এরপর বাইরে বেরিয়ে দেখি কোন গাড়ী নেই অথচ যাত্রী প্রচুর। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পর ২/৩ টি বাস এসে দাঁড়াল। যে মেয়েটি আমাদের নামের লিস্ট দেখে গাড়ীতে উঠাল তার নাম জানলাম লিনা (Lina)। সে আমাদের সকলকে উঠিয়ে দীর্ঘ ৩০/৩৫ কিঃমিঃ পথ পাড়ী দেওয়ার সময় ইটালীয় ও ইংরেজি ভাষায় ধারা বর্ণনা দিচ্ছিল। রাত প্রায় ১১ টার দিকে রোম টারমিনি রেল স্টেশনের নিকট গাড়ী থেকে নামলাম। আমি পূর্বেই লিনাকে বলে রেখেছিলাম যে, আমার এটি প্রথম রোমে আগমন। অতএব, তুমি দয়াকরে আমার জন্যে একটি হোটেল একোমোডেশনের ব্যবস্থা অবশ্যই করবে। সে আমাকে কথা দিয়েছিল, ঠিক আছে চিন্তা করো না। কিন্তু রাত ১২ টা পর্যন্ত তার মোবাইল বহু চেষ্টা করেও আমার জন্যে একটি সিটও পেলোনা কোন হোটেলে। শেষে বেচারী আমার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে বলল, "আমি তো আর অপেক্ষা করতে পারিনা। আমাকে বাসায় ফিরতে হবে। এবার তুমি নিজে একটু চেষ্টা করে দেখ (Good Night). আমি এবং আর দুজন মুসলিম ছেলে এই তিনজন অনেক চেষ্টা করে একটা হোটেলে উঠে দেখি (Free style Hotel) প্রথমে নাম দেখেই তো চমকে উঠলাম। কিন্তু সেখানে মাত্র একটি সিট খালি আছে। অতএব তারা দু'জন আমাকে সেটা ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে গেল। আমি দেখি একটি বড় ঘরে উপর নীচে মোট ৯টি বিছানা। আমি বলি আমাকে নীচে থাকতে দাও। কিন্তু তারা বলল ঐ উপরেরটা কেবল খালি। অতএব, তুমি রাত্রিটা কোনমতে শান্তিমত ঘুমাও। কাল ভোরে তুমি অন্যত্র একটা ভাল হোটেল খুঁজে নিও। অগত্যা আমি তাতেই রাজি হলাম, যেহেতু অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পরেছিলাম। ৪ জন মহিলা ও ৫ জন পুরুষ প্রত্যেকের জন্যে আলাদা বিছানা করা আছে উপর নীচে। আমি যখন কিছু খেয়ে বিছানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নেব ঠিক এমন সময় একটি মাত্র মেয়ে ঘরে প্রবেশ করল। আমি জামা কাপড় বদলিয়ে লোহার সিড়ি বেয়ে উপরে উঠায় সঙ্গে সঙ্গে সিড়িটা হঠাৎ পড়ে গেল সশব্দে। আমি দুঃখ প্রকাশ করায় মেয়েটি আবার সিঁড়িটা আমার উপরে বিছানা বরাবর লাগিয়ে দিল যাতে আমার নামতে অসুবিধা না হয়। আমি শুয়ে পড়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞসা করলাম তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে বলল চেকশ্লোভিয়া। আমি বলি তুমি একা? উত্তর দিল, আমার বয়ফ্রেন্ড আছে। কলেজে পড়ুয়া মেয়ে হতে পারে। সে জামাকাপড় খুলতে শুরু করল।

www.pathagar.com

ট্রাউজারটা খোলার পর সে হঠাৎ একটা মাত্র টিউব জ্বলছিল সেটা নিভিয়ে দিল। আল্লাহ তার ভাল করুক। যে বুদ্ধি করে বাতিটা বন্ধ করে ঘরটা সম্পূর্ণ অন্ধকার করে ফেলে। সে আমার ঠিক উল্টোদিকের উপরের বিছানায় শুয়ে পরে। একটু শীত ছিল তাই কম্বল গায়ে দেয়। এর অনেক পরে গভীর রাতে এক এক করে নিঃশব্দে বাতি না জ্বেলে সকলেই নিজ নিজ বিছানায় শুয়ে পড়ে। তাদের এই সৌজন্যবোধ এবং ভদ্রতা দেখে আমার বেশ ভাল লাগল। কারো ঘুমের যাতে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে সেদিকে তাদের যথেষ্ট সতর্কতা-প্রশংসনীয়।

আমি সবার পূর্বে উঠে তাড়াতাড়ি টয়লেটের কাজটা দ্রুত সেরে নিই। জামাকাপড় বদলিয়ে ঘর ছেড়ে বেরুবার পুর্বে হঠাৎ লক্ষ্য করি রাতের ঐ মেয়েটি তার সমস্ত বস্ত্রাছাদন খুলে তার মাথায় নিকট ঝুলিয়ে রেখেছে এবং আপাদমস্তক কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। সকলকে এই ঘুমন্ত অবস্থায় দেখেই আমি মালপত্র ঘরে রেখে দিয়ে সামান্য কিছু ব্রেক ফাস্ট করেই হোটেলের খোঁজে বেরিয়ে পড়ি। রাস্তার উভয় পার্শ্বে অনেক বাংলা সাইন বোর্ড দেখে আমি অবাক। বুঝলাম ধারে কাছেই অনেক বাঙ্গালী থাকে। কিছুদুর গিয়েই একজন নোয়াখালী নিবাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়। তাকে আমার অসুবিধার কথা বলতেই তিনি আমাকে নিয়ে তাঁদের এক নেতার নিকট আমার কথা বলেন। তখনই তাঁরা দুতিনজন অল্পক্ষণের মধ্যেই একটা হোটেল আমার জন্যে ঠিক করে ফেলেন। কিন্তু হোটেল মালিক ছেলেটি আমাকে মাত্র দু'দিনের জন্যে বুকিং দিল। যেহেতু পোপের ধর্মীয় বক্তৃতা শুনার জন্যে সমস্ত খৃষ্টান সমাজ একত্র হয়েছে রোমে। অতএব, সমস্ত হোটেল এভাবে ওভার ক্রাউডেড অবস্থা। অবশ্য এটি বছরে মাত্র একবারই হয়। যেমন মক্কা শরীফে হজের সময় হাজীদের ভীড় হয় প্রচন্ডভাবে। পক্ষান্তরে খৃষ্টান সমাজের তীর্থক্ষেত্র হল রোম, ভ্যাটিক্যান সিটি। যেখানে ক্যাথলিক খৃষ্টানদের প্রধান ধর্মগুরু পোপ জন পল বাস করেন টিভিতে দেখলাম। আমি রাতে যে ফ্রি স্টাইল হোটেলে উঠেছিলাম, ঐ হোটেলের ছয় তলায় মেস করে থাকেন, এই সমস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোক। তাঁরা বেশীর ভাগই নোয়াখালীবাসী। তাঁরা আমার জন্য যর্থেষ্ট করেছেন। এমনকি তাদের নেতা দেলওয়ার সাহেব আমাকে একদিন সকালে ভ্যাটিক্যান সিটি দেখাতে নিয়ে গেলেন নিজ খরচে। তাঁর অসম্ভব সৌজন্যবোধ আমাকে বিস্মিত করেছে। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কিছু ছবি তুলেছি। প্রায় ৩/৪ ঘন্টা ভ্যাটিক্যান সিটি তিনি আমাকে দেখালেন এবং তার জানামতে যাবতীয় তথ্যগুলিও জানালেন। আমি তাঁর নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

www.pathagar.com

অবশ্য দ্বিতীয় দিনেই বাসে করে সমস্ত রোম শহরটা ঘুরে দর্শনীয় স্থানগুলি একনজরে ২/৩ ঘন্টার মধ্যেই আমি দেখে নিই। ইউরোপের অন্যান্য শহরের থেকে রোম যে অন্যরকম শহর তা আমি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করার সুযোগ পাই। এই সেই নীরোর শহর যখন রোম আগুনে জ্বলছিল, তখন সম্রাট নীরো বাঁশী বাজিয়ে বংশীবাদকের ন্যায় আনন্দ উপভোগ করতে অভ্যস্থ। যেটা পরবর্তীকালে একটা বিখ্যাত প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। পুরাতন রোম এবং নতুন রোমের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছে এই রোম শহরে। ফলে ইংরেজিতে একটি চমৎকার প্রবাদ রয়েছে এমন (Rome was not built in a day). রোমের প্রতীক হচ্ছে কলোসিয়াম (Colosseum) অর্থাৎ প্রাচীনকালে রোমের রাজা রানীদের আনন্দ বর্ধনের জন্যে বহু কয়েদিকে হিংস্র বাঘ, সিংহের সম্মুখে ছেড়ে দেওয়া হতো। তাদের সে যুদ্ধে একটা জলজ্যান্ত মানুষ যা সৃষ্টি কর্তার সেরা সৃষ্টি কী ভাবে হিংস ও ক্ষুধার্ত পশুদের কবলে পড়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত, তা বর্তমান স্টেডিয়ামের মত চতুর্দিকে অজস্র লোকের সমাগমের মধ্যেই দেখানো হতো এবং সকলেই আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়তো। বর্তমানে বহু ইংরেজী সিনেমায় সেই বিভৎস দৃশ্য আমরা অনেকেই দেখেছি। এখনও সেই কলোসিয়ামের ধ্বংসাবশেষ সযত্নে রাখা হয়েছে পৃথিবীর দর্শকদের দেখার জন্যে। প্রতিদিন বহু দর্শনার্থী সেটি ঘুরে ফিরে দর্শন করেন। রোমের পরই সম্ভবত ভেনিস (Venice) শহরের স্থান। যেটি দেখার জন্যে আমিও প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু স্থানীয় কিছু বাঙ্গালী আমাকে সেখানে না যাওয়ার পরামর্শ দেন। কেননা রোম থেকে অনেক দূরে এই শহর সর্বউত্তরে বিদ্যমান। যাওয়া এবং আসাতে দীর্ঘ ১০/১২ ঘন্টার ট্রেন যাত্রা তাও আবার ইউরো স্টার। সেখানে একটা রাত না থাকলে যাওয়ার ঠিক সার্থকতা থাকে না। অথচ রোমের হোটেলেও প্রতিদিন আমাকে ৫০ ডলার ভাড়া দিতে হয়। তাছাড়া প্লেনে আসার সময়েভাবে পাইলট আমাদের ভেনিস শহরটা দেখিয়েছে সেটাকেই আপাততঃ যথেষ্ট মনে করে সান্তনা পাই।

হোটেলে আমার ব্রেক ফাস্ট করার সময় দিতে হবে এটা রাতেই আমাকে জিজ্ঞাসা করা হতো। আমি সাধারণত সকাল আটটার কথা বলে রাখতাম। ড. হুবার্ট ভদ্রলোকটি প্রতি সকালেই ঠিক আটটার সময় আমার ব্রেকফাস্ট নিয়ে আসতেন। ততক্ষণে আমি নামাজ ও গোসল ইত্যাদি সেরে প্রস্তুত। তিনি আমাকে একদিন বাইরে বেরুবার ঠিক আগ মুহূর্তে বলেন আপনার অবশ্যই ফ্লোরেন্স (Florence) ভ্রমন করা উচিৎ। আমি তাঁর কথার গুরুত্ব বুঝতে পেরে তখনই ফ্লোরেন্সের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। তবে আমার হোটেলের নিকটেই বাংলাদেশের শরিয়তপুরের দুই ভাই

www.pathagar.com

প্রতিদিনের যুগান্তর পত্রিকা ট্যাবলয়েড আকারে সারারাতের মধ্যেই কম্পিউটারের মাধ্যমে বের করে সকালেই এক ডলার বা এক ইউরোতে বিক্রি করতেন। আমি প্রতিদিনই তখন থেকে কিনতাম বাংলাদেশের খবরাখবর জানার জন্যে। ঐ পত্রিকাটা কিনে নিয়েই আমি ফ্লোরেন্সের পথে ইউরো স্টার ট্রেনের টিকিট নিয়ে রওনা হয়ে যাই।

প্রায় বেলা তিনটার সময় সোজা ফ্লোরেন্সে গিয়ে ট্রেনটা থামে। আমি স্টেশনে নেমেই তাড়াতাড়ি বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে একটি টিকিট কাউন্টারে গিযে দাঁড়াতেই ভিতরের ভদ্রলোক আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। আমি পুনরায় ইংরেজিতে ভদ্রভাবে কথা বলতেই সে আবারও আমাকে আগের মত তাড়িয়ে দেয়। আমি বুঝতে পারলাম এরা ইংরেজি বলা পছন্দ করছেনা। আমি এদিক ওদিক চেয়ে দেখতেই দেখি কালোমত এক ভদ্রলোক বসে আছেন। আমি তাঁকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি তিনি ইংরেজি জানেন কিনা? তিনি হ্যাঁ সূচক উত্তর দিতেই আমি তাঁর নাম জিজ্ঞসা করি। তিনি বলেন ইব্রাহীম। আমি তখন তাঁকে আমার পরিচয় দিয়ে বলি ঐ কাউন্টারে আমাকে টিকিট দিচ্ছেনা তিনি সঙ্গে সঙ্গেই উঠে আসেন আমার সঙ্গে। তখন দেখি এক ইউরো দেওয়ার সাথে সাথেই আমাকে টিকিট দিল। আমি জনাব ইব্রাহীমকে বললাম এখানে তো কেউ ইংরেজি পছন্দ করেনা। অতএব, তুমি আমাকে একটু পানি খেতে সাহায্য কর। তিনি তখনই রাস্তার ওপাশে গিয়ে একটি দোকানে গিয়ে মেয়েটিকে ইটালীয় ভাষায় পানি চাইতেই এক বোতল মিনারাল ওয়াটার দেয় এবং দাম নেয় ১ ডলার ২০ সেন্ট। ছোট বোতল বড় জোর গ্লাস দুই পানি হবে। এবার আমি তাঁকে বলি, আমি এই ফ্লোরেন্স শহরটার পুরোটা একপাক ঘুরে দেখতে চাই। তিনি আমাকে সাথে সাথেই একটা বাস ১৩ নং দেখিয়ে বলেন এটাতে উঠে চলে যান। ঠিক একঘন্টা পরেই এই বাসটা আবার এখানে ফিরে আসবে।আপনার টিকিটের মেয়াদও ৬০ মিনিট। আমি তাঁর কথা মত বাসে উঠে পড়ি।

এই শহরের রাস্তা অত্যন্ত চমৎকার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। বহু সুন্দর বিল্ডিং রয়েছে রাস্তার দুপাশে। চমৎকার ফুলের বাগানও রয়েছে বেশ কিছু এলাকায়। আমার কাছে ক্যামেরা ছিল। তাই বেশ কিছু ছবি তুললাম। বাস মাঝে গিয়ে একস্থানে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াল এবং ঐ স্থানের চতুর্দিকে নানা রকম দর্শনীয় বস্তু রয়েছে। রাস্তার গোলচত্তরের মাঝে বিশাল আকারের উলঙ্গ পুরুষের একটি কালো পাথরের পূর্ণমূর্তি ডেভিডের যাকে আমরা হযরত দাউদ (আঃ) নবী হিসাবে মান্য করি। এটা তৈরী

www.pathagar.com

করেছেন ইটালীর প্রখ্যাত ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলো। এভাবে ঠিক একঘন্টা পরে বাসটি আবার রেলস্টেশনের সম্মুখে এসে থামল। আমার ট্রেন ছাড়তে তখনও বেশ দেরী দেখে ভাবলাম পিসার হেলান টাওয়ার দেখতে যাব কিনা? কিন্তু ফ্লোরেন্সের ঠিক পশ্চিমে দীর্ঘপথ বাসে গিয়ে পিসা থেকে ফিরতে রাত্রি হয়ে যাবে। সেই হিসেবে আর পিসা গেলাম না। এককাপ চা খাওয়ার জন্যে রাস্তার ধারে একটি ছাতার নীচে বসে অর্ডার দিই চা খাওয়ার পর ওয়েটার আমাকে বিল দিল ৩ ডলার ১০ সেন্ট। কেবল মাত্র এককাপ চায়ের দাম যে এত হতে পারে আমি অবাক! ওয়েটার গুণে গুণে ১০টি সেন্ট পর্যন্ত নিয়ে গেল।

এবার আমি স্টেশনে গিয়ে রোমের টিকিট কাটতে গিয়ে বিপদে পড়লাম। কেউ ইংরেজি বলতে চায়না। তাছাড়া কম্পিউটারের মাধ্যমে আমি টিকিট কাটতে জানিনা। পরিশেষে একটি তরুণী আমার কথা বুঝে আমাকে সাহায্য করল কম্পিউটার থেকে টিকিট কাটতে। আমি তার হাতে ৫০ ডলার দিতেই সে সেটি কম্পিউটারের সামনে ধরতেই একটানে সেটি ভিতরে চলে গেল। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই টিকিট ও বাকী অর্থ ফিরে পেলাম। আমি মেয়েটির এই সাহায্যের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার একটি চমৎকার ছবি তুলি এবং তাকেও বলি আমার একটা ছবি তুলতে।

ট্রেনে উঠে বসার সময় আমি লক্ষ্য করি ন্যাড়ামাথা এক ভদ্রলোক মেরুণ রঙ্গের কাবুলী পোষাকে বসে আছেন। আমি মুসলিম মনে করে ইসলামী কায়দায় সালাম দিই। কিন্তু তিনি কোন জবাব না দিয়ে চুপকরে থাকেন। আফ্রিকার কোন দেশের অধিবাসী হবেন বয়স মাঝাড়ী ধরণের। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমার সালামের জবাব দিলেন না কেন? তিনি বললেন আপনি সালাম দিলেই যে আমাকে জবাব দিতে হবে তার কী কোন অর্থ আছে? আমি বললাম আপনাকে আমি একজন মুসলিম ভেবেই সালাম দিয়েছিলাম। তিনি বলেন আমি মুসলিম না ও তো হতে পারি। বুঝলাম যে তিনি একজন গোঁড়া খৃষ্টান এবং চাঁদা সংগ্রহ করে দরিদ্র ও ভিখারী ব্যক্তিদের জন্যে। আমি তাঁকে বলি, ইউরোপে এত দেশ ঘুরেও আমার দৃষ্টিতে তেমন ভিখারী চোখে পড়েনি ইত্যাদি এরপর তাঁর সঙ্গে আর কোন কথা না বলে আমি পত্রিকা পড়তে থাকি।

আমার হোটেলের ধারে কাছেই ২/১ টি হোটেল ছিল। যেমন ইন্ডিয়ান হোটেল, টেস্ট অব ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্ট ইত্যাদি। আমি দুপুরে ও রাতে টেস্ট অব ইন্ডিয়া রেস্টুরেন্টে খেতাম। আমাদের বাংলাদেশী শরীয়তপুরের অধিবাসী এক যুবক শামীম

www.pathagar.com

সেটির মালিক। আমাকে অন্যান্য বাঙ্গালীরা ঐ হোটেলে খাওয়ার কথা বলেছিলেন। রোমে পৌছার পরদিন থেকেই আমি সেখানেই খেতাম। লাউ রান্নাটা আমার এত প্রিয় যে প্রতি দুবেলাতেই তা খেতাম অথচ প্রতি প্লেট দাম নিত ৩ ডলার। ১০/১২ ডলার মত প্রতি বেলা খাওয়াতেই চলে যেত। যদি রাত্রে কখনও বিরিয়ানী খেতাম, তবুও লাউটা আবার নিতাম। আমার পছন্দনীয় খাবারের প্রতি দুর্বলতা বরাবরই বিদ্যমান। রোমে প্রতিদিনের জন্যে প্রায় ১০০ ডলার মত খরচা হত। বহু বাঙ্গালী ঐ এলাকায় বাস করতেন ব্যবসা বাণিজ্য চালাতেন। আমাকে এক ভদ্রলোক অনুরোধ করেছিলেন যে, আগামী জুম্মার নামাজটা যেন অবশ্যই আমি ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদে গিয়ে পড়ি। তিনি আগামীকালই দেশে চলে আসবেন। তাই আমাকে সঙ্গে নিয়ে মসজিদে যেতে পারবেন না বলে দুঃখ করলেন। তবে মসজিদে যাওয়ার জন্যে পুরো নকস়া করে মসজিদের ইতিহাস আমাকে জানালেন। আমি তাঁকে কথা দিয়েছিলাম।

জুম্মার দিনের জন্যে আমি পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের অপেক্ষায় থাকলাম। কিন্তু তাঁরা কেউ আসতে পারলেন না দেখে আমি নিজেই মেট্রো ট্রেনের টিকিট কাটতে গিয়ে দেখি সবগুলি যন্ত্রই বিকল। আর কয়েকজন বিদেশী ভদ্রলোকও চেষ্টা করে পারলেন না। শেষে আমার হোটেলে গিয়ে বসাতে হোটেল মালিক শামীম বলল আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। অতএব, তাড়াতাড়ি খেয়ে তৈরী হয়ে বসে থাকলাম। মালিক অনেকদেরী করে বেরুল। পথে গিয়ে দেখি তারা ট্রাম ধরল। অথচ আমি যখন বললাম তাদের আমি তো বড় মসজিদ টাতেই যেতে চাই। তখন মালিক শামীম বলে আমি তো তা বুঝিনি। আর এখন আপনি সেখানে গেলেও নামাজ ধরতে পারবেন না। আমার মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল। অতএব, নিরূপায় হয়ে শহরের মধ্যেই একটা মসজিদে তাদের সঙ্গেঁ যেতে বাধ্য হলাম। মসজিদে যেতেই বাঙ্গাঁলী ইমাম সাহেবের সঙ্গেঁ আমার প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন তাঁরা। দেখলাম সকল মুসল্লিই বাঙ্গাঁলী । রোমে যে এত বাঙ্গাঁলী আছে তা না দেখলে বিশ্বাস করা মুসকিল। যা হোক নামাজ শেষ করে হোটেলে ফিরে এলাম এবং আসরের নামাজ পড়ার পরই আমি বড় মসজিদে যাওয়ার জন্য ক্যামেরাসহ বেরিয়ে পড়লাম ।

মেট্রোতে উঠে প্রচন্ড ভিড়ের মধ্যে দাড়িয়ে আছি। আমার বামপাশে একটি যুবক ছোট ফোল্ডিং ছাতাসহ আমার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখি আমার কোটের বাম দিকের ভিতর পকেট থেকে একটি বড় পোস্ট কার্ডের মত ট্রেনের

www.pathagar.com

টিকিট বেরিয়ে এসেছে। আমি অবাক হয়ে পকেট চেক করে দেখি বড় খামের ভিতর প্লেনের টিকিট বাসের টিকিট কিছুই নেই। আমার পাশের সেই যুবককে এক ধাক্কা মেরে চিৎকার করে উঠি এবং নীচে দেখি যে খামটা পড়ে রয়েছে। আমি সেটি তুলে নিয়ে পকেটে রাখি। আমাকে রুমী সুইডেনে বলে ছিল যে একটু সাবধানে থাকবেন খালু। ইটালীতে পকেট মার আছে প্রচুর। এখন তার কথার যথার্থতা বুঝতে পারলাম। পাঁচটি স্টেশান পার হয়ে ফ্ল্যামিনো Flamiro তে গিয়ে নামলাম। তারপর উপরে উঠে আবার উঠলাম ট্রাম-পেট্রাতে। যেটি ট্রামের চেয়ে বড় কিন্তু ট্রেনের চেয়ে ছোট আকারের । তৃতীয় স্টপেজে নেমেই ওভার ব্রীজ পার হয়ে ওপারে গিয়েই দেখি বিশাল উঁচু মিনারের মাথায় চাঁদ মার্কা ফলক এবং প্রকান্ড গম্বুজের মাথায়ও সেই একই চাঁদ মার্কা ফলক লাগানো আছে। আমি এমনিতেই মসজিদ পাগলা মানুষ। যে কোন সুন্দর মসজিদ দেখলেই আমি একটু অন্যরকম হয়ে যাই। অতএব, ইউরোপের এই সর্ববৃহৎ মসজিদ আমি একাই আবিস্কার করতে পেরে কলম্বাসের আমেরিকা আবিস্কারের চেয়েও বোধকরি অনেক বেশী সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মেতে উঠে ওখান থেকেই ছবি তুলতে শুরু করি। চতুদির্কে গভীর জঙ্গল। কোথাও কোন বাড়ীঘর দোকান পাট কিছু নেই। এমনই একটি দুর্গম স্থানে দেওয়া হয়েছিল অসহায় মুসলিমদের মসজিদ তৈরীর জন্যে। বিশ্বের ২৩ টি মুসলিম দেশ এই মসজিদের জন্যে অর্থ যোগান দেওয়া শরীক হন। ইংরেজি অক্ষরের ক্রমানুসারে আমার বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে চার নম্বরে। আলজিরিয়া প্রথম এবং পাকিস্তানের নাম উল্লেখ আছে ১৭ নম্বরে। প্রায় ১০/১২ একর জায়গা জুড়ে মসজিদের সীমানা। চতুর্দিকে লোহার মজবুত গ্রীলের বেড়া দেওয়ায় উঁচুকরে। এক ভদ্রলোক ভিতর থেকে আমাকে বাইরে ছবি তুলতে দেখে মসজিদ ক্যাম্পাসের প্রধান গেটদিয়ে আসতে বললেন ঈষারায়। আমি তার পরিচয় জানমাল পাকিস্তানী ভদ্রলোক। আমাকে বললেন, প্রতি ঈদে চারটিকরে জামাত হয়। মসজিদের মূল ভবনে প্রায় হাজার দশেক লোকের সমাগম হয়। তবে একমাত্র জুম্মা ছাড়া অন্য কোন নামাজ পড়ার জন্যে মসজিদের নীচে তলায় ছোট আকারের মসজিদ আছে। মসজিদের ইমাম সাহেব ও মোয়াজ্জেম সাহেব এসেছেন আফ্রিকার সোমালিয়া থেকে। তাঁরা আমার সঙ্গে আরবী ও কিছু ইংরেজিতে আলাপ করলেন। মোয়াজ্জেম সাহেব আামকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন। জুম্মার নামাজ পড়ার পর তাঁদের সকল মুসল্লিদের খাবার জন্যে বিশাল আকারের সাদা টেন্টে আবৃত রয়েছে প্রকান্ড এলাকা মসজিদ চত্ত্বরের মাঝে। সেখানে অনেক চেয়ার টেবিল লাগান

www.pathagar.com

আছে। পয়সা দিয়ে নিজেরা ইচ্ছামত খাবার খেতে পারেন। আমি বহু ছবি তুললাম। অজুখানা অনেক উপরে রয়েছে। সৌদি আরবের বাদশা আব্দুল্লাহ এই মসজিদ উদ্বোধনের সময় মন্তব্য করেন, "খৃষ্টান পোপদের দেশে এতবড় মসজিদ?" অনেক মুসলিম দেশেই তো এতবড় মসজিদ নাই।"

এই মসজিদ তৈরীর পর পোপ জন পল কৌতুহল বশতঃ দেখতে এসেছিলেন নাকি এই বিশাল মসজিদ। তিনি মিনারের উচ্চতা দেখে মন্তব্য করেন, আমাদের চার্চের উচ্চতাকেও তো এটা ছাড়িয়ে গেছে। অতএব, এত উচ্চ মিনারকে ছোট করে আনতে হবে বলে দাবী করেন। তাঁর দাবী না মানার ফলে তিনি কোর্টে মামলা দায়ের করেন মিনারের উচ্চতার বিরুদ্ধে। দীর্ঘ পাঁচ বছর মামলা চলতে থাকে এবং ঐ পাঁচ বছর একটা কালো গিলাফ দিয়ে মিনারটি ঢেকে রাখা হয় কোর্টের নির্দেশে। আমি সেখানে যাওয়ার মাত্র কিছু কাল পূর্বে মামলার রায়ে মুসলমানদের বিজয় ঘোষিত হয় এবং কালো গিলাফটা তুলে ফেলা হয়। যেহেতু কোন খৃষ্টান সমাজ বা অন্যকোন অনুদানে সেটা তৈরী করা হয়নি,বরং একমাত্র মুসলিম বিশ্বের অর্থানুকূল্যেই তা তৈরী করা হয়েছে, সুতরাং তা বিধি সম্মত ভাবে ঠিকই হয়েছে এটাই ছিল ইতালীর সর্ব্বোচ্চ কোর্টের রায়। সেখানে বড় বড় করে দুটি মার্বেল পাথরের উপর আরবী এবং ইটালীয় ভাষায় উদ্বোধনী প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ পাকের নামে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে একটাতে এবং অন্যটাতে আরবী ও ইংরেজী ভাষায় যে সমস্ত দেশ এই মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশগ্রহন করেছেন সেই সমস্ত মুসলিম দেশের নাম ইংরেজি অক্ষরের ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে চমৎকারভাবে। আমি আমার সুপ্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের নিমিত্তে সেই তালিকাটিও হুবহু তুলে ধরলাম আমার তোলা ফটোগ্রাফ থেকে।

১। আলজিরিয়া
২। অ্যারাবিয়া সাউদিয়া
৩। বাহরায়েন
৪। বাংলাদেশ
৫। ব্রুনাই
৬। ইজিপট্
৭। ইমিরেটস অ্যারাবিয়া
৮। জর্ডানিয়া
১৩। মালয়েশিয়া
১৪। মরোক্কো
১৫। মৌরিতানিয়া
১৬। ওমান
১৭। পাকিস্তান
১৮। কাতার
১৯। সেনেগাল
২০। সুদান

www.pathagar.com

৯। ইন্দোনেশিয়া
১০। ইরাক
১১। কুয়েত
১২। লিবিয়া
২১। তিউনিশিয়া
২২। তুরস্ক
২৩। ইয়েমেন

২১ জুন ১৯৯৫ সালে এই সুবৃহৎ মসজিদের উদ্বোধন করা হয়। সর্বমোট ২৩টি মুসলিম দেশের কেবল নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কোন অনুদানের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি।

আমি একদিন পুনারায় STOP & GO অর্থাৎ থাম এবং যাও এই প্রোগ্রামের জন্যে রোম নগরীটাকে আবার দেখার উদ্দেশ্যে বাসযাত্রা করলাম। কিন্তু বাস যেভাবে ধীরে ধীরে যেতে আরম্ভ করল তাতে আর নেমে দেখার এবং পরবর্তী বাসের জন্য অপেক্ষা করার কোন যৌতিকতা খুঁজে পেলাম না। আসলে এটা ইউরোপের বেনিয়া জাতির একটা বাণিজ্য কৌশলমাত্র। যেটা মাত্র ২/৩ ঘন্টায় দেখা সম্ভব, সেটাই দেখতে গিয়ে সমস্ত দিনটা পার করে দেওয়ার কোন অর্থ হয় না। যেহেতু আমি নাওয়া, খাওয়া ও নামাজ পড়ার প্রয়োজন বাদ দিতে পারিনা।

অন্য একদিন রোমের দক্ষিণে অবস্থিত অন্যতম প্রধান শহর নেপলস্ এর দিকে যাত্রা করার জন্যে বের হলাম। প্ল্যাটফরম নম্বর ঠিকমত রেল কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসা করেই টিকিটটা হলুদ মেশিনে ঢুকিয়ে ১০ নম্বর প্ল্যান্ট ফরমে অপেক্ষা করছিলাম আমি এবং আমেরিকা থেকে আগত একছাত্রী পনি (Ponny) কিন্তু অন্য কোন যাত্রী বা ট্রেন না দেখে আমি পনিকে জিজ্ঞাসা করি টাইম হয়ে গেল অথচ ট্রেন তো দেখছি না। সে বলল এসে পড়বে। পরে হুইল চেয়ারে বসা এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করতেই তিনি বলেন ১১ নম্বরে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। অমনি পনি তার বিশাল বোঝাটা পীঠে ঝুলিয়ে মারল ছুট। আমিও তাকে অনুসরণ করে ছুটলাম কিন্তু হা হতস্মী, তখনই ট্রেনটা আমাদের সামান্য মাত্র ২০ হাত পিছনে ফেলে চলে গেল। এটা ছিল ইউরো স্টার ট্রেন। রিজারভেশন ছাড়া এসব ট্রেনে উঠা যায় না। আমাদের ট্রেন মিস্ যে কী বিড়ম্বনা তা আমি ও পনি টের পেয়েছি হাড়ে হাড়ে। বহু জিজ্ঞাসাবাদ ঘুরা ঘুরির পর প্রায় দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করে আমরা উঠে পড়লাম রিস্ক নিয়েই। ভাগ্যক্রমে আমি একটা সিট পেয়েই বসে পড়লাম। পনি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তার নিজের ডিব্বাতে গিয়ে একটা সিটের জন্যে চেষ্টা করে পেয়ে যায়। আমাদের উভয়েরই আশঙ্কা ছিল যে আমাদের আর ভাড়া হয়ত পেনাল্টি হিসেবে দিতে হতে পারে। যেহেতু টিকিট কাউন্টার থেকে আমাদের উভয়কে ঐ রকমই

www.pathagar.com

ভাষণ দেওয়া হয়েছিল। নেপলস্ এ নেমেই আমরা একে অপরকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি তোমাকে ফাইন দিতে হয়েছে কিনা? কোনরূপ দন্ড দিতে হয় নি জেনে আমরা দু'জনেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু পনি এখান থেকে। চলে যাবে ক্যাপ্রি (Capri) সেখানে তার সঙ্গী সাথীরা একমাসের জন্যে ট্রেনিং ক্যাম্প করে থাকতে এসেছে। পনি এসেছে আমেরিকার শিকাগো থেকে। আমি অবাক হলাম যে তাদের পড়ার জন্যে কী ধরণের ট্রেনিং গ্রহন করতে হয়! যেমন ব্যয়বহুল তেমনি কষ্টসাধ্য। যা আমাদের মত গরীব দেশে চিন্তাই করতে পারিনা। আমি পনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শহরটা দেখার জন্যে চলে যাই। কিন্তু একটু একটু বৃষ্টি নামে, তা সত্ত্বেও আমার হাতে যে অল্প সময় আছে তার সৎব্যবহার করে আজই রোমে ফিরে যেতে চাই। সেখানেও দেখি ফ্লোরেন্সের মত কেউ ইংরেজি বলতে চায় না। বরং আমার ইংরেজি বলা শুনে দূর দূর করে তেড়ে আসল এক স্টেশন মাস্টার একজোড়া ছেলে মেয়েকে কিছু কথা ইংরেজি জিজ্ঞাসা করতেই মেয়েটি আমাকে বললো- If you speak English then go to England"। ছেলেটি কিছু বলেনি। বুঝলাম যে নিজেরা ভাল ইংরেজি জানলেও অপরের মুখে ইংরেজি শুনতে মোটেই পছন্দ করেনা। সম্ভবত বৃটেন বাসীদের প্রতি তাদের বেশ কিছু অবজ্ঞা আছে।

আমি বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে একটা টিকিট স্থানীয় দোকান থেকে কিনে বাসে উঠি। উদ্দেশ্য ফ্লোরেন্সের মতই পুরো শহরটা একপাক ঘুরে দেখা এবং দর্শনীয় স্থান গুলির ছবি তোলা। কিন্তু মাত্র ১০/১৫ মিনিট বাসটি চলার পর পথের ধারে হঠাৎ থেমে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সব যাত্রী একে একে নেমে যায়। এমন কি চালকও এক পর্যায়ে নেমে যায়। অতএব, আমিও শেষে বাধ্য হয়ে নেমে দেখি, গাড়ীর পিছনে সমস্ত তেল পড়ে গেছে। আমি কী করব কোন দিকে যাব ভাবছি। এমন সময় একটা সোমালিয়ার ব্যবসায়ী মুসলিম ছেলে তার বিরাট বোঝা নিয়ে রাস্তার এক ধারে অপেক্ষা করছিল। কালোরা সকলেই ভাল, ইংরেজি জানে, এবং বিদেশীদের সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহার করে। আমি তাকে আমার অসুবিধার কথা জানালে সে আমাকে পরামর্শদেয় রেল স্টেশনে ফিরে যাওয়ার জন্যে। কারণ এই শহরটা তেমন সুবিধার নয়। বিশেষত বিদেশীদের জন্যে। আরও বলল, মেয়েদের থেকে খুব সাবধানে থাকতে। কেনা না ২/৩ টি মেয়ে কাছাকাছি এসেই পকেটে হাত ঢুকিয়ে সবকিছু বের করে নিবে। অতএব, দু'টো হাতে তো আর ছটা হাত আটকে রাখা যাবে না। এখানকার মেয়েরা খুবই বদ। শহরটাও বেশ নোংরা মনে হল। আমি ফিরতি বাসে উঠে রেল স্টেশনে চলে এলাম। এবং টিকিট কাউন্টারে দাঁড়িয়ে থাকার সময় একটা

www.pathagar.com

বৃদ্ধার হাত আমার কোটের বাঁ পকেট স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমি হাত ঝাড়া দেই। মহিলা তার ভাষায় আমার উদ্দেশ্য যা বলল, মনে হয় তার অর্থ তুমি মনে করেছিলে তোমার পকেটে হাত দিচ্ছি। তা নয়, আমার হাতটা হঠাৎ চলে গিয়েছিল।

রোমে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। তবুও হোটেলে গিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করলাম। সেদিন ঐ মসজিদ থেকে ফিরার পথে মনটা এমনই ভাল ছিল যে পথের ধারে এক ফেরিওয়ালার নিকট চমৎকার কিছু খেলনা দেখে ভাল লাগল। লোকটির বাড়ী নোয়াখালী, নাম আলাউদ্দিন। সে দেখি খুবই সুন্দর একটি বড় ইটালীয়ান ঘোড়া, আস্ত হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরী একটি হরিণ এবং এধরনের বিড়াল, ইদুর ইত্যাদি অনেক প্রকারের খেলনা সাজিয়ে রেখেছে বিক্রির জন্যে। আমি যেটা দেখি সেটাই ভাল লাগে। শেষে বেশ ডজন খানিক খেলনার মূল্য জিজ্ঞাসা করায় সে একটা করে দাম শুনাতে লাগল। আমি তাকে বাধা দিয়ে বলি এই সবগুলি খেলনার দাম একবারে বল। পৃথক পৃথক ভাবে বলার দরকার নেই। সে পাইকারী ভাবেই একটা মূল্য বলল। আমি কিছু কমকরে বললে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমি কী করি? আমি উত্তরে বলি এক সময় শিক্ষকতা করেছি দীর্ঘ কাল। সে বলে, আমার আব্বাও স্কুলের হেড মাস্টার ছিলেন। ঠিক আছে আপনি যা পারেন দেন। আমি তার মূল্য পরিশোধ করলে, সে একটা বড় পলিথিন ব্যাগে সমস্ত খেলনা গুলি ভরে ফেলে আমাকে বলে, একটু সাবধানে নিবেন। কারণ ঘোড়ার পা হরিণের শিং ভেঙ্গে গেলে এটার আর কোন সৌন্দর্য থাকবে না। আমি তাকে বলি ২/৩ দিন পরই বিমানে সুইডেন ফিরে যাব। আমাকে তার এত পছন্দ হয়ে গেল, যে সে আমার হোটেলের কার্ড নিল। আমাকে বলল আমি কাল সকালেই আপনার হোটেলে দেখা করব।

বাস্তবিকই পরদিন সকালে আলাউদ্দিন আমার হোটেলে সকালেই চলে আসে। আমি তাকে আমার ব্রেকফাস্ট দিয়ে আপ্যায়িত করি। আমার হোটেল ওয়ালা আমাকে বার বার হোটেল ত্যাগ করতে বলে। কিন্তু দু'দিন দু'দিন করে বাড়িয়ে ৭/৮ দিন কাটিয়ে দেই। পরে সে তার পিতার হোটেল ওয়াশিংটনে (Wasington) যাওয়ার জন্যে আমাকে অনুরোধ করে এবং বলে যে ঐ হোটেল এটার চেয়ে অনেক ভাল এবং ভাড়াও বেশী। কিন্তু আপনি এখানে যে দৈনিক ৫০ ডলার ভাড়া দিতেন, ওখানেও তাই দিবেন বলে আমি তাদের রাজি করিয়েছি। তাছাড়া এটা রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডের একেবারে নিকটে আপনার অনেক সুবিধা হবে। তার কথায় আমি সম্মত হই এবং বলি আগামীকালই এ হোটেল ছেড়ে দেব। ইতোমধ্যে আলাউদ্দিন

www.pathagar.com

আমার কাছে এসে বলে আপনি এতমাল একসঙ্গে কীভাবে ঐ হোটেলে নিবেন? অতএব, আমিই আপনাকে সাহায্য করব।

আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে কিছু কেনাকাটা করার জন্যে বেরিযে যাই। সে দীর্ঘ সময় আমাকে অনেক দোকান ঘুরিয়ে দেখাল এবং আমি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনি। সুইডেনে প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোন ওষুধ বিক্রি করে না। মনসুর সাহেবের ছোট মেয়ে জেনিফারের একটা ওষুধ সুইডেনে কোথাও পাওয়া যায়নি। আমি প্রথমে রোমে এসে পরের দিনই সেই ওষুধ পেয়ে যাই। তাছাড়া রোমে প্রচুর ওষুধের দোকান রয়েছে। ফাহিমের কিছু ওষুধ এবং আমারও বেশ কিছু ওষুধ কিনি।

আমি রোমে একজন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি যে প্রেসক্রিপশন ছাড়া আপনারা কীভাবে ওষুধ বিক্রি করেন? তিনি বলেন যে, বিদেশীদের ছাড়া এখানকার স্থানীয় লোকদের নিকট অবশ্যই প্রেসক্রিপশন ছাড়া ওষুধ বিক্রি করিনা। ওখানে, যেখান থেকে আমি প্রতিদিন যুগান্তর পত্রিকাটা কিনতাম; সেই দোকানের দু'ভাই আমাকে তাঁদের একটা নতুন 'টেস্ট অব বাংলা রেস্টুরেন্ট' উদ্বোধন করা উপলক্ষে একটি মিলাদ মাহফিলে আসার জন্যে দাওয়াত দেন। প্রতিদিন যুগান্তরে পক্ষকাল ধরে ঐ মিলাদের জন্যে আমন্ত্রণ জানান হতো। তা সত্ত্বেও তাঁরা আমাকে আলাদাভাবে একটি নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে ভালভাবে দাওয়াত করেন এবং বলেন, আপনি পাঁচটার সময় চলে আসবেন। এবং সেদিন তাঁরা আমার নিকট থেকে পত্রিকার ১ ডলার মূল্য ফেরত দেন। বলেন আপনি বিশ্বপর্যটক, অতএব আজ আর টাকা নেবনা।

এবার আলাউদ্দীনকে সঙ্গেঁ নিয়ে আমার হোটেল ত্যাগ করি। সে বেচারা আমার ভারী বোঝাটাই নিজে নিল। আমাকে কিছুতেই নিতে দিলনা। প্রায় ১/৩ কি: মি: দূরে হোটেল ওয়াশিংটন। আমি পূর্বেই হোটেল দেখে পছন্দ করেছিলাম। এবার সেখানে খুব বড় একটা হল ঘরে দুটি বিছানা থাকা সত্ত্বেও আমি একটিতে আশ্রয় নেই। অন্যটা খালি থাকে। আলাউদ্দীন আমাকে একেবারে আমার রুমে মালপত্র উঠিয়ে দিয়ে বিদায় নেয়। বেশ ভাল লোক, বেচারা পেটের ধান্ধায় এই দূর দেশে পড়ে রয়েছে। ওখানে বহু বাঙ্গালীর নাগরিকত্ব না থাকায় চাকুরীর তেমন সুবিধা নেই। তাই তাদের নেতা দেলওয়ার সাহেবকে অনেক ব্যস্ত থাকতে হয়েছে বিধায় তিনি আর আমার কাছে আসতে পারেননি। রোম থেকে চলে আসার পূর্বদিন আমার ইচ্ছা ছিল ম্যাপ দেখে পুরো শহরটা শেষ বারের মত পায়ে হেঁটে দেখার। কিন্তু সেইদিনই বিকেল পাঁচটায় মিলাদের নিমন্ত্রণ থাকায় ঐ ঘুরে দেখার প্রোগ্রাম বাদ দেই। ইটালীতে প্রচুর গাড়ী যা রাস্তার ধারেই পার্ক কথা থাকে। প্রতিটি রাস্তার পাশে

www.pathagar.com

ফুটপাতের কিছুটা উপরে গাড়ী রাখা হয় সারি সারি। আমার মনে হয়, ইউরোপের অন্য কোন শহরে একসঙ্গে এত গাড়ী বোধ হয় দেখিনি। অথচ কোন ট্র্যাফিক জ্যাম কোথাও চোখে পড়েনি। আমি হঠাৎ দেলওয়ার সাহেবকেই জিজ্ঞাসা করি এখানে কয়টি গাড়ী তৈরীর কারখানা আছে? তিনি বলেন পাঁচটি ফিয়াট থেকে ফেরারী। সর্বনিম্নমূল্য মাত্র ১০,০০০/- ইউরো দিলেই আপনাকে ব্র্যান্ড নিউ কার দিয়ে দেবে। সর্বোচ্চ মূল্যের গাড়ী ফেরারী। কোথাও কোন গ্যারেজের অবস্থান লক্ষ্য করলাম না। ইটালীতে তেমন শীত বোধ করিনি অথচ প্রত্যেকেরই একটি সোয়েটার অথবা কোট গায়ে থাকে। আমি পুলওভারের উপর কোট পরতাম এবং ঘেমে যেতাম। ওরা বলে ইউরোপের শীত খুবই খারাপ। একবার ধরলে সহজে আপনাকে ছাড়বেনা। আমাদের গায়ের গেঞ্জি বার বার বদলাতে হয়। সুইডেনের তুলনায় শীত খুব কম লক্ষ্য করেছি ইটালীতে।

ওয়াশিংটন হোটেল থেকে সকাল ৯ টায় রাস্তায় নামতেই দেখি ৬-৭ মেয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে ধরতে চায় সাহায্যের জন্যে হাত বাড়িয়ে। আমি দৌড়ে অন্য দিকে চলে যাই। পরের দিন ঠিক বিকেল পাঁচটায় আমি হোটেল ওয়াশিংটন থেকে মিলাদ শরীফের উদ্দেশ্যে সুট পরে মাথায় কাদেরীয়া টুপী দিয়ে ক্যামেরাসহ টেস্ট অব বাংলা রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হই। হাজেরাণে মাহফিল তখন মাত্র জনাকয়েক। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই আস্তে আস্তে লোক সমাগম হয়। অথচ মিলাদ পড়ার জন্যে মৌলভী সাহেবের তখনও কোন দেখা নাই। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি ব্যাপার কী মৌলভী সাহেব কোথায়? তাঁরা বলেন আসবেন, তবে পারলে আপনিও শুরু করতে পারেন। মিলাদ শরীফ বহু প্রকারের আছে। যেমন মিলাদুন্নবী, মিলাদে গাউসিয়া, মিলাদে সা'দী, মিলাদে শেখ বরহকে ইত্যাদি সবগুলিই আমি পড়েছি। কলেজ জীবন থেকে মিলাদ খাঁ হিসেবে। অতএব, এখানে এই বিদেশ বিভূঁয়ে মিলাদ শরীফ পাঠ করার এমন সৌভাগ্য আমার হবে তা কখনও ভাবিনি। অবশ্য সুইডেনে আমার মেয়ের বাসায় কয়েকবার মিলাদপাঠ করেছি। আমার ঠিক বামপাশেই বসে আছেন জনৈক আফগান ভদ্রলোক তাঁর ছেলেরা বা নাতিদের নিয়ে। আমি মহান আল্লাপাকের অসীম প্রশংসা কীর্ত্তন করে মিলাদ শুরু করলাম। বহু লোক, হল ভর্তি হয়ে যাওয়ায় আমি উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াজ করি। ফাওয়ের (FAO) ড. আব্দুর রাজ্জাক সাহেব আমার সম্মুখেই বসে ছিলেন। জনৈক বাঙ্গালী এ্যাডভোকেট সাহেবও বেশ সুন্দর বক্তৃতা করেন। ইতিমধ্যে আমার ক্যামেরাটি নিয়ে এক ভদ্রলোক বেশ কয়েকটি স্ন্যাপ নিয়ে নেন। প্রায় শতাধিক

www.pathagar.com

লোকের সমাগম, আমাদের ওয়াজের শেষের দিকে হঠাৎ দেখি এক মৌলভীসাহেব দু'চারজন লোকসহ মাহফিলে আগমন করেন। আমি তাঁকে এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করি আপনার এত বিলম্বের কারণ? তিনি বলেন, দাওয়াত দিয়ে আমাকে ছ'টার দিকে আসতে বলা হয়েছে। ফলে, আমি ঠিক সময়েই এসেছি। আমি বললাম আমাকে তাহলে পাঁচটার দিকে বললেন কেন, বুঝলাম না। যাহোক, আমি শেষ করলাম, আপনি দয়া করে শুরু করুন। যেহেতু মাগরিবের সময় খুব বেশী বাকী নেই। মৌলভী সাহেব আমার মতই আবার কিছুক্ষণ বললেন। পরিশেষে, আমি তাঁকে মোনাজাত করার জন্যে অনুরোধ করলে তিনি বলেন, মোনাজাতটা আপনিই করবেন। কেননা আপনি তো এখানে মুসাফির। আর মুসাফিরের দোয়া আল্লাহ্ পাক কবুল করেন। বিধায় আমাকেই শেষে আরবী, ফারসী ও উর্দূ ভাষায় এক দীর্ঘ মোনাজাত করতে হল। যেহেতু দুর্বল বাংলা ভাষায় আমি উত্তমরূপে মোনাজাত করতে অপারগ। এরপরই মাগরিবের নামাজ শুরু হয়ে যায়।

ওদিকে বেশ কিছু বাঙালী ভাইদের স্বভাবজাত কায়দায় তাবাররুক নিয়ে হুটো পুটি শুরু হয়ে যায়। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও নাকি ধান ভাঙ্গেঁ। বাংলার এই প্রবাদ বাক্যটির যথার্থতা উপলব্ধি করলাম। নামাজ শেষে আমরা ক'জন খেতে বসলাম। আমাকে জোর করে আর এক প্যাকেট চিকেন বিরিয়ানী তাঁরা নিতে বাধ্য করলেন। ঐ আফগান বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার হোটেলের রুম নম্বরটা জেনে নিলেন। আমি আগামীকাল ভোরে রোম ত্যাগ করব তাও শুনলেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন আমার মিলাদের বেশ উপযুক্ত শ্রোতা। আমি হোটেলে ফেরার পথে একটা স্প্রাইট কিনে খেলাম। যা ওখানে লুটপাটের মধ্যে আগেই শেষ হয়ে যায়। হোটেলে এশার নামাজ পড়ে বিছানায় গিয়েই শুনি ফোন বাজছে। আমার মেয়ে শাহীন সুইডেন থেকে ফোন করেছে। সে বলল, 'আপনি এয়ারপোর্টের' ভিতরেই অপেক্ষা করবেন। রুমী গোথেনবার্গ এয়ারপোর্ট পৌছাতে সামান্য বিলম্ব হতে পারে। তাছাড়া সুইডেনে বেশ বরফ পড়তে শুরু হয়ে গেছে। আমি বিরিয়ানীর প্যাকেটটা টেবিলে রেখেছিলাম। রুমের স্বাভাবিক ঠান্ডায় সেটা ভালই ছিল। সুইডেনে ওদেরকে সেটা খেতে দিই, তারা সকলেই ভারী খুশী বিরিয়ানী খেয়ে।

গোথেন বার্গে থাকার সময় আমাদের ভিসা বাড়িয়ে নেয় শাহীন, যেহেতু আমাদের ইউরোপের আইস দেখা হয়নি তখন পর্যন্ত। এবার ভিসা বাড়াবার সময় দু'হাজার ক্রাউন ফি জমা দিতে হল। শাহীনকে এবং আমাকে সেই মহিলা অফিসারটি বলেন'তোমার মেয়ের কথা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু যে আইস দেখার

www.pathagar.com

জন্যে তোমরা এখানে থাকছ এবার আইস নাও তো পড়তে পারে। আমরা বলি সেটা আমাদের ভাগ্য বলে মেনে নিব। এবং তখন এদেশ ছেড়ে চলে যাব। আমরা বাংলাদেশ থেকে মাত্র দু'মাসের ভিসা নিয়ে গেলেও কার্যত আমাদের সেখানে দীর্ঘ ৯ মাস থাকতে হয়েছে।

সবচেয়ে ভাল লেগেছিল আমাদের রোজার মাসের সময়টা। তখন নভেম্বর মাস প্রচন্ড শীত বাইরে। এবার কিন্তু সেপ্টেম্বর মাস থেকেই হঠাৎ আইস পড়তে শুরু হয়ে যায়। যা সাধারণত খুবই কম সময় লক্ষ্য করা গেছে অন্যান্য বছরে। রোজার সময় আমি জুম্মার নামাজ পড়তে যেতাম বাক্কা প্লনে। বরফের উপর দিয়ে বাক্কা প্লন থেকে হেঁটে প্রায় এক কি: মি: যেতে হত মসজিদে। আমি তুর্কীদের সঙ্গে নামাজ পড়তাম। জুম্মার নামাজের পর ওখানেই কোরআন শরীফ তেলাওয়াতের মাত্র আধঘণ্টা পরেই আসর নামাজের ওয়াক্ত হয়ে যেত। আবার বাসে করে বাসায় ফিরেই দেখি ইফতারের সময় হয়েছে। এরপরই মাগরিবের নামাজ এবং ঘন্টা খানেকের মধ্যেই এশার নামাজের সময় হয়ে যায়। আমি ওখানে ঐ মসজিদ থেকেই ছাপান নামাজের সময়সূচী মোতাবেক নামাজ আদায় করতাম। রমজানের পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজ আমি রুমীসহ বহু বিদেশী মুসলিম ভাইদের সঙ্গেঁ অত্যন্ত আনন্দ পরিবেশের মধ্যে নামাজ আদায় করে মহান আল্লাহ্ পাকের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া ও সিজদা জ্ঞাপন করি। নামাজের আগেই ফিতরার টাকা প্রায় সকলেই দান করেন। আমি বহু বিদেশী মুসলিম ভাইদের সঙ্গেঁ মুসাফা বা করমর্দন ও আলিঙ্গন করি। যেহেতু আমি দীর্ঘদিন ঐ মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করেছি তাঁদের সঙ্গেঁ, সেই হিসেবে আমি অনেকটা তাঁদের পরিচিত হয়ে গিয়েছিলাম ভালভাবে। জুম্মার নামাজে আমি প্রথম সারীতে বা কাতারে ইমাম সাহেবের বেশ নিকটেই থাকতাম। নামাজের পূর্বে তুর্কী ভাষায় কেউ কেউ খুব চমৎকার ওয়াজ করতেন দীর্ঘক্ষণ ধরে। আমি সবটা না বুঝলেও অনেকটা আন্দাজ করতে পারতাম বক্তব্যের বিষয়াবলী। তুর্কী ভাষা বেশ তেজস্বী ও জজ্বা পূন্য মনে হয়েছে আমার নিকট। এই এলাকাতেই আরও দুতিনটি মসজিদ ধারে কাছে ছিল। সেখানেও দু'একবার জুম্মার নামাজ পড়েছি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে আমাকে এই তুর্কীদের মসজিদটাই বেশী ভাল লেগেছে। তাঁরা যথেষ্ট অভিজ্ঞ বলে আমার বিশ্বাস।

মনসুর সাহেব ও তাঁর স্ত্রী বীনা এবং ছোট্ট মেয়ে জেনিফার। আমাদের এই পরিবারের সঙ্গেঁ খুববেশী হাবভাব থাকায় তাঁরা আমাকে নিয়ে একদিন রাতে একটা বৃহৎ স্টেডিয়ামের ভিতর আইস স্কেটিং দেখাতে নিয়ে যান। ছোট থেকে একটু বড়

www.pathagar.com

বয়সের বিভিন্ন গ্রুপের ছেলে মেয়েরা অত্যন্ত চমৎকার আইস স্কেটিং এর মাধ্যমে বহু রকমের কলা কৌশল দেখাল যা বাস্তবিকই খুবই দৃষ্টি নন্দন। আমি বেশ কিছু ছবি তুলেছিলাম তাদের বিভিন্ন ক্রীড়া নৈনৃণ্যের দৃশ্যাবলীর। সমস্ত স্টেডিয়ামে কীভাবে বরফ জমাতে হয় এবং কিছু কিছু খেলার পর আবার মেশিনের সাহায্যে নতুন ভাবে বরফ জমিয়ে স্কেটিং ফ্লোর তৈরী করা হয় দেখলাম। আমি কেবল সুট পরে গেছিলাম, লেগিন্স অর্থাৎ ট্রাউজার না পরে থাকায় বেশ শীত লাগছিল।

অন্য একদিন গ্রীষ্মকালে আমি, রুমী, মুসনুর সাহেব। জেনিফার ও আমার নাতনী মোনামীসহ বেশ দূরে এক শহর সামারল্যান্ডে চলে যাই তাদের বিচিত্র ধরণের গোসল করার অনেক অভিনব আকারের কলা কৌশল দেখার জন্যে। এছাড়াও বহু প্রকারের যান্ত্রিক ও ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের, মাধ্যমে গাড়ী চালনা, নাগর দোলা, ট্রেন ও মোটর কার নিজে চালিয়ে ঘুরে বেড়ান ইত্যাদি দেখতে। মাত্র একবারই টিকিট কেটে ভিতরে প্রবেশ করার পর আর কোন টিকেট কাটতে হয় না। সেখানে আনন্দ এবং হৈ হুল্লোড় দেখে আমার হঠাৎ করে কিয়ামতের ময়দানের কথা স্মরণ হয়। রোজ হাশরের দিন যখন সব মানুষকে কিয়ামতের ময়দানে উঠানো হবে, তখন সকলেই থাকবে উলঙ্গ অথচ কেউ কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করার ইচ্ছা বা অবকাশ কোনটাই থাকবেনা। এখানেও অনেকটা সে রকমই মনে হল আমার। সব বয়সের নারী পুরুষ অর্দ্ধউলঙ্গঁ ভাবে জল কেলীতে এতই মগ্ন যে, তাদের প্রতি যে আর কারো দৃষ্টি পড়তে পারে যা বাস্তবিকই অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। এ বিষয়টা তাদের নিকট একেবারেই গৌন।

রুমীর খুবই ইচ্ছা ছিল যে তার খালার সঙ্গেঁ আমাদের সকলকেই জার্মানীর কিছু শহর দেখান, তার নতুন গাড়ীতে যেহেতু তার খালা অর্থাৎ আমার স্ত্রী কোথাও আমার সঙ্গেঁ যেতে পারলেন না তাঁর পায়ের ব্যাথার জন্যে। অবশ্য সুইডেনে তাঁর পায়ের ব্যাথার চিকিৎসা শাহীন বহুভাবে বহু ভাল ডাক্তারের মাধ্যমে সারাতে মোটেই ক্রুটি করেনি। কিন্তু আশানুরূপ তাঁর উপকার হয়নি। ফলে একমাত্র মোটর কার ছাড়া এ ধরনের ভ্রমণের আর কোন বিকল্প পথ তাঁর জন্য খোলা ছিল না। আমি রুমীকে প্রস্তাব দিয়েছিলাম তুমি যদি গাড়ী নিয়ে জার্মানী যেতে চাও, তবে একটা খরচ আমি বহন করব। সেটা গাড়ীর ফুয়েল অথবা আমাদের সকলের হোটেল খরচা। যেটা তুমি পছন্দ কর সেটাতেই আমি রাজি। কিন্তু রুমী অসুস্থতার কারণে দীর্ঘ ছুটি ভোগ করার ফলে, তার অফিস ছুটি মঞ্জুর না করায় বেচারা অপারগতা প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া বরাবরই ভাল স্পোর্টসম্যান হিসেবে তার নাম ডাকছিল। এসব ধরনের

www.pathagar.com

ভ্রমণে তার যথেষ্ট উৎসাহ আমরা লক্ষ্য করেছি গভীরভাবে। এই প্রকারের খরচ প্রত্রাদিতেও সে বেশ মুক্তহস্ত। যার ফলে গোথেনবার্গের আশেপাশের কোন এলাকায় সে আমাদের দেখাতে বাকী রাখেনি।

বীনা মা আমার জন্য একটি চমৎকার ডিজিটাল মেশিন উপহার দেয় আমার ডাইবেটিসের মাত্রা মাপার জন্যে। বহুদিন ধরে সেটা আমি এখনও ব্যবহার করছি। এ জন্যে আমি তাদের আন্তরিক ভাবে দোয়া করি। শেষ বারে সুইডেন থেকে আসার সময় মনসুর সাহেব আমাকে একজোড়া দামী কাফলিং ও টাই ক্লিপ উপহার দেন।

গ্রোলহাসানের ইউনুস সাহেব বহুদর্শী মানুষ। পৃথিবীর বহু দেশ তিনি ঘুরে ফিরে দেখে এসেছেন। আমার ইটালী ভ্রমণের পর তিনি আমাকে বলেন, 'খালুজান আপনি তো খৃষ্টানদের তীর্থস্থান ঘুরে এলেন। আসলে আপনার যাওয়া উচিৎ ছিল স্পেন। মুসলমানদের নিকট ইউরোপীয়রা যা কিছু ভাল শিক্ষা করেছে তা দেখার একমাত্র [illegible] সুযোগ ছিল স্পেনে। বাস্তবিকই তাই। আমি ছাত্রাবস্থায় পড়েছিলাম| 'Moors [illegible] Spain' অর্থাৎ স্পেনে মূরসরা প্রায় দীর্ঘ ৭০০ বছর রাজত্ব করেছিল খুবই প্রতাপের সঙ্গে। তখন তারা রাজধানী কর্ডোভাসহ বহু উন্নত মানের মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন স্থাপন করেছিল সর্বত্র যা ইউরোপের জন্য একটা বিশেষ শিক্ষনীয় ব্যাপার ছিল। পরে অবশ্য ১৪৯২ সালে কিং ফার্ডিন্যাড ও রাণী ইসাবেলার সহায়তায় খৃষ্টানরা সেগুলি দখল করে নেয়, সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। অতি চমৎকার মসজিদ গুলিকে তারা চার্চে রূপান্তরিত করে।

আমি জনাব ইউনুস সাহেবের কথামত স্থানীয় লাইব্রেরী থেকে সারা বিশ্বের যত ভিডিও ভিজিট করা হয়েছে প্রায় সব গুলি একে একে এনে বাসায় টিভিতে দেখি। যেমন মিশর, অষ্ট্রেলিয়া আফ্রিকা, তুরষ্ক, গ্রীস, রাশিয়া আমেরিকার বহু শহরের, পৃথক পৃথক ভিডিও ভিজিট দেখে আমিও আমার স্ত্রীর ভ্রমণের স্বাদ গ্রহণ করি। তাছাড়াও ঐ লাইব্রেরী থেকে বহু মূল্যবান বই পুস্তক পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। টিভিতে ইন্টারনেটে দেশবিদেশের বহু পত্র পত্রিকা বিশেষত বাংলাদেশের অনেক পত্রিকা পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম বাসাতে এবং লাইব্রেরীতেও। বিদায় কালেই ইউনুস সাহেব আমাকে দামী Parker কলম এবং Parker Pencil Set উপহার দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেন।

www.pathagar.com

চতুর্থত্রিংশ পর্ব

জার্মানী

রাজধানীর নাম	ঃ	বার্লিন (Berlin)
জনসংখ্যা	ঃ	৮১.৯ মিলিয়ন
স্থল ভাগের সীমানা	ঃ	৩,৫৭,০২১ বর্গ কি: মি:
মুদ্রার নাম (বর্তমানে)	ঃ	ইউরো
ভাষা	ঃ	জার্মান
মাথাপিছু জিডিপি	ঃ	২৮,৮৭০ ইউ এস ডলার
গড় আয়ু	ঃ	৭৬ বছর।

জার্মানীর রাজধানী বার্লিন দেখার জন্যে আমি বেশ উতলা হয়ে উঠি। আমার এ অবস্থা লক্ষ্য করে শাহীন ইন্টারনেটে আমার যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে। সে হিসেব করে দেখে, যে টাকা আমার এখনও তার নিকট জমা আছে, তাতে আমি স্বাচ্ছন্দে জার্মানী ঘুরে আসতে পারি। অতএব, পবিত্র রমজানের পূর্বেই আমার জার্মান ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আমি সড়ক পথে বেরিয়ে পড়ি। বালটিক সাগরের উপর দিয়ে জাহাজে যাওয়ার সময় আমার নিকট ছিল সেই সিগারেট কেনার জন্যে একটি কুপন। আমি যেহেতু অধূমপায়ী, সেহেতু ওটির কোন মূল্য আমার নিকট শূণ্য। তবুও জাহাজে কাকে কুপনটি দেওয়া যায়, আমি এমন কাউকে যেন খুঁজছিলাম। হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে এক কোনায় বসে সিগারেট ফুঁকছে। আমি তাকে ওটি নেবে কিনা প্রস্তাব দিতেই সে খুঁবই আগ্রহের সঙ্গে নিল এবং তখনই সে নির্দিষ্ট দোকানে গিয়ে সিগারেট কিনে এনে চা-সহ আমার সম্মুখে বসল। আমিও এক কাপ চা নিয়ে বসে পান করছিলাম তখন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করি তোমার নাম কি? বাড়ী কোথায় ইত্যাদি? সে উত্তরে বলে তার নাম ইরিনা (Irina) বাড়ী রাশিয়ায়। আমি তার রাশিয়ায় জন্ম শুনে আবার কৌতুহল বশত জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তুমি এত ভাল ইংরেজি বল কীভাবে? সে

www.pathagar.com

বলে কেন আমি তো লন্ডনে লেখাপড়া করেছি। আমি জানতে চাই এখন কী পড়। সে জবাব দেয় পি এইচ ডি করছি জার্মানীর বুন্ডেল বার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার আমি জানতে চাই তোমার বিষয়বস্তু কী? সে চটপট উত্তর দেয় ম্যাথ, অর্থৎ ম্যাথমেটিক্স।

আমি তার সঙ্গে গল্পের ছলে বলি, তুমি যদি কিছু মনে না কর তবে আমি বলি। আমি দীর্ঘ তিরিশ বছর এক নাগাড়ে শিক্ষকতা করেছি স্থাপত্য কৌশলের উপর। অতএব, আশাকরি আমি তোমার বিষয়ের উপরেই কি ছোট্ট একটা প্রশ্ন করতে পারি? সে বলে অবশ্যই পার। তখন একটা অঙ্কের আমি মাত্র কিছুটা বলতেই, সে হেসে ফেলে বলে তুমি এটা করেছ ঘোড়া দিয়ে আর আমি এটা শিখেছি উট (Camel) দিয়ে। আমি তাকে বলি তুমি বেশ বুদ্ধিমতী আছ দেখছি। সুতরাং আমাকে একটু সাহায্য কর দেখি। আমি মাত্র ২/৩ দিনের জন্যে বার্লিন যাচ্ছি। সেখানে এত অল্পসময়ের মধ্যে একটা টুর প্রোগ্রাম তৈরী করে দাও, যাতে আমি উল্লেখযোগ্য স্থানগুলি দর্শন লাভে বঞ্চিত না হই। সে তখনই একটা কাগজে সুন্দর হস্তাক্ষরে উভয় পৃষ্ঠায় একটা চমৎকার প্রোগ্রাম তৈরী করে দিল আমার হাতে। সে জার্মানীতে কয়েক বছর আছে। তার তৈরী করা এই টুর প্রোগ্রামটা আমার খুবই কাজে লেগেছিল। জার্মানী সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি নিম্নরূপঃ-

বালটিক সাগর পাড়ি দিয়ে যখন আমাদের বাসটি জার্মান এলাকায় প্রবেশ করে, তখন আমি জানালার পাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখছিলাম ভূ-প্রকৃতির প্রতি। কোথায় কোন পাহাড় বা পর্বত নজরে পড়ল না বরং সমতল ভূমি সর্বত্র বিরাজ মান এবং চাষাবাদের জন্যে যোগ্য ভূমি ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে বলেই আমার নিকট প্রতীয়মান হল। তখনই আমার মনে এধারণাও হল যে, সম্ভবত এদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

রাস্তাগুলি এতই সুন্দর এবং রাস্তার উভয় পার্শে লোহার পাত দিয়ে বেড়া রয়েছে যাতে গাড়ী গতি সীমার বাইরে ছিটকে পড়ে রাস্তার ওপাশে গিয়ে পড়তে না পারে। ঠিক এই ব্যবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছিলাম, যখন ১৯৯৬ সালে আমরা জর্ডানের সীমান্ত ছাড়িয়ে ইরাকের সীমান্তে প্রবেশ করি। বাগদাদ শরীকের বিভিন্ন রাস্তায় চলতে ফিরতে জনাব মতিন হায়দার চৌধুরী হঠাৎ মন্তব্য করে আমাকে বলেন, আজিম ভাই এমন সুন্দর রাস্তা তো আমরা আমেরিকাতেও দেখিনি। জার্মানীর রাস্তা

www.pathagar.com

দেখে আমার স্মৃতিপটে ঐ কথা মনে হয়। স্থাপত্য কৌশলের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে রোডস্ এন্ড হাইওয়েজ ছিল আমার অন্যতম প্রিয় বিষয়। এই বিষয়ের উপরে আমি একক এবং যৌথভাবে কিছু প্রকাশনায় জড়িত ছিলাম।

আমরা বার্লিন শহরের প্রায় কেন্দ্রস্থলে হোটেল অ্যাগন (Agon) এ বেলা ১০ টার দিকে অবস্থান গ্রহণ করি। আমার রুমটা ছিল একটি কর্ণারে রাস্তার ধারেই। রুম নং ১০১। ইউরোপের অন্যান্য যে সব হোটেলে আমি অবস্থান করেছি, তার মধ্যে এটিই ছিল সর্বোত্তম। পাঁচ তারকা মার্কা হোটেল না হলেও অনেক সুযোগ সুবিধা ছিল এখানে।

হোটেল রুমে ঢুঁকে চমৎকার ধপধপে সাদা দুটি বিছানা দেখে বেশ ভাল লাগল। বেশ প্রশস্ত বড় কামরা সঙ্গে রয়েছে ইলেক্ট্রনিক ওভেন, বড় টেলিভিশন, টেলিফোন ইত্যাদি ছাড়াও সম্মুখে রাস্তার ধারেই বড় ব্যালকনি। প্রথমেই বাথরুমে গিয়ে গোসল ইত্যাদি সেরে ফেলি। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, উদ্দেশ্য বাইরের যতখানি দেখা যায় পায়ে হেঁটে। শহরের প্রতিটি রাস্তা ও ফুটপাতগুলি অতি প্রশস্ত, পরিষ্কার, প্রচুর গাছ-পালা লাগান আছে বেশ সুবিন্যস্তভাবে যা অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সর্বক্ষণ।

আলেকজান্ডার স্কয়ারে অবস্থিত রয়েছে বিশ্বঘড়ি (World Clock)। পৃথিবীর যাবতীয় বড় বড় শহরের সময় নির্দেশ করছে এই বিশ্বখ্যাত ঘড়ি চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে। এর পাশেই রয়েছে সর্বোচ্চ (৩৭ তলা) হোটেল ফোরাম। জার্মানীর সর্বোচ্চ ককটেল বার এই হোটেলের মধ্যেই অবস্থিত। আমি সারাটা বিকেল এবং সন্ধ্যার কিছুটা সময় ঘুরে ঘুরে এক নজরে যা দেখা যায় দেখে নিলাম। কেননা, রাতের জার্মানীর রূপ তো অন্যরকম, তাই সে দৃশ্যও বেশ কিছুটা উপভোগ করলাম।

রাতের খাবারের জন্যে হোটেল বা রেস্টুরেন্ট খুঁজে বের করতে বেশ পরিশ্রম করতে হল। প্যারিসের মত পা ফেললেই খাবারের দোকান রেস্টুরেন্ট এখানে নেই। তাই অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর হোটেল অ্যাগন থেকে একটু দূরে একটা রেস্টুরেন্টে রাতের ডিনার সেরে নিলাম, হোটেলে ফিরে নামাজ আদায় করে টিভি দেখার পর ঘুমিয়ে পড়ি।

www.pathagar.com

সকাল ৭টা থেকে বেলা ১০টা পর্যন্ত এক নাগাড়ে এই হোটেলে ব্রেক ফাস্টের ব্যবস্থা আছে ইউরোপের অন্যান্য হোটেলের মত। তবে হোটেল অ্যাগনের মত এত উন্নত মানের বহুবিধ খাবারের সমারোহ আর কোথাও লক্ষ্য করিনি। আমি প্রথমেই ফজরের নামাজ গোসল ইত্যাদি সেরে সমস্ত দিনের জন্যে যেহেতু বেরিয়ে যাব, সেহেতু একেবারে তৈরী হয়ে ক্যামেরাসহ এবং উলের টুপি, মাফলার ইত্যাদি নিয়ে নীচতলার ব্রেক ফাস্টের জন্যে গিয়ে দেখি এলাহী কারবার। এত বেশী খাবারের রকমারী আইটেম দেখে অবাক হয়ে যাই। ফ্রুট জুস রয়েছে ৭/৮ প্রকারের, ভাজাভুজি চিপস্ জাতীয় খাবারের সংখ্যা কম নয়। আমি একস্থানে দাঁড়িয়ে গরুর মাংস দেখে ভাবলাম ভালই হল। আমি যা বেশী পছন্দ করি তাই রয়েছে। কিন্তু তুলে নেবার পূর্বে এক বুড়ি মেমকে জিজ্ঞাসা করি। এটা কী? সে বলল পর্ক অর্থাৎ শুয়োরের মাংস এবং গরুর মাংসের পাশাপাশি রাখা রয়েছে। অতএব, হারাম বস্তু থেকে দূরে গিয়ে পাউরুটি, ডিমসিদ্ধ, বাটার, জ্যাম বা জেলী ইত্যাদি প্রায় ৩০ প্রকারের খাবারের উপকরণ রয়েছে ইচ্ছামত যে যেটা পছন্দ করে খেতে পারে। এখানে কোন ওয়েটার সার্ভ করেনা টেবিলে। প্রকান্ড টেবিলের চারপাশে ঘুরে লাইন দিয়ে খাবার নিজেকেই ইচ্ছামত তুলে নিতে হয়। দুটি বড় পেয়ালায় সিদ্ধ ডিম ছোট্ট টাওয়েলে ঢাঁকা রয়েছে। যা অন্য কোন হোটেলে পরিবেশন করা হয় না।

পরিমিত খাবার খেয়ে উঠে পড়ি। দু'বেলার খাবার তো আর এক বেলাতে খেতে পারিনা। যা শোভনীয়ও নয় এবং স্বাস্থ্যের জন্যেও ক্ষতি কর। অবশ্য অনেকেই কিন্তু পয়সা বাঁচানোর তাগিদে তাও করে বলে মনে হল। হোটেলের চাবিটা জমা দিয়ে বাইরে যেতে হয়। যেহেতু হোটেল কর্তৃপক্ষের লোকজন রুম পরিষ্কার করবে। ভিজা টাওয়েলের পরিবর্তে শুকনা অনেকগুলি টাওয়েল ঘরে রেখে যায়। আমি ওদের লম্বা পরিষ্কার টাওয়েলকে জায়নামাজ হিসেবে ব্যবহার করতাম।

২৮/১০/০২ তারিখে কাল বিলম্ব না করে বেরিয়ে পড়ি ইরিনার তৈরী করা প্রোগ্রামটা পকেটে নিয়ে। বেশ কিছুদূর গিয়ে একা একা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখি একটি মেয়ে কালো ওভারকোট গায়ে দিয়ে ছবি তুলে বেড়াচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি তোমার সঙ্গে কেউ আছে কি? সে বলে, না। আমিও তোমার মতই একা। আমি আরও জিজ্ঞেস করি তুমি কোত্থেকে এসেছে? সে উত্তরে বলে,

www.pathagar.com

অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে মাত্র দিন সাতেক পূর্বে এই প্রথম জার্মানী এসেছি। উদ্দেশ্য জার্মান ভাষা শিক্ষা করে হাউস টিউটর হিসেবে বছর খানেক এদেশে অবস্থান করা। আমি বলি ভালই হল, চল দুজনে একসঙ্গে ঘুরি। তুমি আমার কিছু ছবি তুলবে আমিও তোমার কিছু ছবি তুলে দেব। তার নাম আমাকে বলল নিকোল (Nicole), বেশ ভাল মেয়ে হালকা-পাতলা গড়নের একটু দীর্ঘাঙ্গী। আমরা দুজনেই যেহেতু এই শহরে নতুন, অতএব আলাপ আলোচনা করে কি কি দেখা যায় সেটা ঠিক করে ফেলি। প্রথমেই আমরা বোট ট্যুরটা সেরে ফেলতে চাইলাম। কিন্তু সেটা ছাড়তে ঘন্টা দেড়েক বাকী আছে দেখে আমরা নিকটবর্তী লেকের ওপারে একটা চার্চে গিয়ে টিকিট কেটে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখি। একটি ঘরে দেখি, বেশ কিছু ভাল ভাল বই এবং জার্মানীর দর্শনীয় স্থানগুলির ভিউ কার্ড বিক্রি হচ্ছে। আমি ও নিকোল দুজনেই বেশ কিছু কিনলাম। চার্চ থেকে বেরিয়ে বিশাল প্রান্তরের সামনে একটি প্রকান্ত ফোরারার পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ছবি তুলি। ওদিকে বিশাল জাতীয় পাঠাগারের ছবি তুলি। এভাবে প্রায় ঘন্টা খানেক ঘোরাঘুরি করে আমরা লেকের নিকট চলে আসি বোটে চেপে ঘুরে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে।

পাঁচ ডলার করে এক একজনের টিকিট। আমরা দু'জনে দু'টি টিকেট কিনে বোটের উপর ছাদে গিয়ে বসি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে এমন প্রচন্ড বাতাসও হিমেল হাওয়া বইতে শুরু করে যে আমার মাথার উলের টুপি উড়ে যাবার উপক্রম। নিকোল পরেছে কালো ওভার কোট কিন্তু আমার গায়ে রয়েছে মাত্র জ্যাকেট। আমরা প্রচন্ড শীত ও বাতাসের মধ্যে থাকতে না পেরে নীচে নেমে আসি। জানালার ধারে বসে উভয় দিকের অপূর্ব দৃশ্যাবলী দেখি ও ছবি তুলি।

বোট থেকে নেমে আমি ও নিকোল শহরের আরও কিছু দৃশ্যবলী ঘুরে ঘুরে দেখি। একটি প্রকান্ড প্রাসাদের মধ্যে দেখি বিশাল হলের ঠিক মধ্যস্থলে একটি মহিলার কালো প্রস্তর মূর্তির কোলে একটি রুগ্নবৃদ্ধের অবয়ব। সম্মুখে বেশ কিছু তাজা ফুলের উপস্থাপন এবং এই মূর্তির ঠিক মাথার উপরের ছাদ গোল করে কাটা আছে। যারমধ্যে বৃষ্টির পানি বা সূর্যের কিরণ পড়তে পারে। এই অভূতপূর্ব সৃষ্টির মাঝে কী বুঝান হয়েছে তা আমি এবং নিকোল বহু চেষ্টা করেও কোন অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না। তবে আমার একটি ছবি মহিলার পিছনে দাঁড়ান অবস্থায়

www.pathagar.com

নিকোল আমার ক্যামেরায় উঠালো। আশ্চর্যের ব্যাপার যে, কেবল মাত্র এই একটি মাত্র শিল্পকর্ম ছাড়া ঐ প্রাসাদে আর কিছুই নেই। বড় রাস্তার ঠিক ধারেই এরূপ প্রাসাদের অবস্থান। অতি সম্প্রতি ঢাকায় ফারুকের বাসায় নিমন্ত্রিত এক জার্মান ভদ্রলোক আমাকে ঐ ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেন।

এরপর আমরা প্রোগ্রাম করি, বসে উঠে পুরো বার্লিন শহরটা ঘুরে দেখার জন্যে। বাস স্ট্যান্ডের কাছে এসে হঠাৎ নিকোল বলল, সে থাকে অনেক দূরে। অতএব, এখন বাসে উঠে শহর দেখতে গেলে তার ঠিকানায় পৌঁছাতে অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে। অথচ আমার হোটেল অ্যাগন বেশ নিকটেই। আলেকজান্ডার স্কয়ার থেকে হেঁটেই যাওয়া যায়। তাই আমি আর তাকে বাধা দিইনি। সে তখনই পাতাল ট্রেনের পথ ধরে এবং আমি টিকিট কিনে টুরিস্ট বাসে বার্লিন শহরের মোটামুটি দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখে ফেলি। যেমনঃ টেলিভিশন টাওয়ার এটির উচ্চতা ৩৬৫ মিটার। টাওয়ারের উপরের যে ঘুর্ণীয়মান রেস্টুরেন্ট রয়েছে তার উচ্চতা ২০০ মিটার। এটা থেকে পুরো শহরটি দৃশ্যমান।

যেতে যেতে বার্লিন স্কাপচার (Sculpture) দেখলাম। এটি আসলে এ্যালয়ের (Aloy) তৈরী ধাতব বস্তু। যার নির্মাণ কৌশল অপূর্ব সুন্দর। রাস্তার পাশে রোড ডিভাইডারের উপর স্থাপিত আছে যাতে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। এরপর দেখা যায় বিশাল আকৃতির জু ট্রেন স্টেশন (Zoo Train Station), বেলি ভিউপ্যালেস বহু চমৎকার রাজকীয় প্রাসাদের মধ্যে এটি অন্যতম। চারলোটেনবার্গ প্যালেসের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পোরসিলেন ক্যাবিনেটের মধ্যে রক্ষিত আছে অত্যন্ত সুন্দর নক্সাদার তৈজস পত্র। ব্যান্ডেনবার্গ গেট হল ইউরোপের অন্যতম সিম্বলিক চিহ্ন স্বরূপ একটি প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু। যার উপর রয়েছে চারটি ঘোড়া যা একটি বাহনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সম্মুখের দিকে। ভিক্টোরী কলাম (Victory Column) রয়েছে একটু দূরে। ৬৯ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এই কলামের উপর একটি স্বর্ণময় পরী শোভা পাচ্ছে যেন বিজয় ঘোষণা করছে।

গাড়ীর মধ্যে যাবার সময় কানে হেড ফোন লাগিয়ে বহু ভাষায় ধারা বর্ণনা শুনতে শুনতে যাচ্ছিলাম। ফলে কোন টুরিস্ট গাইডের প্রয়োজন পড়েনি। বার্লিন শহরের রাস্তার উপর পার্শ্বে এত কিছু দেখার আছে যে, তার বর্ণনা সহজে দেওয়া

www.pathagar.com

খুবই মুশকিল। ধীরে ধীরে বাস যাচ্ছিল। একসময় দেখি ইরিনার বিশ্ব বিদ্যালয়ের সম্মুখে বাসটি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল। ছবি তুললাম বুন্ডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের। এভাবে আমি পরের দিনও বাসে ঘুরে ঘুরে পুরো বার্লিন শহর, দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

দুঃখের বিষয় যে, আমি সময়াভাবে বার্লিন থেকে একটু পট্সড্যাম (POTSDAM) যেখানে অতি মনোরম দৃশ্যাবলীস্থ বহু কিছু দর্শনীয় বস্তু আছে, তা দেখতে যেতে পারিনি। আর পারিনি বলেই, আমি কিনেছি বিখ্যাত অ্যালবাম বুক বার্লিন প্যানোরামা। যাতে রয়েছে প্রচুর রঙ্গীন ছবিসহ পুরো মানচিত্র। ইউরোপের যে সমস্ত শহরে আমি ঘুরেছি সেই সমস্ত স্থানের ব্যাপারে ব্যাপক ভাবে লিখিত মূল্যবান বই পুস্তক কিনেছি। যা আমি মাঝে মধ্যে প্রায়ই বসে বসে দেখি এবং অতীত স্মৃতির ভান্ডারে বিচরণ করি আপন মনে।

রুমী আমাকে অনুরোধ করেছিল যে, আমি যেন অবশ্যই পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে বিখ্যাত দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ স্থানটি পরিদর্শন করি। তাই তৃতীয় দিনে আমি পাতাল ট্রেনের সাহায্যে সেখানে যাই মাত্র দু ঘন্টার জন্যে। গিয়ে দেখি সেই ঐতিহাসিক বার্লিন দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ। যার কিছু টুকরা অনেকেই সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর এই দেওয়ালের পূর্ব দিক সমাজতান্ত্রিক এবং পশ্চিম দিক পুঁজিবাদীদের দ্বারা এতদিন শাসিত হয়ে আসছিল। বহুলোকের কত যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। জিডিআর (GDR) এর রাজধানী ছিল বন (BONN) এবং পুঁজিবাদীদের দ্বারা শাসিত অংশের নাম বার্লিন (Berlin)। রাশিয়ার মিখায়িল গর্ভাচেভ, তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ড জর্জ বুশ এবং জার্মান প্রেসিডেন্ট হেলমুট কোল এই তিনজন ব্যক্তির উদ্যোগেই এই প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলা হয় আশির দশকে। একটি বড় ভাঙ্গা টুকরার উপর এই তিন জনের সম্মিলিত স্বাক্ষর লক্ষ্য করলাম। যা রক্ষিত আছে ওখানেই একটি জাদুঘরে। এই জাদু ঘরে বহু কিছু সংরক্ষণ করা হয়েছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে কীভাবে অভিনব উপায়ে অত্যন্ত গোপনে নারী পুরুষের পলায়ন পর অবস্থায় আটকে পড়ার দৃশ্যাবলী। যা অত্যন্ত মর্মান্তিক এবং দুঃখজনক। ৭ ডলারের বিনিময়ে এসব বহু ফটোগ্রাফ, ওয়াল পিকচার ও মডেল ইত্যাদি দেখার সুযোগ আছে। তবে প্রবেশ মূল্য তিন ডলার। অর্থাৎ মোট ১০ ডলারই আমাকে ব্যয় করতে হয়।

www.pathagar.com

আমাদের ভারত উপ মহাদেশের মধ্যে মাত্র একজন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং তিনি হচ্ছেন মহাত্মা গান্ধি। একটি মাঝাড়ী ধরণের কামরায় কেবলমাত্র গান্ধিজীর ব্যবহৃত দ্রব্য সামগ্রী, তাঁর বহু বাণী, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে। যা ভারত থেকে গান্ধিজীর নাতি প্রভুদাস গান্ধীর সৌজন্যে প্রাপ্ত। একস্থানে গান্ধিজীর সম্পর্কে বিখ্যাত বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মন্তব্য লিখিত আছে, - The generations will some and go they will hardly believe that such a man of flesh and blood walked our earth.

গান্ধিজীর নিজের একটি চমৎকার বাণীও লেখা আছে, যেমন,- "There is an order to the Universe, in the midst of death, life continu; in the midst of untruth, truth continu; in the midst of injustice, justice continues and in all darkness there is light." পড়ে খুব ভাল লাগল কথাগুলি, সত্যিই অপূর্ব। ঐ জাদুঘরে যত ছবি, ফটোগ্রাফ ইত্যাদি Fall of Berlin সম্পর্কে আছে। সবগুলিই মোট চারটি প্রধান ভাষায় লেখা আছে। যেমন ইংরেজি, জার্মান, রাশিয়ান এবং স্প্যানিশ। পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিকেই কিছুক্ষণ বিচরণ করলাম। অনেকে দেওয়ালের রেখা বরাবর ভিডিও করছিল যার উপর সন তারিখ ইত্যাদি লিখিত ছিল। পূর্বদিকে কিছু ফেরীওয়ালা নানা প্রকারের টুপী বিক্রি করছিল যা প্রচন্ড শীত প্রধান দেশেই কেবল ব্যবহার করা হয়। যেমন তুরস্ক ও রাশিয়ার অধিবাসীরা ঐ ধরণের টুপী বেশী ব্যবহার করে থাকেন। আমার ঐ ধরণের টুপী ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই বলে, আমি কিনিনি।

দুপুরে বার্লিন রেল স্টেশন থেকে একটি ইংরেজি নিউজ পেপার কিনে নীচে একটি চীনাদের হোটেলে গিয়ে দুপুরের খাবার খাই ১৪ ডলারে। এরপর হাঁটতে হাঁটতে আমার হোটেলে ফিরে আসি। যেহেতু আমাদের আজই বিকেলে বার্লিন ত্যাগ করার কথা। আমার হোটেলের নীচেই ছিল একটা চুলকাটার দোকান। দেখলাম ৭ ডলারে চুল কাটা যাবে লেখা আছে। আমি ভাবলাম গোথেন বার্গে চুল কাটাতে খরচা পড়ে কমপক্ষে ১০০ ক্রোনার যা বাংলাদেশী টাকার প্রায় ৮০০ টাকা। আর ৭ ডলার অর্থাৎ তখন বাংলাদেশী মুদ্রার পরিপ্রেক্ষিতে ১ ডলারের সমান ছিল ৬০ টাকা। অতএব, ৭×৬০=টা ৪২০/- মাত্র। জার্মানীতে দোকানে ঢুঁকে আমি তাদের জিজ্ঞাসা

www.pathagar.com

করি কত লাগবে? দু'তিনটি মেয়ে আমাকে চেয়ারে বসার জন্যে চেষ্টা করতে ব্যস্ত আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই। আমি তাদের আবার প্রশ্ন করি Tell me exactly how much I have to pay? তখন তারা আমাকে বলে ৯ ডলার দিতে হবে। তখন আমি তাদের আবার প্রশ্ন করি তাহলে ৭ ডলার লিখে রেখেছ কেন? আমি তাদের চালাকীটা বুঝতে পেরে বেরিয়ে আসি। ইউরোপে চুল কাটার চার্জসব স্থানেই অত্যন্ত বেশী। সুইডেনে আমি জেনেছি সেখানে নাকি সবচেয়ে মেধাবী ছাত্র বা ছাত্রী ছাড়া চুলকাটার কোর্সে কাউকে ভর্তি করা হয়না। আমি প্রথমবার যখন সুইডেন যাই তখন একটি ইরানী মেয়ে মেরী আমার চুল কেটেছিল মাত্র ১০০ ক্রোনারে। এটা শাহীনের বাসার কাছাকাছি এলাকায়। তাছাড়া শহরের বিভিন্ন দোকানে ২০০-৩০০ ক্রোনার পর্যন্ত চার্জ নেওয়া হয়। দ্বিতীয় বারে ২ মাস পূর্বে একটি মেয়েকে বুকিং দেওয়া হয় বাসায় এসে চুল কাটার জন্যে। সে আমার ও রুমীর জন্যে নিল ১৬০ ক্রোনার।

গোথেন বার্গে যখন এসে পৌছালাম তখন রাত ২টা। প্রচন্ড শীতের মধ্যে বড় রাস্তার ধারে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম একটা ট্যাক্সির জন্যে। কিন্তু কোন ট্যাক্সি না পেয়ে শেষে রেল স্টেশনের নিকট গিয়ে একটি কুর্দী ট্যাক্সি ড্রাইভারকে সঙ্গে নিই যার নাম ছিল আহমদ। সে ১৩০ ক্রাউন ভাড়ায় আমাকে নিয়ে আক্কাস গাটার দিকে রওনা দেয়। কিন্তু কাছাকাছি এসে হঠাৎ রাস্তা ভুল করল। পরে আমাকে অনুরোধ করল AKKAS GATA ইংরেজিতে লিখে দিতে। আমি লিখে দিতেই সে গাড়ীর মধ্যে কম্পিউটারের সাহায্যে তখনই ঠিকানাটা বের করে ফেলে এবং আমাকে ঠিকমত নামিয়ে দেয়। আমার নিকট সদর দরজার চাবি আগেই শাহীন দিয়ে রেখেছিল। তাই কোন অসুবিধা হয়নি। সুইডেনে সমস্ত আবাসিক এলাকায় বাড়ীর প্রধান গ্লাস ডোর রাত ৯ টার পরই কেন্দ্রীয়ভাবে লকট হয়ে যায়। ফলে চাবিছাড়া ভিতরে কেউ প্রবেশ করতে পারেনা।

ইউরোপের ১৫টি দেশের ভিসা থাকা সত্ত্বেও আমি সময় এবং অর্থের অভাবে সবগুলি দেশ ঘুরে দেখতে পারিনি। ফিনল্যান্ড যাওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু পয়সা রেখেছিলাম। কেননা, ঐ টুরটা সম্ভব হলে স্ক্যান্ডেনেভিয়ান কান্ট্রির পুরোটাই আমার দেখা হয়ে যেত। কিন্তু তা যখন হলনা, তখন আমার মেয়ে বলল আব্বা এতবড়

www.pathagar.com

চশমার ফ্রেম কেন ব্যবহার করেন? এখানে সকলেই ছোট ফ্রেমের চশমা ব্যবহার করে। অতএব যা পয়সা আছে আপনার তাতেই একটা চশমা হয়ে যাবে। সুইডেনে চোখের রোগের জন্যে অনেক ভাল চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার আছেন বটে কিন্তু তাঁরা কেউ চশমার প্রেসক্রিপশন করেন না। চশমার দোকানেই দু একজন করে এমন সব ডাক্তার থাকেন। যাঁরা চশমার গ্লাস ঠিক করে দেন। এমন একটি বড় দোকানে শাহীন আমার চলে আসার মাত্র ৪/৫ দিন পূর্বে নিয়ে গেল। যে মহিলা আমার চোখ দেখলেন তিনি মোটেই ইংরেজি জানেন না বলে, শাহীন তাঁকে সুইডিশ ভাষায় সাহায্য করল আমার চশমার পাওয়ায় ঠিক করার জন্যে। অবশেষে একটা ফ্রেমের দাম পড়ল ৫৫০ ক্রাউন এবং গ্লাসের দাম পড়ল ৬০০ ক্রাউন। এই মোট ১১৫০ ক্রাউন দিয়ে চশমাটা নিলাম। অথচ এর পূর্বের ফ্রেমটা ছিল ইংল্যান্ডের, ঢাকায় দাম পড়েছিল ৪৫০ টাকা মাত্র।

এখানেই আমার দু'দুবারের ইউরোপ ভ্রমণের ইতিকথা শেষ করতে চাই। তবে আমার সুপ্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের কৌতুহলের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে যতখানি লিখলাম, আরও এতখানি হয়ত লেখা যেত। কিন্তু বইয়ের করেবর বৃদ্ধির ভয়ে এবং বর্তমান যুগে একনিষ্ট পাঠকের অভাব লক্ষ্য করেই আমি ক্ষান্ত হলাম। তবে অনুরোধ রইল, কেউ যদি কখনও ইউরোপ যাওয়ার বা ভ্রমন করার সুযোগ পান, তা যেন হাত ছাড়া না করেন। নিজের চোখে দেখা, অনুভব করা। উপলব্ধি করা এক কথা। আর বই পড়ে সেই আনন্দ বা ছবি দেখে সেই তৃপ্তি পাওয়া কখনই সম্ভব নয়। এ যেন অনেকটা নিজের মুখে ঝাল খাওয়া আর অপরের মুখের বর্ণনার মতন বিরাট পার্থক্য।

www.pathagar.com

পঞ্চত্রিংশ পর্ব

২০০২ সালের ৬ জানুয়ারী আমি সস্ত্রীক ঢাকায় ফিরে আসি। এখানে এসেও বাসার ভিতর বেশ শীত অনুভব করছিলাম। মনে হচ্ছিল সুইডেনে যে বরফের স্তুপ থেকে ফিরে এলাম, তার বহু তীব্রতা যতই থাকুক কিন্তু সেটা বাইরে। অথচ বাসার ভিতরে সর্বত্র হিটারের ব্যবস্থা থাকায় আমাদের ভালই লাগত। ছাত্রাবস্থায় প্রখ্যাত ইংরেজ কবি সম্ভবত। P.B. shelly'র লেখা একটা কবিতা পড়েছিলাম- "Blow Blow The Winter Wind". কবি তাঁর এই বিখ্যাত কবিতার মাধ্যমে বলতে গিয়ে লিখেছেন,

"Blow blow the winter wind
Thou art not so unkind
As man's ingratitude

বহুকাল পূর্বে পড়া এ কবিতার বাকী ছত্রগুলি আর মনে নেই আমার বয়সের ভারে বলে দুঃখীত। তবে কবি মানুষের নিকট থেকে অকৃতজ্ঞতার জন্যে যে দুঃখ, বেদনা, ব্যাথা ও যন্ত্রণা বোধ করেছিলেন তার তীব্রতা এতই প্রবল ছিল যে, প্রচন্ড শীতের হিমেল হাওয়াও তাঁর কাছে এত কষ্টদায়ক বলে মনে হয়নি তাই কবি মনের দুঃখে অকৃজ্ঞ মানুষের দেওয়া দুঃখকে এত বড় করে দেখেছেন, যা ইউরোপের প্রচন্ড হিমেল হাওয়াকে তাঁর নিকট অত কঠোর বা নির্দয় বলে মনে হয়নি। বাস্তবিকই তাই, উপকারীর উপকার স্বীকার না করা মানুষ যে কত নিকৃষ্ট হতে পারে সেটাই কবি এখানে বুঝাতে চেয়েছেন।

আমি ঢাকায় নিউ ডি.ও.এইচএস এর বাসায় আমার বড় ছেলে ফারুকের সঙ্গেই থাকতাম একান্নভূক্ত পরিবারবর্গের মত। দীর্ঘ ৮/৯ বছর আমরা ঐ এলাকায় থাকার ফলে ডি.ও.এইচ.এস এর একমাত্র জামে মসজিদে প্রাত্যহিক নামাজ পড়ার সুবাদে বহু মুসল্লি ভাইদের সঙ্গে আমার বেশ সখ্যতা ছিল। এমন কি পেশ ইমাম ও খতিব সাহেব মাওলানা মোঃ ছাদেকুল ইসলাম যিনি বেশ উচ্চশিক্ষিত আলেম তাঁর সঙ্গেও

www.pathagar.com

আমার যথেষ্ট সৎভাব ছিল। তিনি কামেলে ডবল, বি,এ (অনার্স) এম,এ, ডবল ফাস্ট ক্লাস ছাড়াও মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটা স্বল্পকালীন কোর্স সমাপ্ত করে আসেন। আরবী ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দক্ষতা আমরা লক্ষ্য করেছি। বিশেষতঃ জুম্মার খুতবা যেটা তিনি বাংলা ভাষায় করতেন, সেটারই সংক্ষিপ্তসার তিনি আরবী ভাষায় সাবলীলভাবে বলতে বেশ পারদর্শী ছিলেন। মুয়াজ্জিনের দায়িত্বে আছেন হাফেজ মুহিবুল্লাহ সাহেব। এরা দুজনেই বয়সে আমার অনেক কনিষ্ঠ হলেও যথেষ্ট ভদ্র ও সৌজন্যমূলক আচরণে বেশ অভ্যস্থ।

সর্বোপরি সেনাবাহিনীর বহু অবসর প্রাপ্ত অফিসার আমার নিকট আত্মীয়ের মত বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার সহপাঠীও ছিলেন। যেমন মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুস সামাদ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) আব্দুল হক, লেঃ কঃ (অবঃ) আলতাফ হোসেন প্রমুখ। তবে আমার সহপাঠী না হলেও বরং আমার বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বহু সেনা অফিসার আমার খুবই নিকট বন্ধুত্বে যাঁরা আমার গুনমুগ্ধ ছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে যাঁদের নাম করা যেতে পারে তাঁরা হচ্ছেন মেজর জেনারেল (অবঃ) র,আ,ম,গোলাম মুক্তাদির, মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রফিক, ব্রিগেডিয়ার জেঃ (অবঃ) ডাঃ আনওয়ার হোসেন, ব্রিগেডিয়ার জেঃ আমিনুল হক বীর উত্তম (অবঃ), ব্রিগেডিয়ার জেঃ (অবঃ) শহীদুল ইসলাম বীর প্রতিক, ব্রিগেডিয়ার জেঃ সাফায়াত আহমদ (অবঃ), কমোডর (নেভী) জুলফিক্কার আলী (অবঃ), নেভাল চীফ (অবঃ) মোহাইমেনুল ইসলাম, মেজর জেঃ (অবঃ) ইজাজ আহমদ চৌধুরী, কর্ণেল (অবঃ) হারুনর রশীদ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) শওকতুল ইসলাম, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) হাবিবুর রহমান, কমোডর (এয়ার) আফতাব আহমদ (অবঃ) গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) জাকারিয়া, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) আব্দুল্লাহ, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) মোয়াজ্জেম আহমদ, লেঃ কঃ (অবঃ) ডাঃ এমঃ হারুন, লেঃ কঃ (অবঃ) ডাঃ এ, আর মল্লিক, ব্রিগেডিয়ার জেঃ (অবঃ) আনিসুর রহমান, লেঃ কঃ (অবঃ) ডাঃ আবুল কাসেম, লেঃ কঃ (অবঃ) আব্দুস সবুর, লেঃ কঃ (অবঃ) জেয়ারদার, লেঃ কঃ (অবঃ) মহম্মদ শাহজাহান, লেঃ কঃ (অবঃ) নূরুদ্দীন লস্কর, লেঃ কঃ (অবঃ) আলাউদ্দীন গাজী, লেঃ কঃ (অবঃ) আব্দুল হাদী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) ডাঃ চৌধুরী আব্দুল গাফফার, লেঃ কঃ

www.pathagar.com

(অবঃ) শাহীদুল ইসলাম, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অবঃ) রহমাতুল্লাহ, মেজর (অবঃ) এম,এ, ওয়াজেদ প্রমুখ আরও বহু বন্ধু ছিলেন।

সাধারণতঃ ফজরের নামাজের পর আমরা যে কজন নিউ ডি.ও এইচ.এস পার্কে প্রাতঃভ্রমণের জন্যে ঘুরে বেড়াতাম তাঁদের মধ্যে খুব বেশী নিয়মিত ছিলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু বিখ্যাত ব্যবসায়ী জনাব আবু বকর সিদ্দিক সাহেব (শফী বিক্রমপুরীর বড় ভাই), উপরে উল্লিখিত কয়েকজন সেনা প্রধান, সেনা কর্মকর্তা এবং সস্ত্রীক লেঃ জেনারেল (অবঃ) নূরুদ্দীন ও মেঃ জেঃ (অবঃ) আব্দুস সাদেক। অত্যন্ত আনন্দ ও আন্তরিক পরিবেশের মধ্যে আমার তাঁদের সঙ্গে মেশার সুযোগ হয়েছিল। লেঃ কঃ (অবঃ) নূরুল হক সাহেবও আমাদের প্রাতঃভ্রমনে শরীক হতেন।

আমার ছোট ছেলের বিয়ের ব্যাপারে লেঃ কঃ (অবঃ) এম,এ জহীর সাহেব যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। এমন কি লেঃ কঃ (অবঃ) জোয়ারদার সাহেবও অনেক চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আসলে বিয়ের ব্যাপারটাই এমন, যে কথায় বলে, 'জন্ম মৃত্যু বিয়ে তিন বিধাতা নিয়ে।' অর্থাৎ এটা মহান আল্লাহ পাকের খাস দপ্তর ছাড়া বোধ করি অন্য কোনভাবে সম্ভব নয়। আর নয় বলেই, এ পৃথিবীতে বহু অলৌকিক ঘটনাবলী আমরা ঘটতে দেখেছি বা শুনেছি। পরিশেষে আমার একবন্ধু জনাব আলহাজ আলী আসগর ইঞ্জিনিয়ার সাহেব তাঁর বড় ভাই মরহুম আলী আরশাদ সাহেবের নাতনী শাহনাজ আক্তার ওরফে উর্মির সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দেন। মেয়ে দেখার পর আমার ছেলে ফাহিমসহ আমরা সকলেই রাজি হয়ে যাই। ফাহিমের যেমন পছন্দনীয় মেয়ের আকাঙ্খা ছিল, ঠিক যেন তেমনটিই মিলে গেছে বলে আমার মনে হল। এখন আমার সেই প্যারিসে নটরডাম ক্যাথেড্রাল দেখতে গিয়ে আমার ডেনিস গাইডের কথা মনে পড়ে গেল।

যা হোক ২০০৩ সালের ১ আগস্ট জনাব এহসানুল হকের একমাত্র সুন্দরী কন্যা মোসাম্মৎ শাহনাজ আক্তার ওরফে উর্মির সঙ্গে ২,৫০,০০০ টাকা মোহরানায় বিয়ে পড়ান হয়। মেয়েকে দেয়া ছেলের পক্ষ থেকে সমস্ত গহনা পোষাক ইত্যাদি ছাড়াই আড়াই লক্ষ টাকা মোহরানা ধার্য্য করা হয়। এবং ফারুক ও সীমা কনেকে দেওয়া যাবতীয় গহনাপত্র উপহার হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০৩ সালের ২২ ডিসেম্বর আমরা ওয়ালিমা ডিনারের ব্যবস্থা করি সেনা কল্যাণ বিভাগ নিয়ন্ত্রিত ট্রাস্ট

www.pathagar.com

মিলনায়তনে। বরাবরের মত ৬০০ মেহমানের জন্যে বিশেষ মেনুর ব্যবস্থা করে ফারুক ও তার স্ত্রী সীমা। অবশ্য ইতোপূর্বে মেয়েপক্ষ থেকে বিয়ের আয়োজন করা হয় আপ্যায়ন কমিউনিটি সেন্টারে। ২০ ডিসেম্বর মেয়ে পক্ষ তাদের মেয়ে আমাদের হস্তান্তরের সময় পুনরায় বহু মেহমানের জন্যে ডিনারের আয়োজন করেন ময়ুরী কমিউনিটি সেন্টারে বেশ ধূমধামের সঙ্গে। এছাড়াও এনগেজমেন্ট এবং গায়ে হলুদের ব্যবস্থা উভয় পক্ষ থেকেই করা হয় বেশ আন্তরিকভাবেই। যেহেতু আমাদের পক্ষ থেকে এটাই ছিল আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সর্বশেষ বিয়ে। কাজে কাজেই প্রচুর ধুমধামের সঙ্গে বহু খরচাপাতি করে আমার দুই ছেলেই অকাতরে। এই বিয়ে উপলক্ষে আমার ছোট মেয়ে শাহীন সুইডেন থেকে তার ছোট্ট ছেলে সৈয়দ ফাবিয়ান ইলাহীসহ বিয়েতে যোগদান করে আমাদের আনন্দ অনেকগুণ বাড়িয়ে দেয়। তবে তার স্বামী সৈয়দ মকবুল ইলাহী ওরফে রুমী এবং একমাত্র মেয়ে মোনামী সোনার চিকিৎসার খাতিরে ডাক্তারদের ছাড়পত্র না পাওয়ায় তারা আসতে পারেনি। ফলে, আমাদের আনন্দে বেশ কিছুটা ফাঁক থেকে যায়।

অবশ্য ইতোপূর্বে আমি ভারতে গিয়ে আমার যাবতীয় নিকট আত্মীয়দের এই বিয়েতে আসার জন্যে দাওয়াত করে আসি। বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের নিকট আত্মীয়স্বজনদের বোধকরি কাউকেই এই নিমন্ত্রণ জানাতে বাদ রাখিনি। পরিশেষে আমার একমাত্র ভাগনা নোমান জাহেদী ছাড়া এই বিয়েতে আর কেউ অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে একটি অপ্রিয় সত্য না বললে হয়ত সত্যের অপলাপ করা হয়। আমার অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ সত্য প্রকাশে আমি দুঃখীত। বাস্তবিক ক্ষেত্রে আমার ভারতীয় আত্মীয় স্বজনদের মনবৃত্তি, রুচী, উদার চিন্তা চেতনার বেশ কিছুটা অভাব আছে বলে মনে হয়। বহু আত্মীয় স্বজনের এ পর্যন্ত একটা পাসপোর্টের যে কী গুরুত্ব তা পর্যন্ত উপলব্ধি করার কোন ক্ষমতা নেই। তাদের শিক্ষা দীক্ষার তেমন অভাব পরিদৃষ্ট না হলেও, তাদের দারিদ্রতা প্রকাশের বাস্তবতা বড়ই দৃষ্টিকটু। অথচ সত্যিকার অর্থে তারা কিন্তু তত দরিদ্র নয়। আমি প্রায় প্রতি বছরই ভারত ভ্রমন করি। নানা উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে আমার সাধ্যমত অপেক্ষাকৃত দুর্বলদের সাহায্য করা। কিন্তু আমি কখনও কোন নিকট বা দূর আত্মীয় থেকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করেছি বলে মনে হয় না। আমার

www.pathagar.com

দীর্ঘ ৩০ বছরের শিক্ষকতার জীবনে আমার পেশাগত নীতির প্রতি আমি যেমন অটল থাকার চেষ্টা করে কোনরূপ অসংগতির প্রতি কখনও আপোস করার কোন প্রশ্রয় দেইনি; ঠিক তেমনই অপরের বিশেষত: আমার প্রিয়জনদের ক্ষেত্রেও তা পছন্দ করিনি। এ প্রসঙ্গে আমার স্কুলে পড়া আল্লামা শেখ সাদী (রহঃ) এর একটি কবিতার মাত্র দুটি ছত্র এ মূহূর্তে মনে পড়ছেঃ

"হামা আজ দস্তে গায়ের নানা কুনান্দ
সাদী আজ দস্তে খোশতান ফরিয়াদ।"

অর্থাৎ হে সাদী, নিজের হাতই যখন নিজের গালে চড় মারে, তখন তা নিয়ে আর খেদ করে কী লাভ! অনেক দুঃখেই আমি উপরের কথাগুলি লিখতে বাধ্য হলাম বলে আমি নিজেই নিজের নিকট লজ্জিত। আমার বিশেষ বন্ধু ড. ওসমান গণি সাহেবের সঙ্গে অতি সম্প্রতি আলাপের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্ব নিয়েই টিকে থাকতে হবে সর্বক্ষেত্রে। ফলে মুসলমান ছেলে মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা বাণিজ্য সর্বোতোভাবেই পশ্চাদপদতা থেকে কোন নিস্কৃতি নেই। তাঁর এই মূল্যবান উপলব্ধির ফলে তিনি নিজেই সউদ্যোগে বেশ কিছু মুসলিম দাতাদের নিকট থেকে কলকাতার সন্নিকটে কিছু উল্লেখযোগ্য জমি পেয়েছেন এবং আরও পাবেন। সুতরাং তিনি মুসলিম ছেলে মেয়েদের জন্যে বিশেষভাবে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে তুলতে চান। যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনিক্যাল, কম্পিউটার, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদি বহুবিধ প্রযুক্তির জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়ার পর যাতে তারা সেখানেই পেশাগত কাজে নিযুক্ত হতে পারে সেই মহান স্বার্থেই তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন, আলহামদোলিল্লাহ্। আমার শুনে খুব ভাল লাগল।

২০০৫ সালের জানুয়ারী মাসেই তিনি এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে প্রধান অতিথি হিসাবে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন যেদিন, ঠিক সেই দিনই আমার দিল্লি যাত্রার তারিখ ছিল। ফলে আমার সেই মহতী সভায় উপস্থিত থাকার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়নি বলে আমি দুঃখীত। তবে আমি আগামী বছর ইনশাআল্লাহ কলকাতা গেলে অবশ্য এ ব্যাপারে বিস্তারিতভাবে জানতে পারব বলে আশা রাখি। এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে

www.pathagar.com

কলকাতায় ডাঃ এম,সি,সিল আমার প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন করেন তাঁর নিজস্ব ক্লিনিক, রেমিডিতে। আমার শ্রদ্ধেয় পীর ভাই প্রখ্যাত প্রফেসর ডাঃ আমিন আহমদের বিশেষ অনুরোধে তিনি আমার অপারেশন করেন। অতি সম্প্রতি অর্থাৎ ২০০৫ সালের ৬ই আগস্ট উর্মির আপন বড় ফুপা জনাব খন্দকার ফয়জুল্লাহ সাহেব ৭৮ বছর বয়সে বার্দ্ধক্য রোগে কিছুদিন ভোগার পর ইন্তেকাল করে জান্নাতবাসী হয়েছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্নাইলায়হে রাজেউন। বড় ভাল মানুষ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন উর্মিদের পরিবারের সকলের বড় মুরুব্বী ও উপদেষ্টা। আমার ছোট ছেলে ফাহিমের বাইওডাটা ও ছবি দেখার পর তিনি আমাকে বলেন, আপনাকে আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছে। উর্মির পিতা জনাব এহসানুল হক সাহেবও তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এরপরই বিয়ের ব্যাপারে কথাবার্তা দ্রুত আদান প্রদান চলতে থাকে। মূলতঃ খন্দকার ফয়জুল্লাহ সাহেবের বাড়ী ছিল মুর্শিদাবাদের ভরতপুর গ্রামে। তাঁর পিতা ছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত আলেম মাওলানা হাবিবুল্লাহ সাহেব, যিনি একসময় মিশরের বিশ্ববিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে অধ্যাপনা করেছেন দীর্ঘকাল। ফলশ্রুতিতে জনাব ফয়জুল্লাহ সাহেব তথা আমাদের প্রিয় মিনি ভায়ের প্রতি আমার এবং আমার চাচাতভাই ড. আনসার আহমদের যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। আমি তাঁর মৃত্যু সংবাদের পরপরই তাঁর নামাজে জানাযায় শরীক হয়ে মিরপুরের কালসী গোরস্তানে তাঁকে দাফন করে আসি। দোওয়া করি মহান আল্লাহ পাক তাঁর পবিত্র রুহে পাকের প্রতি রাজি থাকুন। আমীন॥ সুম্মা আমীন ॥

www.pathagar.com

ষষ্ঠত্রিংশ পর্ব

উর্মির একমাত্র ছোটভাই অনিক স্কুলের ছাত্র অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে, বেশ ভাল ছেলে খুবই ভদ্র। উর্মির ছোট চাচা জনাব একরামুল হককে লক্ষ্য করেছি উর্মির বিয়েতে সবকাজে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। তাঁদের আসল বাসস্থান ছিল কলকাতায় পার্ক সার্কাসে কড়ায়া রোড়ে এবং উর্মির নানাদের বাড়ী হল দাউদকান্দি। উর্মির বিয়ের মাত্র বছর দেড়েক পরই তার বৃদ্ধা নানী বার্দ্ধক্যরোগে ইন্তেকাল করেন। তাঁর নামাজে জানাযায় শরীক হয়ে তাঁকে তাঁর নিকট কিছু আত্মীয় ও আমার পিতার কবরের নিকট রহিম মেটাল গোরস্তানে দাফন করে আসি। মহান আল্লাহ পাক তাঁকেও জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল করুন। আমীন॥

আমার দু'ছেলেরই সরকারী চাকুরীর প্রতি কোন আগ্রহ না থাকায়, তাদের গ্রাজুয়েশনের পর তারা বিভিন্ন মাল্টিনেশন্যাল ফার্মে বিভিন্ন পদে চাকুরী করেছে বেশ উচ্চ বেতনে। যদিও বড়ছেলে ফারুক তার ছোটভাই ফাহিমকে পরবর্তীতে তার নিজস্ব ফার্মে নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে বার বার। কিন্তু প্রতি বারই ফাহিম তাতে রাজি না হয়ে বরং অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। হয়ত এতে তার ইগো বেশ খানিকটা সক্রিয় ছিল বলেই আমার মনে হয়। অবশ্য আমি এ ব্যাপারে কোন মতামত কখনই প্রকাশ করিনি। কেননা, ছেলেদের স্বাধীন চিন্তা চেতনার প্রতি আমি কোনরূপ হস্ত ক্ষেপ করার বিরোধী ছিলাম। যেহেতু আমার স্বর্গীয় পিতাও আমার স্বাধীন চিন্ত াধারার প্রতি কখনও তেমন কোন হস্তক্ষেপ করেননি। তবে, ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর, যখন আমি পাকিস্তান আর্মিতে কমিশন্ড র‍্যাংকে সোজাসুজি নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ পাই; তখন আমি কলকাতায় প্রথমেই আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত সৈয়দ শাহ মুসতারশিদ আলী আলকাদেরী আল হাসানী আল হোসায়নীর আল জিলী আল বাগদাদীর নিকট আরজ করি এবং তাঁর অনুমতি প্রার্থনা করি। কিন্তু হুজুর পাক সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বলেন, তোমার আব্বা-আম্মা যা বলেন তাই কর। আমি তখনই কেন যেন বুঝতে পেরেছিলাম হয়ত এটা আর হলনা। আমি

www.pathagar.com

কিন্তু ঠিক হুজুর পাকের হুকুম মত আমার পিতামাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করতেই তাঁরা একত্রে সঙ্গে সঙ্গে না করে দেন। তাঁদের একমাত্র যুক্তি এই যে, যেহেতু আমি তাঁদের একমাত্র ছেলে এবং আমার মায়ের ভারতীয় সম্পত্তির মাঝে মধ্যে দেখাশুনার জন্যে আমাকেই বেশী ভারতে ভ্রমণ করতে হত। অতএব, এরপর অন্য কোন চিন্তা বাদ দিয়ে আমি এক নাগাড়ে ৩০ বছর শিক্ষকতার পেশায় একনিষ্ঠভাবে নিয়জিত ছিলাম। ১৯৮০ সালের দিকে আমার পিতা ভারতে গিয়ে আমার মায়ের ইচ্ছামত তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তাঁরই সর্বকনিষ্ট বোন আমার হেনা খালার নিকট বিক্রি করে আসেন খুষ্টিগিরিতে। সেই বিক্রয়লব্দ অর্থেই আমি পাবনা শহরের রাধানগরে একটি বাড়ী ক্রয় করে আমার মায়ের নামেই বাড়ীর নামকরণ করি "জারিয়া মঞ্জিল"। অবশ্য বাড়ী কেনার পর বাড়ীর এক্সটেনশন, স্যানিটারী ল্যাট্রীন, বাড়ীর বাউন্ডারী ওয়াল ইত্যাদি যাবতীয় খরচাপাতি আমি আমার নিজের টাকাতেই সম্পন্ন করি। বাড়ীর ভিতর অনেকগুলি নারিকেল ও সুপারি গাছ রোপন করি। ঐ এলাকায় কোন বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় আমি ওয়াপদার (WAPDA) নিকট থেকে কয়েকটি বিদ্যুতের পোল ও তার নিয়ে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন আমারই ছাত্র ওয়াপদার একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার। দুঃখের বিষয় এ মুহূর্তে তার নামটি আমার আর মনে নেই। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে এটিই এখন প্রধান রোগ, যা আমার নিকট বর্তমানে খুবই যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়ত আর দু'চার বছর যদি বেঁচে থাকি, তখন বোধকরি আরও বহুকিছুই আমার স্মৃতির বাইরে চলে যেতে পারে। একথা ভেবেই এই স্মৃতিকণা লেখার উদ্যোগ নিয়েছি।

১৯৭৪ সালে তেজগাঁও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজে থাকতে আমার স্ত্রীর পীড়াপিড়িতে তাঁরই কিছু স্বর্ণালংকার বিক্রয়লব্ধ অর্থ এবং আমার নিজস্ব কিছু টাকার বিনিময়ে ক্রয় করি একখন্ড ভিটে মাটি গাজীপুরের ভূরুলিয়া গ্রামে। এখনও সে জমিটি চতুর্দিকে কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয়েছে। একসময় বাড়ী করার ইচ্ছাতেই সেটা কেনা হয়েছিল। অবশ্য গাজীপুর মিইনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোজাম্মেল হক সাহেব সরে জমিনে উপস্থিত হয়ে রাস্তার জন্যে আমাকে কিছুটা জমি ছেড়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেন এবং আমি তাঁর কথা মেনে নিই। আদতে জমিটি কেনার পূর্বে আমি একটি জামে মসজিদ ও তার নিকটস্থ

www.pathagar.com

একটি মাদ্রাসাকে কেন্দ্র করেই এটি ক্রয় করেছিলাম। বর্তমানে সেই মাদ্রাসার পরিবর্তে হয়েছে একটি বিদ্যালয় এবং ছিন্টে বেড়ার জামে মসজিদটি বর্তমানে বেশ বড় আকারের পাকা মসজিদে রূপ নিয়েছে। ঐ স্থানটিতে অনেকগুলি ছোট বড় কাঁঠাল গাছ, আম গাছ এবং একটা বড় জামগাছ ছিল। ফারুক সেগুলি একদামেই স্থানীয় এক ব্যক্তিকে বিক্রি করে ফেলে। তখন ঐ স্থান পর্যন্ত যাওয়ার তেমন ভাল কোন রাস্তা ছিল না। তবে বর্তমানে ভাল পাকারাস্তা হয়েছে যা আমার জমির পশ্চিম এবং দক্ষিণ পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে।

পাবনা পলিটেকনিকে শিক্ষকতা করার সময় আমার প্রথম দিকের ব্যাচের এক প্রিয় ছাত্র ছিল মহম্মদ ফজলুল হক। বহু বছর পর হঠাৎ ফার্মগেটে তার সঙ্গে এক সন্ধ্যায় আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি তাকে প্রথমে চিনতে ব্যর্থ হলেও সে কিন্তু আমাকে ঠিকই চিনতে পারে। সম্ভবত বেশীর ভাগ শিক্ষকই তাদের বহু ছাত্রদের মাঝে অনেক প্রিয় ছাত্রের চেহারাও হঠাৎ করে হারিয়ে ফেলেন। এটা দুঃখজনক হলেও আমার ক্ষেত্রে এ বাস্তবতা লক্ষ্য করে আমি নিজেই অনেকটা অপ্রস্তুত হয়েছি। যা হোক সেই ছেলে ফজলুল হক আমাকে সালামের পর নিয়ে যায় এক রেস্টুরেন্টে। সেখানে উত্তমরূপে দৈ-মিষ্টি ইত্যাদি দ্বারা আমাকে আপ্যায়ন করে আমার আপত্তি সত্ত্বেও। পরে সে আমাকে বলে, স্যার আপনার অফিসে ঢাকা পলিটেকনিকে আমি একদিন যাব। আমি ইতোমধ্যে ইরাকে কয়েক বছর চাকুরী করে এলাম। আমার বর্তমানে কিছু কাজ আছে আপনার কাছে।' আমি জিজ্ঞাসা করায় সে উত্তর দেয় পরে আমাকে জানাবে। কয়েক সপ্তাহ পরে হঠাৎ দেখি ফজলুল হক আমার চেম্বারে উপস্থিত। কী ব্যাপার? ফজলু আমাকে বলে; স্যার, আমি কোন সরকারী চাকুরী করি না। অতএব, এই মর্মে যদি আপনি ক্লাস ওয়ান অফিসার হিসেবে আমাকে একটা সার্টিফিকেট দেন তবে আমি কুয়েতে গিয়ে চাকুরী করতে পারি। আমি তো শুনে অবাক, বল কী? তাছাড়া তুমি সরকারী চাকুরী কর কিনা তাও আমি জানিনা। সে বলে, "আমি তো আপনারই ছাত্র। আপনি খোঁজ নিয়েও দেখতে পারেন। আমি, বর্তমানে একটি কোরিয়ান ফার্ম শিমুজি কনস্ট্রাকশন কোম্পানিতে কাজ করি। আমি থাকি হোটেল অ্যামবাসডারে ২০৪ নং কক্ষে।" এরপর আর কী করা? দিলাম তাকে একটি সার্টিফিকেট লিখে। সে কিছুক্ষণের মধ্যেই টাইপ করে আবার আমার কাছে নিয়ে

www.pathagar.com

আসে। আমি সিগনেচার দিয়ে আমার সিল লাগিয়ে দিই। সে আমাকে সালাম দিয়ে চলে যায়।

মজার ব্যাপার হল মাত্র মাস দেড়েকের মধ্যেই তার কুয়েতে যাওয়ার টিকিট ও যাবতীয় কাগজ-পত্র নিয়ে আমার সঙ্গে আবার দেখা করে কুয়েতে চলে যায়। সেখান থেকে সে মাঝে চিঠিপত্র লিখত এবং যখনই দেশে ফিরত তখনই আমাদের জন্যে জায়নামাজ, তসবী কিছু কাপড় ইত্যাদি নিয়ে আসত। তার ক'বছর সেখানে থাকার পর আমি তাকে একটি কোয়ার্টার চারমিনার ওয়াল ক্লকের জন্য ফরমায়েশ করি, যা এখানে বহু খোঁজখুঁজি করেও আমি পাইনি। তবে সেই সঙ্গে তাকে একটা শর্তও জানিয়ে দিই যে, ঘড়ির যা মূল্য হবে তা অবশ্যই তাকে নিতে হবে; নতুবা আমি তা গ্রহণ করতে পারব না। সে ঠিকই ঘড়ি এনেছিল। যা ভোর ছ'টায় বাজতে শুরু করত এবং রাত ১১ টায় বন্ধ হয়ে যেত। তাছাড়া প্রতি ১৫ মিনিট পর পর মিউজিক হতো। আমি ঘড়ির দাম জিজ্ঞাসা করায়, সে কিছু ইতস্তত: করতে থাকলেও শেষে দাম বলতে বাধ্য হয়, ১,১০০ টাকা। আমি তাকে মূল্যটা তার হাতে একরকম জোর করেই ধরে দিই। কিছুক্ষণ পর একটি কার আসে আমাকে কোন একটা মিটিং এ নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমি চলে যাই। কিন্তু ফজলু আমার এতই গুণমুগ্ধ ছাত্র যে, সে চলে যাওয়ার পূর্বে আমার ড্রইংরুমের টেবিলের উপর টাকাটি রেখে চলে যায়। এ যেন আমারও দেওয়া হল, এবং তারও নেওয়া হল এমন অবস্থা।

এরপর সে যখন আবার কুয়েত থেকে ফিরে আসে, তখন তার বিয়েতে আমাদের দাওয়াত করে। আমি তার নব বধুর জন্যে একটা দামী কাতান শাড়ী ও একটি সোনার আংটি কিনে নিয়ে যাই পাবনা। পাবনা শহরে তার শশুর বাড়ীতেই বিয়ে পড়ানো পর তার নিজ গ্রাম এক অতি অজ পাড়াগাঁয়ে যেতে হয় কনে ও বরযাত্রীসহ। প্রথমে বাস এবং পরে পানি পথে একমাত্র ট্রলার ছাড়া আর কোন উপায় ছিলনা। প্রায় সন্ধ্যার একটু আগে আমরা সেই গ্রামে পৌঁছাই। পরের দিন জুম্মার নামাজে আমি একটু ওয়াজ করি মসজিদে। পুরো গ্রামে ঐ একটাই জামে মসজিদ। অনেক লোক হয়েছিল, তাছাড়া বৌ-ভাত উপলক্ষে পুরো গ্রামের প্রায় সকলেই ছিল নিমন্ত্রিত। ফজলু ইরাকী ও কুয়েতী অর্থে পাকা বাড়ী করতে গিয়ে অনেক খরচা করেছে দেখলাম। এরপর তার বৌবাচ্চা নিয়ে ঢাকায় যাত্রাবাড়ীতে

www.pathagar.com

একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে বেশ কিছুদিন বসবাস করে। তখন ও আমাদের পরিবারের সকলকে দাওয়াত করে উত্তমরূপে খানা পিনার ব্যবস্থা করে। হোটেল সোনারগাঁও এ তার কোম্পানীর অফিস রয়েছে। ফজলু বেশ ভাগ্যবান বলতে হবে। কেননা, কুয়েত ইরাক যুদ্ধের ঠিক পূর্বেই সে তার পাওনা পয়সাকড়ি সব নিয়ে দেশে ফিরে আসে। বর্তমানে ফজলু রয়েছে সিঙ্গাপুরে এবং সেখানে সে একটি ফ্ল্যাট পর্যন্ত কিনে ফেলেছে। আগামী নভেম্বরে সে দেশে বেড়াতে আসবে এবং আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে ফোনে জানিয়েছে। আমার লিখিত বই মুসলিম বিশ্বে সফরনামা' তাকে পাঠিয়েছিলাম। সিঙ্গাপুরে। সেটি পড়ে সে আমাকে ফোনে জানিয়েছে যে তার খুব ভাল লেগেছে বইটি। ফজলু ঢাকায় আমার কাছে আসার পর আমি পূর্বদেশে যাওয়ার যে পরিকল্পনা করে রেখেছি বিশেষত মালয়েশিয়া, ব্যাংকক ও সিঙ্গাঁপুর; সে ব্যাপার তার সঙ্গে আলাপ করে দেখব ইনশাআল্লাহ। ফজলুর বড় ছেলের নাম ইমরান এটুকু কেবল এখন মনে আছে। ওরা দুই ভাই বোন বর্তমানে।

২০০৪ সালের ২ ডিসেম্বর আমার ভারত যাত্রার বেশ কিছুপূর্ব থেকেই আমি প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের সমস্যায় ভুগছিলাম। পূর্ব থেকেই আমার ডায়াবেটিস রোগ তো ছিলই। অথচ আমি দিনের বেলায় যতনা প্রস্রাবের প্রয়োজন বোধ করতাম, তার চেয়ের বেশী রাতের বেলা প্রস্রাবের বেগ লাগত বেশী। রাতে অন্ত্যত ৩/৪ বার প্রায়ই টয়লেটে যেতে হত। ফলে ফজরের নামাজের জন্যে মসজিদে যেতে বেশ কষ্ট পেতে হত। আমার বন্ধু জনাব আবু বকর সিদ্দিক সাহেব তাঁর পছন্দনীয় দীর্ঘ দিনের ডাক্তার প্রফেসর আব্দুল ওহাব সাহেবের নিকট আমাকে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন এবং প্রফেসর একজন প্রবীণ প্রখ্যাত ইউরোলজিস্ট হিসেবে প্রসিদ্ধ। তিনি আমাকে পরীক্ষা করে অনেকগুলি প্যাথোলজিক্যাল টেস্ট করতে দেন। আমি তাঁকে ফি দিতে গেলে তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। যেহেতু আমর বন্ধু সিদ্দিক সাহেব তাঁকে ইতিমধ্যেই এক হাজার টাকা ফি দিয়ে ফেলেছেন। আমি বেশ একটু অপ্রস্তুত হলাম বটে। যা হোক প্রায় দু হাজার টাকা নানা প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে আমি জমা দিলাম। পরীক্ষার আমার PSA দেখা গেল ২.৯। তিনি পরে আমাকে প্রেসক্রিপশন করেন। আমি তাঁর কথামত ওষুধ সেবন করতে থাকি প্রায় ২/৩ মাস। কিন্তু কোন উপকার না পেয়ে তাঁকে টেলিফোনে জানালে তিনি আমাকে বলেন।

www.pathagar.com

'কাদেরী সাহেব। সম্ভবত ওষুধে বোধহয় আপনার আর কাজ হবে না। অতএব একবার আসেন দেখি' আমার ধারণা হল এবার তিনি নিশ্চয়ই অপারেশনের কথা বলবেন। অথচ সেটা আমি এড়িয়ে যেতে চাই। এরপর কথায় কথায় আমার বন্ধু মেজর জেনারেল (অবঃ) গোলাম মোক্তাদির সাহেব আমাকে পরামর্শ দেয়, "আপনি কর্নেল হারুণকে দেখান। তিনিই বর্তমানে সিএমএইচ (CMH) এর বেশ বড় ইউরোলজিস্ট। তাঁকে আপনি আমার কথাও বলবেন যে আমিই আপনাকে পাঠিয়েছি।"

কর্নেল হারুন অত্যন্ত সুদর্শন এবং ব্যাবহারেও বেশ চৌকশ। তিনি প্রফেসর ওহাব সাহেবের প্রথমেই খুবই প্রশংসা করলেন। তাঁর চেয়ে যে ওহাব সাহেব অনেক প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ তাও বার বার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্রথম দিনেই ৪০০টাকা ফি নেওয়ার পরই বললেন। আগামীকাল আবার আসবেন প্রচুর পানি পান করে এবং ব্রিগডিয়ার জেনারেল জাহাঙ্গীরের নিকট গিয়ে আলট্রাসনোগ্রাম এবং ইউরিন ফ্লোর রিপোর্টটা নিয়ে আমার কাছে আসবেন। যেহেতু এ দুটি প্রফেসর ওহাব বাদ দিয়েছিলেন। যাহোক তাঁর নিকট সব রিপোর্ট নিয়ে গেলে তিনি একটা লম্বা প্রেসক্রিপশন করেন এবং পুনরায় ৩০০ টাকা ফি আমাকে দিতে হয়। দু'মাস পর তিনি আমাকে পুনরায় তাঁর নিকট দেখা করতে বলেন। এভাবেই প্রায় ৮/৯ মাস তাঁকে দেখাতে থাকি এবং প্রতি বারেই ৩০০/৪০০ টাকা তাঁকে ফি দিতে হয়। আমি তাঁকে একবার বলিও যে, আপনি কি এটাকে কোন অপারেশন কেস বলে মনে করেন? এবং তা যদি হয় তো অপারেশন করতেও পারেন। তিনি আমাকে বলেন যে, আপনার তো প্রসাবে তেমন কোন জ্বালা পোড়া নেই, কোন অবস্ট্রাকশন নেই। তবে কেন মিছেমিছি আমি অপারেশনে যাব। এই ওষুধ আপনি খেতে থাকেন আশাকরি এতেই কাজ হবে। আর রাতের বেলা ২/১ বার তো আমরাও উঠি। আমি তাঁকে বলি আমি ভারতে যাচ্ছি বেশ কিছু দিনের জন্যে। তিনি বলেন কোন অসুবিধা নেই। যে ওষুধ আমি আপনাকে দিয়েছি তাই খেতে থাকুন। এভাবেই প্রায় ৮/১০ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল অতএব, ভারতে যাওয়ার সময় আমি কোন রিপোর্ট সঙ্গে নিয়ে যাইনি। যেহেতু সেখানে আবার নতুন করে আমার এই চিকিৎসা করাতে হতে পারে এমন ধারণা আমার ছিলনা।

www.pathagar.com

সপ্তত্রিংশ পর্ব

আমার মেজ ভাগনী রুহী থাকে রাজস্থানে দীর্ঘ ২০/২২ বছর ধরে। আমার পিতাও তার কাছে গেছেন বেড়াতে। কেবল মাত্র আমিই যেতে পারিনি তার কাছে। আমার একমাত্র বোনের এই মেজ মেয়েটি যেমন বুদ্ধিমতি তেমনিই শিক্ষিত। আমি যেমন তার ও তার স্বামীর গুণমুগ্ধ, তারাও তেমনি আমার প্রচন্ড ভক্ত-অনুরক্ত। ফলে, একবার সে টেলিফোনে কথা বলতে কেঁদেই ফেলল এবং অত্যন্ত অনুযোগের সুরে, বলল: "মামা, আপনি আমাদের একমাত্র মামা হওয়া সত্ত্বেও এই দূরদেশে হতভাগী ভাগনিটিকে একবার দেখতেও এলেন না? অথচ আপনি ইতিমধ্যে পৃথিবীর বহুদেশ ঘুরে এসেছেন। আমি তাকে সান্তনা দিয়ে বলি, ঠিক আছে মা, এরপর ভারতে আবার যখন আসব তখন ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই তোর নিকট যাব আমার যতই কষ্ট হোক। রাজস্থানের পশ্চিমে তার সরকারী বাসভবন। তার স্বামী হাবিবুর রহমান সেখানে এটোমিক পাওয়ার প্ল্যান্টের একজন অফিসার। তবে রুহীর কাছে যেতে হলে মাত্র দুটি রাস্তা। একটি আজমীর শরীফ হয়ে বাসরুটে ৫/৬ ঘন্টার যাত্রা এবং অন্যটি সোজা দিল্লি গিয়ে সেখান থেকে কোটারেল জংশন হয়ে সড়ক পথে ৬০ কিঃমিঃ দীর্ঘ পাহাড়ী পথের দুর্গম যাত্রা।

অতএব, ২/১২/০৪ তারিখে ভারতের পথে রওনা দিই। আমার ল'চাচার বড় ছেলে চৌধুরী জালাল উদ্দীন দীর্ঘদিন রোগ, ভোগের পর জান্নাতবাসী হয়। ফলে তার ছোট দুভাই চৌধুরী ফেদা উদ্দীন ও চৌধুরী নেসারউদ্দীন তাদের বড় ভাইয়ের মৃত্যুতে বেশ শোকাতুর ছিল। উপরন্তু তাদের সাধ্যের বাহিরে বেশ কিছু ঋণ গ্রস্ত হওয়ায় তারা প্রায়ই আমার নিকট সাহায্যের আবেদন জানাত। ফলে আমি তাঁদের মোটা ঋণের দাবী সংগ্রহ করি আমারই ছেলেমেয়েদের নিকট থেকে। কেননা বিশ হাজার টাকার মত তাদের দাবী পুরণের মত তাৎক্ষণিক ক্ষমতা আমার একারও ছিলনা। তবুও আমি তাদের টাকাটা যাতে যতখানি সম্ভব তাড়াতাড়ি দেওয়া যায় সেই উদ্দেশ্যে আমি প্রথমেই মারুগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হই। বাংলাদেশী টাকার বিনিময় মূল্য বাবত ভারতীয় মুদ্রায় বার হাজার টাকা আমি তাদের হাতে তুলে দিই।

অবশ্য ইতিপূর্বে অর্থাৎ ১৯৯৬ সালে সিউড়ীতে অবস্থানরত আমার এক চাচাত ভাই কচি যে ছিল একসময় ঐ শহরের বিখ্যাত বডি বিল্ডার তথা মাসলম্যান এবং

www.pathagar.com

পরবর্তীতে সে সিউড়ীর মিউনিসিপালিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দীর্ঘ দিন জন সেবা করে নিজের পরিবারের প্রতি নজর না দিতে পারায় প্রায় নিঃস্ব অবস্থায় আটকে পড়ে। পরে তার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তার ওপেন হার্ট সার্জারীর প্রয়োজন পড়ায় আমার নিকট দীর্ঘ পত্র লেখে মাত্র দেড় লক্ষ টাকার আবদার জানিয়ে। সে কারণ দেখায় যে, আমি তাদের চৌধুরী বংশের সর্বজেষ্ঠ সন্তান হিসেবে এটি আমার কর্তব্য যে তার জন্যে ঐ মাত্র দেড় লক্ষ টাকা তার এবং আমার নিকট আত্মীয়দের নিকট থেকে অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা করেও যদি আমি সংগ্রহ করতে পারি তবে এটা মোটেই কোন দুঃসাধ্য কাজ নয়, বিশেষত আমার পক্ষে। এই টাকার জন্যে সে বার বার আমার নিকট ফোন, ফ্যাক্স ও চিঠি পাঠাতে থাকে। আমি এমতাবস্থায় হতবিহবল হয়ে পড়ি। প্রথমে বেশ কিছু আত্মীয় স্বজন টাকা দিতে রাজি হলেও পরে তারা তার চরিত্র সম্বন্ধে আমার চেয়ে অনেক বেশী ওয়াকেফহাল থাকায় পিছিয়ে পড়ে। বিশেষতঃ তার মাতৃকূলের আত্মীয় স্বজনেরা। পরিশেষে চৌধুরী রহিম নওয়াজ এবং আমার পরিবার থেকে হাজার বার টাকা যোগাড় করে আমি নিজে সিউড়ীতে গিয়ে তাকে দিয়ে আসি এবং পরে বুঝতে পারি যে আমি ঘটনা যতখানি সত্য মনে করেছিলাম, আসলে তা ঠিক নয়। তার নিজের বড়ভাই ম্যাঙ্গোঁ (Mango) থাকে আমেরিকায়। সে সেখান থেকে প্রচুর সাহায্য সহযোগিতা করে তার ভাই বোনদের। তাছাড়া তার ছোট ভাই অরেঞ্জ ভারতীয় ব্যাংকের (State Bank of India) একজন ডেপুটি ডাইরেক্টর। তার মাত্র একটি অত্যন্ত মেধাবী ছেলে সে সমস্ত বীরভূম জেলায় প্রবেশিক্ষা পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করে। অথচ কচির তিনটি ছেলের মধ্যে সবগুলিই অপদার্থ। তার বড় ছেলে মনসুর ঢাকায় দীর্ঘদিন তার কোন আত্মীয়ের নিকট স্বল্প বেতনে কাজ করত। পরে আমাদের ঠিকানা যোগাড় করে ফারুকের নিকট এসে একটি চাকুরী চায়। ফারুক তাকে জিজ্ঞাসা করে কত বেতন পাও ওখানে? সে বলে মাত্র ২০০০ টাকা। ফারুক তাকে ৪০০০ টাকা বেতনসহ দুপুরের খাবার আমাদের সঙ্গেই করার সুযোগ দেয়। কিন্তু হতভাগা তার চাকুরীর প্রতি অনিয়মানুবর্তিতা, অদক্ষতার ফলে চাকুরীটি হারায় বছর খানেকের মাথায়। আমি তাকে একদিন তার দাদার নাম জিজ্ঞেস করি। অথচ সে নিজের দাদার নামটি পর্যন্ত উল্টাপাল্টাভাবে বলতে থাকে। সে নিজেকে একজন ভারতীয় গ্র্যাজুয়েট হিসেবে পরিচয় দিলেও আমি তার লক্ষণ পাইনি। উপরন্তু সে বিয়ে করার জন্যে আমার ছোট ছেলে ফাহিমের নিকট টাকা ধার চায় অথচ ফাহিম নিজেও তখন ব্যাচেলর। চাকুরী চলে যাওয়ার পরও সে বেশ কয়েকবার টাকা ধার

www.pathagar.com

করে নিয়ে গেছে যা কখনও শোধ করেনি। যা হোক এসব কথা আমার লেখার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু অপ্রিয় সত্যগুলি কিছু কিছু প্রকাশ না করলেও তো নয়। যদি কখনও সে এ বইপড়ে, তবে হয়ত তার নিজের চরিত্র সম্বন্ধে জানতে পেরে সংশোধন হতেও পারে। এই প্রত্যাশা নিয়েই আমি এতগুলি কথা লিখতে বাধ্য হলাম। আমি তার স্বভাব চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তাকে ভারতে ফিরে যেতে উপদেশ দিয়েছিলাম।

এবার আবার রুহীর কথায় ফিরে আসি। আমার সেজ ভাগনী পারুর স্বামীর নাম শাহাবুদ্দীন আহমদ ওরফে শাবু। অত্যন্ত ভাল ছেলে। এক সময় নামকরা ফুটবলার ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার ওপেন হার্ট সার্জারীর ফলে খেলা ছেড়ে দিতে হয়। তাছাড়া তার মধ্যে আমি লক্ষ্য করেছি চমৎকার স্পেটর্সম্যান স্পিরিট। সেটা অনেক নামী দামী খেলোয়াড়ের মধ্যেও দেখা যায় না। বর্তমানে সে ভারতে রাজধানী এক্সপ্রেসের প্রধান টিকিট চেকার। সে আমাকে বলে, মামা আমি আপনাকে রাজধানী এক্সপ্রেসে দিল্লি নিয়ে যেতে চাই। তবে সেখান থেকে আবার রাজধানী এক্সপ্রেসে কোটা যাওয়ার জন্যে আপনাকে টিকিট কিনতে হবে। আমি তার কথামত কলকাতায় ফেরারলী প্লেস থেকে টিকিট সংগ্রহ করি। পূর্ব থেকেই রুহী ও হাবিবকে ফোনে জানিয়ে দিই আমি কোন সময় এবং কবে কোটা পৌছাব। দিল্লিতে সে দিন বেলা ১১ টায় পৌছায় সেই দিনই বিকেল সাড়ে চারটায় আমি কোটা যাত্রা করি। রাজধানী এক্সপ্রেসের ব্যবস্থাপনা বেশ চমৎকার। এমন কি বিমানের মতই খানা পিনার উন্নতমানের ব্যবস্থা রয়েছে। কোটায় আমি পৌছালাম রাত ১০ টার পর। ডিসেম্বর মাস, অতএব প্রচন্ড শীত। আমার বগির সামনেই দেখি হাবিব আমাকে স্বাগতম জানানোর জন্যে অপেক্ষমান। সে একটি ট্যাক্সী রিজার্ভ করে নিয়ে এসেছিল রাওত ভাটা থেকে,যেহেতু অতরাতে আর কোন বাস নেই। কোটা এমন সুন্দর আলো ঝলমলে রেলজংশন শহর যেখানে থেকে মুম্বাই, গুজরাট এবং আহমদাবাদ যাওয়া যায়। যাহোক, ঐ রাতেই শহরের অনেকখানি ঘুরেফিরে ৬০ কি:মি: দূরে রাওতভাটার পথে যাওয়ার সময় আমার একটা কথা মনে পড়ল যে, এই দুর্গম কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার পাহাড়ী পথে দীর্ঘ যাত্রা পথের মিল পেলাম, ১৯৯৬ সালে যখন আমি সীমার ফুপাত ভাই জামশেদ তার মোটর বাইকে আমাকে পিছনে বসিয়ে একদম মেঠোপথে ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। করাচী শহরের এতটুকু আলোর ছটাও তখন আমাদের চোখে পড়েনি। খুবই ভয়াবহ এবং বিপদজনক অবস্থায় আমরা যাত্রা করেছিলাম। সে ঘটানার বৃত্তান্তই হাবিবকে আমি শুনাতে থাকি। রাত প্রায় ১২ টার দিকে হাবিবের সরকারী বাসায় আমরা উপস্থিত

www.pathagar.com

হই। রুহী ও তার ছোট ছেলে শারহান আমাদের জন্যে অপেক্ষাতেই ছিল। আমি গাড়ীর ভাড়া দিতে গেলেও হাবিব আমাকে বাধা দেয় কেননা তার পরিচিত এক বন্ধুর গাড়ী রিজার্ভ করেছিল। রুহী ও তার ছেলে আমাকে পেয়ে তো আনন্দে আত্মহারা। অতরাতে খাওয়া দাওয়ার পর আমাকে বড় ঘরটাই তারা ছেড়ে দিল আমার প্রবল আপত্তি থাকা সত্ত্বেও। দোতলা বিশিষ্ট ভবন হওয়া সত্তেও পশ্চিম দিকে প্রকান্ড খোলা ছাদ সেটা তারাই কেবল সর্বক্ষণ ব্যবহার করতে পারে।

পরদিন সকাল বেলায় রুহীর শশুর সাহেব আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁর নিজস্ব তৈরী করা বাস ভবন থেকে। বর্দ্ধমানে কয়েকবছর আগে আমি তাকে ও তার স্ত্রীকে দেখেছিলাম। তারা বেড়াতে এসেছিলেন রাজস্থান থেকে । তখন তাদের শরীর স্বাস্থ্য মোটামোটি ভালই ছিল। কিন্তু এবার আমার বেয়াই সাহেবের এমন ভগ্ন স্বাস্থ্য দেখে আমি বাস্তবিকই তাঁকে চিনতে পারিনি। রুহী আমাকে তাঁর পরিচয় দিয়ে সাহায্য করল। যাহোক আমি আমার চক্ষুদর্শনের এ ভুলের জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিই। তিনি অবশ্য বয়সে আমার চেয়ে বেশ কিছু বড় হবেন। অনেক গল্পগুজব ও নাস্তা পানির পর আমি তাঁকে একটু এগিয়ে দিতে গিয়ে পায়ে পায়ে বেশ একটু দূরে তাঁর বাড়ী পর্যন্ত চলে গেলাম। তিনি পথে অনেক গল্প করতে করতে বললেন, এই যে সব দোকান পাঠ যা কিছু দেখছেন। এসব তখন কিছুই ছিল না, যখন আমি এখানে আসি অর্থাৎ প্রায় ২৫/৩০ বছর আগে । আমি অবাক হয়ে চতুর্দিকে দেখলাম তেমন ভাল লোক বসতির যেন। বেশ অভাব। তাঁর নিজের বাড়ী পর্যন্ত যেতে যেতে যেসব বসত বাড়ী নজরে পরল তাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি ঐ এলাকায় একটু নীচু ঢালের মধ্যে বেশ কিছুটা জায়গা নিয়ে একটি আড়াই তলা পাকা বাড়ী বানিয়েছেন এবং বাড়ী সংলগ্ন তাঁর একটি বাগান আছে নানা রকমের ফলমূলের আমার বেয়ান যেহেতু সদর দরজা বন্ধ রেখে বাথরুমে ছিলেন বলে আমি আর অপেক্ষা করিনি। আমি বেয়াই সাহেবকে কথা দিয়ে আসি যে আমি আবার আসব আপনাদের প্রচুর ছবি তুলব এবং আপনার পুরো বাড়ীটা ভাল করে দেখব।

বলা বাহুল্য যে ভারত প্রকান্ড বড় দেশ এবং তার আছে বহু ছোট বড় প্রদেশ। আমাদের এই ক্ষুদ্র বাংলাদেশের চেয়ে প্রায ৩২ গুণবড়। রাজস্থান ভারতের পশ্চিম প্রান্তে একটি অতি বৃহৎ প্রদেশ। এই রাজস্থানেই রযেছে ভারতের একমাত্র গোপী মরুভূমি। সমস্ত ভারতে যে আটটি এটোমিক পাওয়ার প্ল্যান্ট রযেছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই রাজস্থানের রাওত ভাটায়। রুহীর বাসার একটু দূরেই রয়েছে হেভী ওয়াটার প্লান্ট। যারফলে সেখানকার পানিতে রযেছে ৫% রেডিয়েশন। যেটা

www.pathagar.com

শরীরের জন্যে ক্ষতিকারক। ফলে সেখানে লোকসংখ্যা বেশ কম লক্ষ্য করেছি। রুহীর নিকট আমার থাকার ইচ্ছা ছিল মাত্র সাপ্তাহ খানেক। কিন্তু তাদের আদর আপ্যায়ন ও প্রচুর খানা পিনা আমাকে আটকে রাখে দীর্ঘ ১৪ দিন। মজার ব্যাপার হল যে, আমার জামাই বাবাজী সুপ্রিয় হাবিব আমাকে পেয়ে তার অফিস যাওয়া বন্ধ রাখল পুরো এক সপ্তাহ। প্রায় অফিস যাওয়ার জন্যে তৈরী হয়েও পথে গিয়ে কোন তার কলিগকে বলে জানিয়ে দিত যে সে আজ আর অফিসে যাবেনা।রুহী আমাকে একদিন বলেই বসল যে, মামা লক্ষ করেছেন আপনি আসার পর আপনার জামাই বাবাজী এ কদিন আর অফিস মুখো হয়নি। কেবল রাতদিন আপনার সঙ্গে খোশগল্পে মও। অবশ্য আমিও তাকে বলেছিলাম যে আমিও তোমার পাওয়ার প্ল্যান্ট একদিন যেতে চাই। কিন্তু কেন জানিনা সে কিন্তু আমাকে তার অফিসে নিয়ে যেতে মোটেই উৎসাহী ছিল না। আসল ব্যাপারটাও আমাকে কোনদিন খুলে বলেনি। অথচ মাত্র ১০ কিঃমিঃ দূরে তার অফিস। তাদের নিজেদের বাসেই সকলে যাওয়া আসা করে। শুনেছি তাকে অফিসে প্রবেশের পূর্বে নিজের জামা কাপড় সব বদলিয়ে তাদের অফিসের বিশেষ ধরনের পোষাক পরেই প্রবেশ করতে হয়। কেননা সেখানে প্রচুর রেডিয়েশনের জন্যেই এই সতর্কতা। হয়ত সে জন্যেই আমাকে সেখানে সে নিয়ে যেতে চায়নি।

২৬ ডিসেম্বর ২০০৫ এ যে ভয়াবহ সুনামীর ছোবল আঘাত হানে ভারতের আন্দামান নিকোবর ও তামিলনাড়ু প্রভৃতি অঞ্চলে, এমন কি ভারতের বাইরেও যেমন শ্রীলংকা ফিলিপাইন ইত্যাদি এলাকায়। তখন কিন্তু আমি রাজস্থানেই অবস্থান করছিলাম এবং হাবিবই সর্ব প্রথম এ দুঃসংবাদ তার অফিস থেকে জেনে আসে যে, তালিনাড়ুতে তাদের যে, এটামিক পাওয়ার প্ল্যান্ট আছে তার প্রভূত ক্ষতি হয়েছে এই সুনামীর ফলে। অবশ্য এর ভয়াবহতার দৃশ্য তখন আমরা বাসায় টিভি পর্দায় লক্ষ্য করেছি।

রুহীর ওখানে ভারতের বিখ্যাত দেরাদুন চালের ভাত ছিল আমার খুবই প্রিয়। বেশ লম্বা চিকন ভাতের জন্যে আমি রুহীকে বলি, আরে এটা তো রীতিমত বিরিয়ানী বা পোলাও এর চাল। বাস তারপর থেকেই সে শুরু করল প্রতিদিন বিরিয়ানী পোলাও খাওয়াতে। কিন্তু মজার ব্যাপার হল যে, আমি লক্ষ্য করলাম কোন ঘিয়ের খুশবু পাইনা কেন? রুহীকে বললাম এ ঘি কোথাকার কোন খুশবু নেই কেন? রুহী বলে মামা আমি নিজে বাসায় তৈরী করি এ ঘি। আমি আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞসা করি তাহলে ঘিয়ের সে খুশবু নেই কেন? রহী বলে আপনি চতুর্দিকে তাকিয়ে দেখেন

www.pathagar.com

কী খেয়ে এখানকার প্রাণীকুল বেঁচে আছে। কোথায় সেই সবুজ সতেজ ঘাস, কোথায় তেমন গাছপালা বা বৃষ্টিপাত? এইরুক্ষ মরুভূমির মত স্থানে যে এরা বেঁচে আছে এটাই তো আশ্চর্য। বাস্তবিকই তাই। আমি একদিন বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ছিলাম হঠাৎ দেখি বিশাল এক উটের পাল রাস্তার এক পাশ দিয়ে রাজস্থানী মহিলারা একহাত লম্বা ঘোমটা টেনে তাদের দড়ি ধরে নিয়ে যাচ্ছে লাইন দিয়ে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে। আমার সঙ্গে তখন ক্যামেরা ছিলানা বলে আমি কোন ছবি তুলতে পারলাম না। বাসায় এসে বলতেই রুহীর বেটা শাররহান আমাকে বলে নানাজী আপ হামকো কিউ নেহী বাতায়া? হামখোদ্ দৌড়কে আপকা ক্যামেরা লে যাতে উহাঁ? কিন্তু আমি এমন হঠাৎ করে বিশাল চলন্ত উটের কাফেলার সম্মুখীন হব তাও ভাবিনি।

যাহোক! যে কদিন ছিলাম হাবিব, রুহী ও তার ছেলেরা আমাকে অনেক কিছু ভাল ভাল জিনিষ ঘুরে ঘুরে দেখিছে এবং আমিও অনেক ছবি তুলেছি। যেমন চমৎকার পার্কের, যেখানে রয়েছে বেশ কযেকটি গাছের তৈরী উটের প্রতিকৃতি।

বিশেষ করে রাতের বেলা অনেক আলোয় ভরা পার্ক। অবশ্য সেখানে রয়েছে প্রচুর সংরক্ষিত সবুজ ঘাসের গালিচা, যার উপর দিয়ে হাঁটাচলা নিষেধ। সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মনোরঞ্জনের জন্যে রয়েছে প্রচুর ভাল ব্যবস্থা। যেমন সুইমিং পুল,ক্লাব, লাইব্রেরী, ভাল চিকিৎসা কেন্দ্র। এসব এলাকা যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তেমনই সংরক্ষিত ও সুদৃশ্য। এমন কি মেয়েদের জন্যে আলাদা সুইমিং পুলের চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে। রুহীর বড় ছেলে ফারহান থাকে লেক সিটি নামে খ্যাত উদয়পুরে। সেখানে সে ফিজিও থেরাপীতে পড়াশুনা করছে। আমি চলে আসার মাত্র ২/৩ দিন পূর্বে সে ছুটিতে আসে। ইনশাআল্লাহ্ সে একদিন ডাক্তার হয়ে বেরিযে আসবে। রুহীর ছোট ছেলে শারহান সেও এইচএসসি পড়ছে স্থানীয় কলেজে। ভারতের শিক্ষাকার্যক্রম নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের চেয়ে অনেক উন্নত মানের। রুহীর মাত্র এই দুটি ছেলেকে নিয়েই তার বিরাট আশা। দোয়া করি মহান আল্লাহপাক তাদের আশা পুরণ করুন। আমীন!!

আমি সেখানে জুম্মার নামাজ পড়ার সুযোগ পেয়েছি। বেরেলী পন্থি ইমাম সাহেবের উর্দু ও আরবী খোত্‌বা আমার বেশ পছন্দ হয়েছে। তিনিও আমার সঙ্গে পরিচিত হযে খুবখুশি। শেষদিন তিনি আমাকে একটি উর্দূ বইও উপহার দেন মসজিদটি রুহীর বাসা থেকে বেশ দূরে বাজার এলাকায় ফলে হাবিবের পরিচিত বন্ধু

www.pathagar.com

বান্ধব আমাকে কখনও মোটর বাইক অথবা কখনও কারে আমদের লিফ্‌ট দিয়েছেন। হাবিব ও তার ছেলেরাও জুম্মার নামাজ পড়তে যেত আমার সঙ্গে।

হাবিবের সঙ্গে আমি প্রায়ই হাটে বাজারে গিয়ে লক্ষ্য করেছি প্রচুর সস্তায় সবজি ও নানা প্রকারের ফলমূল। অবশ্য সবই হাইব্রিড জাত। আমাকে রুহী প্রায়ই জোর করে প্রচুর ফলমুল খাওয়াত এটা তার অনেকটা অভ্যাসও বলা চলে। বেদানা মাত্র ২০ রূপী কেজি অথচ বাংলাদেশে ১২০-১৪০ টাকা কেজি। হাটে গিয়ে আমি নিজেও বেশ কিছু ফলমুল ও সবজি কিনতে থাকি অত সস্তা দেখে। হাবিব আমার কেনা কাটা দেখে আমাকে বলে মামা আপনার মানি ব্যাগটা এখন আমাকে দেন পরে নেবেন। রুহীর বড় ছেলে ফারহান রুহীর কথামত আমাকে নিয়ে গেল বেশ দূরে একটা বিশাল আকৃতির ড্যাম দেখাতে যেখানে ছবি তোলা নিষেধ। একটি চমৎকার ফুলের বাগান দেখাল ঐ এলাকায়। রুহী জানে যে, আমি একটু ভোজন রসিক মানুষ। এজন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক আমি যেহেতু পড়াশুনা ছাড়া মোটেই চুপচাপ বসে থাকতে পারিনা। অবশ্য ইসলামী মতে খারাপ কথা বলার চেয়ে চুপ থাকা ভাল এবং চুপ থাকার চেয়ে ভালকথা ভাল। আমি এই নীতি বহুকাল ধরে মেনে চলি। আমার এ অবস্থাতেও আমার রুহীমা আমার মুখের মধ্যে নিজ হাতে ঠেলে ঠেলে খাবার পুরে দেয় আমার আপত্তি সত্ত্বেও আবার সঙ্গে সঙ্গে বলেও ফেলে মামা এ সবই কিন্তু হাইব্রিডের ফলমুল এসব কিছুতেই রয়েছে রেডিয়েশন। কেমন পাগল মেয়ে। যে এতসব জেনেও সে তার একমাত্র মামাকে আদর করে বিষ পান করাচ্ছে। এ যেন সেই, আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান, কলকাতায় ১৯৯৭ সালে আমার গল ব্লাডার অপারেশন করাতে বাধ্য হই। যেহেতু বাংলাদেশী সার্জেন সাহেব আমার ঐ অবস্থায় অপারেশন করতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং বলেন আগামী ৬ সাপ্তাহের পূর্বে ওখানে ছুরি চালান যাবেনা। অথচ আমার পেটের ব্যাথায় আমি তখনও ছিলাম কাতর। আমার ভাগনা নোমান জাহেদীকে সঙ্গে নিয়ে তার পরদিনই বিমানে দ্রুত গিয়ে উপস্থিত হই কলকাতায়। অবশ্য আমি সঙ্গে প্রচুর টাকা পয়সা নিয়েছিলাম যাতে কারো নিকট কোনরূপ টাকা পয়সার জন্যে আমাকে হাত পাততে না হয়। ওখানে মাত্র ৭ দিন পরই বিখ্যাত সার্জন ডাঃ সৈয়দ আব্দুল মোমেন তাঁর নিজস্ব ক্লিনিক দিলকুশায় দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘন্টায় আমার অপারেশন সম্পন্ন করেন। সে সময় আমার মেজ মামা মেহবুব জাহেদী সাহেবের ছোট ছেলে মনসুরের বিয়ের প্রস্তুতি চলছিল বলে তাঁরা সকলের পুরো বাসা খালি করে শুধু আমাদের রেখে

www.pathagar.com

গুসকরায় চলে যান। মামা অবশ্য তখন মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনিই আমাকে ডাক্তারের কাছে প্রথম নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর ছেলের বিয়ের কার্ডসহ।

যা হোক আমার বোন ভাগনা ভাগনিরা জামাই বাবাজীরাসহ সকলেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে আমার সেবা যত্ন করেছে যার প্রশংসা করে আমি আর তাদের মোটেই ছোট করতে চাইনা। অপারেশনের ১০/১২ দিন পর আমরা সকলেই কাশিয়াড়া গ্রামে আমার বোনের বাড়ীতে গিয়ে দীর্ঘ একমাস আমার ঘা না শুকানো পর্যন্ত বিশ্রাম করি। কলকাতা থেকে আসার পথে বর্দ্ধমান রেল জংশনে রুহী ও হাবিব তার দু'ছেলে সহ রাজস্থান থেকে সোজা এসে ঐ ট্রেনেই আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং আমাদের সঙ্গী হয়ে কাশিয়াড়া গমন করে। প্রতিদিন আমার পেটের ঘায়ের ড্রেসিং করত সেজ জামই শাবু, মেজ জামাই হাবিব এবং শেষের দিকে ছোট জামাই ফরিদ।

রুহী সপ্তাহ দুয়েক থাকার পর রাজস্থানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার অভ্যাসবশতঃ আমার মুখে সেমাই, পরটা ইত্যাদি খাবার যা আমার জন্যে তখন ছিল একেবারেই নিষিদ্ধ, আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও জোর করে তার একমাত্র আদরের মামার মুখে গুঁজে দেয়। কিন্তু এর প্রতিফল যে কীরূপ হয়েছিল তা সে বোধকরি আজও জানেনা। সকালে তার মাসহ প্রায় সকলেই কাশিয়াড়া ত্যাগ করে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে। একমাত্র অসুস্থ কবিভাই আমার ভগ্নিপতি এবং হেলেন, কাজের মেয়ে আজাদী ও তার পরিবারবর্গ ছাড়া আমাকে দেখার আর কেউ ছিল না। ওদের চলে যাওযার দিন শেষে রাত্রিবেলা থেকেই শুরু হয় আমর প্রচন্ড ডাইরিয়া। একবার, দুবার বা দশবার নয় সমস্ত রাত্রিতে আমি মোট ২৭ বার, টয়লেটে গেছি একা কেননা। পাশের ঘরে ছিলেন কবি ভাই আর এ ঘরে আমি। দু ঘরের মাঝেই ছিল উঁচু করে তৈরী করা ইন্ডিয়ান কমোড। কবি ভাই আমার টয়লেটে যাওয়ার হিসাবটা আমাকে পরের দিন জানান। অবশ্য পরে হেলেন ডাঃ ডেকে এনে আমাকে দেখিয়ে তবেই সুস্থ করে তুলে এতগুলি কথা লিখলাম কেবল মাত্র এজন্যে যে যেমন কথায় বলে শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ করে যে! ঠিক তেমনই আদর সোহগের মাত্রাটাও পরিমিত হওয়াও বানঞ্ছনীয় এখানে আবেগের কোন অবকাশ নেই। আমার কলেজে ১৯৫৩ সালে বাংলার প্রখ্যাত অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার সাহেব খুব ভাল করে তাঁর এক বক্তৃতায় আমাদের বুঝিয়েছিলেন যে, মনে রেখ আবেগ প্রকাশ করার মধ্যে কোন বুদ্ধির পরিচয় নেই বরং তা নির্বুদ্ধিতারই লক্ষণ। পক্ষান্তরে যারা আবেগ প্রকাশ করেনা, তার মানে এই নয় যে তারা কিছু বুঝেনি বরং তারাই বুদ্ধিমান।

www.pathagar.com

রুহীর ওখানে রাজস্থানে থাকতেই আমি প্রতি রাত একটা থেকে ভোর পাঁচটা প্রতি ৩০/৪৫ মিনিট পরপর টয়লেটে প্রস্রাবের জন্যে যেতাম। আমার তখনই সন্দেহ হয় যে নিশ্চয়ই প্রস্টেট গ্ল্যান্ডের প্রসারিতার কারণেই এটা হচ্ছে। ফলে আমার ফজরের নামাজে বেশ ব্যাঘাত ঘটত। ওখানে হাবিব দু'একজন ডাক্তারকে দেখাল বটে কিন্তু তেমন কাজ হলনা। তাছাড়া তাদের জন্যে যে বিশাল হাসপাতাল রয়েছে সেখানে বাইরের কোন রুগী দেখানোতে বিধি নিষেধ থাকায় আমি সে সুযোগ পাইনি। যাহোক আমি ঠিক করলাম কলাকাতায় গিয়েই আমার চোখ, কান এবং প্রবেস্টেটের চিকিৎসা উত্তম চিকিৎসকের দ্বারাই করার একদিন আমি আমার অবস্থান জানিয়ে ঢাকায় ফোন করি। আমার ছেলেও পুত্রবধুর বিশেষ অনুরোধ ছিল যে, আমি যেখানেই থাকিনা কেন আমি যেন তাদেরকে জানিয়ে দিই। রুহীর বাসায় কোন ফোন না থাকায় আমি ও হাবিব একদিন সন্ধ্যার পর একটা দেকান থেকে ফোন করি। সীমা ফোন ধরে কিছু কথা শুনে আমকে বলে আপনি ফোন ছেড়ে দিন। আমি একটু পরে রুহীর শশুর বাড়ীতে আপনাদের সকলের সঙ্গেই কথা বলব। আমরা আমার বেয়ায়ের বাড়ীতে গিয়ে বেশ কিছুক্ষণ পর তাদের সঙ্গে কথা বলে ঢাকার সব খবর নিলাম।

আমি রাত ভাটা থেকে উদয়পুর আজমীর শরীফ ইত্যাদি স্থানে যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে পারলাম না। যেহেতু রাস্তা বিশেষ সুবিধা নয়, উপরন্তু আমি দীর্ঘ বাস যাত্রা বড়ই অপছন্দ করি। কুহু অর্থাৎ হাবিবের ছোট বোন তার ছেলেসহ হঠাৎ তার পিতার বাড়ীতে বেড়াতে আসে ক'দিনের জন্যে তার কর্মস্থান চিতোড় গড় থেকে। যেখানে শিক্ষকতা করে।আমি তাদের বাসায় হাবিবসহ গিয়ে একদিন রাতে বেশ কিছু গ্রুপ ছবি তুললাম। আমার বেয়ানের পুরো বাসা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সবটা দেখে বেশ ভাল লাগল। তার সমস্ত ছেলে মেয়েরা এবং তাদের ছেলেমেয়েসহ একত্রে এবাড়ীতে আসলেও তাদের কোন অসুবিধা নেই। কেননা, প্রতিটি রুমেই পৃথক পৃথক বিছানার ব্যবস্থা দেখে আমি তাঁর প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। তিনিও বেশ খুশি হলেন তার যথার্থ প্রশংসা করার জন্যে। তার বাসায় খোলা ছাদে নিরিবিলিতে ইসলাম ধর্ম, নামাজ-রোজা ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কিছু আলোচনা করলাম। সে অত্যন্ত মনযোগ দিয়ে আমার সব কথা শুনল। পরে আমি কলকাতায় ফিরে এলে রুহী আমাকে ফোনে জানাল মামা আপনার জামাই এখন রীতিমত নামাজী হয়ে গেছে। আমি বললাম আলাহামদোলিল্লাহ! খুব ভাল ছেলে হাবিব। ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করেছে সে, তবুও সে কিছু বাংলা লিখতে না পারলেও

www.pathagar.com

পড়তে পারে। রুহী কলকাতায় স্কটিস চার্চ কলেজে অনার্স পড়েছে। অতএব, তার ইংরেজিতে চমৎকার দখল আছে আমি জানতাম। তবুও বাঙ্গালি মেয়ে হিসেবে নিজের মাতৃভাষার প্রতি তার যেন একেবারে ভাটা না পড়ে, সে জন্য আমি ঢাকা থেকে আইডিইবি প্রকাশিত কয়েক কপি মাসিক কারিগর ম্যাগাজিন নিয়ে গিয়েছিলাম। যাতে আমারও কিছু প্রতিবেদন। ছিল স্মৃতিকণা ভারত থেকে ইউরোপ নামের নিবন্ধে। ওদের ওখানে তো কোন বাংলা পত্র পত্রিকার প্রচলন নেই একেবারেই। প্রকৃত পক্ষে উভয় বাংলার বাইরে বাংলা ভাষার আদৌ কোন প্রচলন নেই। তাছাড়া ভারত বহু ভাষাভাষীর দেশ। যেমন ইংরেজি, হিন্দি, উর্দূ, তামিল তেলেগু বাংলা, পঞ্জাবী, মালায়ালাম, কানাড়া, গুজরাটি, নেপালী, ভূটানী, সাঁউতালী ইত্যাদি। অবশ্য রুহী তার বাসায় রাখে Times of India এবং সেটাই সে পড়ে। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে নিজের মাতৃভাষার জন্যে আর কোন দেশ বুকের রক্ত দান করেনি একমাত্র এই বাংলাদেশ ছাড়া। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে আমি দশম শ্রেণীর ছাত্র। অতএব, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই সারা দেশ ব্যাপী ভাষা আন্দোলনের মহান ইতিহাস আমার বেশ কিছুটা জানা আছে। এখানে উল্লেক করা যেতে পারে যে, সারা বিশ্বের মধ্যে একমাত্র ভারতেই সর্বনিম্নমূল্যে দৈনিক পত্রিকা পড়ার সুযোগ আছে। যা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। মাত্র এক টাকার বিনিময়ে Daily Telegraph পড়া যায়।

এবং এ কারণেই বোধকরি ভারতে প্রচুর পাঠকের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে হঠাৎ একদিন রুহী আমাকে একটা ঘটনা শুনাল কথায় কথায়, যা আমি মোটেই জানতাম না। অর্থ এ ঘটনা বেশ কয়েক বছরের পুরান। যেটা আমার বোনের পরিবারের সকলেই জানে। আমার সর্বকনিষ্ট ভাগনী ইতির বিয়েতে আমি ভারতে গিয়েছিলাম এবং এই বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল সেজ জামাই শাবু। যেহেতু সে রেলে চাকুরী করে সেই সূত্রে পাওয়া হাওড়া জেলা নিবাসী ফরিদুল ইসলাম মোল্লা নামে একজন রেল কর্মচারী গ্র্যাজুয়েট যুবকের সঙ্গে ইতির বিয়ের প্রস্তাব মেয়ে পক্ষের নিকট গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছিল এবং বিয়েও খুবই জাঁক জমকের সঙ্গে মেয়ের একমাত্র বড়ভাই নোমান জাহেদী যথেষ্ট খরচাপাতিকরে বহু মেহমানের চমৎকার আয়োজন করেছিল। ইতির বিয়ের পরেই আমি কনে ও বরযাত্রীদেরসহ হাওড়ার মোল্লা পাড়ার বাসায় ছেলে পক্ষের দাওযাত রক্ষার পরপরই সমস্ত ভারত ভ্রমনে বেরিযে পড়ি ১৯৯৬ সালে।

www.pathagar.com

গঙ্গা নদীর এপারে কলকাতা আর ওপারে হাওড়া। ইতোমধ্যে গঙ্গার উপর দিয়ে প্রচুর পানি গড়িয়ে বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে পদ্মা নদী নামে সোজা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। অর্থাৎ ৮/৯ বছরের এ দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ফরিদ ও শাবুর মধ্যে এ বিশ্রী মনমালিন্যের ঘটনা তা বাস্তবিকই আমার জ্ঞানের অগোচরে ছিল। কেউ এ ঘটনা আমার কাছে প্রকাশ করেনি। ঘটনা এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে শাবুর পরিবারবর্গ এবং ফরিদের পরিবা বর্গ সম্পূর্ণ ভাবেই বিভক্ত হয়ে পড়ে। ইতি এবং পারু দু'বোন কেউ কারো বাসায় যাতায়াত করতে পারে না দীর্ঘদিন। ইতোমধ্যে ইতির এক মেয়ে ফিজা প্রথম সন্তান হিসেবে পরিবারে এসেছে। যার বয়স বর্তমানে ৮ বছর। আমি অবশ্য বিস্ময়ে রুহীকে প্রশ্ন করি এই সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারটা কেউ মীমাংসা করার চেষ্টা করেনি? রুহী বলল। মামা চেষ্টার কেউ ত্রুটি করেনি। আমার মা ভাই থেকে শুরু করে মন্ত্রী সাহেব জাহেদী নানা পর্যন্ত বহু চেষ্টা করেও কেউ কিছুই করতে পারেন নি। এমন কি কবিভাই পর্যন্ত তাঁর মেয়ের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা নিতেও প্রস্তুত ছিলেন। এ পর্যন্ত ঘটনা জানার পর আমি মন্তব্য করি এ মীমাংসার ব্যাপারটা কীভাবে করা যায় আমি চেষ্টা করে দেখব। রুহীর ও বিশ্বাস সম্ভবত এটা একমাত্র আমার দ্বারাই সম্ভব। যেহেতু সব জামাইগুলিই আমার অত্যন্ত ভক্ত অনুরক্ত সেক্ষেত্রে ইনশাআল্লাহ ব্যবস্থা একটা হবেই বলে আমারও যেন দৃঢ় বিশ্বাস তথা উইল ফোর্স তখনই কাজ করতে শুরু করল। যেভাবে আমি ইতোপূর্বে আমার ছাত্রাবস্থা থেকেই নেতত্বদানে ছিলাম বেশ পারংঙ্গম।

রাজস্থান ছেড়ে আসার পূর্বে আমি মাত্র দুটি টিকিট কেনার জন্যে হাবিবকে টাকা দিয়েছিলাম। একটা ছিল কোটা থেকে আগ্রা এবং অন্যটি ছিল আগ্রা থেকে দিল্লি। বেচারা আমার জন্যে অনেক কষ্টকরে সেই ৬০ কিঃমিঃ দূরে কোটা রেল জংশন থেকে রিজার্ভেশনসহ টিকিট কিনে আনে। যেহেতু আমি পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় তাজমহলের ছবি তুলতে চাই। সাড়ে তিনশত বছরের পূর্তি উপলক্ষ্যে শুনেছিলাম তাজমহলকে নতুনভাবে ঘসামাজা করে বিদেশীদের নিকট আকৃষ্ট করা হয়েছে এবং প্রায় ১৪০টির মত কারখানা বন্ধ করা হয়েছিল তাজমহলের চাকচিক্য সাদা মার্বলের ধপধপে রংটা যাতে টিকিয়ে রাখা যায় সেই উদ্দেশ্যে। এমন কি তাজমহল নীচের দিকে বসে যাওয়ার দরুণ তার ত্রিসীমানায় কেবল মাত্র মসজিদের দিক ছাড়া নতুন ভাবে চওড়া করে পাকা গাঁথুনীর মাধ্যমে যাতে তাকে ধরে রাখা যায় এমন ভাবে করিডোর কনস্ট্রাকট্রাকশন করা হয়েছে ১৭৫ কোটি রূপির বিনিময়ে। আমি কেবলমাত্র আগ্রার তাজমহলের এই শেষ বারের মত ছবি তোলার জন্যে বেলা সাড়ে

www.pathagar.com

তিনটা থেকে রাত সাড়ে সাতটা পর্যন্ত প্রচুর ছবি তুললাম। কিন্তু কোথায় সেই সাদা মার্বল পাথরের ধপধপে উজ্জ্বল রং? কোথায় সেই চাঁদনী রাতে দেখা তাজমহেলের অপূর্ব রূপ? কোথায় সেই যমুনা নদীর জ্বলে পূর্ণ চন্দ্রের শুভ্র সমুজ্জলের ছটা? কিছুই নেই। কালে কপোল তলে শুভ্র সমুজ্জলের ইন্দ্র ধনুচ্ছটার প্রায় সবই মহাকালের গভীর গর্ভে নিমজ্জিত। কিন্তু তবুও প্রতিদিন প্রায় বিশ হাজার দর্শনার্থীর আগমন। দেশীদের জন্যে ২০ রূপী এবং বিদেশীদের জন্যে ৭৫০ রূপীর দক্ষিণা দিতে হয় প্রত্যেক দর্শনার্থীকে। আবার পূর্ণিমার জ্যোৎস্না রাতে মাত্র তিনদিনের জন্যে টিকিটের হার ভারতীয়দের জন্যে ৫০০ শত রূপী এবং বিদেশীদের জন্যে ১২০০ শত রূপী ধার্য্য করা হয়েছে। আমি আমার কৌতুহলবশতঃ একটু খোঁজখবর নিয়ে যে হিসেব পেলাম তা প্রায় অবিশ্বাস্য প্রতিদিনের আয় প্রায় ৫ থেকে ৬ লাখ রূপী। অথচ কবিগুরুর সেই মহারানী হীরা মুক্তা মানিক্যের ঘটনার বিন্দু বিসর্গ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অবর্তমান। রিকশাওয়ালার অনুরোধে এবারও একটা তাজমহলের প্রতিকৃতি উচ্চমূল্যে কিনে ফেলি। যেটার নীচে আলো ধরলে সত্যিকারের সেই আমলের তাজমহলের অপূর্ব রূপ যেন বেশ কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

পুরো একটা দিন ও একটি রাত আমাকে আগ্রায় এই প্রচন্ড শীতে কাটাতে হয় কেবল মাত্র তাজমহলের জন্যে। তবে আর কখনও তাজমহল দেখার আগ্রহ আমার নেই এটা আমি নিশ্চিত।

www.pathagar.com

অষ্টত্রিংশ পর্ব

এবার দিল্লিতে এলাম কেবল মাত্র লোটাস টেম্পল দেখার জন্যে। এটা নিউ দিল্লি থেকে বেশ অনেক দূরে। ট্যাক্সিতে প্রায় ঘন্টা খানিকের যাত্রা। ইরানের বাহাইয়ান সম্প্রদায়ের লোকদের সাহায্যে এটি তৈরী করা হয়েছে প্রায় ২৬ একর বিশাল স্থান জুড়ে। অত্যন্ত নয়নাভিরাম পরিবেশ চতুর্দিকে। বহু কোটি টাকার বিনিময়ে তাঁরা এটা তৈরী করেছেন বিশ্বের ১২/১৪ লাখ বাহাইয়ান সম্প্রদায়ের অর্থানুকূল্যে। তাঁদেরমূল কথা হল একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কোন প্রকারের দেব-দেবী বা অবতারের পূজা করার কোন প্রয়োজন নেই। এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিই একমাত্র তার রক্ষাকর্তা পালন কর্তা। এমনকি এ মহাবিশ্বের ধংসকারীও তিনি। অতি চমৎকার সত্যিকথা নিঃসন্দেহে। এক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে যথেষ্ট মিল রয়েছে ঠিকই। কিন্তু বাহাইয়ান সম্প্রদায় বিশ্বের কোন নবীর নাম পর্যন্ত নবী হিসেবে মানতে অপারগ। কোন প্রকার দক্ষিণা ছাড়াই সেখানে সর্ব ধর্মের লোকের প্রবেশাধিকার রয়েছে। জুতো খুলে লোটাস টেম্পলের মধ্যে যাওয়ার অনুমতি আছে এবং কোন রূপ কথাবর্তা বা হৈচৈ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। টেম্পলের ভিতর ছবি তোলা পর্যন্ত নিষেধ। অনেকটা গোলাকৃতির বিশাল প্রশস্থ স্থানে বহু চেয়ার রাখা রয়েছে। সেখানে চুপচাপ বসে থাকা যায় মাত্র। কোন প্রার্থনা সভা বা বক্তৃতা আমার দৃষ্টি গোচর হয়নি। বহু বই পুস্তক বিক্রি হচ্ছে কেবল মাত্র ঐ সম্প্রদায় সম্বন্ধে। আমি নিজে তাদের নাইজেরিয়ান লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দীর্ঘ আলাপ করে জানতে পেরেছি বেশ কিছু তথ্য। তিনি আমাকে কিছু বইও উপহার দিয়েছেন। যেগুলি ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় লিখিত। তিনি আমাদের নবী মোহাম্মদ (সঃ) কে নবী বলছেন বটে, কিন্তু ইমাম বাহাইয়ানকেও নবী বলছেন আর এখানেই মূল গন্ডগোল ইসলামের সঙ্গে। প্রকান্ড হলের মধ্যে বহু মূলবান কথা কোনায় কোনায় লিপিবদ্ধ করা আছে। ভিতরের পরিবেশটা অনেকটা প্যারিসের নটারডাম ক্যাথেড্রালের সঙ্গে মিল রয়েছে বলে আমার ধারণা।

যাহোক বিশ্বে অন্য কোন মুসলিম দেশে এ ধরনের কোন সম্প্রদায়কে স্থান দেওয়া বা এ প্রকারের কোন প্রাতিষ্ঠানিক নির্মাণের জন্যে জায়গা দেওয়া বোধকরি

www.pathagar.com

মোটেই সম্ভব নয়। যদিও তাঁরা সর্বধর্মকে একত্রিত করেছেন কেবল মাত্র এক আল্লাহতে অথচ বিশ্বের সমস্ত নবী (আঃ) দের থেকে বিচ্যুত বা তাঁদের উপলক্ষ করে অত ভাল ভাল কথায় প্রচার করুন না কেন সারা বিশ্বের মাত্র ১২/১৪ লক্ষ ধনাঢ্য ব্যবসায়ী ব্যক্তির অর্থে এরূপ একটি অত্যন্ত ব্যয় বহুল প্রতিষ্ঠান তৈরী করা বোধকরি একমাত্র ভারতেই সম্ভব। তেত্রিশ কোটি দেব দেবীদের দেশ ভারত। সেক্ষেত্রে এক আল্লাহতে অনুগত হওয়া তাদের জন্যে যেমন জরুরী তেমনি অপরিহার্য।

ঐ দিনেই বিকেলের রাজধানী এক্সপ্রেসে বাবাজীবন শাবু আমাকে পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী পরের দিন হাওড়া স্টেশন থেকে বিদায় জানিয়ে চলে যায় কামারকুন্ডু। আমি সোজা ইতির বাসায় গিয়ে উঠি এবং ঠিক করি যে ২/১ দিন পরই ১ জানুয়ারী ২০০৫ অর্থাৎ ইংরেজি মাসের নববর্ষ আমরা একসঙ্গে কাশিয়াড়া গ্রামে উৎযাপন করব সকলে মিলেমিশে। প্রথম থেকেই ইতি আমাকে আভাস ইঙ্গিতে বার বার বুঝাতে চাইল যে, তার স্বামী ফরিদ কখনই আমাদের সঙ্গে যাবেনা। ফরিদের মনোভাবও দেখি তাই। শেষে আমি ফরিদকে অনেক বুঝিয়ে রাজি করাই এবং শেষে আমাকে বলে মামা আমি আগেই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে টিকিট কাটার ব্যবস্থা করি। আপনারা পরে আসুন। এখানেও ইতির প্রবল সন্দেহ যে, সে আমাদের সঙ্গে না যাওয়ার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা বেছে নিয়েছে। আমি ইতিকে ধমক দিযে বলি তুই বড় আজে বাজে চিন্তা করিস। দেখাই যাক না সে কি করে? বিশেষত আমার সঙ্গে চালাকী করার মত সাহস বোধকরি তার হবে না। আমি ইতি ও তার ছোট্ট মেয়ে ফিজা ঠিক সময়ে স্টেশনে গিয়ে হাজির হই। অথচ ফরিদের কোন খবর নেই। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ইতি বলে মামা আমি তাকে একটু খুঁজে দেখে আসি। আপনারা এখানেই অপেক্ষা করেন। ইতি বেশ কিছুক্ষণ পর একাই ফিরে এল বলল, আমি আপনাকে বলেছিলাম না আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি ইত্যাদি। ইতোমধ্যে ট্রেন প্ল্যাট ফরমে এসে লেগেছে এবং আমি ইতি ও ফিজা ট্রেনে উঠে তাড়াহুড়ার মধ্যে নিজেদের বসার স্থান দখলের যুদ্ধে নেমে যাই। যেটা সারা ভারতের প্রতিটি ট্রেনেই এই একই অবস্থা। কারণ একটাই, অতিরিক্ত লোক সংখ্যা ভারতের জন্যে যেন একটা মহাবিপদের পূর্বাভাস সারা বিশ্বের মধ্যে সর্বাধিক জনবহুল দেশ চীন এবং তারপরই ভারত। কিন্তু চীনের অধিবাসী আর ভারতের অধিবাসী মোটেই এক নয়। বরং আকাশ পাতাল প্রভেদ। চীনারা যেমন শিক্ষিত মার্জিত এবং মনোপলি জাতীয় শ্রেনীর লোক। ভারত তার সম্পূর্ণ উল্টা।

www.pathagar.com

ঠিক সময়েই ট্রেন ছেড়ে দিল কিন্তু তখনও ফরিদের কোন দেখা নেই। চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই হঠাৎ দেখি ফরিদ গাড়ীর শেষের দিকে উঠে আমাদের খোঁজ করতে করতে আমদের পাশে এসে হাজির। আমি ইতিকে বলি, আরে এইতো আসামী হাজির। যাক ট্রেনের মধ্যে সকলে এক জায়গায় একসঙ্গে বসতে না পারলেও ধারে কাছেই ছিলাম সকলে। বর্দ্ধমান পেরিয়ে যখন আমরা গুসকরা স্টেশনে ঠিক ওভার ব্রিজের সামনে নামি তখন দূরে পিছনে দিকে আমি হঠাৎ তামিমকে দেখতে পাই এবং তার সঙ্গেই আমার বোন আমাতুল। আমি ওভার ব্রিজের উপর থেকে দেখি একে একে বর্দ্ধমান ও কামার কুন্ডু থেকে সমস্ত আত্মীয় স্বজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। ওদিকে ফরিদ একপা দুপা করে এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ উধাও হয়ে গেল। আমরা সকলে ট্যাক্সি স্টান্ডে গিয়ে দেখি সেখানেও সে নেই। ইতি আবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল মামা আমি কী বলেছিলাম? আমি তাদের সকলকে দুটো গাড়ীতে উঠতে বলে এগিয়ে গেলাম শহরের দিকে। কিছুদূর গিয়েই দেখি ফরিদ মিষ্টি ইত্যাদি কিনে ফিরে আসছে। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভারের পাশে বসালাম। এরপর শাবুকে ডাকলাম এস এখানে এবং ঠিক ফরিদের পাশেই তাকে বসালাম।পিছনের সিটে আমাতুল পারু ও আমি বসলাম! সারাপথ অর্থাৎ ৮/১০ কিঃমিঃ রাস্তা আমি শাবু ও ফরিদের ফুটবল খেলার গল্প শুনতে শুনতে এক সময় বললাম দেখ তোমরা দু জনেই ভাল স্পোর্টস ম্যান সন্দেহ নেই। কিন্তু এরচেয়েও অনেক বড় জিনিষ হল স্পোর্টসম্যান স্পিরিট। এ ব্যাপারে আমার নিজের সম্বন্ধেও একটা ছোট গল্প তাঁদের শুনালাম। তা শুনে তারা উভয়েই উপলব্ধি করল তাদের ভুলক্রুটি কোথায়। এভাবে বেশ খোশ মেজাজে একাত্মতার আমেজে ডুবে গেলাম আমরা সকলেই। অবশেষে হেলেনের বাসায় সম্মুখে আমরা দুটি গাড়ী থেকে প্রায় ১৫/১৬ জন নেমে পড়লাম।

বাড়ীতে ঢুঁকেই দেখি সৈয়দ কামরুদ্দীন ওরফে কামি অর্থাৎ হেলেণের স্বামী বাড়ীর বারান্দার উপর চৌকিছেড়ে নীচে রৌদ্রের মধ্যে পড়ে প্রচুর হাঁফাচ্ছে শ্বাসকষ্টে। আমাদের সঙ্গে কোন কথা পর্যন্ত বলতে পারছেনা, এমন কি উঠে বসতেও পারছেনা। আমি তার ওধুষের প্রেসক্রিপশনটা আগে দেখি। মাত্র তিন প্রকারের ট্যাবলেট খেয়ে চালাচ্ছে ১৫ দিন এবং ঐ অবস্থাতেই তার ছোট ভাই নিজাম তাকে কলকাতা থেকে মাত্র ৩/৪ দিন পূর্বে এই গ্রামের বাড়ীতে এনে রেখে গেছে। অথচ এই অবস্থায় তার কলকাতায় কোন ভাল হাসপাতালে অব্যশই ভর্তি হওয়া উচিৎ ছিল। আমার নিকট সামান্য ২/৪ টি হোমিও ওষুধ ছিল। আমি তাকে মাত্র একডোজ

www.pathagar.com

একোনাইট খাইয়ে দিয়ে নিকটস্থ মসজিদে যোহরের নামাজ পড়তে যাই। এসে দেখি কামিবেশ কিছুটা সুস্থ বোধ করছে এবং আমাকে বলে, মামা আপনার ওষুধই দিন আমি দিলাম। মহান আল্লাহর ফজলে সে বেশ ধীরে ধীরে সুস্থ্য হয়ে উঠল।

সে দিন রাতেই হেলেন বোধকরি আমাদের আসার খবর পূর্ব থেকেই জানতো বলেই রাজ হাঁসের গোস্ত দিয়ে শীতের পরম উপাদেয় খাবার ভাপা পিঠা বা ধুকি খাওয়াল সফলকে প্রাণ ভরে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে। সে রাতেই পাশের ঘরে জমে উঠল গালগল্প ও গানের আসর। ফরিদও বেশ ভাল কিছু গান করল শাবুর পাসে বসেই। এই বৃদ্ধবয়সে আমিও নাতি নাতনীদের আবদারে কিছু ভাল বাংলা ও হিন্দি গান গাইলাম। এমন কি উর্দূ ও ফার্সি গজলও বাদ পড়ল না। পরের দিন কামির অবস্থা আরও একটু ভাল দেখে আমরা কয়েকজন যেমন শাবু ফরিদ পারু ইতি নোমানের দুই ছেলে মেয়ে ও পরুর তিন মেয়ে ইকফাত, নিশাত ও নাহিদ সকলেই নতুনরাস্তা বীরভূমের দিকে যেটা চলে গেছে যেটা ধরে অনেকদূর এগিয়ে যাই। ওদের নিজেদের ক্ষেতে শরবতী আলু তুলে দিল একটি কৃষক সেই শরবতী আলু খাওয়ার উৎসব পালন করল ফরিদ ও শাবু পরস্পরের মধ্যে। শ্যালো থেকে প্রচুর পানিতে গোসল করল নোমানের বেটা রাসেল, শাবু, ফরিদ সকলে বহুক্ষণ ধরে মজাসে আনন্দ করল! ইতোমধ্যে আমি কামির হাত পায়ের ব্যাথার জন্যে কিছু ওষুধ দেই এবং সে ভাল বোধকরে। আলহামদোল্লিাহ।

২ জানুযারী রাতেও হেলেন আমাদের সকলকে মুরগীর গোস্ত দিয়ে পুনরায় ধুকি বা ভাপা পিটা খাওয়ার প্রচুর আয়োজন করে। তার নতুন তৈরী করা বাড়ীতে আমরা সকলে একসঙ্গে এতগুলি অত্যন্ত নিকট আত্মীয় স্বজন এসেছি দেখে তারও আনন্দ কম নয়। কামিকেও সে নিজের হাতে বেশ কিছু খাওয়ায়। পাসের বাড়ীতে লালের ওখানেও পাঠাল গতকালের মত। লাল এদের সকলের বড় ভাই এবং বেশ উচ্চ শিক্ষিত লালের স্ত্রী রুনী অত্যন্ত খোলামনের মধুর আচরণে অভ্যস্ত। সকলকেই নিজের আপনজন হিসেবে গ্রহন করার তার আশ্চর্য ক্ষমতা আছে যা সচরাচর দেখা যায় না। তাদের দুটি মেয়ে বেশ মেধাবী ছাত্রী, স্কুলে পড়ে। কামির মা অর্থাৎ আমার বেয়াইন অতি বৃদ্ধা মহিলা বিধবা হয়েছেন দীর্ঘদিন গভীর রাতে কামির শরীর হঠাৎ বেশ খারাপ হতে শুরু করে। সারারাত সে ভালাভাবে মোটেই ঘুমাতে পারেনি। আমরা অনেকেই বুঝতে পারি তাকে এখন কলকাতায় চিকিৎসার জন্যে পাঠান দরকার। সে নিজেও কালকাতায় পিজি হাসপাতালে তখন যেতে ইচ্ছুক। পরের দিন সকালেই আমরা তাকেসহ কলকাতা অভিমুখে রওনা দেই। কেবল মাত্র আমি

www.pathagar.com

গুসকরায় মেহবুব জাহেদী মামার বাড়ীতে সকলের সঙ্গে দেখা করে কামির বর্তমান অবস্থা তাঁদের জানিয়ে মার গ্রামের পথে সোজা খানকা শরীফে নেমেই মিলাদ মাহফিলে যোগদানকরি এবং কামির জন্যে বিশেষভাবে দোয়া প্রার্থনা করা হয়। মাত্র ২/৩ দিন পরই হঠাৎ ভোর ৬টায় মহাদুঃসংবাদ সহ ফোন আসে যে, কামি মহান আল্লাহ পাকের ডাকে সাড়া দিয়ে জান্নাতবাসী হয়েছে, বৃহস্পতিরবার রাতে ইন্নাল্লিাহে অইন্না ইলায়হে রাজিউন।

শাবুর যেহেতু বুধবার রাজধানী এক্সপ্রেসে ডিউটি ছিল, সে একটু ভাল দেখেই দিল্লি যাত্রা করে। অতএব ফরিদকে যথেষ্ট পরিশ্রম করে তার কাজিপাড়ার ছেলেদের সহযোগিতায় একটা ট্রাক ভাড়া করে লাশ নিয়ে আসে কামির দু'ভাই ড.বুদু ও নিজাম সহ পরিবারের সকল সদস্য সহ। রামপুরহাট রেলস্টেশনে। এর কিছুক্ষণ পরই দেখি মাজলুর রাহমান সস্ত্রীক এবং সদু এসে উপস্থিত। এরা সকলেই আমার চাচাত ভাই। গুসকরায় নেমেই দেখি মারই গ্রামের আর আমার বহু আত্মীয় ঐ ট্রেনেই এসেছে। আমি তাড়াতাড়ি একটা ট্যাক্সি নিয়ে আমরা প্রথম পাঁচজন জানাজা নামাজের উদ্দেশ্য কাশিয়াড়া গ্রামে হাজির হই। তখনও কলকাতা থেকে লাশ এসে পৌছায়নি জাহেদী মামা ও তাঁর ছেলে মনসুর বসে রয়েছেন লাশের অপেক্ষায়। আমি জানাজা নামাজের জন্য দ্রুত তৈরী হয়ে নেই। প্রচুর লোক সমাগম হয় জামে মসজিদের সংলগ্ন স্থানে সংকুলান হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। মাত্র ক'বছর পূর্বে কবিভায়ের জানাজার নামজ ঐ জুমার দিনেই আমিই পড়িয়েছিলাম এই স্থানেই। অথচ আজ এত লোকের সমাগম দেখে জাহেদী মামাকে আমি বলি, মামা নামাজ কোথায় হবে? মামা বলেন কবর স্থানের পশ্চিমে যে বিশাল ময়দান আছে, সেখানেই নামাজ হবে। আশ্চর্য! ঈদের জামাতের মত বহু লোকের সমাগম এবং আমাকেই নামাজ পড়াতে হল। কবরের যাবতীয় কাজ শেষের পরই দোয়া খায়ের প্রার্থনা করে মহান আল্লাহ পাকের দরবার পাকে কামির জন্যে সকল আত্মীয় স্বজন মুমিন মুসলমানদের জন্যে দীর্ঘ মোনাজত শেষে এসে দেখি তখন অনেকেরই খাওয়া প্রায় শেষ। ওদের ওখানে ওটাই নাকি নিয়ম। মৃত ব্যাক্তির মৃত্যুর পরপরই সকলকে তথা পুরো গ্রামবাসীকে পেট ভরে তৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ানোর রেওয়াজ চালু আছে বহু পূর্ব থেকেই। এ ছাড়া তাঁরা আর কোন অনুষ্ঠান মুর্দার জন্যে পালন করেননা। কিন্তু সৈয়দ কামরুদ্দীনের ক্ষেত্রে সব কিছুই পালনকরা হয়েছে যথারীতি। হেলেনের বাড়ীতে দীর্ঘ ৪০ দিন পর্যন্ত লাল ও রুনী তাদের রান্না খাইয়েছে। কোন চুলা পর্যন্ত জ্বালাতে দেনি হেলেনকে। তাদের এই সম্প্রীতি নিঃসন্দেহে অনেকের জন্যেই

www.pathagar.com

অনুকরণীয়। হেলেনেরএকমাত্র মেয়ে রিপা ডিগ্রী পড়ে এবং এক মাত্র ছেলে রাজ একটু দুর্বিনীত। সম্ভবত তার পিতার অতি আদরের ফলেই এটা হয়েছে। কামি মৃত্যুর আগপর্যন্ত তার ছেলের জন্যে যথেষ্ট আক্ষেপ করে গেছে। ওদের জন্যে আন্ত রিকভাবে দোয়া করি মহান আল্লাহ্ পাকের নিকট। আমীন! সুম্মা আমীন!!

আমি কলকাতায় আমার পীরভাই প্রখ্যাত ডঃ আমীন আহমদ (এম ডি) তাঁর সহায়তায় তারই ছাত্র বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাঃ বরুন দত্তকে চোখ দেখাই। আর একজন ডাঃ আমীনের প্রিয়ছাত্র ডাঃ এস, দাশ গুপ্ত প্রখ্যাত টিএনটি সার্জনকে আমার কানের চিকিৎসা করাই। এবং প্রোস্টেট গ্ল্যান্ডের জন্যে ডাঃ আমীনের বন্ধু ডাঃ এম, সি, সীলকে দিয়ে অপারেশন করাতে বাধ্য হই। যেহেতু আমার পি এস এ ২.৯৬ থেকে বেড়ে তখন ৮.০৭ এ দাঁড়িয়েছিল। বড় হুজুর পাকের নিকট থেকে অপারেশনের অনুমতি নিয়েই আমার প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড অপারেশন করা হয়। সুদীর্ঘ প্রায় দু'মাস আমার ভাগনী ইতির বাসায় আমাকে এই চিকিৎসার জন্যে থাকতে হয় এবং ইতি ও ফরিদ আমার জন্য যথেষ্ট কিছু করেছে। যা উল্লেখকরে আমি তাদের ছোট করতে বা লজ্জা দিতে চাইনা। ফারুক আমার এই অপারেশনের জন্য ৯০০ ডলার কলকাতায় পাঠিয়ে দেয় যেহেতু যতটাকা নিয়ে গিয়েছিলাম আমি তা কোন চিকিৎসার জন্যে নয় বরং বেড়ান এবং অন্যান্য খরচাপাতিতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়সে অর্থ। রুহীদের তোলা বেশ কিছু ছবি আমি তাদের ডাকে রাজস্থানে পাঠিয়ে দিই কলকাতা থেকে। পরিশেষে ভিসা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিমানের টিকিট কিনে ফেলি। এবং পরদিনই ৪ মার্চ ২০০৫ এ ঢাকায় অবতরণ করি। এয়ার পোর্টে ফারুক তার গাড়ী পাঠিয়েছিল আমাকে বাসায় আনার জন্যে। ওদিকে ফরিদ তার বাসা থেকে আমাকে দমদম বিমান বন্দরে ট্যাক্সি করে নিয়ে যায়। কিন্তু আমাকে কোন মতেই ট্যাক্সি ভাড়া মিটাতে দেয়নি বরং সে ঐ ট্যাক্সি নিয়েই ফিরে যায়। আমি কলকাতা থেকে আসার সময় হেলেন রিপা ও রাজ সকলেই বাসায় উপস্থিত ছিল। ট্যাক্সি থেকে তাড়াহুড়া করে দমদমে নামার সময় আমার মেডিকেল ফাইল যেটা গত রাত্রে ফরিদ আমার জন্যে কিনে এনেছিল, সেটা ভুলকরে ট্যাক্সিতে পিছনদিকে ফরিদ রাখার ফলে আমাদের দু'জনেরই কারো মনে ছিলনা। পরে অবশ্য ঢাকা থেকে ফোনে ফরিদকে জানালে, সে সেটা তার পরিচিত চালকের নিকট থেকে উদ্ধার করে আমাকে ঢাকায় পাঠায়।

www.pathagar.com

উনচল্লিশ পর্ব

আমার সন্তানদের মধ্যে প্রথম সন্তান ফারুক এরপর শিল্পী ও শাহীন নামে দু'টি মেয়ে এবং শেষের জন ফাহিম চৌধুরী। মোটামুটি ভাবে এরা সকলেই শিক্ষিত। আমার শিক্ষকতা পেশার প্রতি লক্ষ্য করেই হোক বা সরকারী চাকুরীর প্রতি বিতশ্রদ্ধা বশতই হোক, আমার দুই ছেলেই যে কোনদিন সরকারী চাকুরী করবেনা এটা তারা আমাকে নিশ্চিতভাবেই জানিয়ে রাখে। আমিও তাদের এই স্বাধীন চিন্তা ভাবনার উপর কোন রূপ হস্তক্ষেপ করিনি। যেহেতু আমি নিজেও সরকারী চাকুরীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। আর শিক্ষকতা পেশাকে বোধকরি চাকুরীর পর্যায়ে দেখা উচিৎ নয়। ইংরিজেতে একটা চমৎকার কথা আছে "Teacing is the most noblist profession in the society" এই মহান আপ্ত বাক্যটি যথার্থ অর্থেই যে সত্যি তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটাও ঠিক যে, সবার জন্যে এ পেশা খুব একটা সহজ সাধ্য নয়। যেমন আমার ছাত্রাবস্থায় লক্ষ্য করেছি, অতি উচ্চ শিক্ষিত একজন শিক্ষক শ্রেণীতে শিক্ষাদানে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন পক্ষান্তরে একজন মাঝাড়ী ধরণের শিক্ষক তাঁর তুখোড় শিক্ষকতার ফলে তিনি হয়েছিলেন জনপ্রিয় শিক্ষক হিসেবে খ্যাতিমান।

আমার দুটি ছেলেরই উচ্চাকাঙ্খা ছিল বরাবরই। তাদের ধর্মের প্রতি প্রবল আগ্রহ না থাকলেও কর্মের প্রতি একনিষ্টতার কোন অভাব আমি লক্ষ্য করিনি। সত্যনিষ্ট ভাবে বাস্তববাদী কর্মের প্রতি তাদের স্পৃহা ছিল লক্ষ্যনীয়। ফলে, আমার বড় ছেলে ফারুক তার ছোট ভাই ফাহিমকে বার বার তার নিজস্ব বায়িং হাউসে যোগদানের জন্যে আহবান জানালেও সে কখনই তাতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। বরং অন্য কোন ফার্মে যোগদান করেছে এবং ক্রমশ একটার পর একটা ফার্মে নিজের দক্ষতার পরিচয়ে ইতিমধ্যে এশিয়া ও ইউরোপের বেশ কিছুদেশও ভ্রমন করেছে। ওদের প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং কর্মদক্ষতা সম্ভবত তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যে একটা দিক নির্দেশনার ঠিকানা দিতেও পারে। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সন্তানদের জন্যে একমাত্র দোয়া কারা ছাড়া বোধকরি আর কিছু করার অবকাশ নেই। দীর্ঘ দিন ধরে আমার দুই ছেলে ও বৌমাদের সহ একান্নভূক্ত পরিবারেই ছিলাম। সম্প্রতি ফারুক বনানীতে নিজস্ব ফ্ল্যাটে উঠে আসার পূর্বেই ফাহিম তার স্ত্রীসহ ঐ

www.pathagar.com

নিউডিওএইচএস এলাকাতেই একটি বাসা ভাড়া নিয়ে উঠে গেছে বেশ কিছুদিন আগে যেহেতু তার স্ত্রী উর্মির শাহীন কলেজটা কাছাকাছি হয় বলে।

ফারুকের সঙ্গে আমাদের থাকতে হবে বনানীর বাসায় এই সংবাদ আমার ওখানকার স্থানীয় বন্ধুরা জানতে পেরে যেন অনেকটা কাতর প্রায়। বিশেষত আমার পরম বন্ধু মেজর জেনারেল (অব) গোলাম মোক্তাদির তো রীতিমত আমার উপর ক্ষ্যাপা। তাদের কথা হল, আমাদের এমন চমৎকার এসোসিয়েশন ছেড়ে আপনি যেতে পারবেন না। দরকার হয় আমরা সকলে মিলে আপনার বড় ছেলেকে বুঝিয়ে বলি। বন্ধুবর আবুবকর সিদ্দিক সাহেবের কথা হল আপনি আমাদের ছেড়ে একোরেই চলে যাবেন এটাতো হতে পারেনা। বরং আপনার ছোট ছেলের নিকট এখানে মাঝে মধ্যে এসে থাকবেন এবং আমরা সকলেই আপনার সাহচর্য্য পাব ইত্যাদি। পরিশেষে, তিনি আমার বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করতে উদ্দত হওয়ায় আমি তাঁকে অনুরোধ করি দয়াকরে এ কাজটি করবেন না। আমি তো এখন পর্যন্ত আছি। অতএব, এত সবের কী প্রয়োজন? আপনাদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও দোয়াই আমর জন্যে যথেষ্ট। এমন কি আমি এও তাঁদের অত্যন্ত আনিচ্ছা সত্ত্বেও বলতে বাধ্য হই যে, দেখুন আমি ঢাকার সরকারী কোয়াটার ছেড়ে যাবার সময় আমার অনেক সহকর্মী বন্ধুগন আমার পুরো পরিবারবর্গকে দাওয়াত করে বসেন আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। আমার যুক্তি ছিল সে যেহেতু ইতিপূর্বে আপনারা আমার আর কোন সহকর্মী, অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষ কাকেও এমন ভাবে দাওয়াত করেন নি' তখন আমার ক্ষেত্রে এটা দৃষ্টিকটু দেখায় না কী? তবুও তাঁদের কথা ছিল যে, তাঁদের কথা আলাদা এবং আপনার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরূপ আমাদের নিকট। যেহেতু আপনি আমাদের সকলেরই সিনিয়র এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আমাদের এই সামান্য অনুরোধটুকু আপনাকে রাখতেই হবে। অবশেষে, ডঃ আব্দুল্লাহ আলমুতি শরফুদ্দীন সাহেবের বাসা ভাড়া নিয়ে উঠে গিয়েও তাঁদের অনুরোধ রক্ষার্থে আমাদের সকল সদস্যকে পুনরায় আমি যে বাসা ছেড়ে গিয়ে ছিলাম, সেই বাসাতেই তাঁরা আমাদের উত্তমরূপে ডিনারের আয়োজন করেন। এতে আমি যতটা খুশী হয়েছি তারচেয়ে অনেক বেশী লজ্জিত হয়েছি।

সুতরাং আপনারা আর দয়া করে আমাকে আর সেই লজ্জাদান করবেন না। এখানে অনেকেই আসছেন কিছুদিন থাকছেন আবার নিজের তৈরী বাড়ীতে অন্যত্র উঠে যাচ্ছেন। কৈ তাঁদের কারো ক্ষেত্রে তো এমনটা লক্ষ্য করিনি। অতএব, দয়াকরে এ বিদায় আয়োজনের কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। কে কার কথা শুনে। শেষে

www.pathagar.com

হঠাৎ একদিন জেনারেল গোলাম মোক্তাদির সাহেব বেশ কয়েকজন বন্ধুবান্ধবসহ এশার নামাজের পর মসজিদ থেকে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে সোজা রাওয়া ক্লাবে গিয়ে ডিনারের ব্যবস্থা করেন। কে কি খেতে পছন্দ করেন ইত্যাদি জেনে তিনি ওয়েটারকে অর্ডার দেন। আর্মি অফিসারদের মধ্যে তিনি অনেক সিনিয়র এবং বয়োজ্যেষ্ঠ। সুতরাং ঐ রাওয়া ক্লাবে তাঁর দাপটই বেশী। খাওয়া দাওয়ার এক ফাঁকে বন্ধুবর আবুবকর সিদ্দিক সাহেব হঠাৎ করে উঠে গিয়ে ওয়েটারকে কী যেন বলে আসেন। আমার বন্ধু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শহীদুল ইসলাম বীর প্রতিক আমাকে প্রথমেই একটি অতি মূলবান বই, উস্তাদ আহমদ দিদাদের বক্তৃতাবলী উপহার দেন। খাওয়ার পর ওয়েটার বিলটা এনে জনাব সিদ্দিক সাহবেকে দিলে, জেনারেল মোক্তাদির যিনি তাঁর পাশেই বসেছিলেন তিনি বলেন, ওখানে কেন? আমি অর্ডার দিলাম যে। সিদ্দিক সাহেব ততক্ষণে টাকা বেরকরে বলেন, প্রথম দাওয়াত আমারই ছিল। কিন্তু আপনি চালাকি করে আমার মেহমানকে ছিনিয়ে নিবেন তাতে হতে পারেনা। তখন মোক্তাদির সাহেব বলেন, ঠিক আছে তাহলে ফিফটি ফিফটি করেন। সিদ্দিক সাহেব বলেন, কোন প্রয়োজন নেই। আমি ভাগাভাগির মধ্যেই নেই, বলেই ওয়েটারকে পুরো বিলটা মিটিয়ে দেন। আমরা সকলেই তাদের দুজনের এই অকৃত্রিম অন্তরিকতা উপভোগ করলাম। এর পর শুরু হল একরে পর এক বক্তৃতা আমার সম্ন্বর্কে তাদের ব্যক্তিগত মতামত ইত্যাদি। সবার শেষে আমি আল কোরআন ও হাদিস শরীফ থেকে কিছু বক্তব্য শেষে একটি দীর্ঘ মোনাজাতের পর বিদায় অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে রাত ১১টার পর। জেনারেল মোক্তাদির তাঁর গাড়ীতে আমাদের বাসায় পৌঁছিয়ে দেন সকলকে। স্থায়ী বন্ধত্বের বন্ধন যে কত আন্তরিকতা পূর্ণ হতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এর চেয়ে আর কী বেশী হতে পারে আমার জানা নেই।

বন্ধুরর মেজর জেনারেল (অবঃ) র আমি গোলাম মোকতাদের সাহেব ছিলেন পীরভক্ত মানুষ এবং তার পীর হচ্ছেন হজরত সুফীআজিজুর রহমান সাহেব (মা: জি: আ:)। মূলত: তিনি ক্বাদেরীয়া ও নকশ বন্দিয়া তরিকায় বিশ্বাসী বেশ পরহেজগার সাধু পুরুষ এবং একজন সুলেখকও বটে। পীরাণে পীর হজরত গওসুল আজম বড়পীর সাহেবের প্রতি তার অগাধ ভক্তি শ্রদ্ধায় আমি মুগ্ধ হই। তাঁর বেশ কিছু মাহফিলে। আমি জনাব মোকতাদির সাহেবের মাধ্যমে হাজির হওয়ার বিশেষ সৌভাগ্য লাভ করি। তিনি নিজেকে পীর হিসাবে কোন পরিচিতি দিতে যেমন অনিচ্ছুক তেমন সহজে কাউকে মুরীদ করতেও দারুন অনীহা প্রকাশ করেন। আমি কাদেরীয়া তরিকাভুক্ত জেনে অত্যন্ত মুগ্ধ হন। তিনি আমাকে পর পর তিনটি বই "নূর উসসালেকীন" উপহার দেন, যা তাঁর প্রচুর পরিশ্রমে লিখিত পুস্তক। আমিও তাঁকে আমার লিখিত বড়পীর সাহেরের উপর জীবনী "আমার পীর" এবং 'মুসলিম বিশ্বে সফরনামা" অনেক পূর্বেই উপহার দেই জনাব সুফী আজিজুর রহমান সাহেবকে। তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। তিনি নিজে প্রবল আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাগদাদ শরীফে হুজুর

www.pathagar.com

গওসপাকের রওজা মোবারকে হাজির হতে না পারলেও তাঁর মুরীদ জেনারেল মুক্তাদির সাহেবকে গেলাফ পাকসহ একাধিক বার প্রেরণ করেছেন। বর্তমানে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ অবস্থায় কাসিমপুর খানকা শরীফে অবস্থান করছেন। মহান আল্লাহ পাক তাঁকে দীর্ঘায়ু দান করুন! আমীন!! তার পরিচালনায় জিকির আজকার ও মিলাদ মাহফিলে হাজির হয়ে আমি অশেষ সওয়াবের অংশীদারিত্বে গৌরবান্বিত। কেন না, হুযুর গওসপাকের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় ভক্তি শ্রদ্ধায় আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হয়েছি। তিনি আমাকে অনুরোধ করেন যেমন আমি তাঁকে গওসেপাকের উপর আমাদের দিওয়ান পাক থেকে কিছু কিছু কাসিদাপাক আমার কণ্ঠে রেকর্ড করে দেই। তাঁর প্রতিটি মিলাদ মাহফিলের শেষে অত্যন্ত সুন্নতি তরিকায় তিনি নিজ হাতে উত্তম তাবাররুক তথা খানাপাক পবিত্র কলেমা পাঠের মাধ্যমে উপবিষ্ঠ সমস্ত হাজেরানে মাহফিলের মধ্যে হাতে হাতে বিতরণ প্রক্রিয়া আমাকে যথেষ্ট তৃপ্তি দানে বিমুগ্ধ করে। এই সুফী সাহেবের অপর একজন মুরিদ মেজর জেনারেল (অবঃ) আব্দুর রফিক সাহেবের বাসায় প্রত্যেক মাসের প্রথম জুম্মাবারে সকাল ৮ টায় সুফী সাহেবের ইমামিতে আমরা কয়েকজন মাত্র সালাতুত তসবীহির নামাজ আদায়ে শরিক হই।

ফারুক তার নতুন ফ্ল্যাটে আসার পূর্বেই আমাদের সকলকে জানিয়ে দেয় যে, এ বাসায় আমাদের ব্যবহার্য কোন রূপ আসবাব পত্র এমন কি কোন ফার্নিচার পর্যন্ত নুতন ফ্ল্যাটে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সেহেতু নতুন ফ্ল্যাটে সবকিছুই নুতন থাকবে। এর এরূপ ঘোষণায় তো আমরা একটু হকচকিয়ে উঠলাম, বলে কী তাহলে এতসব মালপত্র কি হবে, কোথায় যাবে, কেনেবে ইত্যাদির বাইরের একজন ঠিকাদার এসে যে দামের হিসের দিল তাতে তার মোটেই মনপুত হলনা। বরং সে আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে এবং বাড়ীর কাজের দুই বুয়ার মধ্যে ও ড্রাইভার আরিফসহ সকলের মধ্যে সমস্ত কিছু বিলি বন্টন করে দিল অত্যন্ত খোলামনে।

৭ আগষ্ট ২০০৫ শনিবার বিকেলের পর আমরা সকলে ফারুকের তৈরী বনানীর নুতন ফ্ল্যাটে এসে উঠলাম অনেকটা শূন্য হাতে। এসেই দেখি পুরো ময়দান ফাঁকা। সকলেই বাইরে জুতো খুলে গৃহ প্রবেশ করলাম। আমি প্রথমেই মাগরিবের নামাজটা আদায় করলাম সর্বদক্ষিণে আমাদের ঘরের ব্যালকনিতে। এর পর রাত দশটার মধ্যেই একে একে আমাদের সকলের জন্যে পৃথক পৃথক ভাবে দামী খাট, জাজিম বিছানা, বালিশ ইত্যাদি আসল নুতন ভাবে, যা পূর্বেই দোকানে অর্ডার দেওয়া ছিল। আমার স্ত্রীর খাটের পায়েরদিকে নকশা করা আছে M অর্থাৎ Mom মা এবং আমার খাটের পায়ের দিকে নকশা করা আছে D-Dad অর্থাৎ বাবা।

www.pathagar.com

ইনস্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ (আইডিইবি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে ১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর। দেশের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্সদের জাতীয় সংগঠন হিসেবে এক শুভ লগ্নে। এরপর থেকে থেমে থাকেনি আইডিইবি।

আইডিইবির শুরুতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ক্যান্টিনে জিমনাসিয়ামে সংগঠনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হত। তারপর ফার্মগেটে ১১ নম্বর হলিক্রস রোডের একটা ছোট্র রুমে আইডিইবির স্বপ্নদ্রষ্টারা বসে কাজ করতেন। এদের মধ্যে মূল দার্শনিক ছিলেন পলিটেকনিকের শ্রদ্ধের শিক্ষক অধ্যাপক মহম্মদ তাজাম্মুল হোসেন সাহেব। তাঁর সঙ্গে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে একে একে অনেকেই যোগদান করি। বর্তমানে প্রায় লক্ষাধিক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং ৩০ হাজার ছাত্র সদস্যদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আইডিইবি।

বহুত্যাগ তিতিক্ষা ও নানা প্রকারের হয়রানীর ফলশ্রুতি স্বরূপ মহান আল্লাহ পাকের অশেষ রহমতের ফলে বর্তমানে কাকরাইলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমাদের নিজস্ব বিশাল কেন্দ্রীয় ভবন আইডিইবি আলহামদোলিল্লাহ।

আমি এখানে বর্তমান নবনির্মিত বিশাল ভবনের নির্মাণ কৌশলের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

সে সঙ্গে এক নজরে আইডিইবির সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম এবং কেন্দ্রীয় ভবন কমপ্লেক্স এর সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী আমার সুপ্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের জন্যে উপহার স্বরূপ লিপিবদ্ধ করলাম।

এক নজরে আইডিইবি'র

সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম

এবং

কেন্দ্রীয ভবন কমপ্লেক্স-এর সংক্ষিপ্ত

ইনষ্টিটিউটশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জনীয়ার্স, বাংলাদেশ

Institutionof Diploma Engineers, Bangladesh

কার্যালয়- আইডিবি ভবন, ১৬০/এ, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৯৩৩৬৬৬, ফ্যাক্স- ৮৩১৮৮৮৮

আইডিইবির সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যক্রম

এদেশের প্রকৌশল অঙ্গনের উপ-সহকারী প্রকৌশলী হতে প্রধান প্রকৌশলী পদে কর্মরত ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং পলিটেকটিনক গ্রাজুয়েটদের প্রতিনিধিত্বকারী বৃহত্তম পেশাজীবী সংগঠন ইনিস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

(আইডিইবি)। ১৯৭০ সালের ৮ নভেম্বর এর প্রতিষ্ঠা। দেশ ও জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে স্ব-অধিকার প্রতিষ্ঠা" দর্শনে পরিচালিত এই ইনস্টিটিউশনের মোট কার্যক্রমের ৭৫ ভাগ দেশ ও জনগণের কল্যাণ এবং অবশিষ্ট ২৫ ভাগ সদস্য প্রকৌশলীদের পেশাগত বিষয়ে পরিচালিত হয়ে থাকে।

সাংগঠনিক কাঠামোঃ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মাধ্যমে ইনস্টিটিউশনের নীতি নির্ধারণীমূলক কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদির উপর সেমিনার ওয়ার্কসপ, সভা সমাবেশসহ কেন্দ্রীয় ভাবে গৃহীত কার্যক্রম দেশব্যাপী পরিচালনার লক্ষে এই ইনস্টিটিউশনের রয়েছে ৬৪টি নির্বাহী কমিটি, ৪৬০ টি উপজেলা ও ১১টি ইউনিট কমিটি ও ৭৮টি সংস্থায় ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স সার্ভিস এসোসিয়েশন এবং প্রতিটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ছাত্র সংগটন বাকাছাপ। ছাত্র সদস্যসহ বর্তমানে এই সংগঠনের সদস্য সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক।

গবেষণা ও স্টাডি কার্যক্রমঃ আইডিইবির রয়েছে একটি ক্ষুদ্র গবেষণা ও স্টাডি সেল। একজন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে এ সেল জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে স্টাডি ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এটি ইতিমধ্যে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ৩৩টি বিষয়ের উপ-স্টাডি রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্যে সরকারের নিকট পেশ করছে। প্রদত্ত রিপোর্টের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঢাকা শহর বন্যা নিয়ন্ত্রণ জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প, খুলনা যশোর এর জলাবদ্ধতা সমস্যা ও সমাধান ঢাকা শহরের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও যানজট সমস্যার নিরসন ঢাকা সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ কাম পূর্ব বাইপাস সড়ক বহুমুখি প্রকল্প সার্কুলার নৌপথ চালু রেল লাইন সংযোজনসহ বহুমুখী ব্যবস্থা রেখে যমুনা সেতু নিমার্ন ইত্যাদি। এর মধ্যে যমুনা সেতু ঢাকা শহর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সার্কুলার নৌপথসহ বেশ কিছু প্রকল্প সরকার বাস্তবায়ন করেছে।

প্রশিক্ষক কার্যক্রমঃ আইডিবি প্রশিক্ষণ সেলের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন শ্রেণীভূক্ত পেশাজীবীদের প্রফেশনাল ইমপ্রভমেন্টের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স বছরব্যাপী কেন্দ্রীয় ও জেলা পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়। প্রদত্ত প্রশিক্ষণ কোর্সের মধ্যে কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত, শিল্প ব্যবস্থাপনা অফিস ব্যস্থাপনা ভূমিকম্প ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভিন্ন ট্রেডম্যানদের দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা বিস্তার কার্যক্রমঃ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার বিশেষ করে স্বনির্ভর প্রাথমিক শিক্ষার মডেল উদ্ভাবনের লক্ষ্যে আইডিইবির নিজস্ব চিন্তা চেতনার আদলে

www.pathagar.com

গড়ে তোলা হয়েছে যশোর নোয়াপাড়া আইডিইবি মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের পাশাপাশি কর্মরত শিক্ষকগণ বিদ্যালয় এলাকায় বনায়ন জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ও স্বাস্থ্য সচেতনতাসহ বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

প্রকাশনাঃ ইনসিইটউশনের সার্বিক কার্যক্রম জাতির সামনে তুলে ধরা ও সমগ্র জাতিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক করে গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নয়ন কর্মকান্ডে গোঁজামিল অপচয় রোধ ও রাষ্ট্রিয় পরিকল্পনার ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ প্রদান ও জনগণেকে সচেতন করার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউশনের রয়েছে একান্ত প্রয়াস। এ লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আইডিইবির একমাত্র মুখপাত্র কারিগর। যা নিয়মিত প্রকাশনার ৩৩ বছর অতিক্রম করছে।

আন্তর্জাতিক কার্যক্রমে সম্পৃক্ততাঃ দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় প্রকৌশলগত দক্ষতা ও জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যমে আঞ্চলিক দারিদ্র বিমোচনের মহৎ লক্ষ্যে আইডিইবি'র উদ্যোগে গঠিত হয়েছে সার্কভুক্ত দেশসমূহের ১৩ লক্ষ ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন সার্ক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম (SDEF)। এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের সংগঠিত করে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের আদান-প্রদান উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষ্যে আইডিইব'র সার্বিক ব্যবস্থপনায় গঠিত হয় মিড লেভেল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম অব এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক কান্ট্রিস্ (MEFAP)। বর্তমানে ঢাকার আইডিইবি ভবনে অবস্থিত সদর দপ্তরের মাধ্যমে এই ফোরামসমূহের কর্যক্রম চলছে।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনের কার্যক্রমঃ জাতীয় ঐতিহ্য ও কৃষ্টি লালনের মাধ্যমে নিজস্ব সংস্কৃতি চর্চায়ও রয়েছে আইডিইবি'র পদচারণা। সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমনস্ক সৃজনশীল লেখনীয় জন্য আইডিইবি প্রবর্তন করেছে আইডিইবি স্বর্ণপদক'। যা প্রতি বছর সাহিত্য সাংবাদিকতা ও গবেষণায় অনন্য ভূমিকা পালনের জন্য জুরী বোর্ডের মাধ্যমে প্রদান করা হয়ে থাকে। এছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে প্রধান্য দিয়ে ভিন্নধর্মী নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনে উৎসাহিত করার লক্ষ্য আইডিইবি প্রতি বছর প্রদান করে থাকে আইডিইবি আব্দুল জব্বার খান স্বর্ণপদক। সংস্কৃতি চর্চার লক্ষ্যে গঠিত হয়েছে আইডিইবি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠি।

দায়বদ্ধতাঃ আইডিইবি দেশ ও জনগনের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণের মধ্যে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার নীতিকে মূল দর্শন হিসেবে গ্রহণ করেছে। এ সংগঠনের সদস্য প্রকৌশলীদের পেশাগত দাবিদাওয়া আদায়ে নেগেটিভ

www.pathagar.com

আন্দোলনের পন্থা অবলম্বন করা হয়না। বরং পজেটিভ আন্দোলনের সংস্কৃতি হিসেবে অফিস সময়ের পর অতিরিক্ত কাজের মাধ্যমে জনগণ ও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। দেশব্যাপী জনগণকে প্রকৌশল সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের সকল জেলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রযুক্তি পরামর্শ কেন্দ্র। যা গণমানুষের কল্যাণ বিনামূল্যে প্রযুক্তি পরামর্শ সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এসব কর্মকান্ডের প্রেক্ষিতে সঙ্গত কারণে আইডিইবি দেশ ও জনগণের নিকট অধিকতর দায়বদ্ধ।

জাতির প্রতি দায়বদ্ধতাকে সামনে রেখে ইনস্টিটিউশনের কার্যক্রম সুষ্ঠু ও ব্যাপক পরিচালনার স্বার্থে ২৭ তলা বিশিষ্ট প্রধান কার্যালয়ের বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে ঢাকার ১৬০/এ, কাকরাইলে। প্রস্তাবিত ২৭ তলা বিশিষ্ট এই প্রকল্পের ১ম পর্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

আইডিইবি কেন্দ্রীয় ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

- প্রকল্পের নাম ঃ ঢাকার কাকরাইলে অবস্থিত ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনীয়ার্স, বাংলাদেশ (আইডিইবি) কেন্দ্রীয় ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ (১ম পর্যায়)।
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ঃ গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- নক্শা প্রণয়নকারী সংস্থা ঃ স্থাপত্য অধিদপ্তর
- প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ঃ গণপূর্ত অধিদপ্তর
- প্রকল্পের অর্থের উৎস ঃ (ক) পিপি ভুক্ত ঃ টাকা- ১৩৪.৬১ লক্ষ (বাংলাদেশ সরকারের অনুদান)
  (খ) পিপি বর্হিভূতঃ টাকা-৪০০.০০ লক্ষ (আইডিইবি'র নিজস্ব অর্থ)
- ফ্লোর এরিয়া ঃ (ক) ২য় বেজমেন্ট-২০,০০০ বর্গফুট (৫০টি কার পার্কিং সুবিধা সম্বলিত)
  (খ) ১ম বেজমেন্ট-১৫,০০০ বর্গফুট (৫০টি কার

www.pathagar.com

পার্কিং সুবধি সম্বলিত)

(গ) নীচ তলা-২০,০০০ বর্গফুট (সুপরিসর লবী ও অভ্যর্থনা কেন্দ্র, ঝুলন্ত স্পাইরাল সিঁড়ি, ৮০০ আসন বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মাল্টিপারপাস হল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা, ক্যাফেটেরিয়া, গিফ্‌ট সপ, সাব-স্টেশণ ও ড্রাইভওয়ে সম্বলিত)।

(ঘ) দ্বিতীয় তলা- ১৫,০০০ বর্গফুট (৭০০ আসন বিশিষ্ট অডিটরিয়াম, আইডিইবি'র প্রশাসনিক দপ্তর)।

(ঙ) তৃতীয় তলা-২০,০০০ বর্গফুট (১২০০ আসন বিশি্‌ট কাউন্সিল হল, ১০০ আসনবিশিষ্ট শীতাপত নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় নির্বাহ কমিটির সভাকক্ষ, রিসার্চ ও স্টাডি সেল-এর কার্যালয়, লাইব্রেরী, কম্পিউটার ল্যাব, ইনস্টিটিউশনের মুখপত্র কারিগণ-এর প্রকাশনা দপ্তর, সার্ক ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম (SDEF)। এবং মিড-লেবেল ইঞ্জিনিয়ার্স ফোরাম অব এশিয়া এন্ড প্যাসিফিক কান্ট্রিন (MEFAP)। এর কার্যালয়।

(চ) চতুর্থ তলা-১৫,০০০ বর্গফুট (ভাড়ার জন্য নির্ধারিত)।

(ছ) পঞ্চাশ তলা-১৫,০০০ বর্গফুট (সদস্য রেস্ট হাউজ ও ভাড়ার জন্য নির্ধারিত)

- **বিশেষ সুবিধা** ঃ (ক) লিফ্‌ট-৬টি (খ) সিঁড়ি-৬টি (গ) জেনারেল টয়লেট ব্লক-প্রতি তলায় ২টি (ঘ) বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ-প্রতি তলায় ১টি (ঙ) ১০০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাব-স্টেমন ১টি (চ) ২০০কেভিএ বৈদ্যুতিক জেনারেটর-১টি।
- **প্রকল্প কাঠামোর** ঃ (ক) ২টি বেজমেন্ট ফ্লোরসহ ২৭ তলা বভন নির্মাণের লক্ষ্যে যথাযথ ভিত্তি নির্মিত।

www.pathagar.com

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ	ঃ	(খ) রাজউক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের বিধিমালা অনুসরণ করে পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প প্রণীত।

(গ) ভূমিকম্প প্রতিরোধক্ষমতা সম্পন্ন এই ভবনটি ন্যূনতম ১০০ বছর আয়ুষ্কাল ধার্য করে নির্মাণের ক্ষেত্রে সকল নির্মাণ সামগ্রী বুয়েট এর টেস্টিং ল্যাবরেটরি হতে পরীক্ষিত। এছাড়া সোরপাইল, র‍্যাফট ফাউন্ডেশন এবং বেজমেন্ট ফ্লোরে পানি চুয়ানো বন্ধ নিশ্চিতের লক্ষ্যে Water Proofing Membrane। ব্যবহার করা হয়েছে।

(ঘ) প্রতি তলার উচ্চতা ১২ ফুট নির্ধারিণ করে নির্মিত এই ভবনে ভবিষ্যতে সেন্ট্রাল এয়ারকন্ডিশন সিস্টেম অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

(ঙ) ভবনের নান্দনিক সৌন্দর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতি তলায় মার্বেল ও মিরর পলিশ টাইলস্ এবং কল সিঁড়ির রেলিং-এ Stainless Steel- এর পাইপ ব্যবাহার করা হয়েছে।

(চ) ভবনের স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে Stainless Steel- পাইপের সীমানা প্রাচীর ও দৃষ্টিনন্দন ২টি গেইট তৈরি করা হয়েছে।

(ছ) ভবনের সকল দরজায় সেগুনকাঠ এবং অভ্যন্ত রীণ আলো বাতাস নির্গমনের জন্য ওপেন স্পেসে এ্যালুমিনিয়াম ফ্রেমযুক্ত Reflecting Glass ব্যবহার করা হয়েছে।

(জ) সম্ভাব্য অনাকাঙ্খিত অগ্নিকান্ড ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় জরুরী নির্গমনের জন্য ২টি বিশেষ সিঁড়ি স্থাপন করা হয়েছে।

(ঝ) প্রাকৃতিক দৃষ্টিনন্দনের লক্ষ্যে ভবনের চারপাশে উন্নতজাতের পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন সৌন্দর্যবর্ধক বৃক্ষ রোপন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট পর্ব

২১/০৭/২০০৭ইং।

আমার বর্তমান বইটির নাম "স্মৃতিকণা- মহান আল্লাহপাকের কোরাণে করিমের মধ্যে বেশকিছু মূল্যবান তাগিদ এসেছে পৃথিবী পরিভ্রমন করে দেখার জন্য। এরই ফলশ্রুতিতে আমি দীর্ঘ ৩০ বছর শিক্ষকতার পর সরকারী নিয়ম অনুযায়ী অবসর গ্রহণ করি এবং সর্বপ্রথম সস্ত্রীক পবিত্র হজ্জ পর্ব সমাধা করি- আলহামদোলিল্লাহ। মহান আল্লাহপাকের দরবারে লক্ষ কোটি শুকরিয়া ও সিজদা আদায় করি!! আমিন!!!

এশিয়া মহাদেশের অনেকখানি ভূখন্ড ঘুরে ঘুরে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পশ্চিমে জেরুজালেম তথা ইজরাইল এবং সর্বদক্ষিণপূর্বে অবস্থিত সিঙ্গাপুর পর্যন্ত এই বিশাল ভূ-ভাগে একমাত্র পর্যটক হিসাবেই ঘুরেছি এবং পর্যটকের দৃষ্টিভঙ্গিতেই এই সমস্ত এলাকায় জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, গাছপালা, জনপদ ও তাদের কালচার ও কৃষ্টি, শিক্ষা-দীক্ষা, আয়-ব্যয়ের উৎস ইত্যাদি যাবতীয় সম্ভাব জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানার চেষ্টা করেছি। যেমনভাবে ইউরোপকে দু'দুবার ঘুরে দেখার ও বুঝার চেষ্টা করেছিলাম। ১৯৯৬ সালে মধ্যপ্রাচ্যে সফরের দীর্ঘ ৪০ দিনের মূল্যবান অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছিলাম মুসলিম বিশ্বের সফরনামা। বইটি বন্ধুমহলে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে বলেই বোধকরি বর্তমান বইটি লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করেছি তীব্রভাবে। অতি সম্প্রতি সিঙ্গাপুর ও মালেয়েশিয়ার বিস্তৃর্ণ ভূ-ভাগ দীর্ঘ তিন সপ্তাহ যাবত পর্যটন শেষ করেছি। এই পরিশিষ্ট পর্বে আর কিছু লিখবনা ভেবেও আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সম্ভবত ঃ আমার জীবনের সর্বশেষ ভ্রমনের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটা সংযোজন করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।

বস্তুত আমার অসংখ্য সুপ্রিয় ছাত্র ও ছাত্রীদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে আমার দারুন ভক্ত- অনুরক্ত হয়ে পড়ে। এদের মধ্যেই ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল হক বর্তমানে সিঙ্গাপুরে চাংগী এয়ারপোর্ট টারমিনাল ভবনের ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কর্মরত রয়েছে। প্রায় দীর্ঘ ১৪/১৫ বছর সে সিঙ্গাপুরে শিমুজী কন্সট্রাকশন কোম্পানীর ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করছে। এটা একটা জাপানী কোম্পানী এবং এরাই ওকে ইতোপূর্বে ইরাক, কুয়েত প্রভৃতি দেশে চাকুরীরত অবস্থায় রেখেছিল। আমি অত্র বইয়ের মাঝামাঝি অবস্থানে ফজলুল হক সম্পর্কে কিছু লিখেছি। সে সিঙ্গাপুর থেকে আমাকে প্রায়ই তার ওখানে যাওয়ার জন্য অনুরোধ

www.pathagar.com

করে টেলিফোন করত। এমনকি সঙ্গে আমার স্ত্রীকেও নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। আমার স্ত্রী বরাবরই তাঁর পায়ের ব্যথার কথা জানিয়ে অব্যহতি পান, কিন্তু আমি তার পুনঃপুন অনুরোধ আর উপেক্ষা করতে পারিনি। যেহেতু সে সেখানে সস্ত্রীক পুত্র-কন্যাসহ নিজস্ব ফ্ল্যাটে বসবাস করছে অতএব, আমার কোনই অসুবিধা হবে না ইত্যাদি জানিয়ে আমার নামে স্পন্সর (Sponsor) পাঠিয়ে ভিসা পেতে সাহায্য করে। আমার শরীরে নানা প্রকার ব্যাধি থাকা সত্ত্বেও ডাঃ কর্নেল (অবঃ) এম. হারুন সাহেবের পরামর্শ মত সিঙ্গাপুর যাওয়ার পূর্বেই যেন আমার ডানদিকের ইংগুইন্যাল হারনিয়া অবশ্যই অপারেশন করিয়ে নিই এই মর্মে গুলশানের সাহাবুদ্দিন মেডিক্যাল কলেজ এন্ড হসপিটাল থেকে এ বছর ফেব্রুয়ারী মাসে Prof. Dr. A.B.M. Ali Akbar Biswas, M.B.B.S, FCPS, FICS আমার সফল অস্ত্রপাচার করেন। সুস্থ হতে প্রায় ২/৩ মাস সময় চলে যায়। উপরন্তু ফজলুল হক তার এবং তার ছেলেমেয়ের ছুটি উপলক্ষ্য করেই যেন আমি সফরসূচী গ্রহণ করি এই মত প্রকাশ করে। বিধায় আমি ১৩/০৬/২০০৭ইং তারিখ বাংলাদেশ বিমানের একটা বুকিং যোগাড় করি।

বাংলাদেশ বিমানের অবস্থা বর্তমানে বেশ খারাপ। কখনই টাইম সিডিউল মেনে কোথাও যাওয়া-আসা করতে পারে না। তবুও ২৯,০০০/- টাকা মূল্যের বিমানভাড়া যা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য ফ্লাইটের চেয়ে কম। বেশ কিছুদিন অপেক্ষার পরই টিকিট পাই। ফাহিম ও তার ড্রাইভার আমাকে জিয়া বিমান বন্দরে দিয়ে আসে রাত ১টার পর। আমরা টেলিফোনে জেনেছিলাম রাত ১২ টা ৫মিনিটের বিমান ছাড়বে রাত ২-৩০ মিনিটে। যাহোক, আমি ফাহিমকে বিদায় দিয়ে ভিতরে গিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিতে গিয়ে দেখি বেশ কিছু লোকের ভিড়। বুকিং অফিসারদের আমি অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক পরিচয়দানে তাঁরা আমাকে অগ্রাধিকার দেন। আমি যেহেতু একা, স্বভাবতই জানালার ধারে সিটটা আমি আকাঙ্খা করেছিলাম। কিন্তু তা হয় নি। রাত ২-১৫ মিনিট অপেক্ষা করেও যখন কোন এনাউন্সমেন্ট শুনলাম না, তখন আমি বিমানের কর্তাদের নিকট গিয়ে জানতে পারলাম যে, ভোর ৪-৩০ মিনিটে প্লেন ছাড়বে। আমি তাঁদের একটু উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করি ইতোমধ্যে আপনারা কোন একটা এনাউন্সমেন্ট দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না? উপরন্তু এতগুলো যাত্রী রাত্রি ৯টা থেকে অপেক্ষা করছে অভূক্ত অবস্থায়। এদের খাওয়াবার প্রয়োজন বোধ করেন না? দু'জন বিমান কর্মকর্তা আমার গন্তব্যস্থান জানতে চাইলে আমি বলি সিঙ্গাপুর। বেশীর ভাগ যাত্রীই ছিল মালয়েশিয়ার শ্রমজীবী। তাঁরা আমাকে বলেন, হ্যাঁ আমরা যাচ্ছি দেখি আপনার কথামত ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি কিনা। আমি ভিতরে গিয়ে এক কাপ কপি পান করি ও পেপার পড়তে থাকি।

www.pathagar.com

ভোর সাড়ে চারটার পর একজন এয়ার হোস্টেসকে বিমানের দিকে যেতে দেখে আমি তাকে আমার বোর্ডিং কার্ড দেখিয়ে আমার আসন নং, আইডি জানালে তিনি আমাকে বলেন ওটি জানালার ধারে নয়। আমি জানালার ধারে বসতে চাই জানিয়ে অনুরোধ করলে, তিনি বলেন আপনি ভিতরে আসুন একটা ব্যবস্থা হবে। কিছুক্ষণ পরে আমরা সকলেই যখন রওনা দিয়েছি তখন দেখি ওই ভদ্রলোক যিনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন সকল যাত্রীকে খাওয়ানোর ব্যাপারে। তিনি আমাকে দেখেই আমার নিকট এসে বলেন আপনি খেতে এলেন না কেন? আপনার জন্যে তো আমরা ৩৫০ লোকের খাওয়ার আয়োজন করেছিলাম। খেতে আসার জন্য এনাউন্সমেন্টও করেছিলাম, কেবল আপনাকে দেখলাম না। আমি বললাম অনেক ধন্যবাদ আপনাদের, আমার খাওয়ার জন্যে আমি বলিনি। কেননা, আমি বিমান ছাড়ার খবর নেওয়ার পর এয়ারপোর্টে এসেছিই রাত একটার পর। যাই হোক, যাত্রীরা এতক্ষণে বুঝতে পারল তারা কি জন্যে খাবার পেয়েছে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম তাদের কেক, রুটি, কোক ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। বেশীরভাগ যাত্রীই ছিল আন্ডার ম্যাট্রিক স্বল্প শিক্ষিত শ্রমজীবী মানুষ। তাই তাদের পক্ষ থেকে কেউ কিছু বলতে সাহস পায় নি। সম্ভবত বিমান কর্মকর্তারা আমাকে একজন সাংবাদিক অথবা মিডিয়ার কেউ একজন ভেবেই বোধকরি আমার কথার উপর গুরুত্ব আরওপ করেছিলেন। প্লেনের ভিতরে গিয়ে দেখি ঐ এয়ার হোস্টেস সোনালী একটা জানালার ধারে আমার বসার ব্যবস্থা করলেন। যাত্রীরা কেউ কেউ এটা দেখে আমার প্রতি তাদেরও সৌজন্য বোধ যেন কিছুটা বৃদ্ধি পেল।

বেশ কয়েক বছর পূর্বে আমি একবার রাজশাহী থেকে ঢাকা অভ্যন্তরীণ বিমানে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। তখন দেশজুড়ে বাস ধর্মঘটের ব্যাপারে আমি রাজশাহীতে আটকে পড়ি। বিমান সোজা ঢাকা আসবে এমনটাই আমার প্রথমে ধারণা ছিল। কিন্তু পথিমধ্যে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে যাত্রা বিরতি হওয়ায় আমার সকল যাত্রীরা সৈয়দপুর বিমানবন্দরে নেমে পড়ি। আকাশের অবস্থা খারাপ আবহাওয়ার কারণে আমাদের দীর্ঘ ৩/৪ ঘন্টা সেখানে অবস্থান করতে হয়। আমি যোহরের নামাজান্তে দুপুরের খাবার বিমান বন্দর স্টল থেকে কিনে খেয়ে ফেলি। বাকী সমস্ত যাত্রীদের জন্য বিমান বন্দর ম্যানেজারকে চেপে ধরি দুপুরের খাবারের জন্য। তিনি অবশেষে বাধ্য হন সকল যাত্রীকে খাওয়াতে। অবশ্য তিনি আমার খাবারের টাকাটাও ফেরত দেন। ঐ সময় আমার এক ভাগনী জামাই ইঞ্জিনিয়ার আবুল কালাম সৈয়দপুরে পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিরয়ার হিসাবে কর্মকর্তা ছিল; অথচ তার কথা আমার একবারও মনে আসেনি। মনে পড়লে আমি অবশ্যই তাকে টেলিফোন করে খবর নিতে পারতাম। যেহেতু আমি প্রায় সর্বক্ষণ ম্যানেজারের রুমেই বসে গল্প করেছিলাম

www.pathagar.com

এবং বগুড়া থেকে আগত আবহাওয়ার ব্যাপারে সংবাদ সংগ্রহ করেছিলাম। যাহোক, শেষে রাত প্রায় ৮টার দিকে আমরা ঢাকা বিমান বন্দরে পৌঁছাতে সক্ষম হই।

১।	সরকারী নাম	ঃ	রিপাবলিক অব সিঙ্গাপুর
২।	রাজধানী	ঃ	সিঙ্গাপুর
৩।	জনসংখ্যা	ঃ	৩.০ মিলিয়ন
৪।	সীমানা (ভূমি)	ঃ	৬৪৭.৫ স্কোয়ার কিঃ মিঃ
৫।	মুদ্রা	ঃ	সিঙ্গাপুর ডলার
৬।	ভাষা	ঃ	চাইনিজ, ইংরেজী, মালে, তামিল।
৭।	জিডিপি মাথাপিছু	ঃ	৩০,৫৫০ ইউ.এস ডলার
৮।	গড় আয়ু	ঃ	৭৬ বছর।

অবশেষে সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে বিমান আকাশে উড়ল ভোর ৫টা ৫ মিনিটে। আমার পাশে বসেছিল মেহেদী হাসান নামের এক লোক। সে কম্বল গায়ে দিয়ে সামনের দিকে মাথা নামিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি যেহেতু কফি খেয়েছিলাম বলেই বোধকরি আমার আর কোন ঘুম আসেনি। তাছাড়া সাধারণত, কোন উড়োজাহাজেই আমার ঘুম আসে না। বাংলাদেশ বিমানের তৈরী In flight Magazine Diganto পড়েই সময় কাটাই। মালয়েশিয়ায় ল্যান্ডিং করার আগ মুহূর্তে ফজলুর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে কথা বলি মেহেদীর মোবাইলে তখন প্রায় ১২টা। আরও ঘন্টা খানিক পর সিঙ্গাপুরের উদ্দেশ্যে বিমান ছাড়ল। প্রায় সব যাত্রীই নেমে গেল মালেয়েশিয়ায়। বিমানের স্টুয়ার্ড ও এয়ার হোস্টেস পর্যন্ত পরিবর্তন। আবার মহান আল্লাহ্‌পাকের প্রশংসা কীর্তনের পর বিমান উড়ল। সিঙ্গাপুর সময় প্রায় তখন ১টা ৩০ মিনিট। টারমিনাল ভবন নং- ১ এ ঢুকেই দেখি ফজলু আমার জন্যে অপেক্ষারত। আমাকে দেখেই সে আমার নিকট এসে কুলাকুলি ও কুশলাদি বাদে আমার লাগেজের জন্যে এগিয়ে গিয়ে কিছু দূর আমাকে নিয়ে অগ্রসর হয়ে আমার ইমিগ্রেশন ও চেকিং এর জন্য আমাকে ছেড়ে সে বাইরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। কেননা, তার নিকট বিমান বন্দরের পাস থাকার জন্যেই এতটা সে করতে পেরেছে। আমি কিছুক্ষণ পরই বাইরে তার সঙ্গে দেখা করে দেখি ফজলুর বৌ নাজমা, মেয়ে আনিসা, ছোট ভাই বিপ্লব সকলেই উপস্থিত। বিশাল চাংঙ্গী এয়ারপোর্ট অতি চমৎকার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চতুর্দিকে বেশীর ভাগই চৌকশ মহিলা অফিসার। তবে আমার লাগেজ মহিলা বিনা চেকিংএই ছেড়ে দিল ফলে অতি অল্প সময়েই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারলাম। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল যে, আমার ভিসা ছিল ২৬ জুন পর্যন্ত

www.pathagar.com

এবং ১৩ জুন আমি ইমিগ্রেশনে রিপোর্ট করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার অফিসার আমার পাসপোর্টে আরও একমাস পর্যন্ত অর্থাৎ ১৩ জুলাই পর্যন্ত ভিসা বাড়িয়ে সিল বসিয়ে দিল। বিশ্বের আর কোথাও এটা হয় কিনা আমি জানি না। তাই একটু অবাক হলাম।

ফজলু বলল, 'স্যার! ঢাকা থেকে ফারুক ভাই আপনার খোঁজে কয়েকবার ফোন করেছিলেন।' আমরা একটা ট্যাক্সিতে উঠলাম। আমি চালকের পাশে বসি। পিছনের সিটে ফজলু তার বৌ এবং মেয়ে। বিপ্লব এয়ারপোর্টেই চাকুরী করে। বিধায় সে সেখানেই থেকে গেল। টারমিনাল ভবন থেকে বেরিয়ে চমৎকার রাস্তার দু'পাশে অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং ফুলের বাগান দেখতে দেখতে এগুচ্ছি। এমন সময় আবার ফারুকের ফোন ঢাকা থেকে। ফজলু তার মোবাইলটা আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। আমি কিছুক্ষণ কথা বলি। প্রায় মিনিট কুড়ি পরই আমরা ফজলুর বাসার নিকট নেমে পড়ি। ফজলুর ফ্ল্যাট ৮ তলায়। লিফট্ আসে ৬ তলা এবং ১১ তলায়। অতএব আমরা ৬ তলায় নেমে ৮ তলায় হেঁটে উঠি। ফজলু তার ছোট ফ্ল্যাটে তার মাস্টার বেডরুমটা আমার জন্যে আগে থেকেই ঠিক রেখেছে। আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও তারা স্বামী- স্ত্রী তাদের সিদ্ধান্তে অটল থাকল। দু'টি বাথরুম, একটি মাস্টার বেডের সঙ্গে। অন্যটি কমন টয়লেট এন্ড বাথ। প্রথমে ঢুকেই ড্রইং, বামে একটি ছোট রুম তারপরই মাস্টার বেডের সঙ্গে এটাস্ট বাথ, ড্রইং এর সঙ্গেই ডাইনিং ও কিচেন। ইউরোপেও অনেক ছোট ফ্ল্যাট অনেকটা এ ধরণেই। অবশ্যই সুইডেনে অতিরিক্ত শীতের কারণেই তাদের ঘরবাড়ীগুলি হিমেল হাওয়া থেকে রক্ষার জন্যে এ রকমভাবে মাত্র এক চিলতে বেলকনি দিয়েই সম্মুখভাগ শেষ করতে হয়েছে। কিন্তু সিঙ্গাপুরের তাপমাত্রা প্রায় সারা বছর ৩১° সেঃ থাকার কারণে এখানে মোটেই শীত প্রধান আবহাওয়াতো নয়ই এমনকি বসন্ত কালও বলা যাবে না। যদিও আমি সেখানে চিড়িয়াখানায় কোকিল ডাকতে শুনেছি। ঘরের ছাদগুলির উচ্চতা সম্ভবত ৭ ফুটের বেশী নয়। ফলে কোথাও কোন সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা নেই। এমনকি অনেক মসজিদেও কোন সিলিং ফ্যানের ব্যবস্থা তেমন চোখে পড়েনি। তবে প্যাডেস্ট্যাল ফ্যান, এসি, দেওয়ালের সঙ্গে ঝুলন্ত মুভিং ফ্যান ইত্যাদি প্রায় সর্বত্র লক্ষণীয়। ফজলুকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম এরা সিলিং ফ্যান কেন ব্যবহার করে না। সে নিজেও এর কোন সদউত্তর দিতে পারেনি। আমি নিজে স্থাপত্য বিভাগের একজন প্রকৌশলী শিক্ষক হিসাবে তাদের কম উচ্চতা সম্পন্ন রুমহাইট রাখার যৌক্তিকতা খুঁজে পাইনি। ফলে প্রায় সর্বক্ষণই একাধিক প্যাডেস্ট্র্যাল ফ্যান চালাতে হতো। ঘরের তাপমাত্রা বেশ অস্বস্তিকর। এই একটি মাত্র বিষয়ই বোধকরি আমার বেশ খারাপ লেগেছে সিঙ্গাপুরে। তাছাড়া আর কোথাও বিশেষতঃ নির্মাণ কৌশলের কোন খুঁত আমি ধরতে পারিনি। আবাসিক এলাকার বাড়ীগুলি বহুতল বিশিষ্ট, ১২

www.pathagar.com

তলা। কিন্তু ছাদে উঠার বা কাপড় শুকানোর কোন ব্যবস্থা নেই। কোন ফ্ল্যাটের কোন বেলকনি বা বারান্দা না থাকার জন্যে জানালা দিয়ে পাইপের সাহায্যে ভিজা কাপড় শুকাতে দেওয়ার বিচিত্র পদ্ধতি সিঙ্গাপুরেই লক্ষ্যনীয়।

ফজলু বাসায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে পুনরায় অফিসে চলে যায়। আমি উত্তমরূপে গোসল করে যোহরের নামাজান্তে দুপুরের আহার করি নাজমা, তার ছেলে ইমরান ও মেয়ে আনিসা সহ। একমাত্র ছেলে ইমরান O Level এ পড়ছে অনেকটা চুপচাপ প্রকৃতির। ঢাকায় যখন তাকে আমি দেখি, তখন সে খুবই ছোট। মেয়েটি সিঙ্গাপুরে জন্মেছে। বর্তমান বয়স ৯/১০ বছর। বিকেলে আসরের নামাজের পর ইমরানকে নিয়ে বেরুলাম মসজিদের উদ্দেশ্যে। প্রায় ১ কিঃমিঃ এর মধ্যে চমৎকার সুদৃশ্য মসজিদ। সেখানে মাগরিবের নামাজ জামাতে ঠিক ইমাম সাহেবের পিছনে আদায় করে বেশ ভাল লাগল। বাংলাদেশের মত মসজিদের ভিতরে জুতো নেওয়ার কোন বিশ্রি ব্যবস্থা নেই। কেননা, মসজিদে জুতো চুরি করার মত নিকৃষ্ঠ কাজ একমাত্র বাংলাদেশ ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও আমি লক্ষ্য করিনি।

১৮১৯ সালের ২৯ জানুয়ারী স্যার স্ট্যামফোর্ড র‍্যাফলস (Sir Stamford Raffles) সিঙ্গাপুর আসেন নদীপথে, বর্তমান আধুনিক যুগের সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে। তিনিই বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং মালের শাসক জোহরের সুলতানের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন। অথচ মাত্র ১৫০ বছরের মধ্যে আধুনিক সিঙ্গাপুরের যে শান-শওকত ও জৌলুস আমার মত পর্যটকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে তা বাস্তবিকই বিস্ময়কর। এশিয়া মহাদেশে যে এমন ছোট্ট অথচ চটকদার আদর্শ পরিচ্ছন্ন, রুচিশীল, জমকাল চোখ-ধাঁধানো শহর থাকতে পারে। যা না দেখলে মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। সিঙ্গাপুরকে বলা হয় A city like full stop মাত্র ২৬ মাইল দৈর্ঘ্য ও ১৪ মাইল প্রস্থ বিশিষ্ট স্থানের মধ্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ইমারত, চমৎকার রাস্তা, যানবাহন বিশেষত, রেলপথ, মেট্রো রেলপথসহ অতি আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে- যা বিস্ময়কর।

আমি তাই আমার সুপ্রিয় ছাত্রকে একদিন বলেই ফেললাম যে, তুমি অত্যন্ত ভাগ্যবান। বিভিন্ন আরব দেশ ঘুরে ফিরে এসে তুমি এমন একটি সুন্দর শহরে আস্ত না গেড়ে বসলে কীভাবে? কেননা, ফজলু এই বর্তমান ফ্লাটটি কিনেছে ক'বছর পূর্বে। কিন্তু এখন এটির পরিবর্তে আরও ভালো ফ্লাট কিনবে বলে আমাকে জানাল। তিনটি বেডরুম তার দরকার। এমন একটি ফ্লাটের চিন্তা ভাবনাতেই সে আছে।

দ্বিতীয় দিন, ১৪ জুন বৃহস্পতিবার আমি ইমরানসহ সকালেই বেরিয়ে পড়লাম। শহরের একপ্রান্তে তখন চলছিল একটি চাইনিজ একজিবিশন। আমি প্রথমই

www.pathagar.com

ইমরানকে ১৬০ ইউ.এস ডলার দিলাম সিঙ্গাপুর ডলারে রূপান্তরিত করানোর জন্যে। সে পেল ২৪৪ সিঙ্গাপুর ডলার। সে আমাকে ফেরত দিতে এলে, আমি বলি তোমার কাছেই রেখে দাও এবং খরচ কর। প্রায় ৪/৫ ঘন্টা ধরে আমরা সমস্ত প্রদর্শনীটা দেখলাম ঘুরে ঘুরে। ওখানে দুপুরে ম্যাকডোনাল'স এর খাবার খেয়ে আবার প্রবেশ করলাম 'ডাইনোসর' ফিল্ম দেখার জন্যে বিশাল গম্বুজ বিশিষ্ট নভো-থিয়েটার অডিটোরিয়ামে। প্রায় ঘন্টা দেড়েক ফিল্ম শোতে কোটি কোটি বছর পূর্বের বিশাল আকৃতির ডাইনোসরের জন্ম, প্রবৃদ্ধি এবং ধ্বংসলীলা সবকিছুই কম্পিউটারের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে অতি বিস্ময়করভাবে। বিশেষত, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকো অঞ্চলে কীভাবে ডাইনোসরের জীবাশ্ম বিজ্ঞানীরা আবিস্কার করেছিলেন তা পর্যন্ত নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। প্রকান্ড হলের তিন চতুর্থাংশ জুড়ে অর্থাৎ সম্মুখে, মাথার উপরে, ডানে ও বামে বিশাল আকৃতির ডাইনোসরের স্বরব ছবি যা অত্যন্ত ভীতিকর এবং ভয়ঙ্কর সশব্দে চিত্রায়িত হয়েছে। বাস্তবিকই আমার এবং ইমরানের এ ধরণের শো এই প্রথম। খুবই ভাল লেগেছে তাদের ইংরেজিতে ধারা বিবরণী। আমাদের উভয়েরই বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয়নি। ধারে কাছে কোন মসজিদ না থাকায় যোহরের নামাজ পড়া হল না। সিঙ্গাপুরে প্রায় ৭৫টি মসজিদ আছে। কিন্তু মসজিদ ছাড়া বাইরে কোথাও নামাজ পড়া নিষেধ। আমরা বিকেলে আবার সুন্দর রেলপথে ফিরে এলাম। ঈশুন, স্ট্রীট নং- ১১, এভিনিউ-৫, ব্লক- ১৫০ অর্থাৎ ফজলুর ফ্যাটে। এই যাওয়া আসার পথের দুধারে চমৎকার নতুন রং করা প্রতিটি ইমারত। খেলার মাঠের সবুজ বিস্তৃত মনোরম ময়দান, ফুলের বাগন এসব কিছুই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে প্রবলভাবে।

বাসায় ফিরে আমার এক ভাগনি ইলাকে ফোন করি। সে থাকে সিঙ্গাপুরের ইস্টকোস্টে। তার কাজের মেয়ে ফোন ধরে জানাল তারা মালয়েশিয়া থেকে এখনও ফিরেনি। চমৎকার ইংরেজিতে উত্তর দিল মেয়েটি। সে এসেছে ফিলিপাইন থেকে। এরপর টেলিফোন করলাম জুডিকে । সে সিঙ্গাপুরেরই মেয়ে, ঢাকায় এসেছিল ব্যবসার খাতিরে। আমার ছোট ছেলে ফাহিমের ওখানে ক'দিন ছিল। আমার সিঙ্গাপুর যাওয়ার সংবাদে সে দারুণ খুশী। তার স্বামী জানাল যে, জুডি কদিনের জন্যে ব্যাংকক গিয়েছে। ফিরে এলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবে। ফজলুর বর্তমানে কাজের চাপ এত বেড়ে গেছে যে, বেচারা মোটেই ছুটি পেলনা। সে প্রতিদিন ভোর ৫টায় উঠে, নামাজ কালাম পড়ে গোসল সেরেই বেরিয়ে পড়ে তার ছোট ভাই বিপ্লবকে সঙ্গে নিয়ে অফিস মুখে। ফিরে সেই রাত ১১ টায় প্রতিদিন। রাত্রে ফিরেই আবার গোসল করে নামাজান্তে খাবার খেয়ে বসে আমার সঙ্গে গল্প করতে। তখন নাজমা আমাদের খেতে দেয় প্রচুর ডেজার্ট, নানাবিধ সুস্বাদু ফলমূল ইত্যাদি। মেয়েটি অত্যন্ত কাজের কোন সহযোগী ছাড়াই সে এক হাতেই সবকাজ

www.pathagar.com

সামাল দেয়। পাবনা শহরের মেয়ে, সেখানে মহিলা কলেজ থেকে পাশ করেছে। সব সময় চমৎকার হাসিখুশী ভাব, দেখতেও বেশ সুন্দরী। তবে ওর ছোট্ট মেয়েটি আনিসা বোধকরি ইনশাআল্লাহ অনেক বেশী সুন্দরী হবে, বুদ্ধিমতীও বটে।

আজ শুক্রবার, ফজলু আর অফিসে গেল না। যেহেতু আমি আগেই বলেছিলাম যে, শুক্রবার জুম্মার নামাজ শহরের সবচেয়ে প্রধান জামে মসজিদে আদায় করতে চাই। ফজলু আমাকে ট্যাক্সি করে সোজা বাসোরা স্ট্রীট এ প্রকান্ড জামে মসজিদে নিয়ে যায়। আমি ও ফজলু ইমাম সাহেবের কাছাকাছি প্রথম কাতারেই স্থান পেয়ে যাই। ইমাম সাহেব আরবী ও ইংরেজীতে লিখিত খুত্‌বা পাঠ করেন দীর্ঘক্ষণ বয়স্ক ইমামের মুখে কোন দাড়ি পরিলক্ষিত হয়নি। সম্ভবত ঐ সমস্ত দেশে লোকের মুখে দাড়ি কমই হয় মনে হল। ইমাম সাহেব সশব্দে অর্থাৎ কিরাতের সঙ্গে তাসমিয়া শরীফ পাঠান্তে সুরা ফাতেহা পাঠের পর অন্য সুরা পাঠ করেন। নামাজ শেষে দীর্ঘ মোনাজাতের পর পুনরায় মোয়াজ্জেন সাহেবকে মাইক দেওয়া হয় দোয়া করার জন্যে। তিনিও বেশ কিছুক্ষণ মোনাজাত পাঠ করেন এবং তারপরপরই বেশ কিছু মুসল্লী ইমাম ও মোয়াজ্জেন সাহেবের সঙ্গে মুসাফাহ , মুয়ানাকা ইত্যাদি সম্পন্ন করেন এবং এরপরই মসজিদ ফাঁকা হতে শুরু হয়। আমার মনে হল, কেবলমাত্র দুই রাকাত ফরজ নামাজের জন্যেই যেন এত লোকের সমাগম ছিল। যা হোক আমি যথাবিহীত পুরা নামাজ শেষেই মসজিদ থেকে বেরিয়ে পড়ি ফজলুসহ। এরপর মসজিদের চতুরপাশ ঘুরেফিরে একটু দেখি। মসজিদের প্রবেশ পথে মাত্র দু'তিন জন ভদ্র ভিক্ষারী লক্ষ্য করেছি। সমস্ত জুতো স্যান্ডেল মসজিদের বাইরে নীচেই পড়ে রইল। গ্রাউন্ড লেভেলের বেশ কিছু উপর থেকে প্রধান জামাত শুরু হল। দোতালা মসজিদ, কিন্তু মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে। এখানে প্রায় সব মসজিদেই এই একই ব্যবস্থা।

মসজিদ থেকে বেরিয়ে ফজলু দুপুরের খাবারের জন্য অনেকগুলি ভাল খাবারের দোকানে গেল। তারমধ্যে ওর পরিচিত এক বাঙ্গালী হোটেলে আমরা দুজন খেলাম। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকবার ফজলুর অফিস থেকে ফোন আসল। কেননা, সেদিন তার অফিস শিফ্‌মেন্টের কাজ চলছিল অথচ ফজলুই তার অফিসের ইনচার্জ। যাহোক সে বার বার ফোনেই তার দায়িত্ব সেদিন পালন করল। আমিও একটু অপ্রস্তুত হলাম। এরপর আমরা গেলাম বিখ্যাত মোস্তফা সেন্টারের কাছে অবস্থিত ট্র্যাভেল এজেন্সিতে। আমার মালয়েশিয়া ট্যুরের জন্য একটা টিকেট ফজলুই ক্রয় করল। যেহেতু আমার নিকট কোন সিঙ্গাপুর ডলার ছিলনা।ওরা কেউ আমার সঙ্গে মালয়েশিয়া যেতে পারবে না জেনে ২/৪ দিন পরে বুকিং দিলাম। সেদিন আসর, মাগরিব অন্য মসজিদে (Angulia) নামাজ পড়ে আমরা রাত্রে বাসায় ফিরলাম।

www.pathagar.com

ইতোমধ্যে ফজলু আমাকে শহরের বেশ খানিকটা অংশ দেখিয়েছে। ফজলু পাবনায় তার পিতাকে একটা পরিচিত ব্যাংক থেকে টাকা পাঠাল। তখন অবশ্য সন্ধ্যার পর হলেও ব্যাংক চালু ছিল।

পরের দিন সকালে ইলা আমাকে ফোনে জানাল সে আসবে আমাকে নিতে দুপুরের পর। কেননা সেদিন বিকেলের দিকে তাদের পরিচিত বন্ধু- বান্ধবীদের নিয়ে সেনটোসা দ্বীপে যাবে একটা পিকনিক পার্টির মত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। আমি রাজি হলাম। ইলা ও তার স্বামী নাফিজ আহমেদ আমাকে তাদের গাড়ীতে নিয়ে গেল প্রথমে তাদের বাসায় ইস্টকোস্টের দিকে। তার কিছুক্ষণ পর আমরা সকলেই অর্থাৎ ইলার ছোট দুইমেয়েসহ মোট ৫ জন মিলে জামাতের সঙ্গে আসরের নামাজ আদায় করলাম। খুবই ভাল লাগল আমার, ওদের এরূপ নামাজের ব্যবস্থা দেখে। নাফিজ নিজে একজন ইঞ্জিনিয়ার। বিখ্যাত মাইক্রোসফট কোম্পানীতে উচ্চ পদে (Critical Situation Manager, Asia Pacific & Greater China Region) কাজ করছে। আমেরিকায় প্রায় ২৪ বৎসর কাটিয়ে এসেছে। সবচেয়ে আমার ভাল লেগেছে নাফিজের প্রাণখোলা আখ্লাক। তাদের নিশান সানী গাড়ীটা নাফিজ নিজেই চমৎকার ড্রাইভ করে। আমরা সকলে মিলে সেনটোসা দ্বীপে গিয়ে হাজির হলাম। ওদিকে আরও কয়েকটি পরিবার পথিমধ্যে আমাদের সঙ্গী হয়ে গেল। সন্ধ্যার বেশ কিছুটা পূর্বেই আমরা সমুদ্রের ধারে বেলাভূমিতে একটা নিরিবিলি স্থানে সকলেই আসন পাতলাম। ইতোমধ্যে আমি আমার ক্যামেরা থেকে কিছু ছবি তুললাম। আমাকে সকলের সঙ্গে নাফিজ পরিচয় করিয়ে দিল। ওরা সকলেই প্রায় মধ্যবয়সী এবং বাঙ্গালী পরিবারের শিক্ষিত সন্তান। সিঙ্গাপুরে চাকুরী বা ব্যবসা উপলক্ষ্যে বসবাস দীর্ঘদিন।

মাগরিবের নামাজ জামাতবদ্ধ অবস্থায় আমরা সকলেই আদায় করলাম এবং ইমামতির দায়িত্ব আমাকেই পালন করতে হল। আমার খুবই ভাল লাগল যে, এই বিদেশ বিভূঁয়ে একদল শিক্ষিত বাঙ্গালী সন্তান এতখানি মুসলিম মানুষ সম্পন্ন হতে পারে দেখে একটু বিস্মিতও হলাম। এরপর প্রত্যেকের জন্যে রাতের খাবার চিকেন বিরিয়ানী পরিবেশন করা হল। যা পূর্বেই প্রস্তুত প্যাকেটে সঙ্গে আনা হয়েছিল। খাবারের পর আমরা সকলেই নির্দিষ্ট স্থানে শূন্য প্যাকেটগুলি ফেলে এলাম। নিকটস্থ স্থানে টয়লেট ইত্যাদির চমৎকার ব্যবস্থা আছে দেখলাম। এরপর বসল আলো-আধাঁরীর মধ্যে ইসলামী আলোচনা। দু'একজন ভদ্রলোক চমৎকার আলোচনা করলেন। বিশেষ করে জনাব মোঃ সারওয়ার কবির শামীম অত্যন্ত সুন্দর, নীতিদীর্ঘ বক্তৃতা করলেন। এই ভদ্রলোকের লিখিত বই 'ইসলামী জিন্দেগীর মৌলিক উপাদান' আমাকে ইলা তার বাসায় এসে উপহার দিল। বইটা আমি পড়ে বুঝলাম লেখক

www.pathagar.com

যথেষ্ট পরিশ্রম করে পবিত্র কোরান ও হাদিস শরীফ থেকে প্রচুর উদ্ধৃতিসহ বইয়ের নামের সার্থকতা বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। সর্বশেষে তাদের অনুরোধে আমি মোনাজাতের মাধ্যমে এই বার্ষিক অনুষ্ঠান শেষ করি। আমি এমন একটা চমৎকার পরিবেশ আমার ইউরোপের রোম সফরের পর এই দ্বিতীয়বার বিদেশে পালন করলাম। বাড়ী ফেরার পথে একস্থানে নাফিজ আমাকে অত্যন্ত চমৎকার কফি পান করাল। কেননা, ঐ দোকানটাই ছিল কফি পানের জন্যে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ।

ইলার বাসায় ফিরে আমরা কিছুক্ষণ পর এশার নামাজ সকলেই জামাতের সঙ্গে আদায় করলাম। খুবই খুশী হলাম নাফিজের এই ব্যবস্থাপনায়। নামাজ শেষে, ডেজার্টি হিসাবে ইলা বেশ কিছু ফলমূল আমাদের সম্মুখে পরিবেশন করল। এই ফাঁকে ওরা স্বামী-স্ত্রী আমাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করতে থাকল ইসলাম ধর্মের উপর। আমাদের আলোচনা দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে এবং গভীর রাতে আমরা শয্যা গ্রহণ করি। আমাকে একটি গেস্টরুম এসি ও ফ্যানসহ চমৎকার বিছানা দেওয়া হয়। মেয়েরা তাদের নিজেদের রুমে চলে যায় অনেক পূর্বেই। শেষে ইলা ও নাফিজ তাদের মাস্টার বেডরুমে চলে যায়। পরের দিন ইলা ও নাফিজ আমাকে ফজলুর বাসায় দিয়ে যায়। যেহেতু আমি মালয়েশিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করব। ওরা মাত্র ক'দিন পূর্বে মালয়েশিয়া ঘুরে এসেছে। ওরা আবার আমাকে নিয়ে যাবে ওদের ওখানে, তাও আমাকে জানিয়ে গেল। ইস্টকোস্ট থেকে ঈশুন বেশ অনেকটা দূরে। তবে অত্যন্ত সুন্দর রাস্তা এবং সেখানে ট্রাফিক সিস্টেম খুবই ভাল বলে আমার মোটেই খারাপ লাগেনি। ইলাদের বাসায় ওদের সকলের বেশ কিছু ছবি আমার ক্যামেরায় তুলেছিলাম। ইলা আমেরিকায় তার মায়ের সঙ্গে ফোনে কথা বলে, ফোনটা আমার হাতে ধরিয়ে দেয়। সেলিনাবু আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেন। তাঁর আব্বার সেদিনই ছিল মৃত্যু বার্ষিকী। ফলে তিনি আমাকে খালুর জন্যে দোয়া করতে অনুরোধ করেন। আমি নামাজ শেষে খালু ও জাহাঙ্গীর ভাইয়ের জন্য প্রাণভরে দোয়া করি। তাঁরা বর্তমানে আরিজোনায় অবস্থান করছেন জেনে আমি আমার চাচাতোভাই ম্যাংগোর ঠিকানা দেই সেলিনাবুকে যোগাযোগ করার জন্যে। যেহেতু ম্যাংগোর মেয়ে ডাঃ জেসমিন চৌধুরী ও তার স্বামী উভয়েই ক্যালিফোর্নিয়াতে বিখ্যাত ডাক্তার। ইলার পিতা চৌধুরী জাহাঙ্গীর কবিরের চিকিৎসার ব্যাপারে হয়ত তারা সাহায্য করতে পারে।

পরের দিন বৃহস্পতিবার ভোরে উঠে ফজরের নামাজান্তে কিছু নাস্তা পানি করেই আমি, নাজমা ও আনিসা বেরিয়ে পড়ি বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে। ফজলু ও বিপ্লব তার অনেক পূর্বেই চলে গেছে অফিসে। আমার বাস ছাড়ার সময় ছিল সকাল ৭-৪৫ মিনিট। আমরা ৬ টার পরই রাস্তায় নামি। তখনও বেশ অন্ধকার। কিছুটা হেঁটে গিয়ে ট্রেন ধরি। চতুর্দিকে প্রচুর বৈদ্যুতিক বাতির আলো ঝলমল প্রভাত কাল। ট্রেনে প্রচুর

যাত্রীকে ঘুম জড়ানো চোখে কানে হেড ফোনে গান বা মিউজিক শুনতে লক্ষ্য করলাম। বুঝলাম এরা প্রচুর পরিশ্রমী জাতি। তখন সামান্য সূর্য উঠেছে। নাজমা দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে থাকার ফলে প্রায় সব কিছুই তার নখদর্পনে। আমাকে সিঙ্গাপুরে প্রথমে একটা ট্রেনের টিকেট কিনে দিয়েছিল ফজলু। ফলে আর কোন টিকেট কেনার প্রয়োজন পড়েনি। ঐ ছোট্ট ভিজিটিং কার্ডরূপী টিকেটটাই প্রতিটি স্টেশনে প্রবেশ এবং বহিরাগমনের জন্য। ইলেক্ট্রনিক গেটের উপর স্পর্শ করা মাত্রই পথ খুলে যায় এবং মাত্র একজন পার হওয়ার পরপরই আবার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায়। ইউরোপের অনেকস্থানে মেট্রো রেলে অনেকটা এ ব্যবস্থা আছে বটে। তবে সিঙ্গাপুরে অনেক উন্নত মানের ব্যবস্থা আছে। নাজমা ও আনিসা আমাকে নির্দিষ্ট বাসের প্রথম আসনে তুলে দিয়ে বিদায় নিল। আমিও অনেকক্ষণ ওদের যাত্রাপথে চেয়ে রইলাম। আমি মালয়েশিয়া যাত্রার পূর্বে ফজলুর বাসায় প্রায় সকলেই আমাকে অনেক সাবধান বানী শুনিয়েছিল ছিনতাইকারী ও পকেটমার সম্পর্কে। ওরা ছাড়াও আরও অনেকেরই ঐ একইমত ফলে, ফজলু আমাকে বলল, 'স্যার আপনার সব টাকা একসঙ্গে নেওয়ার দরকার নাই। যেটুকু দরকার মাত্র সেটাই নিয়ে যান, বাকীটা নাজমার কাছে রেখে যান। আমি তাই করলাম। বাংলাদেশী, সিঙ্গাপুরী ও আমেরিকান ডলারগুলির বেশীর ভাগই ওদের কাছে জমা রাখলাম। গত রাত্রে মাত্র ১০০ ইউ.এস. ডলারের বিনিময়ে যে মালয়েশিয়ান রিংগীত (RM) পেয়েছিলাম সেগুলিসহ কয়েক'শ ইউ.এস. ডলার সঙ্গে নিলাম। সিঙ্গাপুরে মানি এক্সচেঞ্জার আমার ইউ.এস. ডলারকে প্রথম সিঙ্গাপুরী ডলারে রূপান্তরিত করার পর মালয়েশিয়া রিংগীতে দিবে বলে জানাল। আমরা তাতেই রাজি হলাম। অতএব, ১০০ ডলারে পেলাম মাত্র ৩৪২ রিংগীত (RM)। গাড়ী ঠিক সময়ে ছাড়ল। আমি গাড়ীতে জানালার পাশে একক আসনে ছিলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরই আমরা মালয়েশিয়া চেকপোস্টে পৌঁছে গেলাম। গাড়ীতে খুব বেশী যাত্রী ছিল না। আমার ডান পাশে সপরিবারে উঠেছিলেন এক পাকিস্তানী ইঞ্জিনিয়ার। তাঁর সঙ্গে এক পর্যায়ে আলাপ আলোচনায় জানত পারলাম তিনি লাহোর থেকে এসে সিঙ্গাপুরে কর্মরত আছেন। তিনি আমাকে তাঁর একটা ভিজিটিং কার্ডও দিলেন। তার নাম আহমদ বিলাল কামাল। বেশ সদালাপী ভদ্রলোক। তাঁর নিকট জানলাম বর্তমানে লাহোরের লোক সংখ্যা ৫ কোটি এবং সমস্ত পাকিস্তানে প্রায় ২৫ কোটি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও ভদ্রলোক একটু বেশ লজ্জিত হয়েই যেন আমাকে এটা জানালেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনটি বাচ্চা। এছাড়া পাকিস্তানীরা যে পরিবার পরিকল্পনা করেন না এটা আমি সেখানে গিয়ে দেখে এসেছি। ১৯৯৬ সালে মধ্যপ্রাচ্য সফরের শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানে ১০ দিনের ট্যুরে আমি ও প্রফেসর পিয়ারা করাচি, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, ইসলামাবাদ, মারী প্রভৃতি

www.pathagar.com

শহর ভ্রমন করেছি। সেখানে অনেকক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি বেশ ক' বাড়ীতে গাদাগাদা বাচ্চা কাচ্চা।

<u>মালয়েশিয়া</u>

সরকারী নাম	ঃ	মালয়েশিয়া
রাজধানী	ঃ	কুয়ালা লামপুর
জনসংখ্যা	ঃ	২০.৬ মিলিয়ন
সীমানা	ঃ	৩২৯, ৭৫৮ স্কয়ার কিলোমিটার
মুদ্রা	ঃ	রিংগীত (আর এম)
ভাষা	ঃ	মালে, ইংরেজি, চাইনিজ, তামিল
মাথাপিছু জিডিপি	ঃ	৪,৩৭০ ইউ,এস, ডলার
গড় আয়ু	ঃ	৭২ বছর

দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘন্টার বাস যাত্রায় পথের দু'পাশে প্রচুর বনভূমি যার মধ্যে পামগাছের প্রাচুর্য্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। এই পামগাছগুলি থেকে তৈরী ভোজ্য তেল পৃথিবীর বহুদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে সরবরাহ করা হয় এবং এটি মালয়েশিয়ার একটি প্রধান অর্থকরী সম্পদ হিসাবে গণ্য। এছাড়া রাবারগাছ, বিভিন্ন ফল ও ফুলের বাহারী গাছ অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে আমার। মনে হয়েছে বেশ যত্নসহকারেই এসব গাছের পরিচর্যা করা হয়েছে। রাস্তা প্রশস্থ করার কাজও চলছে অনেক স্থানে। ঘন্টা দুয়েক পর একস্থানে আমাদের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাস থামল মাত্র ১০/১৫ মিনিটের জন্যে। সব যাত্রীই নেমে পড়ল তাদের টয়লেট ইত্যাদি ব্যবহারের প্রয়োজনে। সিঙ্গাপুর যত ছোট পক্ষান্তরে মালয়েশিয়া তত বড়। অনেকগুলি জেলায় বিভক্ত এবং তাদের প্রতিটি সীমারেখা ও দিকনির্দেশনা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। যেমন যোহর (JOHOR), মালাক্কা (MALACCA), পাহাংগ (PAHANG) ইত্যাদি স্থানের সীমারেখা আকৃতিতে তৈরী করা হয়েছে পাকাপাকিভাবে। কোন কোনটাতে মসজিদের নক্সায় অত্যন্ত চমৎকার সোনালী গম্বুজ প্রকান্ড আকারে তৈরী যা বহুদূর থেকে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেখানে সিঙ্গাপুর মাত্র সপ্তাহ খানেক ঘুরাফিরা করলেই যথেষ্ট, সেখানে মালয়েশিয়া মাসাধিক কাল ভ্রমনের জন্যে বোধকরি যথেষ্ট নয়। দুপুরের খাবারের জন্যে আবার পথের ধারে এক বিশাল রেস্টুরেন্টের সম্মুখে আমাদের গাড়ী থামল। সেখানে বহু প্রকারের খাবারের আয়োজন প্রস্তুত। পছন্দ মত যার যা ইচ্ছা চটপট খেতে হল। কেননা এখানে মাত্র ৩০ মিনিট বিরতি। নামাজের জন্যেও চমৎকার ব্যবস্থা আছে। বিশ্ববিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি কৌশলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পথের দু'পাশে দেখতে

www.pathagar.com

দেখতে আমরা প্রায় বেলা দেড়টার দিকে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর (KUALA LAMPUR) শহরে পৌঁছালাম। বাসটা থামল শহরের প্রায় মধ্যবর্তী স্থানে জালান পুডুরায়া (Jalan Pudu Raya)। জালান অর্থ স্ট্রীট এটি মালেভাষা।

আমি নিকটস্থ সুইস গার্ডেন হোটেলে যাই। কিন্তু গিয়ে দেখি আমার জন্য সুপার ডিলাক্স রুম ছাড়া কোন ব্যবস্থা খালি নেই। যেহেতু আমি একা এবং ভাড়া ২৮৪ রিংগীত। বিধায় আমি অন্যত্র তেরাস্তার মাথায় একটি চাইনিজ হোটেল এমিরয়্যাল্ডেই আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম। কেননা আমি তখন রীতিমত ক্লান্ত। ৫ তলার উপর ৫২০ নং রুমে উঠেই প্রথমে অজু গোসল সেরে নিকটস্থ কোন মসজিদে যোহরের নামাজ পড়ার জন্যে বেরিয়ে পড়ি। খুঁজতে খুঁজতে বেশ কিছুদূরে একটি প্রকান্ড জামে মসজিদ, 'মসজিদে বোখারী' দেখে মনটা খুশীতে ভরে গেল। বড় রাস্তার ধারেই মসজিদের সীমানার গায়ে আরবী ভাষায় বিশাল আকারে লেখা আছে 'মসজিদে বোখারী"। সমতল ভূমি থেকে বেশ উঁচুতে প্রধান জামাতের স্থান। সমস্তটাই দামী মোটা কার্পেট বিছানো আছে। তখন যোহরের নামাজের জামাত অনেক পূর্বেই শেষ হয়েছে। অতএব আমি একাই নামাজ পড়ে নিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মসজিদের তরুণ ইমাম সাহেব, নাম বললেন মহাম্মদ আমার সঙ্গে আলাপে রত হলেন। চমৎকার ইংরেজি জানেন। আমি তাঁর নিকট থেকে জানতে পারলাম এই বিশাল আকৃতির মসজিদের বয়স মাত্র ছ'মাস। এটি কোন সরকারী অনুদানে নয়; বরং একক ব্যক্তির দানে তৈরী হয়েছে। এমনকি তখনও ফিনিশিং এর কাজ চলছিল। ইমাম সাহেবকে আমি বললাম, আমার এখনও দুপুরের খাওয়া হয়নি। অতএব, এখনই কোন হোটেলে আমার যাওয়া দরকার। তিনি আমাকে বললেন, কোন চীনা হোটেলে না যাওয়া উচিৎ, যেহেতু সেখানে হালাল খাবার না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অতএব, কোন ইন্ডিয়ান অথবা স্থানীয় মালেদের হোটেলে আহার করা উত্তম। আমাকে তিনি আরও বললেন ৪-৪২ মিনিটে আসর। তখন ৪টা বাজে। আমি বেশীদূর না গিয়ে নিকটস্থ স্থানীয় দুই মুসলিম মহিলার নিকট আহার করলাম যাতে আসরের নামাজ জামাতে পড়তে পারি।

মসজিদে পুনরায় ফিরে এসে দেখি ৪টা ৪২ মিনিট আসরের আযান দেওয়া হল এবং জামাত শুরু হল ৫ টায়। নামাজ শেষে মসজিদের নীচে নেমেই দেখি টেবিলে রাখা কিছু খাবারের প্যাকেট। আমার নেওয়ার ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও দেখি এক লোক আমার হাতে খাবারের প্যাকেট ধরিয়ে দিল। আমার হাত রুমালের দ্বারা প্যাকেটটা মুড়ে নিয়ে দ্রুত আমার হোটেলের দিকে চললাম। কেননা তখন আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। মেঘের প্রচন্ড গর্জন, যে কোন মুহূর্তে প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা।

www.pathagar.com

আমি কিন্তু তখন আমার হোটেলের পথটা হারিয়ে ফেলেছি। যকেই জিজ্ঞেস করে আমার হোটেলের কার্ডটা দেখায়, সেই এদিক সেদিক নির্দ্দেশ করে আমাকে আরও বিভ্রান্ত করে ফেলল। সঠিকভাবে না জানলে তাদের এভাবে পথনির্দেশনা মোটেই উচিৎ হয়নি। প্রচুর হাঁটাহাঁটি করে শেষে ট্যাফিক পুলিশকে জিজ্ঞাসা করি, সে আমাকে ট্যাক্সি ড্রাইভারের নিকট পাঠাই এবং সেই ড্রাইভারই আমাকে দূর থেকে আমার হোটেলটা দেখায় তখন প্রায় মাগরিব। আমি তাড়াতাড়ী হোটেলে গিয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করি। অতিরিক্ত ঘুরাঘুরি করে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়ি। হোটেলে এসি, ফ্যান দুটোই চালিয়ে দিই রাতে আর হোটেলে ডিনার করতে যাওয়ার প্রয়োজন হলনা, যখন দেখলাম প্যাকেটে রয়েছে চিকেন বিরিয়ানী। এশার নামাজান্তে টিভিতে ও দেশের কিছু খবরাখবর শুনেই শুয়ে পড়ি।

পরদিন শুক্রবার ভোরে উঠে নামাজ কালাম পড়েই গোসল ইত্যাদি সেরে বেরিয়ে পড়ি রেস্টুরেন্টে চা-নাস্তা করার জন্যে। প্রথমেই সে দোকানের এক বৃদ্ধাকে অনুরোধ করি আমার জন্যে একটা ট্যাক্সি দরকার। সে তখনই একজন চিনা ড্রাইভারকে ডাক দেয়। আমি তাকে পুত্রজায়া যাওয়ার জন্যে ঠিককরি। ড্রাইভার ১১০ রিংগীত দাবী করল। আমি তাকে অপেক্ষা করতে বলি আমার ব্রেকফাস্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত। ঠিক সকাল ৮ টায় পুত্রজায়া অভিমুখে রওনা দিলাম। প্রায় ৩০/৩৫ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। যাওয়ার সময় পথের উভয় পাশে চমৎকার দৃশ্যাবলি দেখার মত। ড্রাইভার চিন চমৎকার ইংরেজি ভাষায় আমাকে বর্ণনা দিতে দিতে যাচ্ছিল। বয়স্ক ড্রাইভার বেশ অভিজ্ঞ মনে হল। পুত্র জায়াকে অনেক দূর থেকেই বেশ আকর্ষণীয় মনে হচ্ছিল। বস্তুত এটি হল প্রধানমন্ত্রীর সদর দফতর। যদিও মালয়েশিয়ার রাজধানী হল কুয়ালালামপুর। চতুর্দিক যেমন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন তেমনি বাহারী ফুল গাছের মনোরম সমারোহ পুত্রজায়াকে করেছে অপূর্ব মোহনীয়। প্রাক্তন প্রথম প্রধানমন্ত্রী টুঙ্কু আব্দুর রহমান পুত্র, এই নামানুসারেই এই শহরের নাম রাখা হয়েছে পুত্রজায়া মালে ভাষায় পুত্র অর্থাৎ প্রিন্স এবং জায়া অর্থ সাকসেস অর্থাৎ বিজয়। ১৯৯৩ সালে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং ২০০১ সালে নতুন ফেডারেল এডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপিটাল হিসাবে গণ্য করা হয়। কুয়ালালামপুর থেকে প্রায় ২০/২৫ কি.মি. দূরে অবস্থিতি। বেশীর ভাগ ইমারতই মুরীশ (Moors) আঙ্গিকে তৈরী বলেই বোধকরি সৌন্দর্য বেড়েছে বহুগুণ। প্রথমেই গিয়ে নামলাম জাতীয় মসজিদ পুত্রজায়ার সম্মুখে। বিশাল আকৃতির অতি মনোরম গোলাপী রং এর প্রকান্ড ডোম বা গম্বুজ ও একটি সুউচ্চ মিনার সোভা পাচ্ছে যা বহুদূর থেকে দর্শনীয়। মসজিদের বাইরেও যেমন বিস্তীর্ণ পাকা প্রাঙ্গণ এবং ফুলের বাগান, মসজিদের ভিতরেও প্রকান্ড প্রাঙ্গন এবং মূল মসজিদ ভবনও অতি বিশাল। সেদিন যদিও

www.pathagar.com

শুক্রবার ছিল তবুও আমার ইচ্ছা ছিল কুয়ালালামপুরের জাতীয় বিশাল জামে মসজিদে জুম্মার নামাজ অদায় করা। সেইহেতু আমি মাত্র ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে পুত্র জায়ার বহু ছবি তুলে। এমনকি মসজিদের পূর্ব দিকে বিশাল ক্যাফেটেরিয়া ও ওয়েট ল্যান্ডের প্রকাণ্ড লেকসহ চতুর্দিকের চিত্র গ্রহণ করি আমার ক্যামেরায়। মসজিদ থেকে দূরে ডান দিকে প্রধানমন্ত্রীর বিশাল প্রাসাদ। সেটাও দেখতে অনেকটা মসজিদের মতই। সুপার মার্কেট রয়েছে অতি উচ্চ মানের। প্রতিটি রাস্তার ধারেই বাহারী রং-বেরঙ্গের ফুলের বাগান। সর্বত্রই ঝক্‌ঝকে, চক্‌চকে পরিবেশ। মোটকথা, সমস্ত মালয়েশিয়ার মধ্যে পুত্রজায়া এক অনন্য, অপূর্ব, অনবদ্য স্থান বলেই আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। অতএব, পুত্রজায়ার তুলনা কেবলমাত্র পুত্রজায়াই এবং এর জন্যে প্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত ডক্টর মোহাম্মদ মোহাথীরের।

ড্রাইভার চিন যতদূর সম্ভব আমাকে এদিক ওদিক ঘোরালো। আমি একসময় তাকে জিজ্ঞাসা করি কী ফুয়েল ব্যবহার করে সে গাড়ীতে। সে বলল, সিএনজি। ফলে সে বেশ কম খরচাতেই পুশিয়ে নেয়। মালয়েশিয়া পৌঁছেই ফজলুকে আমার টেলিফোন করার কথা ছিল, চেষ্টাও করেছিলাম কয়েকবার গতরাতে। আবার এই পুত্র জায়াতে মসজিদ সংলগ্ন পাবলিক ফোনে আমি এবং ড্রাইভার দু'জনেই বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেও ধরতে পারলাম না। বরং প্রতিবারই কয়েন বেরিয়ে আসল। বড়ই অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। যাহোক, এবার দ্রুত ফিরে চললাম বিখ্যাত টুইন টাওয়ারের দিকে। সেখানে পৌঁছার একটু পূর্বেই তাদের ৪৫০টি কুপন শেষ হয়ে যায় ওপরে ওঠার জন্যে। অতি সুন্দরী সারা যার মাত্রায় রয়েছে টুডুং বা হেড স্কার্ক চমৎকার হেসে আমাকে অভ্যর্থনা করল বটে, কিন্তু ফ্রি কুপন শেষ হওয়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। আমি তাহলে আগামী সোমবার আসি বলাতে, বলল সেদিন বন্ধ।

মালয়েশিয়ার প্রধান আকর্ষণ এই টুইন টাওয়ারে আমার উপরে উঠার সখটা আর পূরণ হল না। তবুও বেশ কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে দেখলাম। সম্মুখে দীর্ঘ লেকের উপর চমৎকার ফোয়ারা। এক মেম সাহেব দূরে বসে ছবি তুলছিল টাওয়ারের। আমি তাকে অনুরোধ করায় সে আমার কয়েকটি ছবি তুলে দিল। ৫৫,০০০ বর্গ মিটার ল্যামিনেটেট গ্ল্যাসসহ স্টিলের ৩৩,০০০ প্যানেলসহ কার্টেন ওয়াল দ্বারা অতি সুউচ্চ ইমারত বিশাল আকৃতিতে তৈরী করা হয়েছে অত্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তিতে বিশেষ প্রকৌশলীয় কায়দায়। যা রাতের বেলায় সম্পূর্ণটা আলোময় হয়ে ঝলকাতে থাকে আরও অনেক মোহনীয়ভাবে। আমার হোটেল থেকে বেশ নিকটেই বলা যায়। এই টুইন টাওয়ারের একটু দূরেই রয়েছে বিশ্বের চতুর্থ উচ্চতম টেলিকমিউনিকেশন টাওয়ার ৪২১ মিটার উচ্চতা মেঘের ভিতর পর্যন্ত যার গোলাকার মাথাটি ১১তলা বিশিষ্ট, সেখানে রয়েছে একটি ঘূর্নায়মান রেস্টুরেন্টসহ পর্যবেক্ষণ প্ল্যাটফরম। এটাও রাতের বেলা সম্পূর্ণ আলোকিত অবস্থায় চমকাতে থাকে।

www.pathagar.com

শুক্রবার, বিধায় আমি ড্রাইভারকে বলি চলো আমার হোটেলে। সেখানে আমি অজু করে নামাজের পোষাকপরে কুয়ালালামপুরের জাতীয় বিশাল মসজিদে এসে তাকে ছেড়ে দিই। দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা চিন আমাকে তার গাড়ীতে ঘুরিয়েছে। ১১০ (আর এম) অর্থাৎ মালয় রিংগীত পেয়ে মনে হল সে বেশ খুশী। আমি মসজিদে প্রবেশ করেই দেখি এক ভদ্রলোক টেবিল চেয়ারে বসে ওয়াজ করছেন ইংরেজিতে। সামান্য মাত্র ক'জন মুসল্লী উপস্থিত ছিলেন। অতএব, আমার স্বভাবসিদ্ধ মতে প্রথম কাতারে তাঁর সম্মুখে বসে ওয়াজ তথা লেকচার শুনতে লাগলাম। তিনি লেকচার শেষে আমার পাশে এসে বসলেন। আমি তাঁকে এবং দু'চারজন মুসল্লীকে কিছু আতর পরিবেশন করলাম। ঐ ভদ্রলোক তাঁর পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোট বই রেব করে তাতে আমার ঠিকানা লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। বাংলাদেশের ঠিকানা দিলাম। ঠিক এভাবে আরও দু'একজনের নিকট থেকেও তাঁদের ঠিকানা নিলেন। আমি বুঝলাম এটা হয়ত তাঁর এক ধরণের স্বভাব বা ম্যানিয়া। প্রয়োজন থাক বা না থাক তিনি এটা করেন। এরপর এক তরুণ আজান দিল। আমি কাবলাল জুময়া চার রাকাত আদায় করলাম। কিন্তু সমবেত মুসল্লীদের মাত্র দু' রাকাত নামাজ আদায় করতে দেখলাম। এরপরই দেখি মসজিদের মেহরারের পাশের ঘর থেকে ৫/৬ যুবক সকলেই কালো লম্বা রোবপায়ে পরে মালয় টুপীসহ আমার বাঁ পাশের নির্দিষ্ট শূন্য আসনে বসলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মাথায় পাগড়ী মুখে অতি সামান্য দাড়ি রয়েছে। তিনি সিঁড়ি বেয়ে উপরে সম্মুখের দিকে ঝোলানো ব্যালকনির মত মেম্বারে উঠে গিয়ে চেয়ারে বসলেন। তাঁর সম্মুখে লেকচার স্ট্যান্ড। আবার খুতবার জন্যে দ্বিতীয় আজানের পর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে এক গুচ্ছ লিখিত কাগজে খুতবা পাঠ করলেন প্রথমে আরবী ও পরে ইংরেজিতে। খুতবা পাঠের সময় তাঁর বাম হাতে অবশ্য ধরা ছিল একটি আশা বা লাঠি। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বৃদ্ধ বয়সে এরূপ একটি লাঠি ব্যবহার করতেন। সেই সুন্নত তরিকাটি তাঁরা সকল জুম্মা মসজিদেই বজায় রেখেছেন। আমাদের দেশে সব মসজিদে না হলেও বড় বড় জামে মসজিদে এটি লক্ষ্য করা যায়। যথা বিহিত ফরজ নামাজ শেষে দীর্ঘ মোনাজাত অতঃপর মোয়জ্জেন সাহেবের দীর্ঘ মোনাজাত শেষে সম্মুখ কাতারের ক'জন ইমাম সাহেবের সঙ্গে মুসাফা মুয়ানাকা ইত্যাদি অন্তে বিশাল মসজিদ প্রায় শূন্য। আমি বাকী নামাজ শেষ করে যখন বেরিয়ে আসি, তখন আমার ক্যামেরা থেকে কিছু ছবি উঠালাম। রাস্তায় নেমেই দেখি দু'বন্ধু যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে আলাপ করতেই জানতে পারলাম তারা বাংলাদেশী। একজন জসিমুদ্দীন চাঁদপুর বাড়ী, অপর জনের বাড়ী মাদারীপুর এবং তার নাম সাইদুর রহমান। আমি তাদের বলাম, ভাই আমি সিঙ্গাপুরে আমার প্রিয় ছাত্র ইঞ্জিনিয়ার ফজলুল হককে ফোনে কোন ভাবেই যোগাযোগ করতে পারছিনা। গতকাল এবং আজও কায়কবার চেষ্টা করেছি বলতেই, সাইদুর রহমান তার পকেট

www.pathagar.com

থেকে মোবাইল ফোনটা বের করে আমাকে বলল, আপনি তাঁর নাম্বারটা আমাকে বলেন্ আমি প্রথমে কোর্ড নং ০০৬৫ বলতেই জসিমুদ্দীন ছেলেটি চট করে বলল, না, সিঙ্গাপুরের কোড নং হবে ০২। ঠিক তাই, ওভাবে ফোন করতেই ফজলু ওপার থেকে ফোন ধরে আমার সঙ্গে কথা বলল কিছুক্ষণ। আমি ছেলে দুটিকে অনেক ধন্যবাদ জানালাম এবং বললাম চল, আমার ক্যামেরায় মাত্র ২/৩টি ফিল্ম বাকী আছে। তোমাদের ছবি তুলে নেই। ওখানে ঐ সুপার মার্কেটেই তাদের সঙ্গে আমি সহ ছবি উঠালাম। আবার নতুন ফিল্ম কিনে লোড করে আরও একটা ছবি তুললাম। এবার তাদের আমি বললাম, আমি এখন খুবই ক্ষুধার্ত। অতএব, চল আমরা তিনজনেই একসঙ্গে এই সামনের ম্যাকডোনাল রেস্টুরেন্টে তোমাদের নিয়েই আমি দুপুরের লাঞ্চ করি। তারা কোন মতেই রাজি হল না বরং আমাকেই তাদের বাসায় গিয়ে তৈরী রান্না করা খাবারের জন্য খুবই অনুরোধ করতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করি কতদূর তোমাদের ঠিকানা? ওরা আরও কিছুদূর যেতে হবে বলে জানাল। আমি তাদের বিদায় দেই ধন্যবাদের সঙ্গে। কিন্তু ওরা ২/৪ কদম এগিয়ে গিয়েই আবার ফিরে এসেই হঠাৎ আমার পা ছুয়ে কদমবুচী করতে শুরু করল দুজনেই। বাঙ্গালী সমাজে গুরুজনদের পা ছুয়ে কদমবুচী করার প্রথা বা রেওয়াজ একমাত্র বাংলাদেশেই প্রায় সর্বত্র কম-বেশী লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া আমি বাংলার বাইরে সমগ্র ভারতে, এমন কি পাকিস্তানের কোথাও লক্ষ্য করিনি। যা হোক। আমি তাদের প্রাণ ভরে দোয়া করে বিদায় দিলাম।

স্থানীয় ম্যাকডোনাল রেস্টুরেন্টে আমি পেটপুরে পছন্দনীয় খাবার খেলাম যা আমার বেশ প্রিয়। আমি ইউরোপেও ইতোপুর্বে মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে সস্ত্রীক অনেকবার ম্যাকডোনালের খাবার খেয়েছি বেশ তৃপ্তি সহকারে । কেননা, ঐ খাবার হালাল তো বটেই উপরন্ত আমার নিকট বেশ ব্যালান্স ডায়েট বলেই প্রতীয়মান হয়েছে। এরপর আমি একটা প্রি-পেড ট্যাক্সি ধরে আমার হোটেলে ফিরে আসি।

মালয়েশিয়ার উত্তরে অবস্থিত প্রখ্যাত পেনাং দ্বীপ, যার প্রধান শহর জর্জ টাউন। বিশ্ব পর্যটকদের একটি বিশেষ দর্শনীয় স্থান।

আমি আগামী কাল শনিবার সকালেই পেনাং যাত্রার জন্যে আমার হোটেলের নিকটবর্তী পুডুরায়া বাসস্ট্যান্ড থেকে বুকিং সংগ্রহ করি। যাত্রার প্রাক্কালে একটা দৈনিক ইংরেজি সংবাদপত্র ক্রয় করি প্রায় ১.৮০ রিংগীত মূল্যে। ট্যাবলয়েড সাইজের ৭২ পৃষ্ঠার পত্রিকা। পথে যেতে যেতে কিছু পত্রিকা পড়ি আবার জানালার বাইরের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করি। প্রায় সাড়ে পাঁচ ঘন্টার যাত্রা কুয়ালালামপুর থেকে পেনাং। সকাল ৭-৩০ মিনিটে গাড়ী ছাড়ল, পথে দু'এক স্থানে যাত্রীদের জন্যে বিরতী•সামান্য কয়েক মিনিটের জন্যে। চমৎকার ব্যবস্থা টয়লেট, রেস্টুরেন্ট ইত্যাদির। এই দীর্ঘপথ যাত্রার জন্যে গাড়ীও চমৎকার এসি বাস।

www.pathagar.com

পত্রিকার বেশীর ভাগই পড়া সম্ভব হল না পাশের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী অবলোকনের জন্যে । ভাবলাম, দেশকে কতখানি ভালবাসতে পারলে এমনভাবে বিশ্ব পর্যটকদের আকর্ষণ করা যায়। প্রাকৃতিক বনভূমির বিচিত্র বাহার -বহু গাছ বা বৃক্ষের প্রতি দৃষ্টি পড়লেই মনে হয়েছে যেন গাছভর্তি ফুল। কিন্তু না, গাছের পাতাগুলিই যেন ফুলাকৃতির আকার ধারণ করেছে। দৃষ্টি কখনই ক্লান্তি বোধ করেনি একমূহূর্তের জন্যেও। কত যত্ন ও পরিশ্রমের মাধ্যমে পথের দুধারের এ দৃষ্টি নন্দনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে তা আমার এ দুর্বল ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে আমি দুঃখীত। পরিশেষে সুদীর্ঘ পেনাং ব্রিজ যা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ব্রিজ হিসাবে গণ্য করা হয়, প্রায় ১৩.৫ কিলোমিটার। এরই পাশে আরও একটি ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ব্রিজ নির্মাণাধীন রয়েছে দেখলাম।

জর্জ টাউনের বাস স্ট্যান্ড থেকে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার দিকে এগিয়ে এসে আমাকে শহরের ভিতরে নিয়ে যেতে চাইল। আমি তার নাম জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম আব্দুর রহমান। বেশ ভদ্র এবং শিক্ষিত । চমৎকার শুদ্ধ ইংরেজি ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্থ। আমাকে নিয়ে সে সোজা শহরের প্রায় কেন্দ্র স্থলে একটি রেস্টহাউসে তুলে দিল। আমি তাকে বললাম, আগামীকাল ঠিক সকাল ৮টায় চলে আসার জন্যে। আমি যোহরের নামাজ রেস্ট হাউসের রুমেই আদায় করলাম। একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে বেরিয়ে পড়লাম শহরটা দেখার জন্যে আমার প্রিয় ক্যামেরাটিসহ। নিকটেই দেখলাম একটা বিশাল বহুতল বিশিস্ট সুপার মার্কেট। সেখানে উপর নীচে চতুর্দিকে ঘুরে ফিরে দেখলাম প্রচুর প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারে বিভিন্ন আকারের দোকান সাজান, রয়েছে থরে থরে সুবিন্যস্তভাবে। বেশ ভাল লাগল। গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা ফটোস্টুডিও দেখে আমার একটা এপি এস ফিল্ম ওয়াশ করতে দিলাম। এর কিছুক্ষণ পরে নেগেটিভগুলো প্রায় সবগুলিই প্রিন্ট করার জন্যে অর্ডার দিলাম। দু'টি চীনা ছেলেমেয়ে আমাকে আগামীকাল বেলা একটার মধ্যে ডেলিভারী দিতে চাইল। যদিও আমি বেলা ১০ টার মধ্যে ডেলিভারী নেওয়ার জন্যে দাবী করি, তবুও তারা তাদের সিদ্ধান্তেই অটল থাকল।

অতঃপর আমি নিকটস্থ মসজিদে গিয়ে আসরের নামাজ আদায় করি। মসজিদ ছোট হলেও চমৎকার ইলেট্রনিক ঘড়ি দেখে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হই। প্রতিটি নামাজের সময় আজানের এবং নামাজের ভিন্ন ভিন্ন সময় নিরূপন করছে ক্যালেন্ডারসহ। ইতোপূর্বে সম্ভবত এরূপ উন্নতমানের ঘড়ি অন্য কোথাও দেখেছি কিনা মনে করতে পারছিনা। যাহোক, মসজিদে যথাবিহিত মহিলাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। আমি মসজিদ থেকে বেরিয়ে বিকেলের চা-নাস্তা স্থানীয় মুসলিম রেস্টুরেন্টে সেরে নিলাম। আশেপাশে একটু এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে মাগরিবের নামাজ আবার ঐ মসজিদেই পড়লাম। তবে এবার মনে হল, বোধকরি কোন নির্দিষ্ট ইমাম উপস্থিত

www.pathagar.com

ছিলেন না বলে, উপস্থিত মসল্লীদের মধ্যে মসজিদ কমিটির কোন সদস্য এবার ইমামতি করলেন। আমার দামী জুতাটা যথারীতি মসজিদের বাইরেই রক্ষিত ছিল।

এবার আমি জর্জ টাউনের বিভিন্ন এলাকার কিছু দর্শনীয় বস্তু দেখার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সময় কাটিয়ে এশার নামাজের কিছু পূর্বেই ঐ মসজিদের নিকটবর্তী হতেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে বিদেশী বুঝতে পেরে ইংরেজিতে বলেন, আপনার জন্যে রয়েছে চমৎকার ক্যাপিটাল ক্লিং মসজিদ। এখান থেকে একটু দূরে ১৫/২০ মিনিটের মধ্যেই আপনি পায়ে হেঁটেই সেখানে যেতে পারবেন। আপনাদের মত ভারতীয় পর্যটকদের জন্যে ওটিই সবচেয়ে উত্তম মসজিদ। আমি তাঁর কথার উপর বিশ্বাস রেখেই রওনা দিলাম। যেহেতু সম্পূর্ণ নতুন স্থান, উপরন্ত রাত্রিকাল। স্বভাবতই একে ওকে নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে মসজিদটি খুঁজে পেলাম তখনও জামাত শুরু হয়নি। নামাজে ইমামতি করলেন দীর্ঘদেহী এক যুবক। বেশ তৃপ্তি পেলাম তাঁর পিছনে নামাজ পড়ে। বেশ বড় আকারের চমৎকার মসজিদ। নামাজ শেষে দেখি একটি র‍্যাকের উপর প্রচুর লিফলেট রাখা রয়েছে ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশনের জন্যে। প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করে আমি প্রতিটি বিষয়ের উপর একটি করে প্রায় ১০/১২ টি লিফলেট গ্রহণ করলাম। সবগুলিই অত্যন্ত সুন্দর ইংরেজি ভাষায় ইসলাম ধর্মের মূল এবং মৌলিক বিষয়বস্তুর উপর লেখা হয়েছে। যেমন ঃ- What is Islam? Who is Allah? What is Quran? What is Salat? What is Zakat? What' is Fasting? What is Hajj? ইত্যাদি। অনেক রাতে হোটেল ডিনার সেরে রেস্টহাউসে ফিরলাম। ঐ বৃদ্ধলোক কিন্তু আমাকে ঠিকই বলেছিলেন ঐ মসজিদটি- সম্পর্কে। তাঁকে আমি মনেমনে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

পরদিন খুব ভোরে উঠেই নামাজ কালাম পড়ে গোসল ইত্যাদি সেরে নিয়েই নীচে নেমে এসে অপেক্ষা করতেই দেখি ঠিক আটটাতেই আমার ট্যাক্সি এসে উপস্থিত। কাল বিলম্ব না করেই তাকে বললাম, চলুন সী-বিচের দিকে। পথে যেতে যেতে সে ধারা বিবরণী দিতে লাগল সুন্দর ইংরেজি ভাষায়। বেশ অনেক খানি পথ পাড়ি দিয়ে আমরা পৌছালাম প্রখ্যাত পেনাং সমুদ্র সৈকতে। সেখানে প্রচুর উন্নত মানের লাক্সারী হোটেল রয়েছে দেখার মত। বহুতলা বিশিষ্ট সারি সারি সুদৃশ্য হোটেলগুলি যেন ছাতছানি দিয়ে ডকে,- এখানে এস। সম্মুখে প্রকাণ্ড লনে রয়েছে প্রচুর চেয়ার, আরাম কেদারা। রয়েছে স্পীডবোট ও নৌকা নানা ধরণের। আমার একটু ইচ্ছা ছিল, স্পীড বোটে সমুদ্র ভ্রমন করা। কিন্তু বেলা সাড়ে নয়টার পূর্বে সেগুলি পাওয়া যাবেনা। তখন সবেমাত্র ৯টা বাজে। অতএব, আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতে পারিনা দেখে আমি ও ড্রাইভার আব্দুর রহমান এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে বেশ কিছু ছবি তুরে ফিলে চলারই সিদ্ধান্ত নিলাম। বিশাল সাগরের মধ্যে তখন মাত্র

www.pathagar.com

২/৪ জন তরুণ তরুণী জলকেলীতে মত্ত। সাগরের সত্যিকার সৌন্দর্য্য সাগর তীরে বেলাভূমিতে বিচরণ করেই সন্তুষ্ট হলাম। ফেরার পথে দেখলাম একটা ভাসমান মসজিদ। আবদুর রহমান ও আমি দু'জনেই নেমে পড়লাম গাড়ী থেকে। তুললাম বেশ কিছু ছবি। মসজিদ ছোট হলেও বেশ সুন্দর এবং সাগর থেকে যেন উঠে এসেছে। এ কারণেই সম্মুখে বিশেষস্থান নেই। বহুতল বিশিষ্ট অতি সুউচ্চ পরপর তিনটি বিশাল ভবন সমুদ্রের নিকটেই দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন অতন্ত্র প্রহরী। পেনাং এর সর্ব্বোচ্চ ভবন ৬৫ তলা বিশিষ্ট তুন আবদুল রাজ্জাক কমপ্লেক্স অথবা কোমটার (KOMTAR) টাওয়ার বিল্ডিং এই প্রসিদ্ধ দ্বীপের জন্যে বিশাল প্যানের্যামিক দৃশ্য হিসেবে নীল আকাশের নীচে এককভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে যেন তার উচ্চতার গর্বে গর্বিত। এভাবেই প্রায় তিন ঘন্টা পেনাং এর দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে ঘন্টা পিছু ২৫ রিংগীত হারে মোট ৭৫ রিংগীত ড্রাইভারকে দিই এবং তাকে ঠিক ১২ টার দিকে পুনরায় আসার জন্যে বলে দিই যাতে আমাকে সে বাসস্ট্যান্ডে পৌছে দিতে পারে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালা লামপুরের উদ্দেশ্যে যাত্রার জন্যে।

গতকালের দেওয়া সেই ফটো স্টুডিওতে নিয়ে আমার ছবিগুলি নিয়ে নেই। একটা ভাল মুসলিম রেস্টুরেন্টে উত্তমরূপে ব্রেকফাস্ট করি। এরপর হোটেলে গিয়ে আমার লাগেজ নিয়ে নীচে নেমে এসেই দেখি আব্দুর রহমান প্রস্তুত। আমি তাকে ব্রেকফাস্ট করাতে চাইলেও সে করেনি। যেহেতু তার গাড়ীতেই তার স্ত্রী সব খাবার তৈরী করে দিয়েছিল। বেশ চমৎকার পোষাক পরে থাকে সে। আবার ২০ রিংগীতের বিনিময়ে বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সে আমর লাগেজ বয়ে নিয়ে গিয়ে বাসের টিকিট যোগাড় করে আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে তবেই সে বিদায় নেয়। প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে গাড়ী ছাড়ে।

পেনাং ছেড়ে কিছুদূর এসেই আবার সেই বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ব্রিজের উপর দিয়ে এলাম। দেখলাম কিছুদূরেই ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সম্ভবত বিশ্বের বৃহত্তম ব্রিজটি নির্মীয়মান অবস্থায় আছে। এবারও এসি বাস প্রয়োজন মত নির্দিষ্ট স্থানে থামে যাত্রীদের সুবিধার্তে। একটা খুব বড় হোটেলের সামনে থামল দুপুরের খাবারের জন্যে। পছন্দমত যার যা খাবার তুলে নিয়ে দাম মিটিয়ে খাওয়া শেষে আবার যাত্রা শুরু। প্রায় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পুনরায় বাসস্ট্যাণ্ডে এসে নামলাম। আমার সেই পূর্বের হোটেল এমির‍্যান্ডে ঐ ৫২০ নং রুমেই এসে উঠলাম। মাগবিরের নামাজান্তে কিছু বিশ্রামের পর রাতের খাবারের জন্যে নীচে লিফটে রাস্তার ওপাশে একটা মুসলিম রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেয়ে নিই। আগামীকাল সোমবার ২৫ জুন। ঢাকা থেকে আমাকে সিঙ্গাপুরের জন্যে ভিসা দেওয়া হয়েছিল ২৬ জুন পর্যন্ত। অতএব, আমাকে আবশ্যই ২৬ জুনের মধ্যেই সিঙ্গাপুর পৌছতে হবে। যদিও সিঙ্গাপুর এয়ারপোর্টে আমার

www.pathagar.com

পাসপোর্টে ১৩ জুলাই পর্যন্ত সিল লাগান রয়েছে এটা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সুতরাং আগামীকালই কেবল আমি কুয়ালা লামপুরে থাকতে পারব। রাতে টিভিতে খানিকটা সংবাদাদি শুনলাম এবং দেখলাম। এমনিতেই বেশ ক্লান্ত ছিলাম- ঘুমিয়ে পড়লাম ফ্যান ও এসি দুটো ছেড়ে দিয়ে।

সিঙ্গাপুরের তুলনায় মালয়েশিয়ায় জিনিসপত্র অপেক্ষাকৃত সস্তা মনে হয়। সাধারণত টুরিস্ট অভিযাত্রীরা এখানেই অধিক কেনাকাটা করেন জানতাম এবং দেখলামও তাই। অতএব, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কিছু মার্কেটিং অবশ্য সেরে ফেলবো আজই এবং কালকে সিঙ্গাপুর যাত্রার জন্যে বুকিংও করে নিব। সকালের নাস্তা সেরে পুত্তরায়াতে বাসের জন্যে বুকিং দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সিঙ্গাপুরে নাজমাকে ফোনে জানিয়ে দিলাম কখন কোন বাসে আমি কোথায় পৌছাব। এরপর শপিং সেন্টারের দিকে যেমন চায়না টাউনের দিকে গিয়ে প্রথমেই ছোট বড় সব ছেলে মেয়েদের জন্যে এক চীনা মহিলার কাজ থেকে বিভিন্ন মাপের মালয়েশিয়ার লোগো যেমন টুইন টাওয়ার, টেলিকমিউকেশন টাওয়ার, মসজিদ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের চিত্র-বিচিত্র ছাপান পাকা রং এর গেঞ্জি কিনলাম ডজন খানেক। আমার ক্যামেরায় যত ভাল ছবিই তুলিনা কেন, ভিউকার্ডের মত অত সুন্দর ছবি তোলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যে আমি যত স্থানেই গেছি, দেশ বিদেশের ভিউকার্ড আমি অবশ্যই কিনে থাকি। এবারও মালয়েশিয়া ও পেনাং এর যত উত্তম ছবি পেলাম প্রায় সবই কিনে ফেললাম। কুয়ালামপুরের বিখ্যাত বই বিক্রেতা 'পপুলার বুক শপ থেকে কিনলাম ভিজিটরস্ গাইড টু মালয়েশিয়া- দাম নিল ৪০ রিংগীত। এত দামী বইয়ের সঙ্গেও দিল ফ্রি সিডি ক্যাসেট। প্রায় দীর্ঘ ৪০০ পৃষ্ঠার বই। বহু মূল্যবান তত্ত্ব ও তথ্য সম্বলিত এবং বহু মূল্যবান রং-বেরঙ্গের ছোট বড় ছবি সমৃদ্ধ বইটি। এছাড়াও রয়েছে প্রচুর ম্যাপ। সারাটাদিন ঘুরতে ঘুরতে আরও বিভিন্ন টুকিটাকি জিনিষপত্র কেনাকাটা করতে গিয়ে অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে আমার হোটেলে ফিরলাম। যোহরের নামাজ সঙ্গে সঙ্গে পড়তে পারলাম না। একটু বিশ্রাম নিয়ে বেলা সাড়ে তিনটার দিকে উঠে বহু কষ্টে নামাজ আদায় করলাম। আমার সঙ্গে সব সময় প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র থাকে। যা প্রতিদিন আমাকে নিয়মিত খেতে হয় বিগত কয়েক বছর। এলোপ্যাথী এবং হোমিওপ্যাথী এই দু'ধরনেরই বেশ কিছু প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবস্থা আমার সঙ্গে থাকেই। বিকেলের দিকে আবার কিছু জামা কাপড় কিনলাম। লাগেজ এনেছিলাম একটা এবার হল তিনটা। আমার নিজের জন্যে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আমার প্রিয় বই, যা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভভ নয়। এ জন্যেই প্রথমেই যে বইটি কিনেছিলাম তার নাম হল ঃ "Tudung Beyond Face Value". টুডুং অর্থাৎ মেয়েদের মাথার রুমাল।

www.pathagar.com

আমার বড় ছেলে ফারুক আমার চাহিদা মোতাবেক একটা বেশ দামী রিভলভিং বুক শেলফ তৈরী করে দিয়েছে। যাতে আমি প্রায় হাজার খানেক বই সুবিন্যাস্ত ভাবে সাজিয়ে রাখতে পারি এবং এক নজরে সব বইগুলি আমার নজরে আসে। এতে রয়েছে মোট পাঁচটি থাক। সবার উপরের থাকে আছে ধর্মীয় Religions (Miscellaneous) দ্বিতীয় থাকের নাম ঃ Holy Books, তৃতীয় থাকের নাম ঃ ENGLISH SECTION, চতুর্থ থাকের নাম ঃ BENGALI BOOKS এবং পঞ্চম বা শেষ থাকের নাম ঃ ALBUM (Land scape of the world). অতএব কোন প্রয়োজনীয় বই আমাকে বেশী খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করতে হয়না। একাজের জন্যে আমার ছেলের প্রতি রইল আন্তরিক আর্শীবাদ মুনীর (বনি) শেলফটির জন্যে প্রতিটি থাকের চতুর্দিকে বোল্ড টাইপের ছাপান প্রিন্ট চমৎকারভাবে লাগিয়ে দিয়েছে। তার জন্যেও আমি প্রাণ ভরে দোয়া করি।

আজ ২৬ জুন, অতএব অতি প্রত্যুষে উঠেই নামাজ কালাম পড়ে, স্নানাদি সেরে লাগেজ ইত্যাদিসহ হোটেল এমিরাল্ড ছেড়ে আসলাম। বিখ্যাত হোটেল ও রেস্টুরেন্ট ফুড কোর্টে প্রাতঃরাশ শেষে নিকটবর্তী পুডুরায়া বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে প্রথমেই আমার গাড়ীর নম্বর জেনে নিই এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ নম্বরটা সিঙ্গাপুরে নাজমাকে জানিয়ে দিই। আরওও জানিয়ে দিই গাড়ীটা গিয়ে থামবে ল্যাভোভার স্ট্রীটে বিকেল ৪টার দিক। এবার কিন্তু সিঙ্গাপুর ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে গিয়ে আমাদের সকল যাত্রীকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেয় লাগেজসহ। মজার ব্যাপার যে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় এ চেকপোস্টে আমরা কেউ ঢুকিনি। সিঙ্গাপুর চেকপোস্ট দুপ্রকার ব্যবস্থা। যেমন দেশীদের জন্যে নীচতলায় এবং বিদেশী পাসপোর্ট ধারীদের জন্যে উপরে সবকিছু ব্যবস্থা। ফলে, আমাকে নুতন করে ফরম ফিলাপ করে বিভিন্ন ধাপে ধাপে প্রচুর সময় আটকে রাখা হয়। আমি নীচে নেমে এসে দেখি সর্বনাশ। আমার বাস আমাকে ফেলে রেখে সিঙ্গাপুর চলে গেছে। আমি কিংকর্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় পড়ি। অন্য একবাস চালক আমাকে দয়া করে ল্যাভেন্ডার স্ট্রীটে নামিয়ে দেয়। আমি নাজমাদের কাউকে খোঁজ করে না পেয়ে এবং আমার পূর্ব বাসেরও কোন পাত্তা না পেয়ে অত্যন্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসি। ট্যাক্সি চালক চীনা মুসলিম আব্দুর রাজ্জাক বৃদ্ধ কিন্তু বেশ মজবুত। আমাকে বললেন, আপনি চেকপোস্ট থেকে ট্যাক্সি নিলেই ভাল করতেন। ঈশুন যেতে অনেক কম খরচা পড়ত। বাস্তবিকই তাই, আমি যে পথ দিয়ে বাসে এসেছি ঠিক আবার সেই পথ ধরেই ট্যাক্সি অনেক খানি পথ পাড়ি দিয়ে ঈশুনে ফজলুর বাসায় উপস্থিত হই।

বাসায় তালাবন্ধ দেখে আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই পাশের ফ্ল্যাটের এক মহিলা তাঁর মোবাইলে ফজলুকে আমার উপস্থিতি জানিয়ে দেন। ফজলু আমাকে

www.pathagar.com

বলে, নাজমা চেকপোস্টে গেছে আপনার খোঁজে। ওরা এখনই এসে পড়বে। বাস চালক আমাকে ফেলে রেখে এসে নাজমা ও বিপ্লবদের বলে, সম্ভবত তাঁর পাসপোর্টে কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেননা সে নাকি আমার জন্যে দীর্ঘ ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করেছিল। ফলে, নাজমা বাসায় এসে আমার ছবি নিয়ে তবেই চেকপোস্টে যায়। যা হোক, কিছুক্ষণের মধ্যেই নাজমা তার দুই ছেলেমেয়েসহ বাসায় উপস্থিত হয়। আমি তাদের এই অনর্থক ভোগান্তির জন্যে মর্মাহত হই। আমার মালয়েশিয়া ও পেনাং সফরের মোটামুটি একটা বর্ণনা তাদের শুনাই। ইতোমধ্যে নাজমা আমার ও আমার স্ত্রীর জন্যে বেশ কিছু শপিং করে ফেলেছে দেখলাম। পরের দিন অর্থাৎ ২৭ জুন নাজমা, তার মেয়ে আনিসা ও আমি বিকেলের দিকে যাই ট্যাক্সিযোগে সিঙ্গাপুর চিড়িয়াখানা দেখতে। মোটামুটি বড় আকারের এলাকা নিয়েই গঠন করা হয়েছে এটি। তবে প্রচুর গাছপালা ও জলাভূমি সংলগ্ন অভ্যন্তরীন পাকা সড়কপথে ঘুরে ঘুরে নানা প্রজাতির জীব-জন্তু, পাক-পাখালি, দেখলাম অত্যন্ত বিরল প্রজাতির সাদা-বাঘ কাঁচের ঘরের মধ্যে রয়েছে। চিড়িয়াখানার ভিতরেই একটা চমৎকার বিল্ডিং এ রয়েছে এই সমস্ত পশু-পক্ষীদের চিকিৎসা পদ্ধতির নানাবিধ নিয়মকানুন। আমি এটা ইতোপূর্বে ভারত বা ইউরোপে সম্ভবত লক্ষ্য করিনি। অথচ এটা বিশেষ জরুরী বলে আমার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে। সর্বত্র অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ বিরাজমান। আবহাওয়া এবং পরিবেশ অনুযায়ী যে যে প্রাণী থাকতে অভ্যস্ত তাদের ঠিক সেই অবস্থাতেই রাখার সপ্রশংসনীয় চেষ্টা বেশ লক্ষণীয়। আমরা দীর্ঘসময় সন্ধ্যা পর্যন্ত সবকিছু দেখার চেষ্টা করেছি। পরিশেষে নাজমা একটা রেস্টুরেন্টে আমাদের খাওয়াল। আমাদের সঙ্গে ক্যামেরা ছিল বিধায় প্রচুর ছবি তুলেছি। স্থানে স্থানে দর্শকদের আনন্দ বিধানের জন্যে চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের বিশেষজ্ঞ দ্বারা ধারা বর্ণনা বেশ চিত্তাকর্ষক ছিল। আমরা সন্ধ্যার অনেক পরে ট্যাক্সি যোগে বাসায় ফিরি। ফজলু যেমন তার কাজের চাপের জন্যে আমাকে সঙ্গ দিতে পারেনি। নাজমা সেটা তার অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রমের মাধ্যমে চমৎকারভাবে পুষিয়ে দিয়েছে। ইলাকে আমি মালয়েশিয়া থেকে ফিরে এসে টেলিফোন করি। ওদিকে জুডিকেও জানিয়ে দিই। উল্লেখ্য যে, সিঙ্গাপুরে একটি এলাকা লিটল ইন্ডিয়া নামে প্রসিদ্ধ। ভারতীয়দের বেশ প্রভাব রয়েছে প্রায় সর্বত্র।

২৮ জুন আমি, নাজমা ও আনিসা বেরিয়ে পড়ি নাস্তা করার কিছু পরেই। উদ্দেশ্য সিঙ্গাপুর সম্পর্কে একটা চমৎকার বই কেনা এবং মূল্যবান ভিউকার্ড। সেই সঙ্গে সিঙ্গাপুরের নতুন দর্শনীয় স্থানগুলি ঘুরে দেখা। সিঙ্গাপুরের অতি চমৎকার রেল ভ্রমণ মনে রাখার মত। শহরের মধ্যে বিখ্যাত বিশাল পপুলার লাইব্রেরীতে গিয়ে অনেক মূল্যবান বইএর রাজ্যে আমি খুঁজে খুঁজে বের করলাম 'The Magic of

www.pathagar.com

SINGAPORE'. ঠিক আমি যেমনটি চাইছিলাম তেমন একটা বই। প্রচুর রঙ্গীন ছবিসহ বর্ণনা বহু বিষয়ের উপর। লেখক CHEW YEN FOOK. আনিসা তার পছন্দমত কিনল ছোটদের কার্টুন সিডি। সে তার জমানো খরচা পয়সা দিয়েই কিনল। যেটা পেয়ে বিক্রেতা মেয়েটি ভারী খুশী। এরপর আমরা পার্লামেন্ট ভবনসহ অনেক ছবি তুললাম শহরের বিভিন্ন দর্শনীয় বস্তু ও ইমারতের।এরই এক ফাঁকে কিনলাম চমৎকার কিছু ভিউকার্ড যা আমার ক্যামেরায় উঠানো সম্ভব নয়। অনেক হাঁটাহাঁটি করে শহরের বহুকিছু দর্শনীয় স্থান ঘুরে ম্যাকডোনালস্‌ এ খেলাম তিন জনে বেশ তৃপ্তি সহকারে। বাসায় ফিরলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা। বিশ্বের অনেক বড় বড় শহর যেমন প্যারিস, রোম, স্টকহোম, কোপেন হেগেন, জার্মানীর তুলনায় সিঙ্গাপুর অনেক ছোট হলেও পরিস্কার পরিছন্ন ও দৃষ্টি নন্দনের দিক দিয়ে মোটেও নগণ্য নয়। আমাদের এশিয়া মহাদেশেও যে এমন সুন্দর শহর থাকতে পারে তা না দেখলে কোন মতেই বিশ্বাস যোগ্য নয়। অতএব, আমি আমার সুপ্রিয় পাঠক পাঠিকাদের অনুরোধ করব অন্ততঃপক্ষে বাড়ীর কাছে সিঙ্গাপুর একবার হলেও ঘুরে আসুন – তৃপ্তি পাবেন, খুশী হবেন।

পরের দিন শুক্রবার ২৯ জুন। অতএব আমি স্বাভাবিক ভাবেই জুম্মার দিনে কোন প্রোগ্রাম রাখিনা। আমি ফজলুর ছেলে ইমরানকে নিয়ে মসজিদে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তার মাস্টারের নিকট পড়তে যাবে এই অজুহাতে যেতে পারলো না। বিধায় আমি একাই মসজিদ অভিমুখে রওনা দিলাম। মসজিদে পৌছার পরপরই প্রচন্ড বৃষ্টিপাত হয়ে গেল। পুনরায় নামাজ চলাকালীন আবস্থায় প্রবল বৃষ্টিপাত হয়ে গেল কিন্তু মুসল্লীদের কোন অসুবিধা নামাজ চলাকালীন অবস্থায়ও অসুবিধা হতে লক্ষ্য করিনি। আমি যথারীতি প্রথম কাতারেই ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী স্থানে বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই নামাজ আদায় করলাম। বাসায় ফিরে এসেই দেখি ইমরান তার কম্পিউটারের সম্মুখে বসে কাজ করছে। আমি তার পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করতেই বলল, টিচার অনুপস্থিত, অতএব আর পড়তে যাওয়া হয়নি। মোদ্দাকথা, জুম্মার নামাজের গুরুত্ব তার না জানা থাকার জন্যেই এই অবস্থা এটা পরিস্কার বুঝা যায়। আমাদের মুসলিম সমাজে বেশীর ভাগ পরিবারে ছেলে মেয়েদের এই অজ্ঞতা আমাকে দারুণভাবে পীড়া দেয়। এজন্যেই বোধ করি একটা প্রবাদ আছে,– "নামাজ আটকা, নামাজ ৩৬০ কা, নামাজ খাটকা।" অর্থাৎ যারা কেবল মাত্র শুক্রবার দিন জুম্মার নামাজে উপস্থিত হয়,– আটদিন অন্তর অন্তর (নামাজ আটকা) যারা কেবল মাত্র বাৎসরিক ঈদের নামাজে উপস্থিত হওয়াকে অত্যন্ত জরুরী মনে করে নতুন জামা কাপড় পরে সবার আগে উপস্থিত হয় অথচ মজার ব্যাপার যে, এটা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের মত কোন ফরজ নামাজ নয়,–ওয়াজেব নামাজ (৩৬০

www.pathagar.com

কা)। আর সর্বশেষ তার নামাজের জানাযা যেটা তার কোন এক্তিয়ারভুক্ত নয়, পাড়া প্রতিবেশী মুসলিম মুর্দা হিসাবে তার মৃতদেহের জানাযা নামাজ আদায় করেন। যখন তার লাশকে একটা খাটিয়ার উপর রেখে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় (এই হল নামাজ খাটকা)। দুঃখের বিষয় এখানে একটা সূক্ষ্ম রশিকতা থাকলেও বাস্তবে কিন্তু এটাই বেশী লক্ষ্যণীয় তথাকথিত মুসলিম নামধারী সমাজের করুণ ও কঠোর চিত্র। এখানে শিক্ষিত বা অশিক্ষিতের প্রশ্ন অবান্তর। মোটকথা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কতটা অজ্ঞতা থাকলে এমনটা হতে পারে। আমি আরও লক্ষ্য করেছি বহু শিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তি কিবলা কোনদিকে এ জ্ঞানবোধটুকু পর্যন্ত বিবর্জিত। বোধকরি এ জন্যেই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন, তোমাদের নবীত অতি উত্তম ব্যক্তি, ইসলাম ধর্মও বেশ চমৎকার কিন্তু তোমারা কী? বাস্তবিকই আমরা এ দুঃখ কোথায় রাখব–কাকে বলব? শুধুমাত্র নামাজকে নিয়ে আমার এ কথা নয়। তথাকথিত মুসলিম সমাজে শিক্ষার নামে কুশিক্ষা বর্তমানে এ জাতিকে এমনভাবে অক্টোপাসের মত বেঁধে ফেলেছে যে, হেন খারাপ কাজ নেই যা তাদের পক্ষে অসম্ভব। শুধুমাত্র ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, মানবিক দিক দিয়েও তা কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে বর্তমানে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, মদ্রাসা শিক্ষাও প্রশ্নাতীত নয়।

সে দিনই বিকেলের দিকে ইলা ও নাফিজ আমাকে দ্বিতীয় বারের মত তাদের বাসায় নিয়ে যায়। অনেক রাত্রি পর্যন্ত গল্পগুজব করে খানাপিনা সেরে নামাজান্তে শয্যা গ্রহণকরি। পরের দিন তারা দুপুরে আমাকে বাইরে কোন রেস্টুরেন্টে খাওয়ার জন্যে নিয়ে যায়। আমাদের ঢাকার প্রখ্যাত বাবুর্চি ফখরুদ্দীনের ছেলেরা সেখানে দোকান দিয়েছে এবং তাদের পিতার ছবিসহ বিরাট আকারে ফখরুদ্দীন পরিচিতিসহ ফটো টাঙ্গানো রয়েছে দেখলাম। কিন্তু আমাদের পছন্দীয় খাবার না পাওয়ায় সেখানে খাওয়া হলনা। পার্শ্ববর্তী একটা পাকিস্তানী হোটেলে আমরা খাওয়া সম্পন্ন করলাম। নিকটবর্তী ইঙ্গুলিয়া মসজিদে আমরা সকলেই জোহরের নামাজ পড়ে বাসায় ফিরে আসি। নাফিজের খুবই ইচ্ছা আমাকে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত জুরংবার্ড পার্ক দেখাবে বিকেলে। আমরা আসরের নামাজের পর যখন পার্কে পৌছালাম তখন প্রায় শেষ সময়। যা হোক তবুও কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে যা বুঝলাম প্রায় ৬০০ প্রজাতির বিভিন্ন পাখীর মোট সমাহার ৮,০০০। বিশ্বের বহু দেশেই এমন বিচিত্র রং-বেরঙ্গের পাখীর একত্র সমাহার অত্যন্ত বিরল। বিশেষত পাখী প্রেমিকদের জন্যে এটি একটি উত্তম ভ্রমন স্থান বটে। জনপ্রিয় 'পাখী শোর' জন্যে চমৎকার গ্যালারী আছে সেখানে বহুলোক একসঙ্গে এসে তা উপভোগ করতে পারে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নাফিজ আমাকে সমুদ্রের ধারে নিয়ে যায়–চমৎকার আবহাওয়ায় বহু নারী-পুরুষের সমাগম সেখানেও আমরা মাগরিবের নামাজ আদায় করি স্থানীয় একটা মসজিদে। রাত্রে হঠাৎ করে জুডি টেলিফোন করে ইলাকে জানায় যে, সে আমাকে রাত্রে ডিনার

www.pathagar.com

করাবে। অতএব ইলা আমাকে রাত্রে তার বাসায় কিছু না কিছু খেতে বাধ্য করল। নাফিজ আমাকে একাই লংড্রাইভ করে ঈশুনে ফজলুর বাসায় দিয়ে যায়। প্রায় রাত্রি ১০টার পর জুডি আমাকে নিতে আসে রাত্রে ডিনারের জন্যে। আমি তো ইলার বাসায় কিছু খেয়েই ছিলাম। সুতরাং আমি আর জুডির অনুরোধ রক্ষা করতে পারলাম না। তবে জুডিসহ অনেক ছবি তুললাম। জুডি বেশ কিছু উপহার এনেছিল ফাহিমের মেয়ে ফারনাজের জন্যে এবং তার মা উর্মীর জন্যে। আমি সেগুলি ধন্যবাদের সঙ্গে গ্রহণ করি। রাত ১১ টার পর জুডি, বিদায় নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, ফাহিম আমার এই ভ্রমণে বেশ কিছু আর্থিক সাহায্য করে।

ইতোমধ্যে একদিন আমি ও বিপ্লব সারাদিন সিঙ্গাপুর ঘুরে ফিরে দেখি। দুপুরে আমরা দুজনে ম্যাকডোনালসে খাওয়া দাওয়া করি। সিঙ্গাপুরে প্রখ্যাত শপিং সেন্টার মোস্তাফাতে বেশ কিছু কেনা কাটা করি। আমার কানের জন্যে একটা হিয়ারিং এইড ম্যাসিন কিনে ফেলি। এ ছাড়াও প্রচুর লজেন্স, চকলেট, বিস্কুট, চিপস ইত্যাদি ঢাকার জন্যে খরিদ করি। ফজলুর এক সহকর্মী বন্ধু মুজিবুল হকের বাসায় আমাদের সে রাত্রেই ডিনারের দাওয়াত থাকায় সেখানকার ছেলেদের জন্যেও কিছু টফি ইত্যাদি ক্রয় করি। ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা অত্যন্ত চমৎকার ভাবে আমাদের আতিথেয়তা করলেন। রাত্রে খাবারের পূর্বেই ভদ্রলোক আমাকে তাঁর পুরো এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে আনলেন। অনেকগুলি চমৎকার সুইমিং পুল লক্ষ্য করলাম যেখানে বয়স ভেদে ছেলে মেয়েরা জলকেলি ও সাঁতারে মগ্ন। রাত ৯টার পর সব বন্ধ। অনেক রাত্রে বাসায় ফিরেই আমার আগামীকালের যাত্রার প্রস্তুতি স্বরূপ বিপ্লব, নাজমা ও ফজলু আমার ব্যাগটা চমৎকারভাবে গুছিয়ে দেয় যেটা আমি মোটেই পারিনা।

সিঙ্গাপুরে শেষ দিন রবিবার, ১ জুলাই। কাজের খাতিরে ফজলু পূর্বেই এয়ারপোর্টে গিয়ে আমাদের নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছু পূর্বেই ফোনে জানায় আমাদের কখন সেখানে পৌঁছাতে হবে। বাংলাদেশ বিমান, অতএব সময়ের কিছুই নির্ধারিত নেই। ফজলু আমাকে তার কাজের অনেক কিছুই দেখাল। বিশাল চমৎকার বিমানবন্দরে লাঞ্চ করাল। অনেক ছবি তুললাম ওদের। ওরাও আমাকে ওদের ক্যামেরায় বন্দী করে রাখল। 'ইউ' আকৃতির বিশাল বিমান বন্দর ১,২, ৩ ধাপে তৈরী যার ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে ফজলু এক কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত সেখানে। বিমান বন্দরের ভিতরেই প্রচুর অর্কিড ফুলের সমাহার, পানির ফোয়ারা যা অত্যন্ত মনো মুগ্ধকর। ফজলুর পরিবারবর্গকে বিদায় দিয়ে আমি ও ফজলু প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে চলে যাই। সেখানে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ফজলু আমার সঙ্গে ছিল তার পাসের সৌজন্যে। প্রায় ১টা ৩০ মিনিটে আমার বিমান আকাশে উড়াল দিল সোজা ঢাকার উদ্দেশ্যে– গুড বাই সিঙ্গাপুর।

www.pathagar.com

শেষ কথা

অনেক কথা ইতোপূর্বে বলে ফেলেছি। অথচ এই শেষ কথাটুকু না বললেই যেন নয়, তাই বলা। জীবনের এই শেষ বিকেলে এখন আর অনেক কিছুই মনে করতে পারি না, তবুও মনের আকুতিকে দমিয়ে রাখতে পারিনি বলেই শেষ বারের জন্য কলমের ইতি ব্যবহার। অবশ্য এই বই লেখার পিছনে প্রধান যে পটভূমি তা'হল আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় ছোট হুজুর পাক হযরত সৈয়েদেনা সৈয়দ শাহ্ রোওয়াইশেদ আলী আল কাদেরী সাহেব কেবলার অনুপ্রেরণা। তিনি নিজে যেমন বহু দেশ ভ্রমন করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরও করবেন, তেমনিই যারা ভ্রমণ পিপাসু তাদেরও তিনি যথেষ্ট স্নেহ করেন, ভালবাসেন।

বিধায়, আমি যখনই কোন দেশ ভ্রমণ করে তাঁর সামনে হাজির হয়েছি তখনই তিনি আমাকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করেছেন কিছু লিখবে তো? তাঁর একান্ত স্নেহভাজন হিসাবে এ ধরনের বই লেখার জন্য যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করেছি বলেই যেন এই শেষ বারের মত আমার লেখা স্মৃতিকণা আমার প্রিয় পাঠক ও পাঠিকাদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলাম। আমার আত্মকাহিনী ও ভ্রমন বৃত্তান্ত বিষয়াবলী একত্র লেখার মূল ব্যাপার হল যে, লেখকের জীবন ইতিহাস এবং ভ্রমণ কাহিনী বিলক্ষণ ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। কেননা, কেবল ভ্রমনকাহিনী যেন অনেকটা ট্র্যাভেল গাইড সদৃশ। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য তা নয় বলেই আমার আত্মকাহিনীটা জুড়ে দিতে হল নানা কারণে। আশাকরি আমার সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ আমার এ বিষয়টা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন, তাহলেই আনন্দ পাবেন।

বাস্তবিকপক্ষে বস্তুনিষ্ঠ ও সত্যনিষ্ঠ বিষয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ চিরন্তন। ফলে, স্বউপার্জিত লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে অবসর জীবনে এমন দীর্ঘ ভ্রমন খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। এতে আমার মাত্র তিনটি প্রধান আকর্ষণ। যথাঃ এবাদাত, জিয়ারত এবং পর্যটকের দৃষ্টিতে পৃথিবী দেখা। আমাদের প্রিয় নবীজি (সাঃ) জ্ঞান অন্বেষণের জন্যে সুদূর চীন পর্যন্ত যাওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। অতএব জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির পক্ষে কখনই নিজেকে একস্থানে আটকে রাখা সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

এ বইয়ের প্রুফ দেখার ঝামেলা প্রথম আমার উপর দিয়েই গেছে। যদিও একাজে আমার স্ত্রী এবং আমার বড় পুত্রবধু সীমা আমাকে বেশ কিছুটা সাহায্য করেছে বলে আমি তাদের নিকট কৃতজ্ঞ। পরিশেষে, বাংলা সাহিত্যের দিকপাল এবং বহু সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান আমার এ বইটির জন্যে একটা ছোট্ট ভূমিকা লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর বহু ব্যস্ততার মধ্যেও দয়া করে আমার শেষ প্রুফটাও এক নজর দেখেছেন বলে আমি তাঁর এবং তাঁর পরিবারবর্গের সকলের জন্যে আন্তরিকভাবে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করি।

লেখকের কৃতজ্ঞতা স্বীকার বলেও একটা কথা আছে। তাই এই সুযোগে জনাব এস এম রইসউদ্দিন, পরিচালক প্রকাশনা বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরও আমি জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। কেননা তাঁদের সকলের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এ পুস্তকখানি এত সুন্দরভাবে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না।

বনানী, ঢাকা

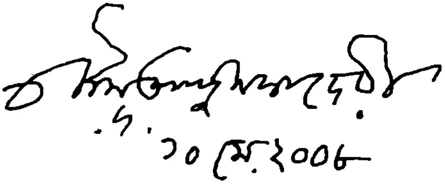

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কোলকাতার বিখ্যাত বোটানিক্যাল গার্ডেন বটবৃক্ষের মূল কান্ডটি আবিষ্কার করতে পারলে পুরস্কার দেয়া হবে, যা আজ পর্যন্ত কেউ আবিস্কার করতে পারেনি ।

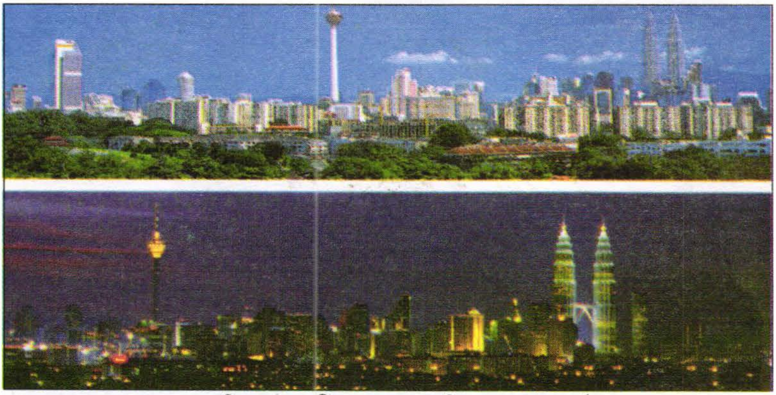

২০০৭ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুর দিন ও রাতের অপূর্ব মনোরম দৃশ্য ।

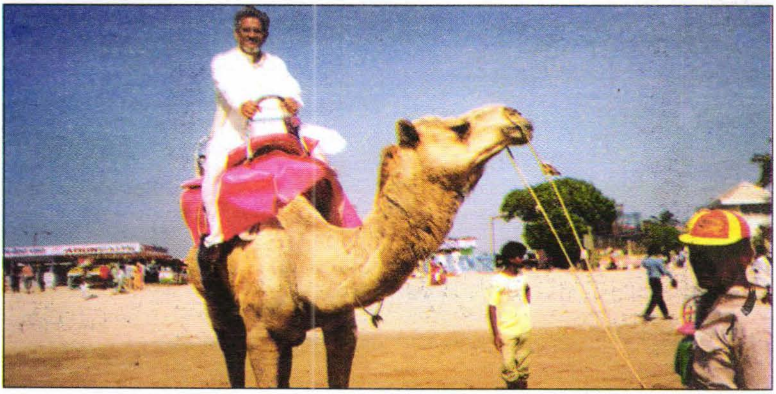

লেখক- ১৯৯৬ সালে মুম্বাই জুহু বীচে উটের পীঠে দূর দৃশ্য অবলোকন করছেন ।

www.pathagar.com

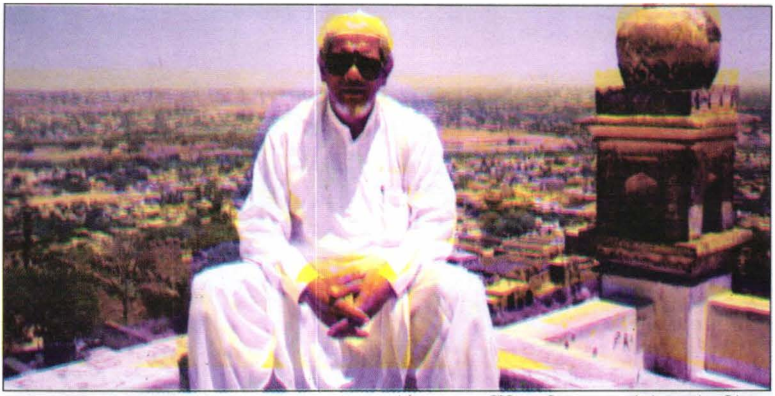

লেখক-১৯৯৬ সালে ভারতের হায়দ্রাবাদে গোল্ডকুন্ডা কোর্টে ৭২০ ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে ৪২০ ফুট উপরে উপবিষ্ট।

বাংলাদেশ পলিটেকনিক শিক্ষক সমিতি কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ-এর র‍্যালিতে লেখককে প্রথম সারিতে (ডান দিক হতে তৃতীয় স্থানে) দেখা যাচ্ছে।

রোমে ইউরোপের সর্ববৃহৎ মসজিদ মুসলিম বিশ্বের ২৩টি দেশের দানে নির্মিত ক্রমানুযায়ী বাংলাদেশের স্থান ৪র্থ।

www.pathagar.com

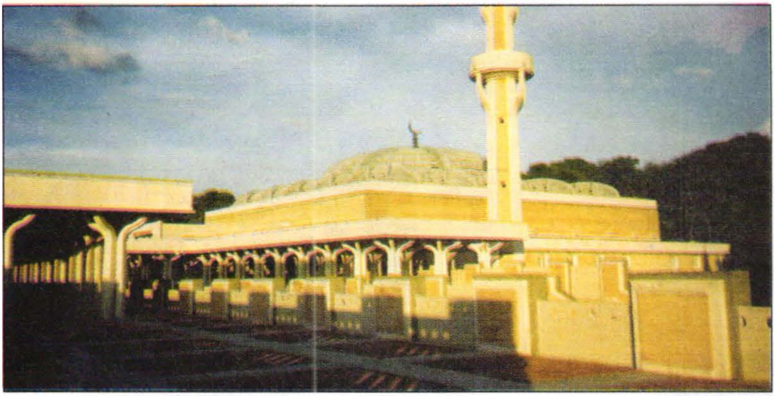

রোমে ইউরোপের সর্ববৃহৎ জামে মসজিদ প্রায় ১০ হাজার লোকের একত্র জামাত সম্ভব। ছবিটি অক্টোবর, ২০০২ সালে তোলা হয়।

রোমে ইউরোপের সর্ববৃহৎ জামে মসজিদ বিশ্বের ২৩টি মুসলিম দেশের অর্থানুকুল্যে নির্মিত।

জার্মানীর রাজধানী বার্লিনের একটি বিখ্যাত চার্চ (Cathedral)

www.pathagar.com

সুইডেনে গোথেনবার্গে (শাহীনের বাসার সম্মুখে) রাস্তার বরফ পরিষ্কার করা হচ্ছে।

সুইডেনের থ্রোল হাসানে কৃত্তিম তিনটি জল প্রপাত থেকে বিশাল জ্বলরাশি বাৎসরিক ছেড়ে দেওয়ার অপূর্ব দৃশ্য।

তেজগাঁও এতিম খানায় একসঙ্গে উনিশটি মেয়ের শুভ বিবাহ উপলক্ষে লেখক আমন্ত্রিত হয়ে আর্থিক সাহায্যের সুযোগ লাভ করেন।

www.pathagar.com

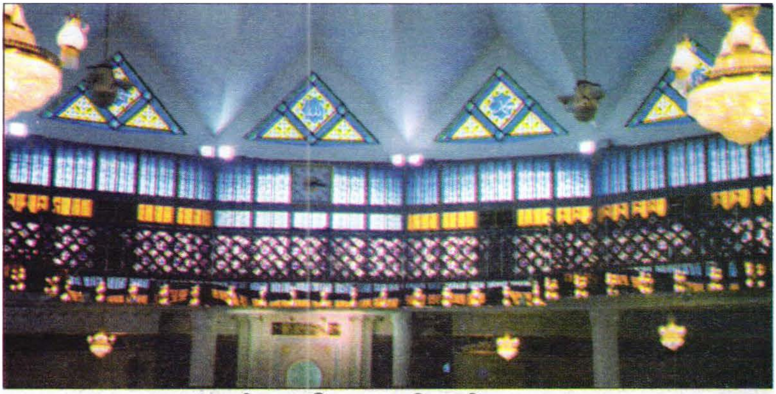

মালয়েশিয়ার জাতীয় জামে মসজিদের ভিতরের দৃশ্য।

সিঙ্গাপুরে চাংগী এয়ার পোর্টে লেখক তাঁর প্রিয়তম ছাত্র ফজলুল হকের পরিবারসহ।

লেখক- জুন, ২০০৭ সালে পুত্রজায়ার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সম্মুখে।

www.pathagar.com

গোথেনবার্গের কোরটাডালায় মেজর মনসুর সাহেবের ড্রইং রুমে রুমির কোলে ফাবিয়ান, ফারুক, তার মা, বোন শাহীন, ওদের প্রিয় ভাবী রীনা।

সুইডেনের রাজধানী স্টকহমে বিখ্যাত নোবেল হাউসের সম্মুখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে লেখক সস্ত্রীক। পিছনে বিশাল মনোহর লেক- ১৯৯৯।

র‍্যামবার্গ পাহাড়ের চূড়ায় যেখান থেকে গোথেনবার্গ শহরের অনেকখানি দৃশ্যমান। লেখক সস্ত্রীক, রুমী তার মেয়ে মোনামীসহ- ১৯৯৯

www.pathagar.com

গোথেনবার্গের রেলওয়ে ষ্টেশনের নিকট মনোরম পরিবেশে সস্ত্রীক লেখক, কন্যা শাহীন ও নাতনি মোনামী- ১৯৯৯

গোথেনবার্গে বোটানিক্যাল গার্ডেনে লেখক তাঁর পরিবারবর্গসহ আনন্দময় মুহূর্তে।

স্টকহমে বিশ্বের বিখ্যাত ব্যক্তিদের হাতের ও পায়ের মেটালিক ছাপসহ স্বাক্ষর চিহ্নিত। বক্সার মোহাম্মদ আলী ও কালো মানিক পেলে ফুটবলার।

www.pathagar.com

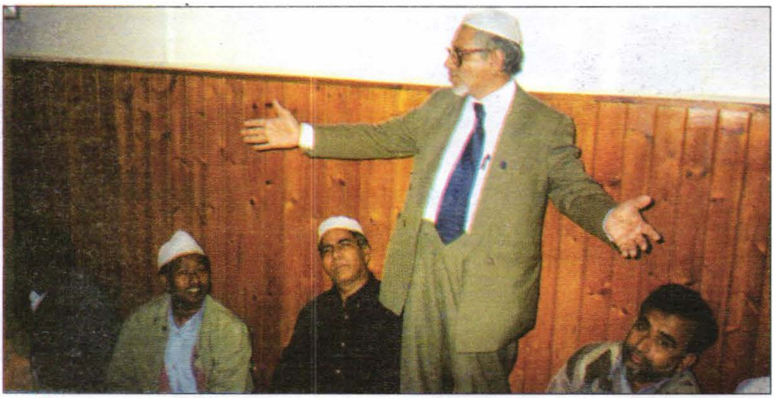

২০০২ সালে রোমে "টেষ্ট অফ বাংলা রেস্টুরেন্ট" উদ্বোধন উপলক্ষে লেখক মিলাদ মাহফিলে ওয়াজরত অবস্থায়।

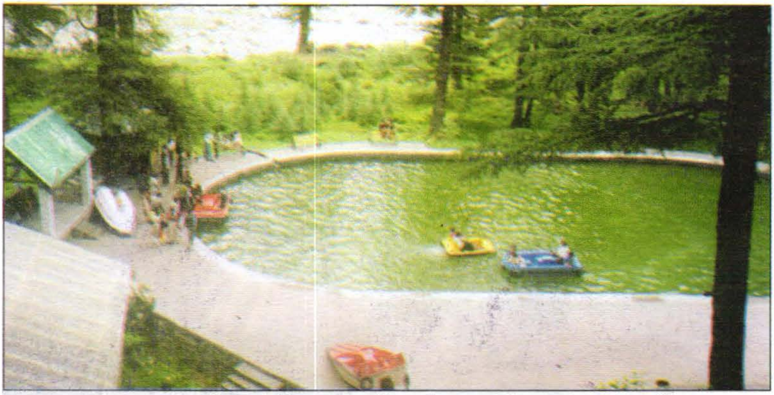

ভারতের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত পাহাড়ী শহর মানালী। পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে প্রখ্যাত আকর্ষণীয় স্থান।

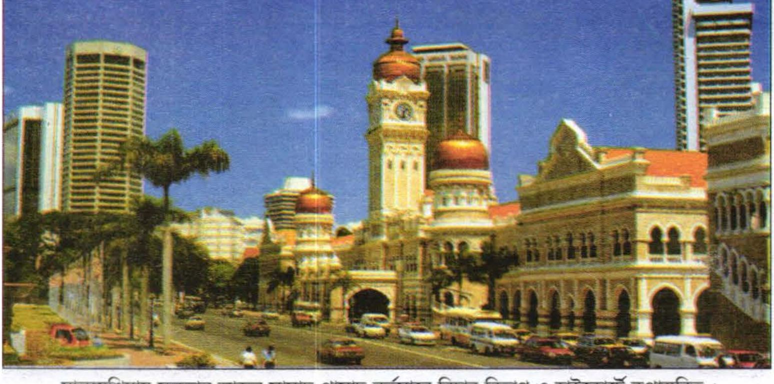

মালয়েশিয়ায় সুলতান আব্দুল সামাদ প্রাসাদ বর্তমানে বিচার বিভাগ ও হাইকোর্টে রূপান্তরিত।

www.pathagar.com

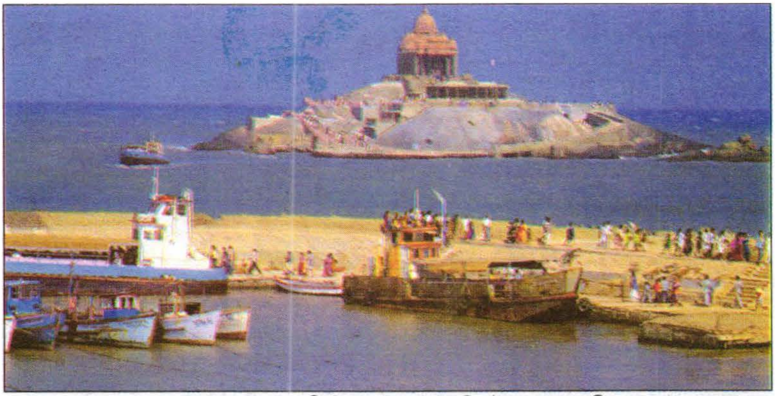

ভারত মহাসাগরে স্বামী বিবেকানন্দ রক স্মৃতিসৌধ, কন্যাকুমারী

১৯ জুন ১৯৯৯ সালে লেখকের স্ত্রী, জামাতা রুমি, মেয়ে শহীন ও নাতনী নোমানী গোথেনবার্গের রোজ গার্ডেনে (৩০০০ প্রকার গোলাপ সজ্জিত এ বাগান)।

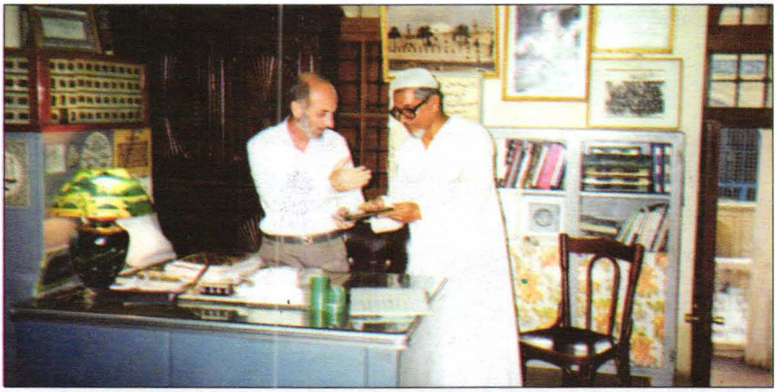

বাগদাদ শরীফে সম্মানিত লাইব্রেরীয়ানকে লেখক তার লিখিত বই আমার পীর হযরত গওসুল আজম (রা.) অর্পন করছেন।

www.pathagar.com

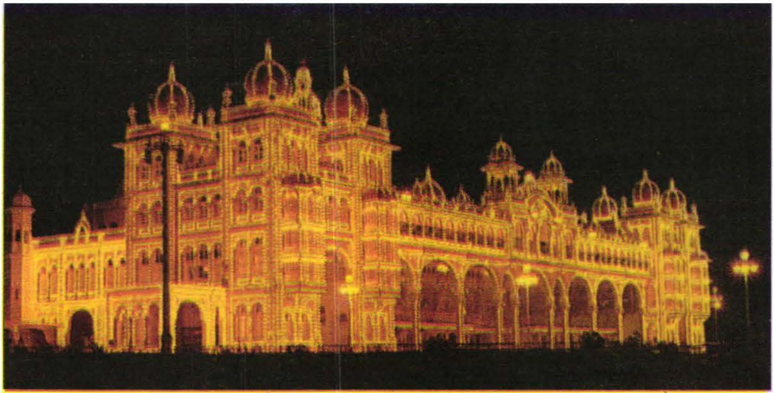

মহীশূরে মহারাজার আলোকিত প্রাসাদ

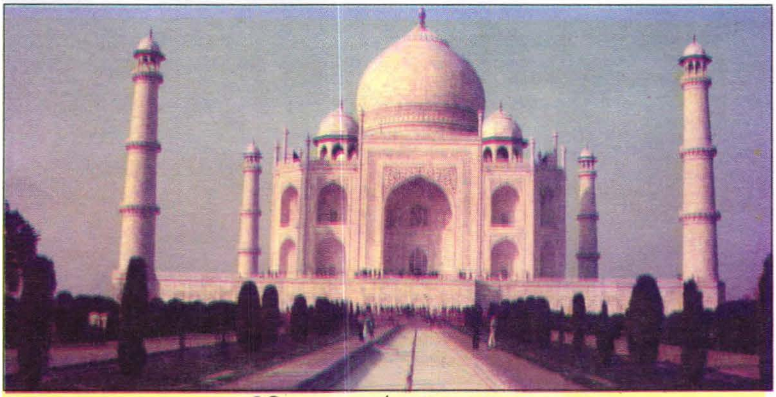

পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতের তাজমহল

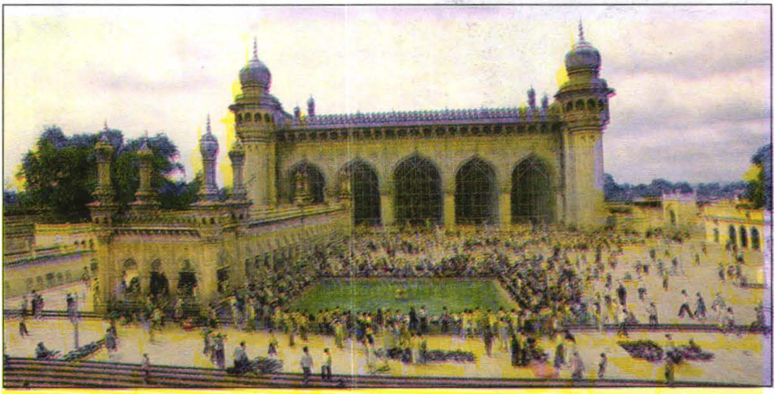

মক্কা মসজিদ, হায়দ্রাবাদ

www.pathagar.com

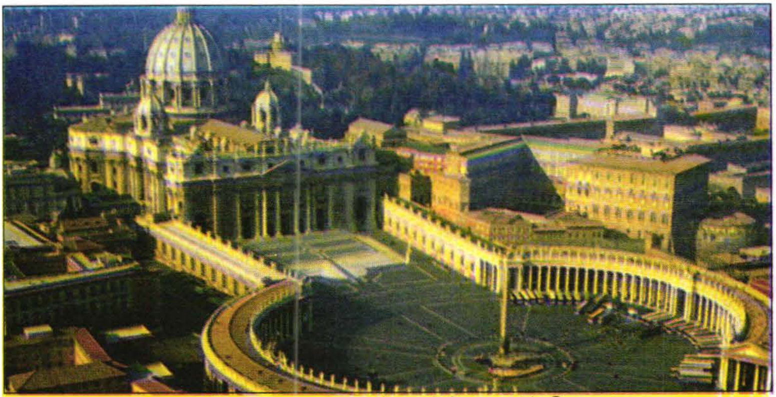

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম শহর ভ্যাটিকান সিটি, রোম- ইটালী

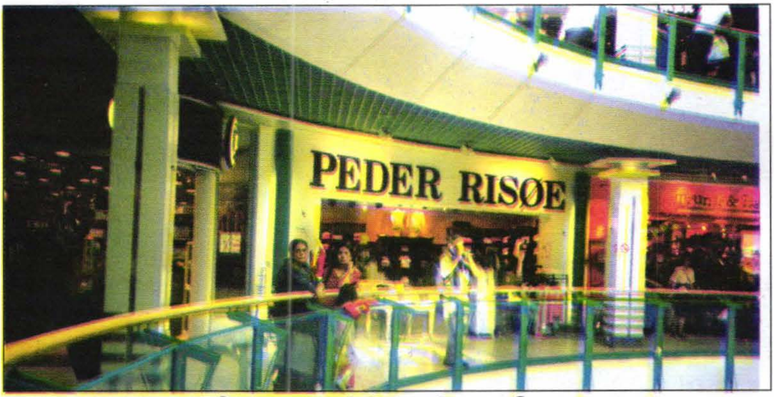

নরওয়ের রাজধানী অসলোতে একটি বিখ্যাত শপিংমলে শাহীন, তার মা ও মেয়ে

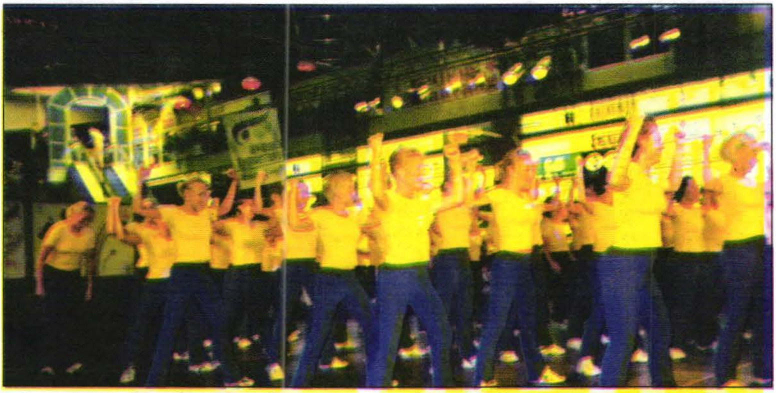

বিশ্বের ৪২তম জিমনাষ্টিক শো অনুষ্ঠিত হয় গোথেনবার্গে প্রধান বিপনীকেন্দ্রে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশের ছেলে-মেয়েরা অংশগ্রহণ করে। ছবিতে সুইডেনের তরুণীদের শারীরিক কসরত দেখানো হচ্ছে।

www.pathagar.com

মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে- অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র।

ছোট্ট মাছধরা গ্রাম থেকে বর্তমানে বিশাল সমুদ্র বন্দরে রূপান্তরিত সিঙ্গাপুর।

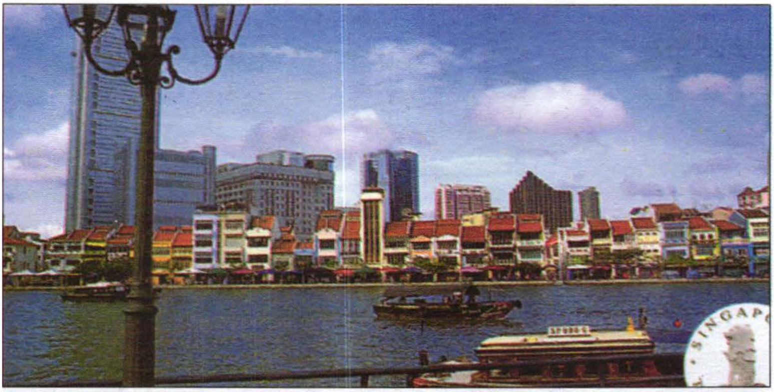

পর্যটকদের দারুণ মনলোভা আকর্ষণ সিঙ্গাপুর নদীতে নৌকা বিহার।

www.pathagar.com

মারগ্রামে মীরাপাড়ায় মসজিদ সংলগ্ন রওজা মোবারক হযরত সৈয়দ মহম্মদ সালেহ সাহেব (রহ.) এবং তৎপুত্র হযরত সৈয়দ শাহ মহম্মদ গোলাম মুর্ত্তজা সাহেব (রহ.) তথা যিনি মীর সাহেব নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

কাশ্মিরের গুলমার্গে পর্যটন কেন্দ্রে শ্রীনগরের স্কুলের ছেলে মেয়েরা

মাড়গ্রামে বুড়াপীর তলায় উঁচু টিলার উপর সুরক্ষিত আছে হযরত জাফর খাঁ গাজীর (রহ.) মাযার মোবারক এবং তার পার্শেই তার ভাইয়ের রওজা মোবারক।

www.pathagar.com

রওযা মোবারক হযরত সৈয়দ শাহ আব্দুল্লাহ কিরমামী (রহ.) খুষ্টিগিরি।

দার্জিলিং শহরের সর্বোচ্চ স্থানে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত গোল-চত্তর।

ভারতের জম্মু যাদুঘরে রাজা কিরণ সিংহের ১০০ কেজি সম্পন্ন স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসন আজ পর্যন্ত রক্ষিত আছে।

www.pathagar.com

মঙ্গল কোর্ট শরীফে নবনির্মিত খানকা-ই ক্বাদেরীয়াহ সুরম্য মসজিদ পার্ক।

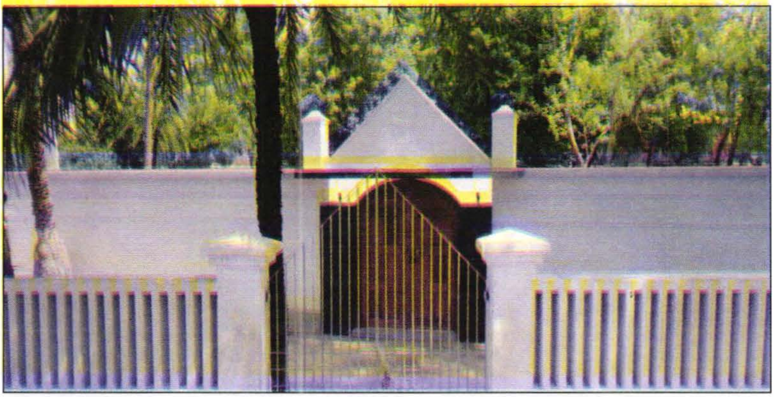

মঙ্গলকোর্ট শরীফে মসজিদ পার্ক সংলগ্ন রওজায়ে আকদস হযরত সৈয়দ শাহ জাকের আলী আল কাদেরী (রহ.) ও হযরত সৈয়দ শাহ তোফায়েল আলী আল কাদেরী (রহ.) সহ আরো একজন সাহেব জাদার মাযার শরীফ রয়েছে।

কাশ্মিরের শ্রীনগরে মুঘল বাদশাহদের তৈরী ডাল লেকের পূর্ব প্রান্তে পাশাপাশি দুটি বিশাল পুস্প উদ্যান। একটি সালামার ও অপরটি নিশাত উদ্যান।

www.pathagar.com

মাড়গ্রামের চৌধুরী পাড়া সংলগ্ন পশ্চিম প্রান্তে বিশাল এলাকাসহ নির্মিত খানকায়ে কাদেরীয়া ।

রাতের সিঙ্গাপুর সেখানে অনুষ্ঠানের কোন অন্ত নেই ।

কুয়ালালামপুর সিটি, রাতের আলোকিত মনোরম সোভামন্ডিত সৌন্দর্য ।

www.pathagar.com

বি.সি.এস. সমমান মর্যাদায় ১ম শ্রেণীর সরকারী সিনিয়র ইনস্ট্রাকটর (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং) পদে সুদীর্ঘ তিরিশ বছর কর্মরত ছিলেন। তার রচিত সরকারীভাবে Roads and Highways, Irrigation and Flood Control, Engineering Materials ইত্যাদি। এছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানীর (রাঃ) জীবনীমূলক দুটি পুস্তক রচনা করেন যথাক্রমে 'আমার পীর' হযরত গওসল আজম (রাঃ) ও পীরানে পীর হযরত গওসল আজম (রাঃ)। এছাড়াও 'মুসলিম বিশ্বে সফরনামা' তাঁহার রচিত। শিক্ষকতার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক সাধনা করেছেন। ১৯৯৭ সালে দারুল এহসান অ্যারাবিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করেন। ইন্সটিটিশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশের নেতৃস্থানীয় সদস্য পদে দায়ীত্ব পালন করেন। দেশ ভ্রমনের দুর্নিবার আকর্ষণ বোধ-এ বিশ্বের ১৯টি দেশ ভ্রমন করেছেন। পারিবারিক জীবনে লেখক দুই পুত্র ও দুই কন্যা সন্তানের জনক।

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

চৌধুরী নূরুল আজিম কাদেরী ১৯৩৩ সালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলায় মাড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা: জনাব চৌধুরী বজলে রউফ কাদেরী ওরফে ফাইয়াজ মাতা: বিবি সৈয়দা জারিয়াতুর রাসুল। শিক্ষা জীবন পাবনা জেলার জি.সি.আই থেকে ১৯৫৩ সালে মেট্রিক পাস করেন, ১৯৫৫ সালে পাবনা এড ওয়ার্ড কলেজ হতে আই এস সি পাস করেন। পাবনা ইলিয়ট বনমালী টেকনিক্যাল স্কুল হতে ১৯৬৩ সালে সাব ওভারসিয়ার কোর্স সমাপ্ত করেন। ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হতে ১৯৬৩ সালে ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং (সিভিল) পাশ করেন; ১৯৬৮ সালে টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ঢাকা থেকে ডিপ-ইন-টেক এডুকেশন অর্জন করেন। অতঃপর ১৯৭২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

ISBN-984-70241-0000-9

www.pathagar.com